ফিকাহুস সুন্নাহ

৩য় খন্ড

সাইয়্যেদ সাবেক

সাইয়্যেদ সাবেক

ফিক্‌হুস সুন্নাহ

৩য় খণ্ড

সাইয়্যেদ সাবেক

ফিক্হুস সুন্নাহ

৩য় খণ্ড

কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে লেখা
ইসলামের বিধি-বিধান ও মাসায়েল

অনুবাদ ও সম্পাদনা

আকরাম ফারূক

আবদুস শহীদ নাসিম

ফোন : ৮৩১৭৪১০, মোবা : ০১৭৫৩৪২২২৯৬
E-mail : shotabdipro @ yahoo.com

ফিক্‌হুস সুন্নাহ ৩য় খণ্ড

সাইয়্যেদ সাবেক

ISBN : 978-984-645-052-1

শ প্র : ৮০

প্রকাশক

শতাব্দী প্রকাশনী

৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৮৩১৭৪১০, মোবা : ০১৭৫৩৪২২২৯৬

E-mail : shotabdipro@yahoo.com

প্রথম প্রকাশ :

সেপ্টেম্বর ২০১২ ঈসায়ী

কম্পোজ

এ জেড কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স

মুদ্রণে

আধুনিক প্রেস

২৫, শিরিশদাস লেন

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৪২০.০০ টাকা মাত্র

FIQHUS SUNNAH : By sayyed sabiq, Published by Shatabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Phone: 8317410, Mob: 01753422296, E-mail : shotabdipro@Yahoo.Com, 1st Edition : September 2012.

Price Tk. : 420.00 only.

আমাদের কথা

আমাদের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও প্রভু মহান আল্লাহ্ই সমস্ত প্রশংসার মালিক। আমাদের প্রতি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ অসীম অবারিত। সালাত ও সালাম আমাদের নেতা ও পথপ্রদর্শক আখেরি নবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি।

মহান আল্লাহ্র অশেষ রহমতে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমি আধুনিক কালের প্রখ্যাত ফকীহ্ ও শরিয়া বিশেষজ্ঞ আল উস্তায সাইয়্যেদ সাবেক প্রণীত ফিক্হুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থখানি আরবি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও সম্পাদনা শেষ করে বাংলাভাষী পাঠকগণের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করছে। গ্রন্থটি তিন খণ্ডে প্রকাশিত।

এ গ্রন্থটি ফিক্হ শাস্ত্রের এক অমর কীর্তি। শহীদ হাসানুল বান্নার অনুরোধ, উৎসাহ ও পরামর্শে আল উস্তায সাইয়্যেদ সাবেক গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানি আধুনিক বিশ্বে ইসলামের অনুসারী (Practicing Muslim) শিক্ষক ও ছাত্রদের গাইড বই।

ফিক্হ্ শাস্ত্রের ইতিহাসে এ গ্রন্থটি একটি মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। এ যাবৎ সাধারণত মায্হাব ভিত্তিক ফিক্হ্ গ্রন্থাবলি রচিত হয়ে আসছে। কিন্তু এ গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য সেসব গ্রন্থ থেকে ভিন্ন এবং উজ্জ্বল। সংক্ষেপে এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো :

০১. এটি কোনো মায্হাব ভিত্তিক ফিক্হ গ্রন্থ নয়।

০২. এটি দলিল ভিত্তিক ফিক্হ গ্রন্থ।

০৩. শরয়ী বিধি-বিধান আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই সংশ্লিষ্ট স্বব্যাখ্যাত আয়াতসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

০৪. বিধান আলোচনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়ত রসূলুল্লাহ্ সা.-এর সংশ্লিষ্ট সুন্নাহ্ উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্ধৃত করা হয়েছে সে সংক্রান্ত হাদিসসমূহ।

০৫. সাহাবায়ে কিরামের আছার উল্লেখ করা হয়েছে।

০৬. ইজ্তিহাদ কিয়াস এবং ব্যাখ্যা সাপেক্ষ আয়াত ও হাদিসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ী মুজ্তাহিদগণের ব্যাখ্যা ও মতামত উল্লেখ করা হয়েছে।

০৭. পরবর্তীকালের মুজ্তাহিদ ফকীহ্গণের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে।

০৮. বিভিন্ন মযহাব এবং মযহাবের ইমামগণের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে।

০৯. যেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও প্রাপ্ত হয়েছে, বিভিন্ন ইসলামি আদালতের রায় ও পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করা হয়েছে।

১০. কোথাও কোথাও অগ্রাধিকারযোগ্য মত ও পথের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সার্বিক বিবেচনায় এই গ্রন্থখানি সাধারণ মুসলিম, আহলুল হাদিস, আহলুর রায় এবং বিভিন্ন মযহাবের মুকাল্লিদ (অনুসারী)- সকলের অনুসরণযোগ্য এক অসাধারণ গ্রন্থ।

ইসলামি শরিয়তের বিশুদ্ধ ও সঠিক অনুসরণের জন্যে সকল শিক্ষিত মুসলিমেরই গ্রন্থখানা পাঠ করা প্রয়োজন এবং সকলের ঘরে ঘরে থাকা প্রয়োজন মনে করছি।

এ গ্রন্থের অনুবাদ এবং মুদ্রণের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি যদি কারো নযরে আসে, তাহলে প্রকাশকের ঠিকানায় লিখিতভাবে কিংবা ফোন করে জানালে পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধন করে নেয়া হবে ইনশাল্লাহ্।

গ্রন্থখানি থেকে ইসলামের অনুসারীগণ উপকৃত হলেই সার্থক হবে আমাদের চিন্তা, পরিকল্পনা ও সার্বিক শ্রম। মহান আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা

শহীদ ইমাম হাসান আল বান্নার ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার। আর সালাত ও সালাম আমাদের নেতা মুহাম্মদ সা. এবং তাঁর অনুসারী ও সাহাবাদের প্রতি।

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ، وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ۔

'মু'মিনদের সকলের এক সাথে বের হওয়া জরুরি ছিল না। কিন্তু কতোই না ভালো হতো যদি তাদের প্রত্যেক গোষ্ঠী থেকে একটা দল অন্তত বেরিয়ে আসতো, তারা দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করতো এবং ফিরে এসে নিজ নিজ কওমের মানুষকে সতর্ক করতো, যাতে তারা সতর্ক হয়।' (সূরা ৯, আত্-তাওবা : আয়াত ১২২)

মহান আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হলো ইসলামের জ্ঞান ও দাওয়াতের প্রসার ঘটানো, সে সাথে ইসলামী বিধিমালা বিশেষত, ফিক্হী বিধিমালার প্রসার ঘটানো, যাতে করে সর্বস্তরের জনগণ তাদের ইবাদত ও আমল সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করতে পারে। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন :

"আল্লাহ্ তায়ালা যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের গভীর জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন। শিক্ষার মাধ্যমেই জ্ঞান অর্জন করা যায়। নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) দুনিয়ায় টাকা কড়ি রেখে যাননি, তাঁরা রেখে গেছেন শুধু দীনের জ্ঞান। এই জ্ঞান যে অর্জন করবে তার তা প্রচুর পরিমাণেই অর্জন করা উচিত।"

ইসলামী ফিক্হ, বিশেষত ইবাদত সংক্রান্ত বিধিমালা এবং সর্বস্তরের মুসলমানদের জন্য উপস্থাপিত সাধারণ ইসলামী বিষয়সমূহ অধ্যয়নের সবচেয়ে সরল, উপকারী, হৃদয়গ্রাহী ও মনমগজ আকৃষ্টকারী পদ্ধতি হলো, ফিক্হ্কে নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় ও বিদ্যাগত পরিভাষা ও কল্পিত খুঁটিনাটি বিধিসমূহ থেকে মুক্ত রাখা। সে সাথে ফিক্হ্কে যতোদূর সম্ভব সহজভাবে কুরআন ও সুন্নাহ্র উৎসসমূহের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং যতোটা সুযোগ পাওয়া যায় ইসলামের যৌক্তিকতা ও কল্যাণময় দিকগুলো সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করা, যাতে করে ফিক্হ্ অধ্যয়নকারীগণ উপলব্ধি করতে পারেন যে, এই অধ্যয়ন দ্বারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হতে যাচ্ছে এবং এতে দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। ইসলামের অধিকতর জ্ঞান অর্জনে এটা তাদের সবচেয়ে বেশি উৎসাহ যোগাবে।

আল্লাহ্ তায়ালা বিশিষ্ট প্রবীণ আলিম আল-উস্তায্ সাইয়্যেদ সাবেককে এই পথে পদচারণার প্রেরণা ও তওফীক দান করেছেন। তাই তিনি উৎসের সহজ ও সাবলীল উল্লেখসহ বিপুল তত্ত্ব ও তথ্য সংবলিত এই গ্রন্থখানি রচনা করেছেন এবং এতে অতীব সুন্দর পদ্ধতিতে ফিক্হী বিধিসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন। আল্লাহ চাহেন তো এর দ্বারা তিনি আল্লাহ্র কাছ থেকে যেমন উত্তম প্রতিদান লাভ করবেন, তেমনি ইসলামকে নিয়ে গর্ববোধকারী সারা বিশ্বের মুসলিম জনতাকেও করতে পারবেন অভিভূত। দীন ও উম্মতের প্রতি তাঁর এই সুমহান কীর্তি এবং দীনের দাওয়াতে তাঁর এই মূল্যবান অবদানের জন্য আল্লাহ্ তাঁকে যথোচিতভাবে পুরস্কৃত করুন, তাঁর দ্বারা মানুষকে উপকৃত করুন এবং তাঁর হাত দিয়ে তাঁর নিজের ও জনগণের কল্যাণ সাধন করুন। আমীন।

হাসান আল-বান্না

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

গ্রন্থকারের কথা

সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা লাভের মালিক আল্লাহ, যিনি মহাজগতের মালিক, প্রতিপালক ও পরিচালক। সালাত ও সালাম আমাদের পথ প্রদর্শক মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি, যিনি পূর্বাপর সকল মানুষের নেতা এবং তাঁর অনুসারীদের প্রতি, আর সেইসব লোকদের প্রতিও, প্রতিদান দিবস অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত যারা তাঁর দেখানো পথে চলবে।

আমরা সম্মানিত পাঠকগণের উদ্দেশ্যে ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড পেশ করছি। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেনো গ্রন্থটিকে পাঠকগণের জন্যে কল্যাণময় করেন, এটিকে শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি লাভের কারণ বানিয়ে দিন। তিনিই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম দায়িত্বশীল।

সাইয়্যেদ সাবেক

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিশতম অধ্যায়

ইসলামে যুদ্ধ ও শান্তি

শান্তির দীন ইসলাম: দীন ইসলাম মুসলমানদের অন্তরে যেসব নীতিমালার শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত করেছে শান্তির নীতি তার অন্যতম। ফলে তা তাদের অস্তিত্ব ও বিশ্বাসের অংশে পরিণত হয়েছে। দীন ইসলাম তার সূচনাকাল এবং তার আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরণের সূচনা থেকেই পৃথিবীর সব দিগন্তে মানবজাতিকে শান্তির দিকে আহ্বান করেছে এবং এমন একটি সঠিক পদ্ধতি প্রণয়ন করেছে যা মানবজাতিকে শান্তির দিকে নিয়ে আসে।

ইসলাম জীবনকে ভালোবাসে, তাকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করে এবং তার প্রতি মানুষের ভালোবাসা সৃষ্টি করে। এ কারণেই তা মানুষকে ভয় ভীতি থেকে মুক্ত করেছে এবং তাদের জীবিকার জন্য এমন একটি উৎকৃষ্ট পথ বলে দিয়েছে যা জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে ধাবমান এবং তা সুবিস্তৃত নিরাপত্তার সবুজ-শ্যামল ছায়ায় আবৃত। 'ইসলাম' শব্দটি আস-সালাম (শান্তি) শব্দমূল থেকে গঠিত। কেননা শান্তি ও ইসলাম উভয়ই স্থিরতা, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি বৃদ্ধি করে।

এই দীনের মহান প্রভুর নামসমূহের একটি হলো আস-সালাম (শান্তিদাতা)। কেননা নীতিমালা দিয়ে এবং পথ ও পন্থাসমূহ বলে দিয়ে তিনি মানবজাতিকে নিরাপত্তা দান করেছেন। আর এই দীনের রসূলও শান্তির পতাকাবাহী। কেননা তিনি মানবজাতির জন্য সত্য-সঠিক পথের আলোকবর্তিকা। কল্যাণ ও জ্ঞানের আলো নিয়ে তিনি এসেছেন। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন:

إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ 'নিশ্চয়ই আমি করুণার আধার ও পথপ্রদর্শক।'

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রিসালাত সম্পর্কে বলেন: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ 'আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল অনুগ্রহের পাত্ররূপেই পাঠিয়েছি।' (সূরা আম্বিয়া: আয়াত ১০৭)।

আর মুসলমানদের অভিবাদন সালাম অন্তরসমূহে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে, পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুত করে এবং মানুষকে তার অপর ভাইয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে। আল্লাহ্র কাছে সর্বোত্তম ও তাঁর নৈকট্য লাভকারী মানুষ হলো যে আগে সালাম দেয়। সালাম দেয়া ও এর প্রসার ঘটানো জ্ঞানী ব্যক্তির ঈমানের অঙ্গ।

আল্লাহ্ তায়ালা সালাম শব্দটিই মুসলমানদের অভিবাদনরূপে ধার্য করেছেন একথা জানানোর জন্য যে, নিশ্চয়ই তাদের ধর্ম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম এবং তারা শান্তিকামী ও শান্তিপ্রেমী। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: إِنَّ اللهَ جَعَلَ السَّلاَمَ تَحِيَّةً لِأُمَّتِنَا وَأَمَانًا لِأَهْلِ ذِمَّتِنَا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সালামের আদান-প্রদানকে আমার উম্মতের জন্য অভিবাদনরূপে ধার্য করেছেন এবং আমাদের অমুসলিম নাগরিকদের জন্য করেছেন নিরাপত্তার উপায়।'

মানুষের কর্তব্য হলো, কারো সাথে কথা বলা শুরু করার আগে পরস্পর সালাম বিনিময় করা। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: اَلسَّلاَمُ قَبْلَ الْكَلاَمِ 'কথা বলার আগে সালাম।' (তিরমিযী, আবওয়াবুল ইসতি'যান, বাব ১১।)[১]
এর কারণ, সালাম হলো নিরাপত্তা, আর নিরাপত্তা লাভের পরই কেবল কথাবার্তা শুরু হতে পারে। যে কোনো বালেগ ও বুদ্ধিমান মুসলমান তার প্রভুর নিকট তাঁর নবীর উপর, তার নিজের উপর এবং আল্লাহ্র সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের উপর সালাম দেয়ার মাধ্যমে শান্তি বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করে থাকেন। আল্লাহ্র কাছে মোনাজাত শেষে তিনি পার্থিব কাজ-কর্মে আত্মনিয়োগ করেন শান্তি, রহমত ও বরকতের সাথে।

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের কোনো অমুসলিম যোদ্ধা শান্তির বাণী (সালাম) উচ্চারণ করলে তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকা মুসলিম যোদ্ধার অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

---

১. ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এটি মুনকার (পরিত্যক্ত) হাদিস। আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি, রাবী আনবাসা হাদিস শাস্ত্রে দুর্বল ও অবহেলিত এবং মুহাম্মদ ইবনে যাযান হাদিস শাস্ত্রে বর্জিত, পরিত্যক্ত ও প্রত্যাখ্যাত (তিরমিযী)।
কুরআনে অপরের ঘরে প্রবেশের আগে প্রথমে অনুমতি প্রার্থনা ও পরে সালাম প্রদানের কথা বলা হয়েছে (দ্র. সূরা নূর, আয়াত ২৭) -(অনুবাদক)

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا 'কেউ তোমাদের সালাম দিলে তাকে বলো না, তুমি ঈমানদার নও।' (সূরা ৪ নিসা: আয়াত ৯৪)।

ঈমানদারগণের সাথে আল্লাহ্ তায়ালার অভিবাদন বাক্য হবে সালাম। تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ
'যেদিন তারা আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করবে সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে সালাম।' (সূরা আল আহ্যাব: আয়াত ৪৪)।

আখেরাতে ফেরেশতাগণ সালাম প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে অভিবাদন জানাবে:

وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ 'আর ফেরেশতারা তাদের নিকট উপস্থিত হবে প্রতিটি দরজা দিয়ে এবং বলবে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।' (সূরা রা'দ: ২৩-২৪)।

আর পুণ্যবানদের বাসস্থান হবে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিপূর্ণ: وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ
'আল্লাহ্ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান জানান।' (সূরা ইউনুস: আয়াত ২৫)।

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ 'তাদের প্রভুর নিকট তাদের জন্য রয়েছে শান্তির আবাস।' (সূর আনআম: ১২৭)।

জান্নাতবাসীরা শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যতীত অন্য কোনো শব্দ শোনবেওনা এবং আলোচনাও করবে না।

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا 'সেথায় তারা শোনবে না কোনো অসার কথা ও পাপকথা সালাম আর সালাম বাণী ব্যতীত।' (সূরা আল ওয়াকিয়া: আয়াত ২৫-২৬)।

ইসলাম শান্তির আদর্শ, শক্তির নয়: ইসলাম ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকে বাধ্যতামূলক করেছে এবং যুলুম-অবিচারকে হারাম করেছে। পক্ষান্তরে আন্তরিকতা, দয়া-মায়া, পারস্পরিক সহযোগিতা, ত্যাগ স্বীকার ও কুরবানিকে তার সুমহান শিক্ষা ও উন্নত মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা জীবনকে সুন্দর ও অন্তর সমূহকে সহানুভূতিশীল করে তোলে এবং মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে। ইসলাম মানুষের বিবেককে সম্মান করে, মানবীয় চিন্তা-চেতনাকে মূল্যায়ন করে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্মত হওয়ার ক্ষেত্রে বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তাধারাকে উপায় বা ব্যবস্থা মনে করে।

ইসলাম কাউকে কোনো নির্দিষ্ট বিশ্বাসের ব্যাপারে বাধ্য করে না। সৃষ্টিজগত, প্রকৃতি কিংবা মানবজাতি বিষয়ক কোনো চিন্তাধারা গ্রহণে বলপ্রয়োগ করে না। এমনকি ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রেও ইসলাম মনে করে, 'ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই'। ইসলামের পদ্ধতি হলো, আল্লাহ্র সৃষ্টি সম্পর্কে বিবেক, চিন্তা ও অন্তরদৃষ্টিকে কাজে লাগানো। যেমন, আল্লাহ্ বলেন:

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ 'ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে কোনোরূপ জোর-জবরদস্তি নেই। সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।' (২: ২৫৬)।

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ؕ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝

'তোমার প্রভু ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তাদের সকলে অবশ্যই ঈমান আনতো। তবে কি তুমি ঈমান আনার জন্য মানুষের উপর জোর জবরদস্তি করবে।' (সূরা ইউনুস: আয়াত ৯৯)।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

'আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া ঈমান আনার সাধ্য কারো নেই এবং যারা উপলব্ধি করে না আল্লাহ্ তাদেরকে কালিমালিপ্ত করেন।' (সূরা ইউনুস: আয়াত ১০০)।

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝

'বলো, আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তোমরা তার দিকে দৃষ্টিপাত করো। নিদর্শনসমূহ ও ভয় প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসবে না।' (সূরা ইউনুস: আয়াত ১০১)।

আর রসূলুল্লাহ্ সা.-এর একমাত্র দায়িত্ব ছিলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একজন প্রচারক ও তাঁর দিকে আহ্বানকারীর। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝ وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۝

'হে নবী! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।' (সূরা আহ্‌যাব: ৪৫-৪৬)।

মানুষে মানুষে সম্পর্ক: ইসলাম উপরোক্ত নীতিমালার কেবল প্রশংসাই করে না, বরং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ও দেশে দেশে শান্তি ও নিরাপত্তার সম্পর্কও গড়ে তোলে। ফলে মুসলমানদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং মুসলমানদের সাথে অন্যদের সম্পর্ক পরিপক্ক হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো।

মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক: দীন ইসলাম এসেছে একটি সমন্বিত অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে, হৃদয়ের সাথে হৃদয়কে গেঁথে দিতে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে। সেই অস্তিত্ব বিচ্ছিন্নতা, দুর্বলতা, ব্যর্থতা ও পরাজয়ের কারণ থেকে দূরে থাকবে, যাতে রিসালাতের মহান গন্তব্য, মহতী উদ্দেশ্য ও কল্যাণকর লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়িত করা যায়। তা হলো: আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, তাঁর বাণীকে সমুন্নত করা, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা, উত্তম কাজ করা এবং যেসব মূলনীতির ছায়ায় মানুষ নিরাপদে নির্বিঘ্নে জীবন যাপন করে তা স্থিতিশীল রাখার জন্য সংগ্রাম করা।

এসব কারণে ইসলাম সমাজের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক ও নিবিড় বন্ধন সৃষ্টি করতে তৎপর। এই সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য হলো, এটি এমন এক নাগরিক সম্পর্ক যা বর্ধনশীল ও স্থায়ী। এটি অন্যান্য বস্তুগত সম্পর্কের মতো নয়, যা উপলক্ষ্য শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় এবং প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ছিন্ন হয়ে যায়। এই সম্পর্ক রক্ত, বর্ণ, ভাষা, দেশ, বস্তুগত কল্যাণ ও অন্যান্য মানবিক বন্ধনের চাইতেও অধিক শক্তিশালী। এই সম্পর্কের দাবি হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে শক্তিশালী বন্ধন তৈরি করা এবং তাদের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন ও অটুট কাঠামো গড়ে তোলা।

এসব বন্ধনের প্রথমটি হচ্ছে ঈমান। এটি হলো একটি অক্ষ, যাকে কেন্দ্র করে ঈমানদারগণ একীভূত হয়। এই ঈমান মুমিনদের মাঝে বংশীয় সম্পর্কের চাইতেও শক্তিশালী ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রচনা করে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী: .....اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ 'নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।' (সূরা হুজুরাত: ১০)।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ـ 'মু'মিন পুরুষগণ ও মুমিন নারীগণ পরস্পরের পৃষ্ঠপোষক বা সহযোগী।' (সূরা তাওবা: ৭১)।

রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ. 'মুসলমান মুসলমানের ভাই।'

ঈমানের প্রকৃতি হলো সমবেত, ঐক্যবদ্ধ করা, বিভক্ত করা বা বিচ্ছিন্ন করা নয়। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: اَلْمُؤْمِنُ اٰلِفٌ مَّاْلُوْفٌ وَّلَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَا يَاْلِفُ وَلَا يُؤْلَفُ. 'মুমিন ব্যক্তি বন্ধুত্ব স্থাপনকারী ও অপরের বন্ধু হয়। তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই যে বন্ধু বানায় না এবং বন্ধু হয় না।'

মুমিন ব্যক্তি তার মুমিন ভাইয়ের জন্য শক্তির উৎস। মহানবী সা. বলেন:

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهٗ بَعْضًا. 'এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য অট্টালিকা স্বরূপ, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।'

মুমিন ব্যক্তি অপরের কষ্টে সহানুভূতিশীল হয়, তার অনুভূতি জাগ্রত করে, তার আনন্দে আনন্দিত হয়। তার শোকে ও দু:খে শোকাহত ও দু:খিত হয় এবং নিজেকে তার অংশীদার মনে করে। রসূল সা. বলেন:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعٰى لَهٗ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمّٰى وَالسَّهَرِ.

'পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া-মায়া ও সহমর্মিতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে মুমিনদের দৃষ্টান্ত হলো একটি দেহ। জ্বর ও নিদ্রাহীন রজনীর কারণে তার কোনো অঙ্গ কষ্ট অনুভব করলে তার সমস্ত দেহ তার জন্য ব্যথিত হয়, কষ্ট অনুভব করে।'

সংঘবদ্ধ হওয়া ও শৃংখলা বজায় রাখার আহ্বানের মাধ্যমে ইসলাম উপরোক্ত বন্ধনকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে এবং শক্তিশালী করেছে। পাশাপাশি তার ঐক্যবদ্ধ শক্তি-সামর্থকে দুর্বল করতে পারে এমন সব উপায়-উপকরণকে নিষিদ্ধ করেছে। আর সংঘবদ্ধ শক্তি সর্বদা আল্লাহ্‌র হেফাজতে ও তাঁর হাতের ছায়াতলে থাকে। মহানবী সা. বলেন:

يَدُ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ. 'আল্লাহ্‌র সাহায্য জামাতের (সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী) সাথে। যে ব্যক্তি (জামাত থেকে) বিচ্ছিন্ন হলো সে বিচ্ছিন্ন হয়ে দোযখে ধাবিত হলো।'

সংঘবদ্ধ জীবন মানুষের জন্য স্বভাবতই প্রশান্তির উৎস। এরপর দয়া ও অনুগ্রহের প্রসঙ্গ। রসূল বলেন:

اَلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ. 'জামাত হলো রহমত এবং বিচ্ছিন্নতা হলো আযাব।'

জামাত (সংঘ) যতো ক্ষুদ্রই হোক, যে কোনো অবস্থায় তা বিচ্ছিন্নতা থেকে উত্তম। এর সদস্য সংখ্যা যতো বেশি হবে তা আরো উত্তম। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন:

اَلْإِثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ وَالثَّلَاثَةُ خَيْرٌ مِنَ الْإِثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعَةُ خَيْرٌ مِنَ الثَّلَاثَةِ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللّٰهَ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِيْ إِلَّا عَلٰى هُدًى.

'দু'জনের সংঘ (জামাত) একজনের তুলনায় উত্তম, তিনজনের সংঘ দুজনের তুলনায় উত্তম, এবং চারজনের সংঘ তিনজনের তুলনায় উত্তম। সুতরাং সংঘবদ্ধ হওয়া তোমাদের কর্তব্য। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা সৎপথ ছাড়া অন্য কিছুর উপর কখনো আমার সমস্ত উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করবেন না।'

ইসলামের সকল প্রকার ইবাদতের জন্যই সংঘবদ্ধ হতে হয়। যেমন জামাতে নামায আদায় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। তা একাকী নামায পড়ার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি ফযিলতপূর্ণ। আর যাকাত হলো ধনী ও গরীবের মাঝে পারস্পরিক আদান-প্রদান। রোযা নির্দিষ্ট এক মাসের জন্য উপবাসে একত্রে অংশগ্রহণ। হজ্জ প্রতি বছর মুসলমানদের জন্য একটি পবিত্র সাধারণ সম্মেলন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তারা এক মহান পবিত্র উদ্দেশ্যে একত্র হয়। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন:

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَحَفَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْ مَلَإٍ عِنْدَهُ.

'আল্লাহ্‌র ঘরসমূহের মধ্যকার কোনো ঘরে এক দল লোক জমায়েত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করলে এবং পরস্পরকে তা শিক্ষা দিলে তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়, তাদেরকে (আল্লাহ্‌র) রহমত পরিবেষ্টন করে নেয় এবং আল্লাহ্ তাঁর নিকটে উপস্থিত ফেরেশতাদের নিকট তাদের আলোচনা করেন।'

মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ থাকুক এটাই রসূলুল্লাহ্ সা. পছন্দ করতেন, এমনকি বাহ্যিক কাঠামোগতভাবেও। একদিন তিনি কিছু সংখ্যক মুসলমানকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বসে থাকতে দেখে বলেন, তোমরা একত্র হও। তাই তারা একত্র হয়ে বসলেন।

জামাত একদিকে যেখানে আল্লাহ্‌র দীন রক্ষার শক্তি হিসেবে কাজ করে এবং মুসলমানদের পার্থিব স্বার্থ রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করে, অন্যদিকে সেখানে বিচ্ছিন্নতা ও বিভাজন দীন ও দুনিয়া উভয়টিকে ধ্বংস করে। ইসলাম বিচ্ছিন্ন থাকতে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছে। কেননা এটি হলো পরাজয়ের উন্মুক্ত পথ। ইসলাম বিচ্ছিন্নতা ও বিভাজনের প্রতি এতো সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে যে, অন্য কোনো বিষয়ে এতো গুরুত্ব দেয়নি যা মুসলমানদের শক্তিকে ধ্বংস করে দেয় এবং তার অনিবার্য পরিণতি হলো দুর্দশা, ব্যর্থতা, লাঞ্ছনা ও ভোগান্তি। মহান আল্লাহ্‌র বাণী:

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَأُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

'তোমরা তাদের মতো হয়োনা যারা তাদের নিকট স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।' (সূরা আলে ইমরান: ১০৫)।

وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ... 'তোমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করো না। অন্যথায়

তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নি:শেষ হয়ে যাবে।' (সূরা আনফাল: আয়াত ৪৬)।

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا 'তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জু শক্তভাবে ধরে রাখো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।' (সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১০৩)।

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ط 'আর তোমরা মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা, যারা নিজেদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।' (সূরা রূম: ৩১-৩২)।

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ط 'যারা নিজেদের দীন সম্পর্কে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তাদের কোনো দায় তোমার উপর বর্তায় না।' (সূরা আল আনআম: আয়াত ১৫৯)।

রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: وَلَا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اِخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا. 'আর তোমরা পরস্পর বিভেদ করো না। কেননা তোমাদের পূর্বকালের লোকেরা বিভেদে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়েছে।

আর কোনো জামাতেরই কখনো প্রকৃত ঐক্য অর্জিত হতে পারে না যতোক্ষণ না তার প্রত্যেক সদস্য তা অর্জনে নিজের সর্বাত্মক শক্তি ও সহযোগিতা বিনিয়োগ করে। এই সহযোগিতা বস্তুগত ও নৈতিক উভয়ই হতে পারে। যেমন ধন-সম্পদ, জ্ঞান, মতামত, পরামর্শ ইত্যাদি।

মানবজাতি হচ্ছে আল্লাহ্‌র পরিবার। আল্লাহ্‌র কাছে তাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় হলো সেই ব্যক্তি যে তাঁর পরিবারের জন্য সবচেয়ে উপকারী। যেমন রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ. 'মানুষের জন্য সর্বাধিক উপকারী ব্যক্তি তাদের মধ্যে সর্বোত্তম'।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করা পছন্দ করেন'।

اِشْفَعُوا تُؤْجَرُوا. 'তোমরা (অপরের উপকারার্থে) সুপারিশ করো, তোমাদের প্রতিদান দেয়া হবে'।

এক মুসলমান অপর মুসলমানের আয়নাস্বরূপ। সে তাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করে এবং পিছন থেকে তাকে পাহারা দেয়। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন:

إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرْآةُ أَخِيهِ فَإِنْ رَأَى مِنْهُ أَذًى فَلْيُمِطْهُ عَنْهُ. 'নিশ্চয়ই তোমাদের যে কেউ তার (মুসলিম) ভাইয়ের আয়নাস্বরূপ। সে তাকে কোনো কষ্টে নিপতিত দেখলে তা যেনো তার থেকে দূর করে দেয়।'

এভাবে ইসলাম এই সম্পর্ককে সুদৃঢ় ও মজবুত করার জন্য কাজ করে, যাতে একটি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী সমাজ গড়ে তোলা যায়। যাতে তা নিজে নতুন সমস্যার মোকাবেলা করতে এবং সীমালংঘনকারীদের শত্রুতা বিনাশে সক্ষম হয়। বর্তমান সময়ে এ ধরনের ঐক্য মুসলমানদের জন্য কতোই না প্রয়োজন। এর সাহায্যে তারা ইসলামের একটি ফরয আদায় করতে পারবে, রাজনৈতিক সুরক্ষা ও সামরিক শক্তি অর্জন করবে এবং নিজেদের অস্তিত্ব ও একক অর্থনৈতিক সুরক্ষা লাভ করতে পারবে, যা তাদেরকে প্রয়োজনীয় সমৃদ্ধি এনে দিবে।

ঔপনিবেশিক শক্তি মুসলিম সমাজে অনেক ক্ষতির প্রভাব রেখে গেছে। যেমন ধার্মিকতায় দুর্বলতা, চারিত্রিক স্খলন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতা ইত্যাদি। তাই গোটা উম্মত একই লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে একই অনমনীয় সুরে অগ্রসর হলেই কেবল এসব সামাজিক ক্ষতির প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব।

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ: মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বন্ধন রক্ষার্থে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ একটি মূলনীতি হিসেবে গণ্য। তাদের মধ্যকার এসব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন শিথিল হয়ে গেলে এবং তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করলে তখন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে যতোক্ষণ না তারা ন্যায়ের পথে এবং সামাজিক শৃংখলার মধ্যে ফিরে আসে। মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ج فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي

تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْءَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ ج فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ○

'ঈমানদারদের দু'টি দল পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে দাও। তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো যতোক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসা করে দিবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবিচারকারীদের পছন্দ করেন। (সূরা হুজুরাত: আয়াত ৯)।

উপরোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়, ঈমানদারগণ পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হলে অবিলম্বে তাতে হস্তক্ষেপ করা এবং বিবাদমান পক্ষবৃন্দের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া সমাজের বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়। যদি এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর বাড়াবাড়ি করে এবং মীমাংসার উদ্যোগ গ্রহণের পরও তারা তাতে সাড়া না দেয় তাহলে এ বিদ্রোহী দলকে বশীভূত করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সকল মুসলমানের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

হযরত আলী রা. বিদ্রোহী দলের বিপক্ষে যুদ্ধ করেছেন। একইভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ফকীহগণ একমত যে, এই বিদ্রোহী পক্ষ তাদের বিদ্রোহের কারণে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় না। কেননা কুরআনুল কারীম তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ দেয়ার পাশাপশি তাদের ঈমানদার হিসেবে বর্ণনা করেছে। যেমন আল্লাহ্র বাণী:

وَاِنْ طَائِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا... 'যদি ঈমানদারগণের দু'টি দল সংঘাতে লিপ্ত হয় (সূরা হুজুরাত: ৯)। এ কারণে তাদের মধ্যকার পলায়নপর ও আহত লোকজনকে হত্যা করা যাবে না, তাদের মালপত্র যুদ্ধলব্ধ মাল বলে গণ্য হবে না, তাদের নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা যাবে না, যুদ্ধকালে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া জীবন ও সম্পদের ক্ষতিপূরণ নেয়া যাবে না এবং বিদ্রোহীদের মধ্যকার নিহতদের গোসল, কাফন, জানাযা ও দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে।

অপরদিকে ন্যায়পন্থীদের দলের যারা নিহত হবে তারা শহীদ হিসেবে গণ্য হবে। তাই তাদেরকে গোসলও দেয়া হবে না এবং জানাযাও পড়া হবে না। কারণ তারা আল্লাহ্র নির্দেশিত যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারীদের সমতুল্য।

ইসলামি শরীয়ার বিধান মোতাবেক পরিচালিত কোনো দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী কর্তৃক নির্বাচিত ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান)-এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের বেলায়ও একই বিধান প্রযোজ্য। যদি সমাজ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইমামকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে তা করা হয়। অর্থাৎ তাদেরকে বিদ্রোহী গণ্য করার জন্য তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকতে হবে। তা হলো:

এক. ইসলামি রাষ্ট্রের ন্যায়পরায়ণ শাসকের আনুগত্য পরিহার করা। আল্লাহ্ ইসলামি শরীয়া মোতাবেক মুসলমানদের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনাকারীদের আনুগত্য করা তাদের উপর বাধ্যতামূলক করেছেন।

দুই. পর্যাপ্ত শক্তিশালী দল কর্তৃক বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়া, যাদেরকে বশীভূত করার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি, জনবল সংগ্রহ ও যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু তারা পর্যাপ্ত শক্তিশালী না হলে অর্থাৎ অল্প সংখ্যক হলে অথবা নিজেদেরকে রক্ষার মতো উপায়-উপকরণ তাদের না থাকলে তারা বিদ্রোহী হিসেবে গণ্য হবে না। কারণ তাদেরকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা ও বশে আনা যায়।

তিন. ইসলামি শরীয়া মোতাবেক ইমামের শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের আহ্বানে তাদের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা থাকতে হবে। গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা না থাকলে তারা হবে সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী, বিদ্রোহী নয়।

চার. তাদের সর্বজনগ্রাহ্য একজন নেতা থাকতে হবে। কারণ নেতা ছাড়া কোনো শক্তিশালী সংগঠন সৃষ্টি হতে পারে না।

পাঁচ. এই বিদ্রোহ সশস্ত্র হতে হবে, নিছক অস্ত্রহীন প্রতিবাদ বিদ্রোহও নয়, যুদ্ধও নয় এবং তার জন্য কোনো শাস্তিও নেই। এই হলো বিদ্রোহীদের অবস্থা ও তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্র বিধান।

অপরপক্ষে নিছক পার্থিব-স্বার্থে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য অথবা রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে বিবাদের জন্য অস্ত্র ধারণ করা হলে তা যুদ্ধ হিসেবে গণ্য হবে। সামরিক বিধান বিদ্রোহের বিধান থেকে স্বতন্ত্র উল্লেখ করে মহান আল্লাহ্ বলেন:

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে অথবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এ হলো তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি। কিন্তু যারা তোমাদের (সরকারের) আয়ত্বাধীনে আসার পূর্বে তওবা করবে তাদের জন্য (শাস্তি) নয়। তোমরা জেনে রাখো! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আল মায়েদা: আয়াত ৩৩-৩৪)।

অপরাধের ধরন অনুযায়ী বিচারকের রায় মোতাবেক সশস্ত্র বিদ্রোহীদের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড অথবা শূলীবিদ্ধ করা অথবা বিপরীত দিক থেকে হাত ও পা কেটে ফেলা অথবা কারাদণ্ড প্রদান অথবা নির্বাসন। তাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি নিহত হবে সে দোযখী এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে যে ব্যক্তি নিহত হবে সে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে। আর তাদের উভয় পক্ষই যদি অন্ধ গোত্র-সম্প্রদায় প্রীতি অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য যুদ্ধ করে তাহলে উভয় পক্ষই বিদ্রোহী হিসেবে গণ্য হবে এবং তাদের বেলায় বিদ্রোহের শাস্তি কার্যকর হবে।

মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার আন্ত-সম্পর্ক: মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার আন্ত-সম্পর্ক হলো পারস্পরিক পরিচিতি, মানবিক সহযোগিতা, সদাচার ও ন্যায়-ইনসাফ উজ্জীবিত রাখার সম্পর্ক। মহান আল্লাহ্ পারস্পরিক পরিচয় সম্পর্কে বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ○

'হে মানুষ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে এবং তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যকার সর্বাধিক ধার্মিক ব্যক্তিই আল্লাহ্র কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন। (সূরা হুজুরাত: আয়াত ১৩)।

মহান আল্লাহ্ সদাচার ও ন্যায়-ইনসাফের উপদেশ দিয়ে বলেন:

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ○

'ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে উচ্ছেদ করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণ লোকদের পছন্দ করেন। (সূরা মুমতাহিনা: আয়াত ৮)।

এসব সম্পর্কের দাবি হচ্ছে পারস্পরিক কল্যাণ বিনিময়, উপকারসমূহের মাত্রা বৃদ্ধি, সহযোগিতা প্রদান, সহমর্মিতা প্রকাশ ও মানবিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করা।

উপরোক্ত বিষয়টি কাফেরদেরকে পৃষ্ঠপোষক বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে না। কাফেরদেরকে পৃষ্ঠপোষক বন্ধু হিসেবে গ্রহণের নিষেধাজ্ঞার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাথে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতাকে

নিষিদ্ধ করা। অনুরূপভাবে তাদের কুফরীর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশকে নিষিদ্ধ করাও উদ্দেশ্য। কারণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সহযোগিতা করা দীন ইসলামের অস্তিত্বের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর এবং মুসলিম উম্মাহর শক্তিকে দুর্বল করার শামিল। অনুরূপভাবে কুফরের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশও এক ধরনের কুফরী, যা কোনো মুসলমানকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

অপরদিকে যে বন্ধুত্ব শান্তি স্থাপন, সুন্দর সমাজ গঠন, উত্তমরূপে পারস্পরিক আদান-প্রদান ও কল্যাণ বিনিময়, সৎ কাজে ও ধার্মিকতায় পারস্পরিক সহযোগিতাকে বুঝায়, ইসলাম তাকে স্বাগত জানায়।

অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা সংরক্ষণ: ধর্মীয় বিষয়ে ইসলাম মুসলমান ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সাম্য ও সমান অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। মুসলিম নাগরিকদের জন্য যেসব অধিকার রয়েছে তা অমুসলিম নাগরিকদেরও রয়েছে এবং মুসলমানদের উপর যে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায় তা তাদের উপরও বর্তায়। তাদেরকে প্রদত্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার মধ্যে রয়েছে:

এক. অমুসলিম নাগরিকদের কাউকে নিজ ধর্ম ত্যাগ করার জন্য অথবা নির্দিষ্ট কোনো বিশ্বাস গ্রহণের জন্য কোনোরূপ চাপ সৃষ্টি বা বল প্রয়োগ করা যাবে না। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ‘দীন গ্রহণের ব্যাপারে জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে স্পষ্ট হয়েছে।’ (সূরা আল বাকারা ; আয়াত ২৫৬)।

দুই. আহ্লে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের নিজ নিজ ধর্মের বিধিবিধান পালন করার অধিকার রয়েছে। সুতরাং তাদের গীর্জা ধ্বংস করা যাবেনা এবং তাদের ক্রুশও ভাঙ্গা যাবে না। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন:

أَتْرُكُوهُمْ وَمَا يَدِينُونَ ‘তাদেরকে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে দাও।

এমনকি কোনো মুসলিম পুরুষের ইহুদি বা খ্রিষ্টান স্ত্রীর নিজ প্রার্থনার জন্য গির্জা বা সিনাগগে যাওয়ার অধিকার আছে। এক্ষেত্রে তাকে বাধা দেয়ার অধিকার স্বামীর নেই।

তিন. অমুসলিমদের ধর্মে যেসব খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে তা ইসলাম তাদের জন্য বৈধ ঘোষণা করেছে। তাদের শুকরের পাল হত্যা করা যাবে না এবং তাদেরকে মদপানে বাধা দেয়া যাবে না, যতোক্ষণ তা তাদের ধর্মে বৈধ। এভাবে ইসলাম তাদের ব্যাপারে মুসলমানদের চাইতেও বেশি উদারতা প্রদর্শন করেছে। এ সমাজে মুসলমানদের জন্য মদ ও শূকর সম্পূর্ণ হারাম এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

চার. বিবাহ, তালাক ও পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা বহাল রয়েছে। তারা কোনোরূপ সীমাবদ্ধতা বা বাধ্যবাধকতা ছাড়াই ইচ্ছা মতো তাদের সম্পদ ভোগ-ব্যবহার করতে পারবে।

পাঁচ. ইসলাম তাদের মান-মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করেছে এবং বিবেক-সম্মত ও যুক্তিসংগত আলোচনা ও বিতর্কে কঠোরতার পরিবর্তে ভদ্রোচিতভাবে তাদেরকে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা দিয়েছে। আল্লাহ্ বলেন:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتٰبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلٰهُنَا وَإِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

‘তোমরা কেবল উত্তম পন্থায়ই আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক করবে, কিন্তু তাদের মধ্যে যারা স্বৈরাচারী তাদের ব্যতীত এবং বলো, আমাদের নিকট যা নাযিল হয়েছে এবং তোমাদের নিকট যা নাযিল হয়েছে আমরা তাতে ঈমান আনলাম। আর আমাদের ইলাহ এবং তোমাদের ইলাহ তো একই এবং আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পনকারী। (সূরা আনকাবূত: আয়াত ৪৬)

ছয়. কোনো কোনো মাযহাবের সিদ্ধান্ত মতে অপরাধের শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারা ও মুসলমানগণ একই বিধানের অধীন। মুসলিম ও অমুসলিম ব্যক্তি পরস্পরের ওয়ারিস হতে পারে না বটে, কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে ওয়ারিস হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের অনুরূপ তাদের অধিকার রয়েছে। অতএব সে তার মুসলমান আত্মীয়ের ওয়ারিস হয় না এবং মুসলিম ব্যক্তিও তার অমুসলিম আত্মীয়ের ওয়ারিস হয় না।

সাত. ইসলাম ইহুদি-খ্রিষ্টানদের খাদ্যদ্রব্য ও তাদের যবেহ্কৃত পশুর গোশত ভক্ষণ মুসলমানদের জন্য হালাল করেছে এবং তাদের নারীদের বিবাহ করাও বৈধ করেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন:

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۖ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

'আজ তোমাদের জন্য সমস্ত উত্তম জিনিস হালাল করা হলো। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য হালাল।[২] আর ঈমানদার সচ্চরিত্র নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্র নারী। তোমরা দেনমোহর দিলে তোমাদের জন্য (বিবাহ করা) হালাল করা হয়েছে, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা গোপন প্রেমিকা গ্রহণের জন্য নয়। কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার যাবতীয় কাজ নিষ্ফল হয়ে গেলো এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' (সূরা আল মায়েদা: আয়াত ৫)।

আট. দীন ইসলাম অমুসলিমদের সাথে দেখা-সাক্ষাত, তাদের রোগীদের দেখতে যাওয়া বা সেবা করা, তাদেরকে উপহারাদি প্রদান এবং তাদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা বাণিজ্যসহ অনুরূপ সামাজিক লেনদেনকে বৈধ করেছে। রসূলুল্লাহ্ সা.-এর মৃত্যুর সময় ঋণের দায়ে তাঁর লৌহ বর্মটি এক ইহুদির নিকট বন্ধক ছিলো। রসূলুল্লাহ্ সা.-এর কোনো কোনো সাহাবি ছাগল-মেষ যবেহ করে তাঁর খাদেমকে বলতেন, প্রথমে আমাদের ইহুদি প্রতিবেশীকে গোশত দিয়ে এসো।

'আল-বাদায়ে ওয়াস-সানায়ে' কিতাবের রচয়িতা বলেন, 'যারা মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করবে তারা পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য করবে। অমুসলিম নাগরিকদের সাথে সামাজিক লেনদেন এজন্য বৈধ যে, এটা তাদের ইসলাম গ্রহণের উপলক্ষ্য হতে পারে। আর মুসলমানদের এলাকায় তাদেরকে বসবাস করতে দেয়া এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অধিক সহায়ক। এছাড়া তাদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক লেনদেনে মুসলমানদেরও বহুবিধ উপকার রয়েছে।'

নিষিদ্ধ বন্ধুতা: অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের আন্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ হলো মূলনীতি। অমুসলিমদের পক্ষ থেকে বিপরীত কোনো কার্যক্রম প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত এ নীতির কোনো পরিবর্তন হবেনা। তারা এক্ষেত্রে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ও বিচ্ছিন্নতামূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হলে, মুসলমানদের সাথে শত্রুতামূলক আচরণ করলে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলে সেই অবস্থায় তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্য পালনীয় ও অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য ন্যায়নীতির ভিত্তিতে তাদের সাথে সমানভাবে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কার্যক্রম বলবৎ থাকবে। কুরআন মজীদ এ বাস্তবতার প্রতি তার অনুসারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং এ বিষয়ে তাদেরকে স্পষ্ট ও বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহ্র বাণী:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ

'ঈমানদারগণ যেনো ঈমানদারগণকে ব্যতীত কাফেরদেরকে পৃষ্ঠপোষক বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কোনো ব্যক্তি তা করলে তার সাথে আল্লাহ্র কোনো সম্পর্ক নেই। তবে ব্যতিক্রম হলো, তোমরা যদি তাদের থেকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করো। আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন। (সূরা আলে ইমরান: আয়াত ২৮)।

উপরোক্ত আয়াত থেকে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ জ্ঞাত হওয়া যায় :

---

২. ইসলামি শরীয়ায় মুসলমানদের জন্য যেসব খাদ্য-পানীয় হালাল কেবল সেগুলো ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ওখানে মুসলমানদের জন্য হালাল। একই ভাবে তাদের ওখানে হালাল পশুর গোশতই মুসলমানদের জন্য হালাল যদি আল্লাহ্র নামে যবেহ করা হয়। (অনুবাদক)

এক. অমুসলিম শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপারে সতর্ক নীতি অবলম্বন করতে হবে। কারণ এতে ক্ষতির আশংকা থাকে।

দুই. যে মুসলমান তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে আল্লাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তার সাথে আল্লাহ্‌র কোনো সম্পর্ক নেই।

তিন. তবে দুর্বল ও ভীতিপূর্ণ অবস্থায় তাদের নির্যাতন ও আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাদের সাথে বাহ্যিক বন্ধুত্ব বজায় রাখা জায়েয।

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মজীদে বলেন:

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ ○ اَلَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ○ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ صلے اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ○ اَلَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ قَالُوْا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ط فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ○

'আপনি মুনাফিকদের সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি। যারা ঈমানদারগণের পরিবর্তে কাফেরদের পৃষ্ঠপোষক-বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি তাদের নিকট মান-সম্মান কামনা করে? সমস্ত সম্মানতো আল্লাহ্‌রই। এ কিতাবে তিনি তো তোমাদের নিকট নাযিল করেছেন যে, তোমরা যখন শুনবে আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে এবং তাকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন তারা তাদের প্রসঙ্গ না পাল্টানো পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে বৈঠক করবেনা। অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হবে। মুনাফিক ও কাফের সকলকেই নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জাহান্নামে একত্র করবেন। যারা তোমাদের ক্ষতি হওয়ার অপেক্ষায় থাকে তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের যুদ্ধজয় হলে বলে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলামনা? আর যদি কাফেরদের কিছু বিজয় হয় তবে তারা বলে, আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রবল ছিলামনা এবং আমরা কি তোমাদেরকে ঈমানদারগণের কবল থেকে রক্ষা করিনি? কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন এবং আল্লাহ্ কখনো ঈমানদারগণের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোনো পথ রাখবেননা।' (সূরা আন নিসা: আয়াত ১৩৮-১৪১)।

উপরোক্ত আয়াত থেকে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ জানা যায়:

এক. মুনাফিকরা কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাদের সাথে হৃদ্যতা গড়ে তোলে এবং ঈমানদারদের সাথে বন্ধুত্ব ত্যাগ করে গোপনে কাফেরদের সহযোগিতা করে।

দুই. তারা এ কাজের মাধ্যমে কাফেরদের নিকট সম্মান ও শক্তি লাভের আশা করে। মূলত এটা তাদের ভুল। কারণ সকল সম্মান ও শক্তি তো আল্লাহ্ ও মুমিনদের জন্যই। মহান আল্লাহ্‌র বাণী:

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ 'শক্তি ও মর্যাদা তো আল্লাহ্‌রই, তাঁর রসূলের এবং ঈমানদারদের। কিন্তু মুনাফিকরা অনুধাবন করে না। (সূরা মুনাফিকূন: আয়াত ৮)।

তিন. এই মুনাফিকরা ঈমানদারগণের অবস্থার আশু পরিণতির অপেক্ষায় থাকে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের জন্য যুদ্ধজয় ও সাহায্য এলে তারা বলে, দীন ও জিহাদের ব্যাপারে আমরা তোমাদের সাথে আছি। পক্ষান্তরে কাফেরদের বিজয় দেখলে তারা তাদেরকে বলে, আমরা কি মুসলমানদের দল থেকে কেটে পড়ে এবং তাদের গোপন সংবাদ তোমাদের জানিয়ে দেয়ার মাধ্যমে তাদের শাস্তি থেকে তোমাদের রক্ষা করিনি? অতএব তোমরা যা পেয়েছো আমাদেরকে তার অংশ দাও।

মুসলমানদের মধ্যে এমন কিছু লোক ছিলো যারা কাফেরদের সাথে আত্মীয়তা, প্রতিবেশী বা মৈত্রীচুক্তির

কারণে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখতো। কিন্তু এ বন্ধুত্ব মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর ছিলো। তাই আল্লাহ্ তায়ালা এ ধরনের ক্ষতিকর বন্ধুত্বের ব্যাপারে মুসলমানদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ط وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ ج قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ صلے ج وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ط قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ○

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের ছাড়া অপর কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা। তারা তোমাদের ক্ষতিসাধন করতে ত্রুটি করবেনা। যা তোমাদের বিপর্যয় ঘটায় তারা তাই কামনা করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে এবং তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছে তা আরো ভয়ংকর। আমি তোমাদের জন্য আমার বাণীসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, যদি তোমরা অনুধাবন করো। (সুরা আলে ইমরান: আয়াত ১১৮)।

উপরোক্ত আয়াতে মুসলমানদেরকে তাদের নিজেদের ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে অর্থাৎ বিশেষ করে তাদের নিকট নিজেদের গোপন বিষয় প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এ ঘনিষ্ঠতা তোমাদের অকল্যাণ সাধনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াকে তারা পছন্দ করে এবং উপভোগ করে। তোমাদের ব্যাপারে তাদের কারো কারো কথাতেই এর লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। হিংসা-বিদ্বেষের প্রাবল্যের কারণে তা গোপন রাখা তাদের জন্য কঠিন। আর তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছে তা তাদের মুখ ফুটে যা বের হয়েছে তার চেয়েও ভয়াবহ।

ঈমানের বৈশিষ্ট্য হলো, ঈমানদার ব্যক্তি তার শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে, যদিও সে তার সবচেয়ে কাছের মানুষ হয়। মহান আল্লাহ্র বাণী:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ط

'যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনে ঈমান রাখে সে সম্প্রদায়কে আপনি পাবেন না যে, তারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে পছন্দ করে, এরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা এদের জ্ঞাতি-গোত্রই হোক না কেন। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ঈমানকে সুদৃঢ় করেছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে রূহ (হিদায়াতের আলো) দ্বারা। (সূরা মুজাদালা: আয়াত ২২)।

উপরোক্ত আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে এমন লোক বিদ্যমান থাকা সঙ্গত নয়, যে তাদের শত্রুকে বন্ধু বানায় যদিও এ শত্রুরা তাদের কারো পিতা, পুত্র বা ঘনিষ্ঠজন হয়। যারা সাম্রাজ্যবাদকে, আরব ও মুসলমানদের শত্রুদেরকে সহযোগিতা করে তাদের ব্যাপারে কুরআন মজীদের বিধান পরিষ্কার। নিশ্চয়ই এ সহযোগিতা আল্লাহ্, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল সা. মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। তারা কখনো ইসলামের দাবি, ইতিহাসের দাবি, প্রতিবেশীর অধিকার, মজলুমের অধিকার এবং মুসলিমদের বর্তমান ও ভবিষ্যত অধিকারের ব্যাপারে আন্তরিক নয়। এ বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে শয়তানের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে এবং যুগ-যুগের লাঞ্ছনা ও চিরস্থায়ী অপমান নিজেদের জন্য রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে।

ব্যক্তির অধিকার ও মর্যাদার স্বীকৃতি: শান্তির নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং মানুষের মাঝে শান্তি ও নিরাপত্তার সম্পর্ক সৃষ্টি করার পর ইসলাম মানুষের বংশ, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, দেশ, জাতীয়তা ও সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তে তাকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে এবং সম্মানিত করেছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا .

'নিশ্চয়ই আমি আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলভাগে ও সমুদ্রে তাদের যাতায়াতের বাহন দিয়েছি, তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং আমি যেসব মাখলুক সৃষ্টি করেছি তাদের বহু সংখ্যকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (সূরা বানী ইসরাঈল: আয়াত ৭০)।

এ মর্যাদাদানের লক্ষণ হলো, আল্লাহ্ মানুষকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সৃষ্ট রূহ-এর ভাণ্ডার থেকে তাতে রূহ দান করেছেন, তাঁর ফেরেশতাদের দ্বারা তাকে সাজদা করিয়েছেন, আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবই মানুষের জন্য নিয়ন্ত্রণাধীন করে রেখেছেন, তাকে এ পৃথিবী নামক গ্রহের নেতা বানিয়েছেন এবং নিজের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করেছেন, যাতে সে পৃথিবীকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করতে পারে।

প্রদত্ত এই মর্যাদাকে বাস্তবে রূপদান এবং জীবন পদ্ধতি করার জন্য ইসলাম মানুষের সকল প্রকারের অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে এবং তা সংরক্ষণকে অপরিহার্য করেছে, চাই তা ধর্মীয় বা নাগরিক বা রাজনৈতিক অধিকার হোক। এসব অধিকারের মধ্যে রয়েছে:

১. জীবন রক্ষার অধিকার: প্রত্যেক ব্যক্তির তার জীবনের হেফাজত ও প্রতিরক্ষার অধিকার রয়েছে। সুতরাং মানুষ হত্যার অপরাধ অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ ব্যতীত কারো জীবন নষ্ট করা বৈধ নয়। মহান আল্লাহ্র বাণী:

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ج كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ط

'এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, নরহত্যার অপরাধ অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার অপরাধ ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন গোটা মানবজাতিকেই হত্যা করলো। আবার কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন গোটা মানবজাতির প্রাণ রক্ষা করলো। (সূরা আল মায়িদা: আয়াত ৩২)

সহীহ হাদিসে এসেছে, 'তিনটি অবস্থার কোনো একটি ব্যতীত কোনো মুসলমানের রক্তপাত বৈধ নয়: জীবনের বিনিময়ে জীবন (হত্যা), বিবাহিত ব্যভিচারী ও মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ধর্মত্যাগী।'

২. সহায়-সম্পদ রক্ষার অধিকার: জীবনের মতো মানুষের সহায়-সম্পদও পবিত্র এবং সুরক্ষাপ্রাপ্ত। সুতরাং অবৈধ উপায়ে ও পন্থায় কারো সম্পদ জবর দখল করা বৈধ নয়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قف

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ বাতিল পন্থায় গ্রাস করোনা। তবে তোমাদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করা বৈধ।' (সূরা আন্ নিসা : আয়াত ২৯)।

রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন:

مَنْ اَخَذَ مَالَ اَخِيْهِ بِيَمِيْنِهِ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ وَاِنْ عُوْدًا مِّنْ اَرَاكٍ.

'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে দিবেন এবং জান্নাত হারাম করে দিবেন। এক ব্যক্তি বললো, 'হে রসূলুল্লাহ্! যদি সামান্য কিছু হয়? তিনি বললেন, যদি আরাক গাছের একটি ডালও হয়।

আরাক হলো এক প্রকার কাঁটাযুক্ত গাছ, যা দ্বারা মেসওয়াক তৈরি করা হয়।

৩. মান-ইজ্জত রক্ষার অধিকার: কারো মান-সম্মানে আঘাত হানা বৈধ নয়, যদিও তা নিছক একটি কথা দ্বারাও হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ. 'দুর্ভোগ প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য, যে আগোচরে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।' (সূরা ১০৪ আল হুমাযাহ: আয়াত ১)।

৪. ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার: ইসলাম শুধুমাত্র জান-মাল, সম্পদ ও ইজ্জত-সম্মান রক্ষার অধিকারকেই স্বীকৃতি দেয়নি, বরং ইবাদত-আরাধনার স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, জীবন ধারণের জন্য পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠান থেকে উপকার লাভের স্বাধীনতাকেও প্রতিষ্ঠিত

করেছে। ইসলাম এ সকল অধিকার সংরক্ষণ করাকে রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক করেছে। আর মানুষের অধিকারসমূহ এতেই সীমাবদ্ধ নয়।

৫. বাসস্থান লাভের অধিকার: যে কোনো স্থানে ও যে কোনো দিকে বসবাস করার এবং কোনো প্রকার বাধা-প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই পৃথিবীর যে কোনো স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার অধিকার মানুষের রয়েছে। তাই অপরের উপর অত্যাচার না করলে বা আইনের দৃষ্টিতে বহিষ্কার কিংবা কারাদণ্ড না হলে কোনো ব্যক্তিকেই এক্ষেত্রে বাধা দেয়া, তাড়িয়ে দেয়া বা কারাগারে অন্তরীণ করা জায়েয নেই। তা করা যাবে অন্যের উপর বাড়াবাড়ি করলে, শান্তি বিনষ্ট করলে এবং নিরপরাধ মানুষের সাথে সন্ত্রাসী আচরণ করলে।

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে অথবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এ হলো তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি। কিন্তু যারা তোমাদের (সরকারের) আয়ত্তাধীনে আসার পূর্বে তাওবা করবে তাদের জন্য (শাস্তি) নয়। তোমরা জেনে রাখো! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' (সূরা আল মায়িদা: আয়াত ৩৩-৩৪)।

৬. মত প্রকাশের অধিকার: অধিকারসমূহের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা গ্রহণের অধিকার। প্রত্যেক ব্যক্তিরই শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে; যার মাধ্যমে তার বিবেক আলোকিত হয়, তার সত্তা উন্নতিলাভ করে এবং তার মর্যাদার স্তর উন্নত হয়। তেমনি মানুষের অধিকার রয়েছে তার মত প্রকাশ করার, যুক্তি দ্বারা তা প্রমাণ করার এবং সত্যকে প্রকাশ করার ও তার ঘোষণা দেয়ার। সমাজের জন্য ক্ষতিকর না হওয়ার শর্তে ইসলাম মত প্রকাশকে এবং স্বাধীন চিন্তাকে বাধা দেয়না।

রসূলুল্লাহ্ সা. তাঁর সাহাবিগণকে এ মর্মে বায়াত করান যে, তাঁরা তিক্ত হলেও সত্যকে প্রকাশ করবেন এবং আল্লাহ্র ব্যাপারে তারা কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবেন না। রসূলুল্লাহ্ সা. আরো বলেছেন ;

اَلسَّاكِتُ عَنِ الْحَقِّ شَيْطَانٌ اَخْرَسَ. 'সত্য প্রকাশে নীরবতা অবলম্বনকারী একটি বোবা শয়তান'।

এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

'নিশ্চয়ই আমি যেসব স্পষ্ট দলীল ও পথনির্দেশ নাযিল করেছি তা আমি মানুষের জন্য কিতাবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পরও যারা তা গোপন করে, তাদেরকে আল্লাহ্ অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়। কিন্তু যারা তওবা করে, নিজেদেরকে সংশোধন করে এবং সত্যকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে তাদের তাওবাই আমি কবুল করি। আমি অতিশয় তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।' (সূরা ২ বাকারা: আয়াত ১৫৯-১৬০)।

ইসলাম মনে করে ক্ষুধার্তের অধিকার হলো তাকে খাদ্যদান করা, বস্ত্রহীনের অধিকার হলো তাকে বস্ত্র দান করা, রোগীর ক্ষেত্রে তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দান করা। এসব অধিকার প্রাপ্তির বেলায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সমান। মানুষের অধিকারসমূহের স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে এ হলো ইসলামের শিক্ষা। এটি এমন এক শিক্ষা, যার মধ্যে গোটা বিশ্ববাসীর জন্য নিহিত রয়েছে সার্বিক কল্যাণ।

অধিকারের স্বীকৃতি ও তা বাস্তবায়নের বেলায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যেসব ধর্ম ও মতবাদ মানুষের অধিকারসমূহ নিয়ে বক্তৃতা, বিবৃতি দেয়, সে ক্ষেত্রে ইসলামের ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য। নিশ্চয়ই ইসলাম অধিকারের শিক্ষাকে ধর্মের অপরিহার্য অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। অধিকারসমূহ আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করা যায়, যেমন নামায-রোযা ইত্যাকার আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করা যায়।

অধিকার নষ্ট করার শাস্তি: উপরোক্ত অধিকারসমূহ মানুষকে বিস্তৃত দিগন্তপানে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ করে দেয়, যাতে সে পূর্ণতায় পৌঁছতে পারে এবং তার জন্য নির্ধারিত উন্নতি লাভ করতে পারে, তা বস্তুগত কিংবা শিক্ষামূলক যাই হোক না কেন।

মানুষের অধিকারসমূহের কোনো একটি নষ্ট বা বিলোপ করা অপরাধ হিসেবে গণ্য। এজন্য ইসলামে যে কোনো প্রকারের সংঘাত হোক, তা নিষিদ্ধ করার এটিই বাস্তব কারণ। কোনো মানুষের জীবনের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি সংঘাতের অনুষঙ্গী; জীবন ধারণ হলো পবিত্র অধিকার। সংঘাতের মাধ্যমে জীবন ধ্বংস হয়।

তাই সাম্রাজ্য-সীমা বৃদ্ধি এবং সম্পদ-শক্তি বৃদ্ধির যুদ্ধকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ○

'এটা আখিরাতের সে প্রাসাদ, যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য, যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত-দুর্বিনীত হতে এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায়না। শুভ পরিণাম আল্লাহ্ ভীরুদের জন্য।' (সূরা কাসাস: ৮৩)।

প্রতিশোধ ও শত্রুতা প্রসূত যুদ্ধকে নিষিদ্ধ করে মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ـ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ○

'তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেয়ার কারণে কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেনো কখনো সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকাজ ও ধার্মিকতায় তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করো এবং পাপ ও সীমালংঘনে পরস্পরকে সাহায্য করোনা। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।' (সূরা ৫ আল মায়েদা: আয়াত ২)।

ধ্বংস ও বিনাশ সাধনের যুদ্ধকে নিষিদ্ধ করে মহান আল্লাহ্ বলেন:

–وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا 'পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তোমরা তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করোনা।' (সূরা আল আরাফ: আয়াত ৫৬)।

কখন যুদ্ধ বৈধ হয়?: যেহেতু শান্তিই স্বাভাবিক অবস্থা ও জীবন যাপনের মুলনীতি, আর যুদ্ধ হচ্ছে ব্যতিক্রম ও বিচ্যুতি, তাই ইসলামের দৃষ্টিতে মাত্র দুটি অবস্থা ব্যতীত আর কোনো অবস্থায় কোনো ক্রমেই যুদ্ধ বৈধ নয় । যে দুটি অবস্থায় যুদ্ধ বৈধ তা হচ্ছে:

প্রথম অবস্থা: যখন কেউ আক্রমণ ও আগ্রাসন চালায়, তখন জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রম ও স্বদেশের প্রতিরক্ষার্থে আক্রমণ ও আগ্রাসন প্রতিহত করতে যুদ্ধ অনিবার্য হয়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

' وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ○

যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করোনা। আল্লাহ্ সীমা লঙ্ঘনকারীগণকে ভালোবাসেন না। (সূরা আল-বাকারা: ১৯০)।

সা'দ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ । যে ব্যক্তি নিজের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজের ধর্ম (দীন) রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। (আবু দাউদ, তিরমিযি)।

قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ط

'(বনী ইসরাইল বললো:) 'আমরা যখন স্ব স্ব আবাসভূমি ও স্বীয় সন্তান-সন্ততি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছি, তখন আল্লাহ্র পথে কেন সংগ্রাম করবোনা?' (সূরা আল বাকারা: আয়াত ২৪৬)।

দ্বিতীয় অবস্থা: যখন কেউ ইসলামে বিশ্বাসীদেরকে নির্যাতন, ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গকে বাধা দান বা ইসলাম প্রচার ও ইসলামের দাওয়াত দাতাকে দাওয়াত ও প্রচার থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পথ রোধ করে। তখন আল্লাহ্র পথে দাওয়াত ও প্রচারের অধিকার বহাল করা ও রক্ষা করার উদ্দেশ্য যুদ্ধ অপরিহার্য হয়।

প্রথম প্রমাণ সূরা বাকারার ১৯০, ১৯১, ১৯২ ও ১৯৩ আয়াত :

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ○ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ج وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ج فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ط كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ○ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ○ وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ط فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ○

'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করোনা। আল্লাহ্ সীমা লঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেননা। তাদেরকে (আক্রমণকারীদেরকে) তোমরা যেখানেই পাবে, হত্যা করবে এবং তারা তোমাদেরকে যেখান থেকে বহিষ্কার করবে, তোমরাও সেখান থেকে তাদের বহিষ্কার করবে। বিপর্যয় হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। মসজিদুল হারামের নিকট তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবেনা যে পর্যন্ত না তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে। এটাই কাফেরদের পরিণাম। যদি তারা বিরত হয় তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবত না নির্যাতন দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি তারা বিরত হয় তবে যালেমদের ব্যতীত আর কাউকে আক্রমণ করা চলবেনা।'

উল্লেখিত আয়াতগুলোর শিক্ষা হলো:

১. যারা প্রথম আক্রমণ পরিচালনা করে ও সীমা লঙ্ঘন করে, কেবল মাত্র তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ হয়েছে। আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করা পৃথিবীর সমস্ত আইনে ও সকল ধর্মে বৈধ। 'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো' আল্লাহ্র এ উক্তিতেই এ বিষয়টি পরিষ্কার ।

২. যারা যুদ্ধ শুরু করবে না তথা প্রথমে আক্রমণ পরিচালনা করেনা, তাদের উপর প্রথম আক্রমণ পরিচালনা করা বৈধ নয়। কেননা এটা সীমা লঙ্ঘন। আল্লাহ্ সীমা লঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন এবং যুলুম ও আগ্রাসন হারাম করেছেন । তিনি বলেছেন: তোমরা সীমা লঙ্ঘন করোনা। আল্লাহ্ সীমা লঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেননা।

৩. প্রথম আক্রমণ করতে নিষেধ করার পক্ষে এ বলে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীদের ভালোবাসেননা। এ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, এই নিষেধাজ্ঞা অকাট্য ও অপরিবর্তনীয়। কেননা এখানে সীমা লঙ্ঘনকে আল্লাহ্ ভালোবাসেননা বলে সংবাদ ও তথ্য জানানো হয়েছে। আল্লাহ্র কোনো সংবাদ ও তথ্য কখনো রহিত ও পরিবর্তিত হতে পারেনা। কারণ প্রথম আক্রমণ ও সীমা লঙ্ঘন হচ্ছে যুলুম, যা আল্লাহ্ কখনো ভালোবাসেননা।

৪. অনুমোদিত এই যুদ্ধের একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও সীমারেখা রয়েছে। সে লক্ষ্য ও সে সীমারেখা হলো মুমিন নারী ও পুরুষদের যুলুম ও নির্যাতন প্রতিহত করা ও বন্ধ করা এবং তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা বহাল করা, যাতে তারা আল্লাহ্র ইবাদাত করতে পারে এবং আল্লাহ্র দীন বাস্তবায়িত করতে পারে সর্বপ্রকার আক্রমণ ও আগ্রাসন থেকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে।

দ্বিতীয় প্রমাণ সূরা আন নিসার ৭৫ নং আয়াত:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ج وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ع وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ○

'তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা সংগ্রাম করবেনা আল্লাহ্‌র পথে এবং সে সব অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য, যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, এ জনপদ, যার অধিবাসী জালেম, তা থেকে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও। তোমার নিকট থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক করো এবং তোমার নিকট থেকে কাউকে আমাদের সহায় করো।'

এ আয়াত যুদ্ধের দুটি কারণ বর্ণনা করছে:

প্রথমত: আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ। আসলে এটা ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য, যাতে কোনো বাধাবিঘ্ন ও যুলুম নির্যাতন অবশিষ্ট না থাকে এবং আনুগত্য শুধু আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত: সে সকল অসহায় নরনারীর মুক্তির জন্য যুদ্ধ, যারা মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল অথচ হিজরত করতে সক্ষম ছিলনা। ফলে কুরাইশ কাফেররা তাদের উপর নিষ্ঠুর যুলুম ও নির্যাতন চালায়। তাই তারা আল্লাহ্‌র নিকট ঐ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ প্রার্থনা করে। তাদেরকে যালেমদের যুলুম থেকে রক্ষা করা ও তাদেরকে তাদের মনোনীত দীন অনুসরণ করার অধিকার ও স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয়ার কোনো বিকল্প ছিলনা।

তৃতীয় প্রমাণ সূরা নিসার ৯০ নং আয়াত:

فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ لا فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا○

'তারা যদি তোমাদের নিকট থেকে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব করে তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেননি।

বস্তুত যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করেনি, মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরতদের সাথেও যুদ্ধ করেনি, বরং উভয় পক্ষের কাছ থেকে দূরে সরে থেকেছে, এবং শান্তির অন্বেষায় তারা সর্বতোভাবে যুদ্ধ থেকে দূরে থেকেছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ মুসলমানদের নেই।

চতুর্থ প্রমাণ সূরা আনফালের ৬১ ও ৬২ নং আয়াত:

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ○ وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ○

'তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে এবং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করবে। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায় তবে তোমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।'

এ আয়াতে শত্রুপক্ষ সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়লে সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ার আদেশ দেয়া হয়েছে, এমনকি এই ঝোঁক যদি ধোঁকা ও প্রতারণামূলক হয় তবুও।

পঞ্চম প্রমাণ হলো, রসূলুল্লাহ্ সা. কর্তৃক পরিচালিত সব কটা যুদ্ধ ছিলো প্রতিরক্ষামূলক। আদৌ আগ্রাসী যুদ্ধ ছিলনা। মক্কা বিজয়ের পর আরবের মোশরেকদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধ ও তাদের চুক্তিগুলো বাতিল করাও এ মূলনীতির ভিত্তিতেই হয়েছিল। এটা সূরা তাওবার ১৩, ১৪ ও ১৫ নং আয়াত থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত:

اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ط اَتَخْشَوْنَهُمْ ج فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ○ قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ

صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ○ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ط وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ○

'তোমরা কি সে সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবেনা, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছে ও রসূলকে বহিষ্কার করার সংকল্প গ্রহণ করেছে ? তারাই তো প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় করো ? মুমিন হয়ে থাকলে আল্লাহ্কেই ভয় করা তোমাদের সমীচীন। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের বিজয়ী করবেন, মু'মিনদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন এবং তাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।'

মোশরেকরা যখন ঐক্যবদ্ধ হলো এবং মুসলমানদের উপর সর্বাত্মক আক্রমণ চালালো, তখন আল্লাহ্ মুসলমানদেরকেও ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিলেন। তিনি বললেন:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ط وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ○

'তোমরা মোশরেকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করবে,যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকো। জেনে রাখ, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।' (সূরা তাওবা: ৩৬)।

ওদিকে ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার কারণ ছিলো এই যে, তারা রসূলুল্লাহ্ সা. হিজরত করে মদিনায় আসার পর তাঁর সাথে অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু অনতিকাল পরেই সে চুক্তি ভংগ করে মোশরেক ও মুনাফিকদের সাথে মিলিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয় এবং আহ্যাব যুদ্ধে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এ প্রেক্ষাপটে সূরা তাওবার ২৯ আয়াত নাযিল করলেন:

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ○

'যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা আল্লহর প্রতি ঈমান আনেনা ও পরকালেও ঈমান আনেনা, এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা নিষিদ্ধ করেনা এবং সত্য দীন অনুসরণ করেনা, তাদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করো, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া দেয়।' তিনি সূরা তাওবার ১২৩ আয়াতে আরো বলেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ط وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ○

'হে মুমিনগণ, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ করো এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক। অবশ্যি আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।'

ষষ্ঠ প্রমাণ এই যে, একবার রসূলুল্লাহ্ সা. জনৈকা নিহত মহিলার লাশ দেখে বললেন: 'এই মহিলা তো যুদ্ধরত ছিলনা।' এ থেকে জানা গেলো মহিলাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ছিলো এই যে, অন্যান্য যুদ্ধরতদের সাথে সে যুদ্ধরত ছিলনা। সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধে কাফেরদের যুদ্ধ করাই ছিলো তাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করার কারণ, তাদের কাফের হওয়া আমাদের যুদ্ধের কারণ ছিলনা।

সপ্তম প্রমাণ হলো, রসূলুল্লাহ্ সা.সংসারত্যাগী ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন এবং এর কারণও অবিকল তাই, যার জন্য তিনি নারীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

অষ্টম প্রমাণ হলো, ইসলাম বল প্রয়োগকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পন্থা হিসাবে নির্ধারণ করেনি, বরং ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পন্থা নির্ধারণ করেছে বিবেক–বুদ্ধির ব্যবহার, চিন্তা শক্তিকে কাজে লাগানো এবং আকাশ ও পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য জিনিসসমূহ অবলোকনকে। যেমন সূরা ইউনুসের ৯৯, ১০০ ও ১০১ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন:

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ط اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ○ وَمَا

كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ○ قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُوْنَ○

‘তোমার প্রতিপালক যদি চাইতেন তবে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই ঈমান আনতো। তবে কি তুমি মুমিন হবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে? আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত ঈমান আনার কারো সাধ্য নেই। যারা অনুধাবন করেনা, আল্লাহ্ তাদেরকে কলুষলিপ্ত করেন। বলো, আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার প্রতি লক্ষ্য করো। নিদর্শনাবলী ও ভীতি-প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না।’

আল্লাহ্ সূরা বাকারার ২৫৬ আয়াতে বলেন: لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قف قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج

‘দীন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নেই। সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে।’

ইতিহাস থেকেও প্রমাণিত যে, রসূলুল্লাহ্ সা.বহু লোককে যুদ্ধবন্দী হিসাবে গ্রেফতার করেছিলেন। কিন্তু তাদের কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছেন বলে জানা যায় না। তাঁর সাহাবিরাও একই পন্থা অনুসরণ করতেন।

আবু হুরায়রা থেকে আহমদ বর্ণনা করেন, সুমামা হানাফিকে যখন বন্দী করা হলো, তখন রসূলুল্লাহ্ সা. প্রতিদিন সকালে তার কাছে গিয়ে বলতেন, হে সুমামা তোমার কাছে কী আছে? (অর্থাৎ মুক্তিপণ দেয়ার মতো কিছু আছে কি?)

সুমামা জবাবে বলতো: আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন, তবে তা করতেই পারেন। কারণ আমি আপনাদের লোককে হত্যা করেছি। আর যদি আমার উপর অনুগ্রহ করেন, তবে একজন কৃতজ্ঞ লোকের উপরই আপনার অনুগ্রহ করা হবে। আর যদি সম্পদ চান তবে যা চান তা দেবো।

রসূলুল্লাহ্ সা. এর সাহাবিগণ মুক্তিপণ নিয়ে তাকে মুক্তি দেয়াই অধিকতর পছন্দ করলেন এবং বললেন, একে হত্যা করে আমরা কী করবো? অত:পর রসূলুল্লাহ্ সা. তার কাছে গেলে সে ইসলাম গ্রহণ করলো। তারপর তিনি তাকে মুক্তি দিলেন। তাকে আবু তালহার বাগানে পাঠালেন এবং তাকে গোসল করার আদেশ দিলেন। অত:পর সে গোসল করলো ও দু'রাকাত নামায পড়লো। তখন রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: তোমাদের ভাইয়ের ইসলাম গ্রহণ খুবই সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

পক্ষান্তরে খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কারো বিরুদ্ধেই রসূলুল্লাহ্ সা. ততোক্ষণ যুদ্ধ করেননি, যতোক্ষণ না তাদের নিকট হোদাইবিয়ার সন্ধির পর সকল রাজা-বাদশাহের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। রোম ও পারস্যের সম্রাটের নিকট, এবং মুকাওকাশ, নাজজাশী,পূর্বাঞ্চলীয় আরব রাজ্যসমূহ ও সিরিয়ার নরপতিদের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করেছেন। এ সব খ্রিষ্টান ও অন্যান্য নরপতিদের মধ্য হতে কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি সিরিয়ার খ্রিষ্টানদেরকে সেখানকার শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করলে তারা সদ্য ইসলাম গ্রহণকারীদের কতেককে হত্যা করে। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা করে এবং অন্যায়ভাবে ও আগ্রাসী পন্থায় তাদেরকে হত্যা করে। এভাবে খ্রিষ্টানরা যখন মুসলমানদেরকে প্রথম হত্যা করলো, তখন রসূলুল্লাহ্ সা. সেখানে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন। এই বাহিনীর প্রথম সেনাপতি নিযুক্ত করেন যায়েদ ইবনে হারেসাকে, তারপর জাফরকে, অত:পর আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহাকে। এটাই ছিলো খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ, যা মুতার যুদ্ধ নামে পরিচিত। এ যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক খ্রিষ্টান মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। উল্লিখিত তিনজন সেনাপতিই এখানে শহীদ হন। সর্বশেষে সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন খালিদ ইবনুল ওলীদ।

উপরোক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, আগ্রাসন প্রতিহত করা, ইসলামের দাওয়াতী কাজকে সবল রাখা, যুলুম ও অত্যাচার রোধ করা, এবং ধর্ম গ্রহণে মানুষের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করা ব্যতীত আর কোনো উদ্দেশ্যে ইসলাম যুদ্ধের অনুমতি দেয়নি। কেননা এ সব উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা ইসলামের আরোপিত কাজসমূহের অন্যতম এবং এর আরেক নাম জিহাদ।

❖❖❖

একুশতম অধ্যায়

জিহাদ

জিহাদ শব্দটি আরবি অভিধানে 'জুহ্দ' ধাতু থেকে গৃহীত। জুহদ অর্থ শক্তি ও কঠোর শ্রম। আর জিহাদ অর্থ সর্বশক্তি নিয়োগ করা এবং শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ও শত্রুকে প্রতিহত করতে কঠোর পরিশ্রম করা। আধুনিক পরিভাষায় একে 'হার্‌ব' বা যুদ্ধ বলা হয়। যুদ্ধ হচ্ছে দুই বা ততোধিক দেশের মাঝে সশস্ত্র লড়াই। মানবজাতির মধ্যে এটা একটা স্বাভাবিক বিষয়। কোনো জাতি ও কোনো প্রজন্ম যুদ্ধ থেকে মুক্ত থাকতে পারেনা। পূর্বতন অহি ভিত্তিক সকল ধর্মেও যুদ্ধের স্বীকৃতি দেয়া ও বহাল রাখা হয়েছে। ইহুদিদের পঠিত তাওরাতে নাশকতা, ধ্বংস, হত্যা, ও বন্দীকরণের নিকৃষ্টতম পন্থা অবলম্বন সহকারে যুদ্ধ বহাল রাখা হয়েছে। নিম্নে তাওরাতের একটি উদ্ধৃতি দেয়া গেলো: 'যখন তুমি যুদ্ধ করতে কোনো শহরের নিকটবর্তী হবে তখন সে শহরকে প্রথমে সন্ধির দিকে আহ্বান জানাবে। সে যদি সন্ধির ব্যাপারে সম্মতি জানায় ও তোমার জন্য শহর খুলে দেয়, তাহলে সেখানকার সমগ্র জনতা তোমার অনুগত প্রজা ও দাসে পরিণত হবে। আর যদি সন্ধি করতে সম্মত না হয় বরং তোমার সাথে যুদ্ধের আচরণ করে, তাহলে তাকে অবরোধ করো। আর যখন তোমার প্রতিপালক খোদা তাদেরকে তোমার হাতে সোপর্দ করবে, তখন তাদের সকল পুরুষকে ধারালো তরবারির আঘাতে শেষ করে দাও। আর নারী, শিশু, গবাদিপশু, শহরের যাবতীয় সহায়সম্পদ ও যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী সবই তুমি নিজের গনিমত হিসেবে গ্রহণ করবে এবং তোমার প্রতিপালক খোদা প্রদত্ত শত্রুসম্পদ তুমি ভোগ করবে। দূরবর্তী সে শহরগুলোর বেলায়ও এরূপ করবে, যা এ সব শহরের অন্তর্ভুক্ত নয়। নিকটবর্তী এ সব শহরের অধিবাসী, যাদের সম্পদের অংশ তোমার প্রতিপালক খোদা তোমাকে প্রদান করেন, তাদের মধ্য থেকে কাউকে তুমি কিছুই দেবে না, বরং তাদেরকে পুরোপুরি বঞ্চিত করবে। হিত্তি, আমুরীয়, কিনানী, কারযি, হুবি ও ইউসীদের কাউকেই কিছু দেবেনা, যেমন তোমার প্রতিপালক খোদা তোমাকে আদেশ করেছেন।'

খ্রিষ্টানদের পঠিত বাইবেলে রয়েছে:

'তোমরা ভেবনা আমি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছি। আমি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, বরং তরবারি প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছি। আমি মানুষকে তার পিতার বিরুদ্ধে ও কন্যাকে তার মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করতে এসেছি। তার পরিবার-পরিজনকে তার শত্রু বানাতে এসেছি। যে ব্যক্তি পিতাকে ও মাতাকে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসবে সে আমাকে পাওয়ার যোগ্য হবেনা, যে ব্যক্তি ছেলে ও মেয়েকে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসবে সে আমাকে পাওয়ার যোগ্য হবেনা। যে ব্যক্তি তার ক্রুশ গ্রহণ ও আমাকে অনুসরণ করবেনা, সে আমাকে পাওয়ার যোগ্য হবেনা। যে ব্যক্তি নিজের জীবনকে ভালোবাসবে সে জীবনকে হারাবে। আর যে ব্যক্তি আমার জন্য জীবনকে বর্জন করবে সে জীবনকে পাবে।'

আন্তর্জাতিক আইনও যে পরিস্থিতি ও পরিবেশে যুদ্ধ বৈধ হয়, তাকে স্বীকৃতি দেয় এবং যুদ্ধের জন্য এমন নীতিমালা নির্ধারণ করে, যা যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংসলীলা হ্রাস করতে পারে। যদিও বাস্তবে তার কিছুমাত্র হ্রাস করা সম্ভব হয়নি।

ইসলামে জিহাদ কিভাবে বৈধ হলো: আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে সমগ্র মানব জাতির নিকট প্রেরণ করেছেন। তাঁকে ন্যায়নীতির দিকে ও সত্য দীনের দিকে দাওয়াত জানানোর আদেশ দিয়েছেন। মক্কায় অবস্থানকালে তিনি প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে এবং সুমিষ্ট উপদেশের মাধ্যমে এ দাওয়াত দিয়েছেন।

যেহেতু তাঁর জাতি এ দাওয়াতকে নিজেদের বংশগত ও নৈতিক অস্তিত্বের জন্য ক্ষতিকর মনে করেছে, তাই তাদের দিক থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া রসূলের জন্য অবধারিত ছিলো। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তাঁকে তাদের বিরোধিতাকে ধৈর্য ও ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন:

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا– 'আপনি আপনার প্রতিপালকের ফায়সালার অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ করুন। আপনিতো আমার চোখের সামনেই রয়েছেন।' (সূরা তুর: আয়াত ৪৮)

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَٰمٌ ط فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۝ 'তাদের উপেক্ষা করুন এবং বলুন, 'সালাম', তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।' (সূরা জুখরুফ: আয়াত ৮৯)।

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ○ 'আপনি পরম সৌজন্য সহকারে তাদেরকে ক্ষমা করুন।' (সূরা হিজর: ৮৫)।

قُلْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ- 'মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে, যারা আল্লাহ্‌র দিনগুলোর প্রত্যাশা করে না।' (সূরা জাসিয়া: আয়াত ১৪)

এ সময় আল্লাহ্ অসদাচরণকে অসদাচরণ দ্বারা ও সহিংসতাকে সহিংসতা দ্বারা মোকাবিলা করা অথবা যারা দাওয়াতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা যারা মুমিন নারী ও পুরুষদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালাচ্ছিলো তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুমতি দেননি।

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ط نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ○ 'মন্দের মুকাবিলা করুন যা মন্দের ভালো তা দ্বারা। তারা যা কিছু বলে, সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত।' (সূরা মুমিনুন: আয়াত ৯৬)

এ সময় ' জিহাদ' শব্দ প্রয়োগে যা কিছু নির্দেশ দিয়েছেন, তা কুরআন ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রতিরোধের অর্থেই দিয়েছেন। যেমন: وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ○

'আপনি কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যান।' (সূরা ফুরকান: আয়াত ৫২)

এভাবে মক্কায় তেরো বছর অতিবাহিত হওয়ার পর যখন কাফেরদের সহিংস আচরণ ও অত্যাচার-নির্যাতন মারাত্মক আকার ধারণ করলো এবং চরম পর্যায়ে উপনীত হলো, এমনকি রসূল সা.কে হত্যার চক্রান্ত পর্যন্ত করা হলো, তখন তিনি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য হলেন এবং তার সাথীদেরকেও মদিনায় হিজরতের আদেশ দিলেন:

وَاِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ط وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ○

'স্মরণ করুন, যখন কাফেরগণ আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আপনাকে বন্দী করার জন্য, হত্যা করা অথবা নির্বাসিত করার জন্য । তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্ও কৌশল করেন। আল্লাহ্ই কুশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' (সূরা আনফাল: আয়াত ৩০)

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ 'তোমরা যদি তাকে সাহায্য না করো , তবে আল্লাহ্ তো তাঁকে সাহায্য করবেনই।' (সূরা তাওবা: আয়াত ৪০)

অবশেষে ইসলামের নতুন রাজধানী মদিনায় যখন শত্রুরা মুসলমানদের উপর আগ্রাসন চালাতে শুরু করলো এবং তারা নিজেদের জানমালের নিরাপত্তার প্রয়োজনে ও ইসলামের দাওয়াত অব্যাহত রাখার স্বার্থে অস্ত্র ধারণে বাধ্য হলো, তখন যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো। এ সময় সর্বপ্রথম সূরা হজ্জের ৩৯, ৪০ ও ৪১ নম্বর আয়াতগুলো নাযিল হলো:

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ط وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ○ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ط وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ط وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ○ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ○

'যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্। আল্লাহ্ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেতো খ্রিষ্টান সংসার বিরাগীদের উপাসন স্থান, গির্জা, ইয়াহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ, যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্‌র নাম। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন, যে আল্লাহ্‌কে সাহায্য করে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শক্তিমান,

পরাক্রমশালী। আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা নামায কায়িম করবে, যাকাত দেবে ও সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। সবকর্মের পরিণাম আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে।'

এখানে তিনটি কারণ উল্লেখ করে যুদ্ধের অনুমতির যৌক্তিকতা প্রমাণ করা হয়েছে।

১. কাফেররা সম্পূর্ণ আগ্রাসী কায়দায় ও বিনা উসকানীতে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করেছে, তাদেরকে অন্যায়ভাবে তাদের বাড়িঘর থেকে বহিষ্কার করেছে এবং এর একমাত্র কারণ ছিলো এই যে, তারা সত্য দীনকে মেনে নিয়েছে এবং বলেছে: আমাদের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ্।

২. এরূপ আত্মরক্ষার অনুমতি যদি আল্লাহ্ মানব জাতিকে না দিতেন, তবে সে সকল ইবাদত-উপাসনার স্থানগুলো ধ্বংস হয়ে যেতো, যেখানে সর্বদা আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হয়। আল্লাহ্ ও আখেরাতে অবিশ্বাসী কাফেরদের অত্যাচারে এগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো।

৩. পৃথিবীতে মানুষকে বিজয়, প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দানের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো নামায কায়িম করা, যাকাত প্রদান করা, সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করা।

কিভাবে ও কখন জিহাদ ফরয হলো: হিজরি দ্বিতীয় বছরে আল্লাহ্ জিহাদকে ফরয (বাধ্যতামূলক) করলেন তাঁর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করার মাধ্যমে:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ج وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ج وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

'তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেয়া হলো যদিও তোমাদের নিকট তা অপ্রিয়। কিন্তু তোমরা যা পছন্দ করনা, সম্ভবত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা পছন্দ করো সম্ভবত তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জাননা।' (সূরা আল বাকারা: আয়াত ২১৬)

জিহাদ একটি ফরযে কিফায়া: কিছু ফরয কাজ এমন আছে যা সম্পাদন করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক, একজন বা কয়েকজনে করলে তা সম্পন্ন করা হয়না। যেমন ঈমান, পবিত্রতা অর্জন, নামায, যাকাত, রোজা ও হজ্জ। এগুলোকে ফরযে আইন বলা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির উপর এগুলো সম্পন্ন করার দায়িত্ব রয়েছে। এগুলো বাদ দেয়া বা অসম্পূর্ণভাবে করা কারো জন্য বৈধ নয়। (ইসলামের মৌলিক জ্ঞান অর্জনও ফরযে আইনের অন্তর্ভুক্ত) আবার কতক ফরয এমন রয়েছে, যা কতক মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক, সকলের জন্য নয়। এগুলোকে ফরযে কিফায়া বলা হয়। (যাদের এসব কাজের যোগ্যতা বা সুযোগ আছে, কেবল তাদের উপরই এ সব কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব অর্পিত।) ফরযে কিফায়া মোটামুটি চার প্রকার:

১. ধর্মীয় কাজ, যথা ইসলামের বিশদ জ্ঞান অর্জন, ইসলামের বিধান অন্যকে শেখানো। সন্দেহ-সংশয়পূর্ণ বিষয়ের মীমাংসা করা ও সিদ্ধান্ত প্রদান, ইসলামের উপর সৃষ্টি করা সন্দেহ দূর করা ও অপপ্রচারের জবাব দেয়া। জানাযার নামায, জামায়াতে নামায আদায়ের ব্যবস্থা করা ও ইসলামি সংগঠন গড়ে তোলা, নামাযের জন্য আযান দেয়া ইত্যাদি।

২. আর্থনীতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের উপায়-উপকরণ ও পেশা ইত্যাদি অবলম্বন করা, যথা কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা ইত্যাকার যে সকল পেশা থেকে সকলে বিরত থাকলে গোটা সমাজ ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয় দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৩. যে সকল কাজে উপযুক্ত শাসক থাকা শর্ত: যেমন জিহাদের নির্দেশ দান, শরিয়ত নির্ধারিত দণ্ডবিধি বা হুদুদ বাস্তবায়ন। এগুলো একমাত্র শাসকের দায়িত্ব ও অধিকার। সাধারণ নাগরিক ও প্রজার পরস্পরকে শাস্তি দেয়ার অধিকার ও ক্ষমতা নেই।

৪. যে সব কাজে শাসক শর্ত নয়, (বরং যোগ্যতা, ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা ও স্বতস্ফূর্ত উদ্যোগই যথেষ্ট) যেমন সৎকাজের আদেশ দান, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা ও বাধা দেয়া। ভালো ও মহৎ কাজ করতে, সদগুণাবলী অর্জন করতে ও জনকল্যাণমূলক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা ও আহ্বান জানানো, এবং খারাপ কাজ ও অসৎ গুণাবলী প্রতিহত করা।

বস্তুত এ সব ফরযে কিফায়া সকলের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। কতিপয় ব্যক্তির উপরই এগুলো সম্পাদন করার দায়িত্ব অর্পিত। কিছু লোক সম্পাদন করলে এবং তাতে কাজটি সাফল্যজনকভাবে নিষ্পন্ন হলে বা তাদের চেষ্টা যথেষ্ট প্রমাণিত হলে সকলের পক্ষ থেকেই কাজগুলো করার দায়িত্ব পালিত হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ না করলে সকলেই গুনাহ্‌গার হবে। এ বিষয়ে সূরা তাওবার ১২২ নং আয়াত, সূরা নিসার ৭১ নং আয়াত ও সূরা নিসার ৯৫ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

জিহাদ সকল মুসলমানের উপর ফরয নয়। এটা ফরযে কিফায়া। কিছু লোক জিহাদ সম্পন্ন করলে এবং তাতে শত্রু দমিত হলে অবশিষ্ট লোকদের উপর থেকে এ দায়িত্ব রহিত হয়। আল্লাহ্‌ সূরা তাওবার ১২২ নম্বর আয়াতে বলেন:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً ط فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْآ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ○

'মুমিনদের সকলের এক সঙ্গে (জিহাদের বা ইসলামের জ্ঞান অর্জনের) অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়। তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়ের নিকট যখন তারা ফিরে আসবে তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা সাবধান হয়।'

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ○

'হে মুমিনগণ, তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো। অত:পর হয় দলে দলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও, অথবা একসঙ্গে অগ্রসর হও।' (সূরা নিসা: আয়াত ৭১)

(অগ্রসর হওয়া দ্বারা কাফেরদের সাথে বিরুদ্ধে অভিযানে বের হওয়া বুঝানো হয়েছে।) ইমাম বুখারি বলেন: ইবনে আব্বাস থেকে 'দলে দলে বিভক্ত হয়ে বের হওয়ার' ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে 'পৃথক পৃথক সশস্ত্র সেনাদলের আকারে বের হওয়া।'

لاَ يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ط فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ط وَكُلاًّ وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ط وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

'মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে, তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে,আল্লাহ্‌ তাদেরকে ঘরে বসে থাকা লোকদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা ঘরে বসে থাকে, তাদের উপর আল্লাহ্‌ জিহাদকারীদেরকে মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।' (সূরা নিসা: ৯৫)।

আবু সাঈদ খুদরি থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সা. বনু হুযাইলের বনু লিহয়ান গোত্রে একটি দল পাঠালেন এবং বললেন: ' প্রতি দুই ব্যক্তির মধ্য থেকে একজন অভিযানে যাওয়া উচিত। এর প্রতিদান উভয়ের মধ্যে বন্টিত হবে।'

জিহাদ কখন ফরযে আইন হয়?: নিম্নোক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত জিহাদ ফরযে আইন হয় না:

১. জিহাদের যোগ্যতা ও ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি যখন যুদ্ধের কাতারে উপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থায় তার উপর জিহাদ ফরয হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ বলেন: يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا ○

'হে মুমিনগণ, তোমরা যখন কোনো দলের সম্মুখীন হবে, তখন অবিচল থাকবে।' (সূরা আনফাল: ৪৫)

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ○

'হে মুমিনগণ, তোমরা যখন কাফের বাহিনীর সম্মুখীন হবে তখন যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালাবেনা।' (সূরা আনফাল: আয়াত ১৫)

২. মুসলমানরা যে শহরে বা স্থানে বসবাস করে, সেখানে যখন শত্রুরা উপস্থিত হয়, এরূপ অবস্থায় সমগ্র শহরবাসীর উপর শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে পড়া ফরয হয়ে যায়। এ সময় সকলে মিলিত হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া শত্রুকে প্রতিহত করা সম্ভব না হলেও লড়াই করার দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকা কারো জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ্ বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ 'হে মুমিনগণ, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী, তাদের সাথে যুদ্ধ করো। (সূরা তাওবা: আয়াত ১২৩)

৩. সক্রিয়ভাবে জিহাদে অংশগ্রহণের যোগ্য ও সক্ষম কোনো ব্যক্তিকে যখন শাসক জিহাদের জন্য বের হওয়ার আদেশ দেন বা আহ্বান জানান, তখন তার পক্ষে সে আদেশ বা আহ্বানে সাড়া না দেয়ার কোনো অবকাশ থাকেনা। কেননা ইবনে আব্বাস রা: বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'মক্কা বিজয়ের পর আর মদিনায় হিজরতের প্রয়োজন নেই। তবে জিহাদ ও প্রয়োজন হলে হিজরতের নিয়ত অব্যাহত রাখতে হবে। আর যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাকা হয় তখন বেরিয়ে পড়ো'। (বুখারি)

উল্লেখ্য, মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমানদের মদিনায় হিজরত করা ফরয ছিলো। এই হাদিস দ্বারা মক্কা বিজয়ের পর তা রহিত করা হয়েছে। তবে দারুল হারব (অমুসলিম শাসিত দেশ) থেকে মুসলিম শাসিত দেশে হিজরত করা রহিত হয়নি। যে ব্যক্তি নিজের দীনী দায়িত্ব পালনের স্বাধীনতা নিরাপদ মনে করেনা, তার জন্য হিজরত করা তখনো ফরয।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝

'হে মুমিনগণ, তোমাদের কী হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে অভিযানে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে ভূতলে ঝুঁকে পড়ো? তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছ? পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অতি সামান্য।' (সূরা তাওবা, ৩৮)

যার উপর জিহাদ ফরয: সুস্থদেহ, সুস্থ মস্তিষ্ক, বয়স্ক মুসলমান পুরুষ, যার নিজের ও জিহাদ থেকে ফেরা পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের আর্থিক সচ্ছলতা আছে, তার উপর জিহাদ ফরয। সুতরাং অমুসলিমের উপর, মহিলার উপর, বালক ও শিশুর উপর, পাগলের উপর ও রোগীর উপর জিহাদ ফরয নয়। কাজেই এদের কেউ জিহাদে অংশ গ্রহণ না করলে কোনো দোষ নেই। কারণ তাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা যুদ্ধের অন্তরায়। রণক্ষেত্রে তাদের থাকার তেমন কোনো প্রয়োজন নেই। তাদের থাকায় উপকারিতা তো কমই, উপরন্তু তা অধিকতর ক্ষতির কারণও হতে পারে। এ সম্পর্কেই আল্লাহ্ বলেন:

لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا۟ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۝

'যারা দুর্বল, যারা পীড়িত এবং যারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ, তাদের কোনো অপরাধ নেই (অর্থাৎ অভিযানে যোগদান না করায়) যদি আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি তাদের অবিমিশ্র অনুরাগ থাকে। যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো হেতু নেই।' (সূরা তাওবা: আয়াত ৯১)

لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ۔

'অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রুগ্নের জন্য কোনো অপরাধ নেই।' (আল ফাতাহ: ১৭)

ইবনে উমর রা. বলেন: আমি ওহুদের দিন নিজেকে রসূলুল্লাহ সা.এর নিকট পেশ করেছিলাম। তখন আমার বয়স চৌদ্দ বছর। তিনি আমাকে অনুমতি দেননি।' (সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিম)।

তাছাড়া যেহেতু জিহাদ একটি ইবাদাত। তাই এটা বয়োপ্রাপ্ত ব্যতীত কারো উপর ফরয হয়না। আহমদ ও বুখারি বর্ণনা করেন, আয়েশা রা. বলেন, আমি বললাম: হে রসূলুল্লাহ্ সা. মহিলাদের উপর কি জিহাদের দায়িত্ব আছে? রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: হাঁ, এমন জিহাদের দায়িত্ব আছে, যাতে যুদ্ধ নেই। তা হচ্ছে হজ্জ ও উমরা। অপর বর্ণনায়: তবে যে হজ্জে কোনো গুনাহর কাজ হয় না, তা শ্রেষ্ঠ জিহাদ।'

ওয়াহেদি ও সুয়ূতি 'দুররে মনসুরে' মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, উম্মে সালমা রা. বললেন: হে রসূলুল্লাহ্ সা. পুরুষরা যুদ্ধ করবে, আমরা করছিনা, এটা কেমন কথা ? আমাদের জন্য কেবল অর্ধেক উত্তরাধিকার ? তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ط وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ط وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا ○

'যে জিনিস দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তা আকাঙ্ক্ষা করোনা। পুরুষ যা অর্জন করে, তা তার প্রাপ্য-অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।' (সূরা নিসা: আয়াত ৩২)

সুয়ূতি ও ওয়াহেদি ইকরামা থেকে বর্ণনা করেন, মহিলারা জিহাদের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে বললো: আমরা চেয়েছিলাম যে, আল্লাহ আমাদেরকে জিহাদের সুযোগ দিন, এবং পুরুষরা জিহাদ করে যে পুণ্য লাভ করে, আমরাও তা লাভ করি।' তখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়।

তবে এ আয়াত মহিলাদের যুদ্ধাহতদের পরিচর্যা ইত্যাদির জন্য রণাঙ্গনে যাওয়া নিষিদ্ধ করেনা।

আনাস রা. বলেন: ওহুদের দিন লোকেরা রসূলুল্লাহ্ সা. থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আমি আবু বকর রা.-এর কন্যা আয়েশা রা.কে ও উম্মে সুলাইমকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে দেখেছি। এমনকি তাদের পায়ের নূপুর পর্যন্ত আমি বেরিয়ে পড়তে দেখেছি (অত্যধিক ছুটাছুটির দরুন), তারা উভয়ে পিঠের উপর পানিভর্তি মশক বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, অত:পর তা যোদ্ধাদের মুখে ঢেলে দিচ্ছিলেন, তারপর পুনরায় মশক ভরে আনছিলেন এবং তা যোদ্ধাদের মুখে ঢালছিলেন।' (বুখারি ও মুসলিম)

আনাস রা. আরো বলেন: রসূলুল্লাহ সা. উল্লেখিত সুলাইম ও আরো কয়েকজন আনসারী মহিলাকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ করতেন, তারা পিপাসার্তদের পানি পান করাতেন ও আহতদের চিকিৎসা করতেন।' (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি)

পিতা-মাতার অনুমতি: জিহাদ ফরয। এতে পিতা-মাতার অনুমতির প্রয়োজন নেই। তবে নফল জিহাদের জন্য স্বাধীন পিতা-মাতা বা তাদের যে কোনো একজনের অনুমতি প্রয়োজন। ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম: কোন্ কাজটি আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়: তিনি বললেন: যথা সময়ে নামায পড়া। আমি বললাম: এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন: পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার। আমি বললাম: তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন: আল্লাহর পথে জিহাদ। (বুখারি ও মুসলিম)।

ইবনে উমর বলেছেন: এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলো। তিনি বললেন: তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত? সে বললো: হাঁ। তিনি বললেন: তবে পিতা-মাতার কাছে থেকেই জিহাদ করো। (বুখারি, আবুদাউদ, নাসায়ি ও তিরমিযি, তিরমিযি একে সহীহ বলেছেন)।

'শিরয়াতুল ইসলাম' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে: জিহাদে শুধু সে ব্যক্তিরই যাওয়া উচিত, যে পরিবার ও সন্তানদের দায় ও পিতা-মাতার সেবার দায় থেকে মুক্ত। কেননা এটা জিহাদের চেয়েও অগ্রগণ্য, বরং এটাই শ্রেষ্ঠ জিহাদ।'

ঋণদাতার অনুমতি: নফল জিহাদে অংশগ্রহণ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ঋণদাতার অনুমতি অথবা ঋণ পরিশোধ ব্যতীত বৈধ নয়। ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে ঋণের স্থলে কোনো জিনিস বন্ধক রাখলে অথবা কোনো ব্যক্তি তার জন্য যামিন হলেও চলবে।

ইমাম আহমদ ও মুসলিম কাতাদা থেকে বর্ণনা করেন: এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সা. কে বললো: আমি যদি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে গিয়ে নিহত হই, তাহলে কি আমার সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যাবে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, যদি তুমি ধৈর্যশীল হও, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করো ও রণাঙ্গন থেকে না পালাও। তবে ঋণের দায় মাফ হবেনা। জিবরীল আমাকে এ কথা বলেছেন।

যুদ্ধে কাফের ও পাপাচারীদের সাহায্য গ্রহণ: কাফেরদের সাথে যুদ্ধে মুনাফিক ও পাপিষ্ঠ লোকদের সাহায্য গ্রহণ বৈধ। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই ও তার সহযোগী মুনাফিকরা রসূলুল্লাহ্ সা. এর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতো। পারস্যের যুদ্ধে মদ্যপায়ী আবু মাহজান সাকাফির পরীক্ষার কাহিনী সুপ্রসিদ্ধ।

তবে মুসলমানদের সহযোদ্ধা হয়ে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করা নিয়ে ফকিহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেছেন: তাদের সাহায্য গ্রহণ আদৌ জায়িয নয়। তবে ইমাম মালেকের মতে অমুসলিমরা মুসলিম যোদ্ধাদের সেবক হয়ে রণাঙ্গনে গেলে তা বৈধ। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন: কাফেরদের সাহায্য গ্রহণ ও কাফেরদের পক্ষ হতে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান সর্বতোভাবে বৈধ। তবে সে ক্ষেত্রে ইসলামি বাহিনীর ফায়সালাই তাদের উপর কার্যকর হবে। আর যদি মোশরেকদের ফায়সালা অগ্রগণ্য হয় তাহলে মাকরূহ হবে। ইমাম শাফেয়ি বলেছেন: দুই শর্তে এটা জায়েয:

১. মুসলমানরা যদি সংখ্যালঘু এবং মোশরেকরা সংখ্যাগুরু হয়।

২. সাহায্যকারী মোশরেকদের ইসলাম সম্পর্কে ভালো মনোভাব ও ঝোঁক থাকা চাই। তাদের সাহায্য গ্রহণের পর সাহায্য বাবদ মজুরী দেয়া হবে। কিন্তু মুসলমানদের লব্ধ গনিমতের ভাগ দেয়া হবেনা।

দুর্বল লোকদের সাহায্য গ্রহণ: ১. সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের পুত্র মুসয়াব বলেন: আমার পিতা মনে করতেন যে, তার নিম্নস্তরের লোকদের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। এ কথা জানতে পেরে রসূলুল্লাহ্ সা. তাকে বললেন: তোমরা তোমাদের দুর্বল লোকদের ওসিলায়ই তো জীবিকা ও সাহায্য পেয়ে থাকো। -(বুখারি ও নাসায়ি)। নাসায়ির ভাষা এ রকম: 'আল্লাহ্ এ উম্মাতকে তাদের দুর্বল শ্রেণির ওছিলা তথা তাদের দোয়া, নামায ও আন্তরিকতার বদৌলতেই সাহায্য করে থাকেন।'

২. আবু দারদা রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সা. কে বলতে শুনেছি: 'তোমরা আমাকে দুর্বল শ্রেণির মুসলমানদের মধ্যে খুঁজবে। কেননা তোমরা তোমাদের দুর্বলদের বদৌলতেই সাহায্য ও জীবিকা পেয়ে থাকো।' -(আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ)।

৩. আবু হুরায়রা রা. বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: এমন অনেক ধূলামলিন জটবদ্ধ চুলওয়ালা লোক আছে, যাকে দরজা থেকে ফিরিয়ে দেয়া হয়, অথচ সে (আল্লাহ্র নিকট এতো প্রিয় যে, সে) আল্লাহ্র নামে কসম খেলে আল্লাহ্ নিজেই তাকে কসম থেকে দায়মুক্ত করেন। (অর্থাৎ কোনো মানুষকে বাহ্যত এমন নগণ্য বেশভূষায় দেখা যায় যে, তার দিকে কারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়না, তবে মজবুত ঈমান ও দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী, সে যদি আল্লাহর নিকট কোনো দোয়া করে, তবে সঙ্গে সঙ্গে তা কবুল হয়ে যায়।)

জিহাদ ও শাহাদাতের মর্যাদা

জিহাদের মর্যাদা: আল্লাহ্র কলেমাকে উর্ধ্বে তুলে ধরা বা বিজয়ী করা, পৃথিবীতে তাঁর হেদায়াতের বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সত্য দীনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করার নাম জিহাদ। তাই এটা নফল হজ্জ, নফল ওমরা, নফল নামায ও নফল রোযার চেয়ে উত্তম। এতদ্সত্ত্বেও জিহাদ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল ধরনের ইবাদাতের সমষ্টি। অপ্রকাশ্য ইবাদাত হিসাবে উল্লেখযোগ্য যুহ্দ তথা পার্থিব সম্পদ উপার্জন থেকে নিবৃত্ত থাকা, স্বদেশ ও জন্মভূমি সাময়িকভাবে হলেও পরিত্যাগ করা এবং লোভ-লালসা ও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বাসনা বর্জন জিহাদে বিদ্যমান। এ জন্য জিহাদকে 'ইসলামের বৈরাগ্য' বলা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'আমার উম্মাতের বৈরাগ্য হলো আল্লাহ্র পথে জিহাদ।' জিহাদে আরো রয়েছে জীবন ও সম্পদ আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করা ও আল্লাহ্র নিকট বিক্রি করে দেয়ার মহড়া। আর এটা আল্লাহ্র ভালোবাসা, ঈমান, প্রত্যয় ও আল্লাহ্র উপর ভরসার প্রত্যক্ষ ফল। আল্লাহ্ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

'আল্লাহ্ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে, হত্যা করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিশ্রুতি পালনে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দ করো। এটাই মহাসাফল্য।' (তাওবা: ১১১)

ইসলাম জিহাদকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। অধিকাংশ মাদানি সূরায় এর মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা জিহাদ বর্জন করে তাদের নিন্দা করা হয়েছে এবং তাদেরকে মুনাফিকি ও অন্তরের ব্যাধিতে আক্রান্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

মুজাহিদ সর্বোত্তম মানুষ: ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: সর্বোত্তম মানুষ কে, তা কি তোমাদেরকে বলবো? যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে তার ঘোড়ার লাগাম আঁকড়ে ধরে। এর পর কে শ্রেষ্ঠ, তা কি বলবো? যে তার প্রাপ্ত যৎসামান্য গনিমত নিয়ে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে এবং তা থেকে আল্লাহ্‌র হক আদায় করে। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী প্রাপ্য বণ্টন করে।) সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ কে, তা কি তোমাদেরকে বলবো? যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে মানুষের কাছে প্রার্থনা করে, কিন্তু আল্লাহ্‌র নামে দান করেনা।'

রসূলুল্লাহ্ সা.কে জিজ্ঞাসা করা হলো: সর্বোত্তম মানুষ কে? তিনি বললেন: সে মুমিন যে আল্লাহ্‌র পথে নিজের জীবন ও সম্পদ দিয়ে জিহাদ করে।' লোকেরা বললো: এরপর কে উত্তম? তিনি বললেন: যে মুমিন কোনো গিরিবর্থে অবস্থান করে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং নিজের ক্ষতি থেকে মানুষকে বাঁচায়।'

'আল্লাহর ভয় ও নিজের ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য গিরিবর্থে অবস্থান করে' এ উক্তিতে জনসাধারণের সাথে মেলামেশার চেয়ে নির্জনবাস উত্তম, এই নীতিতে বিশ্বাসীদের জন্য প্রমাণ রয়েছে। তবে এ বিষয়ে মতভেদ আছে।

ইমাম শাফিয়ি ও অধিকাংশ আলেমের মতানুসারে বিপথগামিতা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে এমন আশা থাকলে মেলামেশাই উত্তম। আবার কয়েকটি দল মনে করে, নির্জনতাই উত্তম।

অধিকাংশ আলেম এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন: এ হাদিসে সমাজে গোমরাহির ব্যাপক প্রসার এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দাংগা-হাঙ্গামার সময় নির্জনতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে, অথবা যে ব্যক্তি নিজেকে নিরাপদে রাখতে পারেনা এবং তাদের আচরণে ধৈর্য ধারণ করতে পারেনা, তার জন্য নির্জনতা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়া হয়েছে, অথবা এ ধরনের অন্য কোনো ব্যতিক্রমী অবস্থার দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

নবিগণ, অধিকাংশ সাহাবি, তাবেয়ি, আলেমগণ ও দুনিয়ার মোহমুক্ত মনীষীগণ জনগণের সাথে মেলামেশা করতেন এবং জুমুয়ার নামাযে, জামাতে, জানাযায়, রোগী পরিদর্শন ও ইসলামি সভা সমাবেশ ইত্যাদিতে যোগদানের মাধ্যমে উপকৃত হতেন। গিরিগুহা বা গিরিপথের উল্লেখ দ্বারা রূপক অর্থে নির্জনতাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এ সব স্থান প্রায়শ নির্জন থাকে। এ হাদিসটির সাথে অন্য একটি হাদিসের সাদৃশ্য রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে: রসূলুল্লাহ্ সা.কে পরিত্রাণের উপায় জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: 'তোমার যবানকে সংযত কর, নিজের বাড়িকে নিজের জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত মনে করো এবং নিজের গুনাহ্‌র জন্য রোদন কর।'

জান্নাত মুজাহিদের জন্য: ইমাম তিরমিযি বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নির্জনতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রসূলুল্লাহ্ সা.কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন: 'এটা করো না। কেননা তোমাদের কোনো ব্যক্তির আল্লাহ্‌র পথে অবস্থান তার বাড়িতে বসে সত্তর বছর নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন ও বেহেশতে প্রবেশ করান, এটা কি তোমরা চাওনা? আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করো। যে ব্যক্তি উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে বসে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত।'

মুজাহিদ বেহেশতে একশো ধাপ উন্নতি লাভ করে: আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'হে আবু সাইদ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামকে দীন হিসাবে ও মুহাম্মদ সা. কে নবি হিসাবে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়, তার জন্য জান্নাত অবধারিত।' এতে আবু সাইদ খুদরি চমৎকৃত হয়ে বললেন: হে রসূলুল্লাহ্, কথাটা আমাকে আবার বলুন। তখন রসূলুল্লাহ্ সা. কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপর বললেন: আর একটা কাজ আছে, তা করলে আল্লাহ্ বেহেশতের মধ্যে বান্দাকে একশো ধাপ উন্নত অবস্থান দান করেন, তন্মধ্যে দু'টির মধ্যে আকাশ ও পৃথিবীর সমান ব্যবধান।

আবু সাঈদ বললেন: হে রসূলুল্লাহ্, সে কাজটি কী? তিনি বললেন: 'আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ। .... আল্লাহ্‌র

পথে জিহাদ।' রসূলুল্লাহ্ সা. আরো বলেছেন: 'বেহেশতের মধ্যে একশোটি স্তর রয়েছে, যা আল্লাহ্ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য বরাদ্দ করে রেখেছেন। তার দুটি স্তরের মাঝে আকাশ ও পৃথিবীর সমান দূরত্ব। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহর কাছে বেহেশত চাইবে তখন ফেরদাউস চাইবে। কেননা ওটা বেহেশতের মধ্যম স্তর ও সর্বোচ্চস্তর। এর উপরে রয়েছে আল্লাহর আরশ। এ ফেরদাউস থেকেই বেহেশতের নদীগুলো উৎসারিত।'

জিহাদের সমকক্ষ কিছু নেই: আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা.কে জিজ্ঞাসা করা হলো: হে রসূলুল্লাহ্, মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সমকক্ষ কী? রসূলুল্লাহ সা. বললেন: সেটা তোমরা করতে পারবেনা। এ প্রশ্নটি দু'বার বা তিনবার করা হলো। প্রতিবার রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: তোমরা সেটি করতে পারবেনা। সর্বশেষ বার তিনি বললেন: 'আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীর সমকক্ষ হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে ক্রমাগত রোযা থাকে ও আল্লাহ্র আয়াতগুলো পাঠ করে ক্রমাগত নামায পড়ে, অত:পর আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে নামায ও রোযা আদায় অব্যাহত রাখে।' (পাঁচটি হাদিসগ্রন্থে বর্ণিত)।

শাহাদাতের মর্যাদা: রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'আল্লাহ্র পথে কে আহত হবে, সেটা তো একমাত্র আল্লাহই জানেন। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে আহত হবে, সে কেয়ামতের দিন যখন উপস্থিত হবে, তখন তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। সে রক্তের বর্ণ তো রক্তেরই বর্ণ, কিন্তু তা থেকে মেশকের ঘ্রাণ ছুটবে।'

মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম বলেন: আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক যখন জিহাদের ময়দানে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁকে বিদায় জানাতে এলে তিনি আমাকে নিম্নোক্ত কবিতাটি লিখিয়ে দিলেন এবং মক্কায় অবস্থানরত ফুযাইল ইবনে ঈয়াযের নিকট পাঠালেন:'হে হারামাইনে বসে আল্লাহ্র ইবাদতকারী, তুমি যদি আমাদেরকে দেখতে তবে বুঝতে যে, তুমি ইবাদাতের মধ্যে খেলা করছো। যার গাল দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে, সে জেনে রাখুক যে, আমাদের গলা আমাদের রক্ত দ্বারা রঞ্জিত হচ্ছে। যার ঘোড়া কোনো বাতিল উদ্দেশ্যে ছুটাছুটি করে ক্লান্ত হচ্ছে, সে জেনে রাখুক, আমাদের ঘোড়াগুলো যুদ্ধের দিনে ক্লান্ত হয়। সুগন্ধীর বাতাস তোমাদেরকে মোহিত করে। আর আমাদের সুগন্ধী হলো তরবারির ধারালো প্রান্তের ঝাপটা এবং পবিত্র ধুলা। আমাদের নবির সত্য ও সঠিক বাণী, যা কখনো মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে না, আমাদের নিকট এসেছে: 'আল্লাহ্ ওয়ালাদের ধুলো ও দোযখের আগুন কোনো মানুষের নাকের মধ্যে একত্রিত হবে না।' এ বাণী কখনো মিথ্যা হবার নয়। এই যে আল্লাহর কিতাব। এটি আমাদের মাঝে ঘোষণা করে: 'শহীদ কখনো মরে না। এ কথা মিথ্যা নয়।'

মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম বলেন: আমি মসজিদুল হারামে তার এই চিঠি নিয়ে ফুযাইল ইবনে ইয়াযের সাথে সাক্ষাত করেছিলাম। তিনি যখন চিঠিটা পড়লেন, তখন তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তিনি বললেন: আবু আব্দুর রহমান সত্য কথা বলেছে এবং আমাকে সদুপদেশ দিয়েছে। তারপর বললেন: তুমি কি হাদিস লিখতে পারবে? আমি বললাম: হাঁ। তিনি বললেন: তাহলে আবু আব্দুর রহমানের চিঠি আমার নিকট বহন করে নিয়ে আসার পারিতোষিক স্বরূপ এই হাদিসটি লেখ:

'আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বললো: হে রসূলুল্লাহ্! আমাকে এমন একটি কাজ শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা আমি আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের সমান সওয়াব পাবো। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: অব্যাহতভাবে একাধারে নামায পড়তে এবং রোযা ভঙ্গ না করে একাধারে রোযা রাখতে পারো? সে বললো: হে রসূলুল্লাহ্ এ কাজে আমি সবার চেয়ে বেশি অক্ষম। তারপর রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: তুমি যদি এটা করতে পারতে, তবুও আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের সমান হতে পারতেনা। তুমি কি জাননা, একজন মুজাহিদ তার সাধ্য অনুপাতে যেটুকু সৎকাজ করে, তাতেই সে এই মর্যাদা লাভ করে? রসূলুল্লাহ্ সা. তার সাহাবিদেরকে বলেছেন: 'তোমাদের ভাইরা যখন ওহুদে শহীদ হলো, তখন আল্লাহ্ তাদের আত্মাগুলোকে সবুজ পাখিদের পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন: অত:পর সে পাখিরা বেহেশতের নহরে নহরে বিচরণ করতে লাগলো, বেহেশতের ফলমূল আহার করতে লাগলো এবং আরশের ছায়ার নীচে ঝুলন্ত প্রদীপের পাশে বিশ্রাম নিলো। তারপর যখন তারা তাদের পানাহার ও ঘুমের পরিপূর্ণ স্বাদ পেয়ে তৃপ্তি লাভ

করলো, তখন বললো: আমাদের দুনিয়ার ভাইদের কাছে আমাদের পক্ষ থেকে কে এই বার্তা পৌছাবে যে, আমরা বেহেশতে জীবিত আছি এবং জীবিকা পাচ্ছি, যাতে তারা জিহাদ থেকে উদাসীন না হয়? তখন আল্লাহ্ বললেন: তোমাদের পক্ষ থেকে এই বার্তা আমিই পৌছাবো। অত:পর আল্লাহ্ নাযিল করলেন:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ○ فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ
اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ لا وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ○
يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لا وَّ اَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

'যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করোনা। বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পেছনে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে এ জন্য যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দু:খিতও হবেনা। আল্লাহ্র অবদান ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং এটা এ কারণে যে, আল্লাহ মুমিনদের কর্মফল নষ্ট করেননা।' (সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১৬৯-১৭১)

রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'শহীদদের রূহ সবুজ পাখিদের পাকস্থলীতে অবস্থান করে, তারা বেহেশতে যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করে।' রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'শহীদ হত্যার বেদনা কেবল ততোটুকুই অনুভব করে, যতোটুকু বেদনা তোমাদের কোনো ব্যক্তি একটি পোকামাকড়ের কামড়ে অনুভব করে।' রসূলুল্লাহ্ সা. আরো বলেছেন: শ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো, তোমার রক্তপাত হওয়া ও তোমার ঘোড়ার নিহত হওয়া।

জাবির ইবনে আতীক বলেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: আল্লাহ্র পথে নিহত ব্যক্তি ছাড়াও সাত ব্যক্তি শহীদ: প্লেগে মৃত ব্যক্তি শহীদ, পানিতে ডুবে মরা ব্যক্তি শহীদ, দেহের ভেতরের গভীর ক্ষত, ঘা বা ফোঁড়া থেকে জন্ম নেয়া জ্বর, কাশি ইত্যাদির কারণে মৃত ব্যক্তি শহীদ, পেটের ব্যাধিতে মৃত ব্যক্তি শহীদ, পুড়ে মরা ব্যক্তি শহীদ, বিধ্বস্ত কাঠামোর নীচে চাপা পড়ে মরা ব্যক্তি শহীদ এবং সন্তান প্রসবকালে মারা যাওয়া নারী শহীদ।' (আহমদ, আবুদাউদ, নাসায়ি, সহীহ্ সনদ সহকারে)।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: তোমরা কাকে শহীদ মনে করো? লোকেরা বললো: হে রসূলুল্লাহ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদে নিহত হয় সে শহীদ। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: তাহলে আমার উম্মতের শহীদ তো খুবই কম। লোকেরা বললো: তাহলে হে আল্লাহ্র রসূল, শহীদ কারা? রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদে নিহত হয় সে শহীদ, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে থাকা অবস্থায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ, যে ব্যক্তি প্লেগে মারা যায় সে শহীদ, পেটের রোগের কারণে যে মারা যায় সে শহীদ, এবং যে ব্যক্তি পানিতে ডুবে মারা যায় সে শহীদ।' –(মুসলিম)।

সাইদ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: 'যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ, যে ব্যক্তি নিজের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ, এবং যে ব্যক্তি নিজের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।' (আহমদ ও তিরমিযি, তিরমিযি কর্তৃক বিশুদ্ধ ঘোষিত)।

আলেমগণ বলেন: আল্লাহ্র পথে জিহাদে নিহত না হয়েও এ সকল ব্যক্তির শহীদ হওয়ার অর্থ হলো, আখেরাতে তারা শহীদের সওয়াব পাবে। তবে পৃথিবীতে তাদের মৃতদেহকে গোসল করানো ও জানাযা পড়া হবে।

'বস্তুত শহীদ তিন প্রকার: দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় শহীদ। এ হলো কাফেরদের সাথে যুদ্ধে নিহত ব্যক্তি। শুধু আখেরাতে শহীদ, দুনিয়ার বিধি অনুযায়ী শহীদ নয়। এরা হচ্ছে যাদের কথা এখানে উল্লেখ করা হলো: তৃতীয় জন হচ্ছে, শুধু দুনিয়ার দৃষ্টিতে শহীদ, আখেরাতে নয়। এ হচ্ছে গনিমত থেকে চুরি করে অথবা জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করে মৃত ব্যক্তি।' আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'আল্লাহ শহীদের সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন, কিন্তু ঋণ মাফ

করবেননা।' বান্দাদের উপর কৃত জুলুম, অত্যাচার যথা হত্যা করা, মানুষের সম্পদ অবৈধভাবে হরণ করা ইত্যাদি ঋণের মতোই, যা মাফ করা হবেনা।

আল্লাহ্‌র দীনকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে জিহাদ: জিহাদ ততোক্ষণ পর্যন্ত যথার্থ ও প্রকৃত জিহাদ নামে আখ্যায়িত হয়না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তার উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন, আল্লাহ্‌র দীনকে বুলন্দ ও প্রতিষ্ঠিত করা, সত্যের পতাকা সমুন্নত করা, বাতিল শক্তিকে পরাভূত করা এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে বর্জন করে সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করা না হয়। এগুলোর কোনো একটি ছাড়া কোনো পার্থিব স্বার্থ ও উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে জিহাদ করা হলে তা প্রকৃত জিহাদ বলে গণ্য হবেনা। সুতরাং কেউ যদি কোনো পদ লাভ, কোনো ধনসম্পদ লাভ, বীরত্ব বা অন্য কোনো ধরনের খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র যুদ্ধ করে, তবে সে আখেরাতে কোনো সওয়াব বা প্রতিদান পাবেনা। আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট এসে বললো: কোনো ব্যক্তি সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, কেউবা খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, কেউবা বীরের খেতাব লাভের জন্য যুদ্ধ করে। এদের মধ্যে কে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে? রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: আল্লাহ্‌র বাণীকে সমুন্নত করা ও আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে, সে-ই আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে। আবু দাউদ ও নাসায়ি রহ. বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি বললো: হে আল্লাহ্‌র রসূল! এক ব্যক্তি খ্যাতি ও আখেরাতের পুরস্কার দুটোই অর্জন করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। সে কী পাবে? রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: সে কিছুই পাবেনা। লোকটি তিনবার প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করলো। রসূলুল্লাহ্ সা. তিনবারই তাকে বললেন: সে কিছুই পাবেনা। আল্লাহ্ এমন কোনো আমল গ্রহণই করেননা, যা শুধু তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা হয়না।

বস্তুত নিয়ত বা উদ্দেশ্যই যে কোনো আমল বা কাজের প্রাণ। যে কাজের নিয়ত বা উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও আখেরাতের সওয়াব লাভ নয়, সে কাজ মৃত ও প্রাণহীন। আল্লাহ্‌র কাছে তার কোনো মূল্য নেই। ইমাম বুখারি উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: "নিয়ত দ্বারাই কাজের বিচার করা হবে। যে কোনো ব্যক্তি তার কাজ থেকে শুধু তাই পাবে, যা সে নিয়ত করেছে।"

একমাত্র খালেস ও নির্ভেজাল নিয়তই প্রত্যেক কাজের যথার্থ মূল্য নিশ্চিত করে। খালেস নিয়ত দ্বারা একজন মানুষ শহীদ না হয়েও শহীদের মর্যাদা লাভ করতে পারে। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি যথার্থ আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ্‌র নিকট শাহাদাত পায়, সে যদি বিছানায় শুয়েও মারা যায়, তবু আল্লাহ্ তাকে শহীদের মর্যাদায় অভিষিক্ত করবেন।" রসূলুল্লাহ্ সা. আরো বলেন: 'মদিনায় এমন বহু গোষ্ঠী রয়েছে, যারা তোমাদের প্রতিটি অভিযানে ও প্রতিটি প্রান্তর অতিক্রম করার সময় তোমাদের সাথে ছিলো। অথচ তারা (প্রকৃত পক্ষে) ওযরের কারণে তোমাদের সাথে থাকতে পারেনি।" বস্তুত খালেস নিয়তের পরিবর্তে কোনো দুনিয়াবী স্বার্থ যখন জিহাদের প্রেরণার উৎস হয়, তখন জিহাদকারী শুধু যে আখেরাতের পুরস্কার ও সওয়াব থেকেই বঞ্চিত হয় তা নয়; বরং সে এ দ্বারা নিজেকে কেয়ামতের দিন আযাবে নিক্ষেপ করে। আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সা. কে বলতে শুনেছি, কেয়ামতের দিন সর্ব প্রথম যে ব্যক্তির বিচার অনুষ্ঠিত হবে, সে হবে একজন শহীদ। তাকে কেয়ামতের ময়দানে হাজির করা হবে। অত:পর তাকে যে সব নিয়ামত দান করা হয়েছিল তার উল্লেখ করা হবে। লোকটি সকল নিয়ামতের কথা স্বীকার করবে। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি এ সব নিয়ামতের কিরূপ সদ্ব্যবহার করেছো? সে বলবে: তোমার জন্য যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ্ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি যুদ্ধ করেছ এজন্য, যেন তোমাকে বীর বলা হয়। সেটা বলাও হয়েছে। অত:পর তাকে মাথা নীচের দিকে দিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আরেক জন হবে এমন এক ব্যক্তি, যে ইসলামের জ্ঞান অর্জন করে তা অন্যদেরকে শেখাতো এবং কুরআন পাঠ করতো। তাকে হাজির করে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ স্মরণ করানো হবে। সে নিয়ামতগুলোর কথা স্বীকার করবে। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি এ সব নিয়ামতের কিরূপ সদ্ব্যবহার করেছ? সে বলবে: আমি দীনের ইলম শিখেছি, শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করেছি। আল্লাহ্ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি ইল্‌ম শিখেছ এজন্য, যেন লোকে তোমাকে আলেম বলে। আর কুরআন পড়েছ এ জন্য যেন লোকে তোমাকে আলেম বলে। সেটা বলাও হয়েছে। অত:পর তাকে অধো মুখে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। আরেক জন হবে এমন এক

ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ যথেষ্ট প্রাচুর্য দান করেছিলেন এবং নানা ধরনের ধনসম্পদের অধিকারী করেছিলেন। তাকে হাজির করে ঐ সব নিয়ামতের কথা স্মরণ করানো হবে। সে সবই স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করবেন: তুমি এ সব নিয়ামতের কিরূপ সদ্ব্যবহার করেছিলে? সে বলবে: তুমি যে সকল খাতে অর্থ ব্যয় করা পছন্দ কর, তোমার সন্তুষ্টির খাতিরে তার সব কটিতেই ব্যয় করেছি। আল্লাহ্ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছ। আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নয়, বরং লোকে তোমাকে দানশীল বলবে এ উদ্দেশ্যে দান করেছ। সেটা বলাও হয়েছে। অত:পর তাকে অধোমুখে দোযখে নিক্ষেপ করার আদেশ দেয়া হবে এবং নিক্ষেপ করা হবে।' (সহীহ্ মুসলিম)।

আমলের প্রতিদান: মুজাহিদ যতোই আন্তরিক ও খালেস নিয়তের অধিকারী হোক না কেন, সে যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গনিমতের অংশ নেবে, তখন সেটা তার সওয়াব থেকে কমিয়ে দেয়া হবে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: ছোট বা বড় যে ধরনেরই যুদ্ধ পরিচালিত হোক না কেন, তাতে অংশ গ্রহণ করে যারা নিরাপদে ফিরে আসে ও গনিমত গ্রহণ করে, তারা তাদের জিহাদের প্রতিদানের দুই তৃতীয়াংশ গ্রহণ করে। আর ছোট বা বড় যে কোনো যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে যারা নিহত বা আহত হয়, তারা জিহাদের পূর্ণ সওয়াব লাভ করে।' (সহীহ্ মুসলিম)।

ইমাম নববী বলেন: এ হাদিসের একমাত্র সার্বিক অর্থ হলো, যোদ্ধাদের মধ্যে যারা অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসে অথবা গনিমত গ্রহণ করে, তাদের সওয়াব যারা অক্ষত অবস্থায় ফেরেনি অথবা অক্ষত অবস্থায় ফিরেছে, কিন্তু গনিমত গ্রহণ করেনি, তাদের চেয়ে কম হবে। কেননা গনিমত হচ্ছে জিহাদের প্রতিদানের একটা অংশ। সেটা যারা গ্রহণ করবে তারা জিহাদের সওয়াবের দুই তৃতীয়াংশ পেয়েছে বলে গণ্য হবে। গনিমত মোট সওয়াবের একটা অংশ গণ্য হবে। এ ব্যাখ্যা সাহাবিদের থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ উক্তিগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন জনৈক সাহাবি বলেছেন: আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তার সওয়াবের কোনো অংশ ভোগ না করেই মারা যেত। আবার কেউ কেউ এমনও থাকতো যে, তার সুফল দুনিয়াতে ভোগ করতো। সুতরাং আমরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছি তা সঠিক এবং এটাই হাদিসটির প্রকাশ্য অর্থ। কোনো সুস্পষ্ট ও সহীহ্ হাদিস এই ব্যাখ্যার বিপক্ষে নেই। তাই আমরা এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, সেটাই যথার্থ বলে গ্রহণ করতে হবে। কাযি ইয়ায রহ.ও এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ আবু আইয়ুব রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন:

"তোমাদের হাতে বহু জনপদ বিজিত হবে এবং তোমরা সুসংগঠিত সেনাবাহিনীতে পরিগণিত হবে। তখন বিভিন্ন সেনাদল তৈরি হবে। কেউ কেউ সে সব সেনাদলে ভর্তি হয়ে যুদ্ধে যাওয়া পছন্দ করবে। সে তার গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। পুনরায় সে সব ক'টি গোত্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে নিজেকে তাদের সামনে পেশ করবে ও বলবে: 'কে আছে, যার বদলে আমি অমুক সেনাদলে যাবো? সে-ই প্রকৃত যোদ্ধা। শেষ রক্ত বিন্দু দিয়েও সে লড়াই করবে।"

আল্লাহ্‌র পথে সীমান্তে অবস্থান করে শত্রুর মোকাবেলা করার ফযিলত: সীমান্তে এমন অনেক স্থান থাকে যেখান দিয়ে শত্রু সেনারা মুসলমানদের দেশে অনুপ্রবেশ করতে পারে। এ সকল জায়গায় কঠোরতম প্রতিরোধ গড়ে তোলা জরুরি, যাতে শত্রুরা তাকে দুর্বল স্থান হিসেবে ব্যবহার করে সেখান দিয়ে ভেতরে ঢুকতে না পারে। ইসলাম এ ধরনের সম্ভাব্য ফাঁকা স্থানগুলোকে সংরক্ষণ করতে বিপুলভাবে উৎসাহিত করেছে। সৈন্যদেরকে এর জন্য প্রতিষ্ঠিত করার আদেশ দিয়েছে, যাতে তারা মুসলমানদের শক্তির উৎসে পরিণত হয়। আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এ ধরনের ফাঁকা স্থানগুলোতে অবস্থান ও প্রহরী দ্বারা সংরক্ষিত করাকে 'রিবাত' বলে আখ্যায়িত করা হয়। রিবাতের ন্যূনতম মেয়াদ এক ঘন্টা বা কিছু সময় এবং সর্বোচ্চ সময় চল্লিশ দিন। আর সর্বোত্তম মেয়াদ হলো, যতোক্ষণ বা যতোদিন অবস্থান করলে তাকে শত্রুর চোখে সর্বাপেক্ষা ভীতিজনক ঘাঁটিতে পরিণত করা যায়। আলেমগণ সর্বসম্মতভাবে বলেছেন, ইসলামের ও মুসলমানদের দুশমনকে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সীমান্তে বা রণাঙ্গনে অবস্থান মক্কায় অবস্থানের চেয়েও উত্তম। এর ফযিলত সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদিসসমূহ বর্ণিত হয়েছে:

ইমাম মুসলিম সালমান রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: একদিন ও একরাতের 'রিবাত'

এক মাস ব্যাপী রোযা ও নামাযের চেয়ে উত্তম। এ অবস্থায় যদি কেউ মারা যায়, তাহলে সে যে সব নেক কাজ করতো, তা তার উপর চলতে থাকবে, (এটি রিবাতেরই বিশেষ ফযিলত) এবং তার জীবিকা তার উপর অব্যাহত থাকবে। উপরন্তু সে যালেমদের যুলুম থেকে নিরাপদে থাকবে।' তিনি আরো বলেছেন: 'প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সাথে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে রিবাতকারীর (জিহাদকারীর) নেক আমল বন্ধ হয়না। তার আমল কেয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সে কবরের আযাব থেকে নিরাপদ থাকে।'

জিহাদের নিয়তে তীর নিক্ষেপের ফযিলত: ইসলাম আল্লাহর পথে জিহাদের নিয়তে তীর নিক্ষেপ করা, যুদ্ধবিদ্যা ও আত্মরক্ষার কৌশল শিখতে উৎসাহ দিয়েছে, এ সব বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণে এবং তীরন্দাযী ও মল্লযুদ্ধ শিখতে উদ্দীপনা যুগিয়েছে।

১. উকবা ইবনে আমের রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সা.কে মিম্বরে বসে বলতে শুনেছি: আল্লাহ্ বলেছেন: "শত্রুর বিরুদ্ধে যতোদূর সম্ভব, শক্তি সঞ্চয় করো। জেনে রেখ, তীরন্দাযীই শক্তি, জেনে রেখ, তীরন্দাযীই শক্তি, জেনে রেখ, তীরন্দাযীই শক্তি।' (মুসলিম)

২. উকবা ইবনে আমের থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'অচিরেই বহু ভূখন্ড তোমাদের দখলে আসবে। সুতরাং তোমরা বর্শা খেলায় উদাসীন হয়োনা। আল্লাহ্ তা'য়ালা একটা বর্শার উসিলায় তিন ব্যক্তিকে বেহেশতে প্রবেশ করান: বর্শার নির্মাতাকে, তা সরবরাহকারীকে এবং আল্লাহ্‌র পথে তা নিক্ষেপণকারীকে।'

তীর বা বর্শা নিক্ষেপন শেখার পর তা ভুলে যাওয়াকে ইসলাম কঠোরভাবে নিন্দা করেছে। বিনা ওযরে তা বর্জন করা মাকরূহ তাহরিমী।

৩. রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপন শিখে তা বর্জন করে, সে আমাদের কেউ নয়, অথবা বলেছেন, সে আল্লাহ্‌র নাফরমানি করে।'

৪. রসূলুল্লাহ্ সা. আরো বলেছেন: 'মানুষের সব খেলাই অন্যায়। কিন্তু তীরন্দাযীর খেলা, ঘোড়া দাবড়ানোর খেলা এবং নিজের স্ত্রীর সাথে আমোদ প্রমোদ করা ন্যায়সঙ্গত।'

কুরতুবি বলেছেন: 'এ হাদিসের প্রকৃত মর্ম আল্লাহ্ই ভালো জানেন। তবে (আমার জানা মতে) এর মর্ম হলো: মানুষ যে সব উপায়ে চিত্তবিনোদন করে, তাতে দুনিয়া ও আখেরাতের কোনোই ফায়দা নেই। তাই সেগুলো অন্যায় এবং তা বর্জন করা উত্তম। কিন্তু এ তিনটি কাজ যদিও বিনোদন ও আমোদ-ফূর্তি হিসাবেই করা হয়; কিন্তু এগুলোর কিছু উপকারিতাও রয়েছে। কেননা তীর নিক্ষেপণ ও ঘোড়দৌড়ের অনুশীলন যুদ্ধের সহায়ক কলাকৌশল। আর স্ত্রীর সাথে আমোদ-প্রমোদের পরিণামে একমাত্র আল্লাহর এবাদতকারীর একটি সন্তান লাভ করার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। তাই এ তিনটি জিনিস ন্যায়সঙ্গত।' রসূলুল্লাহ্ সা. আরো বলেছেন: হে ইসমাইলের বংশধর। তোমরা তীরন্দাযী করো। কেননা তোমাদের পিতা তীরন্দায ছিলেন।' আর ঘোড়ায় আরোহণ ও অস্ত্র চালনা শিক্ষা করা ফরযে কিফায়া, যা কখনো কখনো ফরযে আইনেও পরিণত হয়ে থাকে।

নৌযুদ্ধ স্থল যুদ্ধের চেয়ে উত্তম: যেহেতু নৌপথের যুদ্ধ স্থলপথের যুদ্ধের চেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ, তাই তাতে সওয়াব বেশি।

১. আবু দাউদ উম্মে হারাম রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূল সা. বলেছেন: সামুদ্রিক অভিযানে মৃত ব্যক্তি এবং সমুদ্রে ডুবে মরা ব্যক্তি দু'জন শহীদের মর্যাদা পায়।

২. ইবনে মাজা আবু উমামা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: সমুদ্রে যে ব্যক্তি শহীদ হয় সে স্থলভাগের দুজন শহীদের সমান। আর সমুদ্রে মাথা ঘোরা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি স্থলভাগে রক্তে গড়াগড়ি খাওয়া ব্যক্তির সমান। আর উভয় প্রকার শাহাদাতের লক্ষ্যে যে যুদ্ধ করে, সে আল্লাহর এবাদতের মধ্যে জীবন কাটিয়ে দেয়ার জন্য দুনিয়ার সম্পর্ক ছিন্নকারীর সমান মর্যাদাবান। আল্লাহ্ নৌযুদ্ধের শহীদ ব্যতীত অন্য সকলের প্রাণ সংহার করার কাজে মৃত্যুর ফেরেশতাকে নিযুক্ত করেন। নৌযুদ্ধের

শহীদের প্রাণ তিনি নিজেই সংহার করেন। আর স্থল যুদ্ধে শহীদের ঋণ ব্যতীত সকল গুনাহ্ মাফ করেন। কিন্তু নৌযুদ্ধের শহীদের ঋণসহ সকল গুনাহ মাফ করেন।

সেনাপতির প্রয়োজনীয় গুণাবলী: সেনাপতির মধ্যে যে গুণাবলী থাকা জরুরি, ইমাম ফাখরী সেগুলোর উল্লেখ করে বলেন: "জনৈক তুর্কী সমর বিশারদ বলেছেন: একজন সেনাপতির মধ্যে এমন দশটি গুণাবলীর সমাবেশ হওয়া জরুরী, যা বিভিন্ন জীবজন্তুর মধ্যে স্বভাবগতভাবে বিদ্যমান। সেগুলো হচ্ছে: সিংহের সাহস, শূকরের ক্ষিপ্রতা, শৃগালের ধূর্ততা, সারস পাখির প্রহরা, মোরগের ত্যাগ ও বদান্যতা, ছানাদের প্রতি মুরগীর স্নেহ, কাকের সতর্কতা, তায়ারু'র মতো মোটাতাজা দেহ। তাগারু ইরানের খোরাসান প্রদেশের এক ধরনের পশু, যাকে প্রভুর পরিশ্রম ও সফরের জন্য মোটাতাজা করা হয়।

সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার মানুষের নেতৃত্বে জিহাদ: জিহাদের জন্য নেতা বা শাসকের ন্যায়বিচারক বা সৎলোক হওয়া শর্ত নয়। বরং সর্বাবস্থায় জিহাদ করা ওয়াজিব। জিহাদের ময়দানে একজন পাপিষ্ঠ লোকের মধ্যেও এমন বীরত্ব ও সাহসিকতা থাকা বিচিত্র নয়, যা অন্যদের মধ্যে নেই।

সাধারণ সৈনিকদের ব্যাপারে সেনাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য: সাধারণ সৈনিকদের ব্যাপারে সেনাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ:

১. তাদের সাথে পরামর্শ করা, তাদের মতামত গ্রহণ করা, তাদেরকে বাদ দিয়ে স্বেচ্ছাচারী পন্থায় কাজ না করা। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন: وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ "কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো।' (সূরা ৩ আলে ইমরান: আয়াত ১৫৯)

আবু হুরায়রা রা. বলেন: "নিজের সাথীদের সাথে রসূলুল্লাহ্ সা. এর চেয়ে বেশি পরামর্শ করতে কাউকে দেখিনি।' (আহমদ ও শাফেয়ি)।

২. তাদের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রদর্শন, কোমল ও নমনীয় আচরণ। আয়েশা রা. বলেন, রসূল সা. বলেছেন: "হে আল্লাহ্! যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের উপর কোনো ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল হয় এবং তাদের প্রতি কোমল আচরণ করে, তুমি তার প্রতি কোমল আচরণ করো।" (মুসলিম)।

মা'কিল ইবনে ইয়াসার রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: "যে নেতা মুসলমানদের উপর দায়িত্বশীল হয়, অত:পর তাদের কল্যাণের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেনা এবং তাদের হিতাকাংখী হয়না, সে বেহেশতে প্রবেশ করবেনা।" (সহীহ মুসলিম)।

আবু দাউদ জাবির রা. থেকে বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ্ সা. সফরে যাওয়ার সময় পিছনে থাকতেন, যারা দুর্বল, তাদেরকে এগিয়ে নিতেন, কাউকে নিজের বাহনের পেছনে তুলে বসাতেন এবং গভীরভাবে ভালোবাসতেন।

৩. সৎ কাজে আদেশ দান ও অসৎকাজ থেকে বারণ করা, যাতে তারা গুনাহ্র কাজে লিপ্ত হতে না পারে।

৪. কিছুক্ষণ পর পর বাহিনীকে পর্যবেক্ষণ করা, যাতে সৈনিকদের সম্পর্কে সেনাপতি যথাযথভাবে অবহিত থাকতে পারেন, যারা যুদ্ধের অযোগ্য তাদেরকে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেন। অকেজো সাজসরঞ্জাম ফেরত পাঠাতে পারেন এবং যে সকল ব্যক্তি সৈনিকদেরকে যুদ্ধ থেকে সরে যেতে বা নিষ্ক্রিয় থাকতে প্ররোচনা দেয় এবং যারা নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে বেড়ায়, যেমন এরূপ বলে: 'তাদের বাহিনীর পর্যাপ্ত জনবল ও অস্ত্রবল নেই।' অনুরূপ যারা বাহিনীর গতিবিধির খবর পাচার করে বা বিশৃংখলা সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে, তাদেরকে বাহিনী থেকে ছাটাই করতে পারে।

৫. তদারককারীদের চিহ্নিত করা।

৬. পতাকা প্রদান।

৭. যাত্রাবিরতির উপযুক্ত স্থান নির্বাচন ও আত্মগোপনের স্থানসমূহ সুরক্ষিত রাখা।

৮. শত্রুর গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখার জন্য ব্যাপকভাবে গোয়েন্দা নিয়োগ করা।

রসূলুল্লাহ্ সা. এর রীতি ছিলো, কোনো জায়গায় অভিযানে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে অন্য জায়গার দিকে ইংগিত করতেন। কিন্তু মনে মনে সেই জায়গার লক্ষ্যই ঠিক রাখতেন, যাতে শত্রু তাঁর ইচ্ছা জানতে না

পারে। তিনি সর্বত্র গোয়েন্দাদেরকে ছড়িয়ে দিতেন, যাতে তারা শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে খবর নিয়ে আসতে পারে। তিনি একাধিক বাহিনী প্রস্তুত করে রাখতেন এবং তাদের জন্য পতাকা নির্বাচন করে দিতেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. এর পতাকা ছিলো কালো এবং ব্যানার ছিলো সাদা। (আবু দাউদ)।

সেনাপতিদের প্রতি রসূলুল্লাহ্ সা. এর বিদায়ী নির্দেশাবলী: আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ্ সা. যখন কাউকে কোনো কাজে পাঠাতেন, তখন বলতেন: মানুষকে সুসংবাদ দিবে, নৈরাশ্যজনক সংবাদ দিবে না, তাদের কাজ সহজ করে দিবে, কঠিন করে দিবে না।' (অর্থাৎ যখন কোনো প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দায়িত্ব দিয়ে পাঠাতেন তখন বলতেন, যে সকল লোক অসৎ কর্মশীল হয়েও ইসলামের নিকটবর্তী, তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্মের দিকে অগ্রসর হতে ইচ্ছুক, তাদেরকে আল্লাহ্র রহমতের ব্যাপকতা ও সওয়াবের বিশালতার সুসংবাদ দিবে। বিভিন্ন ভীতিজনক সংবাদ দিয়ে হতাশ করে দিবে না। মানুষের প্রতি সহজ ও নমনীয় থেকো, কঠোর ও উগ্র হয়োনা। (এটা ইসলামের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য অধিকতর প্রয়োজনীয়।)

আবু মূসা রা. থেকে আরো বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. আমাকে ও মুয়াযকে ইয়ামানে প্রেরণকালে বললেন: সহজ করে দেবে, কঠিন করে দেবেনা। সুসংবাদ দিবে, হতাশ করে দিবে না। মতবিরোধে লিপ্ত হয়ো না, একমত হয়ে কাজ করবে।' (বুখারী ও মুসলিম)।

আনাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'আল্লাহ্র নাম নিয়ে, আল্লাহ্র উপর ভরসা করে ও রসূলুল্লাহ্র আদর্শ অনুসরণ করে রওনা হয়ে যাও, কোনো মরণোন্মুখ বৃদ্ধকে হত্যা করোনা তবে যুদ্ধরত কিংবা যুদ্ধের পরামর্শদাতা বা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হলে হত্যা করা যাবে। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. হাওয়াযেন বাহিনীতে বিদ্যমান একশো বিশ বছরের চেয়ে বেশি বয়স্ক যায়দ বিন সাম্মকে হত্যা করেছিলেন। কেননা সে যুদ্ধের ব্যাপারে তাদের উপদেষ্টা ও ঝানু সমরবিদ ছিলো। কোনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু বা মহিলাকে হত্যা করোনা। সক্রিয় যোদ্ধা, যোদ্ধাদের তদারককারিণী বা পরামর্শদাতা হলে হত্যা করা যাবে। বাড়াবাড়ি করো না, তোমাদের গনিমতগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করো। আপোস মীমাংসা করো ও মহানুভবতা প্রদর্শন করো। আল্লাহ্ মহানুভবদেরকে ভালোবাসেন।' (আবু দাউদ)

উমর রা. এর নির্দেশাবলী: উমর রা. সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. ও তার সঙ্গী যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ নির্দেশ লিখে পাঠান: 'আমি তোমাকে ও তোমার অধীনস্থ সৈন্যদেরকে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্কে ভয় করার ও সংযম অবলম্বন করার আদেশ দিচ্ছি। কেননা আল্লাহ্র ভয় ও সংযম, শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়ার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র, সবচেয়ে শক্তিশালী সমর কৌশল। তোমাকে ও তোমার বাহিনীকে আদেশ দিচ্ছি শত্রুর চেয়েও বেশি সতর্ক থাকবে গুনাহ্র কাজ থেকে। কেননা সৈন্যদের পাপাচার তাদের জন্য তাদের শত্রুর চেয়েও ভয়ংকর। মুসলমানরা বিজয়ী হয়ে থাকে শুধু তাদের শত্রুদের আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার কারণেই। তা না হলে তারা শত্রুদেরকে পরাভূত করতে পারতোনা। কেননা মুসলমানদের জনবল তাদের জনবলের সমান নয়। তাদের অস্ত্রবলও শত্রুর অস্ত্রবলের সমান নয়। কাজেই পাপাচারে যদি মুসলমানরা ও তাদের শত্রুরা সমান হয়ে যায়, তাহলে শক্তির দিক দিয়ে তারা আমাদের চেয়ে প্রবলতর হয়ে যাবে। আমরা যদি আমাদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা তাদের উপর বিজয়ী হতে না পারি, তবে শুধু শক্তি দিয়ে তাদেরকে পরাস্ত করতে পারবোনা। জেনে রেখো, তোমাদের অভিযানকালে তোমাদের উপর আল্লাহ্র পক্ষ হতে রক্ষীবাহিনী নিয়োজিত রয়েছে। তারা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত। কাজেই তাদের প্রতি লজ্জাশীল থেকো। আল্লাহর পথে থাকা অবস্থায় কোনো গুনাহে জড়িত হয়োনা। এ কথা বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করো না যে, আমাদের শত্রুরা আমাদের চেয়ে অসৎ। কাজেই তারা কখনো আমাদের উপর বিজয়ী হবে না। অতীতে বহু জাতির উপর তাদের চেয়ে অসৎলোক বিজয়ী ও পরাক্রমশীল হয়েছে, যেমন বনি ইসরাইল আল্লাহ্র ক্রোধ উদ্রেককারী কার্যকলাপে লিপ্ত হলে তাদের উপর অগ্নি উপাসক কাফেরদেরকে বিজয়ী করেছিলেন। তারা তাদের বাড়িঘরে পর্যন্ত আক্রমণ চালাতো। তাদের উপর আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েছিল। তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট সাহায্য কামনা করছি। তোমরাও শত্রুর উপর আল্লাহ্র সাহায্য চাইতে থাকো। এ সাহায্য আমি তোমাদের ও আমাদের জন্য প্রার্থনা করছি।

চলার পথে মুসলমানদের উপর নমনীয় আচরণ করো। এমনভাবে চলতে বাধ্য করো না যাতে তারা ক্লান্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই বলে এতো নমনীয়তা দেখাবে না যে, শত্রুর অবস্থানে না পৌঁছেই কোনো স্থানে যাত্রাবিরতি করবে। মনে রেখো, সফরে শক্তি হ্রাস পায় না। তাদেরকে এমন এক শত্রুর অভিমুখে যাত্রা করতে হচ্ছে, যারা প্রতিষ্ঠিত এবং যারা নিজেদের ও পশুপালের রক্ষণাবেক্ষণে সিদ্ধহস্ত। প্রতি শুক্রবার একদিন ও একরাত তোমার সাথীদের কাছে অবস্থান করো, যাতে তারা কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে তৃপ্তি লাভ করে। এ সময় তারা তাদের অস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম সমর্পণ করবে। তাদের যাত্রাবিরতির স্থানগুলোকে সন্ধি স্থাপনকারী ও চুক্তির ভিত্তিতে নিরাপত্তা গ্রহণকারীদের গ্রামগুলো থেকে দূরে রাখবে। এ সময় তোমার সাথীদের মধ্য থেকে যাদের দীনদারী সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত, তারা ছাড়া আর কাউকে ঐ সব গ্রামে প্রবেশ করতে দেবেনা। মুসলিম বাহিনীর কেউ যেনো ঐ সব গ্রামবাসীর কাউকে কোনো রকম অবজ্ঞা ও অমর্যাদা না করে। মনে রাখবে, তাদের সম্মান ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব তোমাদের উপর বর্তায়, তাদের উপরও বর্তে, যেমন চুক্তির উপর ধৈর্য ধারণের দায়িত্ব। যতোক্ষণ তারা ধৈর্য ধারণ করে ততোক্ষণ তাদের সাথে সদাচরণ করে যাও। সন্ধিকারীরা কোনো অত্যাচার করলে যুদ্ধরত কাফেরদের সাহায্য নিয়ে তাদের উপর প্রতিশোধ নিবেনা। শত্রুর ভূমিতে যখন অবস্থান করবে, তখন তোমাদের ও তাদের মধ্যে গোয়েন্দাদেরকে ছড়িয়ে দাও। তাদের কোনো গতিবিধি যেনো তোমার অজানা না থাকে। তোমার কাছে মুসলমান বা এলাকাবাসীর মধ্য থেকে কেবল এমন লোক থাকা চাই, যার সত্যবাদিতা ও হিতাকাংখিতা সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত। মনে রেখো, মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত লোকেরা মেপে মেপে সত্য বললেও তার সংবাদ তোমার উপকারে আসবেনা। ধোঁকাবাজ ব্যক্তি তোমার পক্ষে নয়, বিপক্ষে গোয়েন্দাগিরি করবে। শত্রু এলাকার নিকটবর্তী হয়ে গেলে তুমি বেশি বেশি অগ্রবর্তী বাহিনী পাঠাবে, প্রচুর সংখ্যক ক্ষুদ্র সেনাদল ছড়িয়ে দেবে, যারা শত্রুর সরবরাহ লাইন ও সুযোগ-সুবিধা বিচ্ছিন্ন করে দেবে, আর অগ্রবর্তী বাহিনীগুলো তাদের গোপন তথ্য উদঘাটন করবে।

অগ্রবর্তী বাহিনীগুলো গঠন করার জন্য তোমার সাথীদের মধ্য থেকে যারা ঝানু সমর কুশলী ও প্রবীণ যোদ্ধা, তাদেরকে নিয়োগ করো। তাদের দ্বারা অশ্বারোহী দলও গঠন করো। তারা যদি কোনো শত্রুর মুখোমুখি হয় তবে সেটা হবে তোমার মতানুসারে সংঘটিত শক্তি প্রয়োগের প্রথম ঘটনা। ছোট ছোট সেনাদল প্রেরণের কাজটা জিহাদে পারদর্শীদের হাতে অর্পণ কর। আর অসি চালনার উপর ধৈর্য ও সংযম অবলম্বন করো। এ কাজ কাউকে খেয়াল-খুশিমত করতে দিবেনা। তাহলে তোমার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি নমনীয়তার কারণে তোমার মতের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব যতোটা ব্যাহত হয়, তার চেয়েও বেশি ব্যাহত হবে। যে ক্ষেত্রে পরাজয়ের আশংকা প্রবল, সে ক্ষেত্রে কখনোই অগ্রবর্তী বাহিনী বা ছোট সেনাদল প্রেরণ করবেনা। শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ যখন শেষ করবে, তখন তোমার দূরবর্তী সেনা, অগ্রসেনা ও ছোট সেনাদলগুলোকে তোমার কাছে সমবেত করো এবং তোমার সমর পরিকল্পনা ও শক্তি সুসংহত করো। এরপরও তোমার উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া না হলে ততোক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য তাড়াহুড়ো করবেনা, যতোক্ষণ শত্রুর গোপন তথ্য ও তার যোদ্ধাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ না পাও, এবং তাদের এলাকা সম্পর্কে তার অধিবাসীদের সমান জ্ঞান অর্জন না করো। এই বিবরণ লাভ ও জ্ঞান অর্জনের পর শত্রুর সাথে তুমি ঠিক তদ্রূপ আচরণ করতে পারবে, যেরূপ আচরণ তারা তোমার সাথে করে।

এরপর তুমি তোমার বাহিনীর উপর গুপ্তচর ছড়িয়ে দাও, এবং রাতের বেলা শত্রুর উপর আক্রমণে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে জাগ্রত হও এবং চুক্তিবদ্ধ কোনো যুদ্ধবন্দীকে বাইরে (পলায়নরত বা যুদ্ধরত) পেলে তৎক্ষণাত তাকে হত্যা করো, যাতে যারা তোমার শত্রু ও আল্লাহ্‌র শত্রু, তারা ভয় পায়। আল্লাহ তোমার ও তোমার অধীনস্থ সৈনিকদের অভিভাবক। তিনিই তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুর উপর বিজয় দানে সক্ষম। তাঁর কাছেই সকলের সাহায্য চাওয়া উচিত।'

সৈনিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য: সেনাপতির প্রতি সৈনিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, আল্লাহর নাফরমানী হয় না এমন প্রত্যেক হুকুম নির্বিবাদে মান্য করা ও আনুগত্য করা। ইমাম বুখারি ও মুসলিম আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূল সা. বলেছেন: 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করলো, যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য, সে আল্লাহ্‌র অবাধ্য, যে ব্যক্তি আমীরের অনুগত, সে আমার অনুগত, যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্য, সে আমার অবাধ্য।'

গুনাহের কাজে আনুগত্য করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেননা স্রষ্টার হুকুম লংঘন করে সৃষ্টির হুকুম পালন করা যায় না। বুখারি ও মুসলিম আলি রা. থেকে বর্ণনা করেন: 'একবার রসূলুল্লাহ্ সা. একটা ছোট সেনাদল পাঠালেন, জনৈক আনসারীকে তার সেনাপতি নিয়োগ করলেন এবং সেনাদলের সদস্যদেরকে তার হুকুম শুনতে ও মান্য করতে আদেশ দিলেন। এক পর্যায়ে সৈনিকরা কোনো ব্যাপারে তার হুকুম অমান্য করলো। তখন সেনাপতি বললো: তোমরা আমার জন্য কিছু কাষ্ঠ সংগ্রহ করো। তারা কাষ্ঠ সংগ্রহ করলো, তারপর সেনাপতি বললো: 'তোমরা আগুন জ্বালাও। তারা আগুন জ্বালালো। তারপর সেনাপতি বললেন: রসূলুল্লাহ সা. কি তোমাদেরকে আমার হুকুম শ্রবন ও পালনের আদেশ দেননি? তারা বললো: দিয়েছেন। সেনাপতি বললেন: তবে এ আগুনের মধ্যে প্রবেশ করো। এ কথা শুনে সৈনিকরা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলো। তারপর বললো: আগুন থেকে বাঁচতেই তো আমরা রসূল সা.এর নিকট এসেছি। এভাবে কিছুক্ষণ কেটে গেলে সেনাপতির ক্রোধ প্রশমিত হলো এবং আগুন নিভে গেলো।

অভিযান থেকে ফেরার পর সৈনিকরা রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট ঘটনাটা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন: তোমরা যদি ঐ আগুনে প্রবেশ করতে, তবে আর কখনো বের হতে পারতেনা। তিনি আরো বললেন: 'স্রষ্টার আদেশ লঙ্ঘন করে সৃষ্টির হুকুম পালন করা চলবেনা। শুধুমাত্র ন্যায় ও বৈধ কাজে আনুগত্য করতে হবে।

যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব: যে কোনো যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে শত্রু পক্ষকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া মুসলমানদের উপর ওয়াজিব। বুরাইদা রা. থেকে মুসলিম বর্ণনা করেন:

'রসূলুল্লাহ্ সা. যখনই কোনো ব্যক্তিকে কোনো ছোট বা বড় বাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ করতেন, তাকে বিশেষভাবে আল্লাহ্কে ভয় করার এবং সাধারণ মুসলমান সৈনিকদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণের নির্দেশ দিতেন। অরপর বলতেন: আল্লাহ্র নামে আল্লাহ্র পথে অভিযানে রওয়ানা হয়ে যাও, যারা আল্লাহ্র সাথে কুফরি করেছে তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যুদ্ধ করো এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদে (গনিমত) খেয়ানত করনা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করনা, নিহতদের লাশ (নাক কান ইত্যাদি কেটে) বিকৃত করনা, কোনো শিশুকে হত্যা করনা, (নারী ও বৃদ্ধদেরকেও না, কারণ তারা যুদ্ধ করেনা) মোশরেক শত্রুদের মুখোমুখি হলে তাদেরকে তিনটি জিনিসের ইসলাম গ্রহণ ও দেশত্যাগ, নচেত জিযিয়া প্রদান দাওয়াত দাও। এর যেটাই তারা গ্রহণ করে, তা মেনে নাও এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করোনা। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও। যদি তারা এ দাওয়াত গ্রহণ করে তাহলে তা মেনে নাও ও যুদ্ধ করোনা। তারপর তাদেরকে তাদের দেশ ছেড়ে মুহাজিরদের দেশে হিজরত করার আদেশ দাও এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তারা হিজরত করলে অন্যান্য মুহাজিরদের সমান সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার পাবে, আর অন্যান্য মুহাজিরদের যা কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য, তাদেরও তাই দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে। যদি তারা হিজরত ও জিহাদ করতে সম্মত না হয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তারা মরুচারী বেদুইনদের মতো হবে। (অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও যুদ্ধোত্তর দখলকৃত জমি ও সম্পদের কোনো অংশ পাবে না) আর অন্যান্য মুসলমানদের উপর আল্লাহ্র যে সব হুকুম কার্যকর হয়, তাদের উপরও তা কার্যকর হবে। ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তাদেরকে জিযিয়া কর দিতে বলবে। পরবর্তী সূরা তাওবায় জিযিয়া শুধুমাত্র ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এটা সম্ভবত তার আগের ঘটনা। তারা জিযিয়া দিতে রাজি হলে তা গ্রহণ করো ও তাদের সাথে যুদ্ধ করোনা। আর রাজি না হলে আল্লাহ্র সাহায্য চেয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। কোনো দুর্গের অধিবাসীদেরকে অবরুদ্ধ করার পর তারা যদি আল্লাহ্ ও রসূলের নিরাপত্তামূলক আশ্রয় চায়, তবে তাদেরকে তা দেবেনা। তবে তাদেরকে তোমার ও তোমার সাথীদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তামূলক আশ্রয় দেবে। কেননা পরে যদি তোমরা সে আশ্রয় দানের চুক্তি ভঙ্গ করতে চাও, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নামে দেয়া চুক্তি ভঙ্গ করার চেয়ে তোমার ও তোমার সাথীদের পক্ষ হতে দেয়া চুক্তি ভঙ্গ করা কম গুরুতর হবে। কোনো দুর্গবাসীকে অবরুদ্ধ করার পর তারা যদি তোমার কাছে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি ও কর্তৃত্বের অধীনে নেমে আসার অনুমতি চায় তবে অনুমতি দেবেনা। তবে তোমার কর্তৃত্বের অধীন নেমে আসতে দেবে। কারণ তুমি জান না তাদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহর কর্তৃত্ব লংঘন করবে কি না। অর্থাৎ আল্লাহ্র নিরাপত্তামূলক আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি ও কর্তৃত্ব এড়িয়ে যাওয়া উচিত। কেননা এ দুটি অত্যন্ত সম্মানজনক এবং এ দুটির সম্মান সযত্নে রক্ষা করা কর্তব্য। (বুখারি ব্যতীত অবশিষ্ট পাঁচটি সহিহ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত)।

একবার সেনাপতি সালমান ফারসির অধীন একটি মুসলিম বাহিনী পারস্যের একটা প্রাসাদ অবরোধ করে। সৈনিকরা সেনাপতিকে বললো: আমরা কি ওদের উপর আক্রমণ চালাবো? সেনাপতি বললেন: রসূল সা. আক্রমণের আগে ইসলামের দাওয়াত দিতেন বলে শুনেছি। তাই আমাকেও সুযোগ দাও তাদেরকে দাওয়াত দেয়ার। এরপর সালমন অবরুদ্ধ প্রাসাদবাসীর নিকট এসে বললেন: আমি তোমাদেরই মতো একজন পারসিক। আরবরা আমার আনুগত্য করে। কাজেই তোমরা ইসলাম গ্রহণ করলে আমাদেরই মতো সকল অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা পাবে এবং আমাদেরই মতো যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য তোমাদের উপরও অর্পিত হবে। কিন্তু তোমরা যদি কোনো মতেই তোমাদের ধর্ম ছাড়তে প্রস্তুত না হও তাহলে বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ স্বহস্তে আমাদেরকে জিযিয়া দাও। আমরা তোমাদেরকে নিজেদের ধর্মে অটল থাকতে দেবো। সালমান ফারসি ভাষায় বললেন: তোমরা প্রশংসার যোগ্য নও। তবুও জিযিয়া দিলে তোমাদেরকে স্বধর্মে বহাল থাকতে দেবো। আর যদি কোনোটাই মানতে রাজি নাহও তবে আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবো।

পারসিকরা বললো: 'আমরা জিযিয়া দেবনা। আমরা বরং তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবো। এবার সৈনিকরা সালমানকে বললো: এখনকি আমরা ওদের উপর আক্রমণ চালাব না? সালমান তাদেরকে তিন দিন সময় দিলেন। তারপর বললেন: ওদের উপর হামলা চালাও। এরপর আমরা তাদের হামলা করে প্রাসাদ দখল করলাম।' (তিরমিযি)

ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন: আমরা যতোদুর জানতে পেরেছি, রসূলুল্লাহ সা. কখনো কোনো জাতিকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে দাওয়াত না দেয়া পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হননি।

'আল-আহকামুস সুলতানিয়া' (শাসন বিধি) নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে: 'যাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে নি, তাদের উপর অতর্কিত ও নৈশকালীন আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে হত্যা করা ও তাদের সহায়সম্পদ পোড়ানো আমাদের জন্য হারাম। তাদের উপর প্রথম আক্রমণ পরিচালনা করা আমাদের জন্য হারাম, যতোক্ষণ না তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করি এবং রসূল সা. এর সে সব মুজিযা ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ তাদের সামনে তুলে ধরি, যা দাওয়াত গ্রহণ করার সহায়ক হয়।

হানাফি মযহাবের ইমামদের মধ্য হতে ইমাম সারাখসীর মতে দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথে যুদ্ধ পরিচালনা না করা বাঞ্ছনীয়। চিন্তা করার জন্য তাদেরকে অন্তত এক রাত সময় দেয়া উচিত। ফকীহদের মতানুসারে সেনাপতি যদি উল্লিখিত তিনটি জিনিসের দাওয়াত দেয়া ও যুক্তি সহকারে সতর্ক করার আগে যুদ্ধ শুরু করে এবং শত্রুর কিছু লোককে অতর্কিতভাবে ও রাত্রিকালে হত্যা করে তবে তাকে সে সব নিহত ব্যক্তির জন্য দিয়াত দিতে হবে।

'ফতুহুল বুল্‌দান' গ্রন্থে বালাযুরি বলেছেন: 'সমরকন্দবাসী তাদের শাসনকর্তা সুলায়মান ইবনে আবিস্ সুরা-কে বললো: কুতায়বা ইবনে মুসলিম বাহেলি আমাদের সাথে কৃত চুক্তি লঙ্ঘন পূর্বক বিশ্বাসঘাতকতা ও আমাদের উপর যুলুম করেছে, আমাদের দেশ দখল করেছে। অথচ আল্লাহ্ ইনসাফ ও ন্যায়বিচারকে প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী করেছেন। সুতরাং আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিন আমীরুল মুমিনীনদের নিকট এ যুলুমের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করার জন্য একটি প্রতিনিধি দল পাঠাই। আমাদের যদি ন্যায্য অধিকার থেকে থাকে, তবে আমাদেরকে তা দেয়া হবে। সুলায়মান তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তারা একটা প্রতিনিধি দল উমর ইবনে আব্দুল আযীযের নিকট প্রেরণ করলো। উমর যখন তাদের উপর কৃত যুলুমের কথা জানলেন, তখন সুলায়মানের নিকট নিম্নরূপ বিধি পাঠালেন: 'সমরকন্দবাসী আমার নিকট তাদের উপর কৃত যুলুমের অভিযোগ করেছে। কুতায়বা তাদেরকে তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে যুলুম করেছে। আমার এই চিঠি পাওয়া মাত্র তুমি তাদের জন্য একজন বিচারক নিয়োগ করো, সে তাদের অভিযোগ বিবেচনা করবে। সে যদি তাদের পক্ষে রায় দেয়, তাহলে কুতায়বা তাদের উপর বিজয়ী হওয়ার আগে তারা যেখানে ছিলো সেখানে পাঠিয়ে দাও এবং তোমরা যেখানে ছিলে সেখানে অবস্থান করো।'

চিঠি পেয়ে সুলায়মান 'জমি ইবনে হাযের'কে বিচারক নিযুক্ত করলেন। তিনি রায় দিলেন যে, সমরকন্দে অবস্থানরত আরবরা তাদের শিবিরে চলে যাবে। তারপর সমান অবস্থান থেকে তাদের নিকট প্রস্তাব পাঠাবে এবং নতুন করে সন্ধি অথবা যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় অর্জিত হবে।

এ রায় ঘোষিত হওয়ার পর ভূমির স্বত্বাধিকারীরা বললো: বরং যা হয়েছে তাতেই আমরা রাজি। নতুন করে যুদ্ধ করতে আমরা প্রস্তুত নই। কেননা তাদের মধ্যে যারা বিচক্ষণ ব্যক্তি তারা বলেছে: 'মুসলমানরা আমাদের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, আমরা তাদের সাথে বসবাস করেছি, তারা আমাদেরকে শান্তিতে ও নিরাপদে অবস্থান করতে দিয়েছে, এবং আমরাও তাদেরকে শান্তিতে ও নিরাপদে অবস্থান করতে দিয়েছি। এখন যদি আমরা যুদ্ধাবস্থায় ফিরে যাই তাহলে কে বিজয়ী হবে, তা আমাদের জানা নেই। যদি আমরা বিজয়ী না হই, তবে ইতিমধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি করে আমরা শত্রুতার জন্ম দিয়ে ফেলবো। এভাবে তারা যে অবস্থায় ছিলো সেটাই বহাল রাখলো, তাতেই সন্তুষ্ট হলো এবং নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকলো। কেননা ইতিমধ্যে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের সুবিচার দেখে মুগ্ধ হয়েছে এবং তাকে একটা বিরাট অর্জন হিসাবে গণ্য করেছে। আর এটা শেষ পর্যন্ত স্বতস্ফূর্তভাবে তাদের ইসলামে প্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ন্যায়বিচারের এমন দৃষ্টান্ত মুসলমানরা ব্যতীত আর কেউ কখনো স্থাপন করতে পেরেছে বলে আমাদের জানা নেই।'

যুদ্ধের প্রাক্কালে আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করা: আল্লাহ্‌র নিকট মুজাহিদদের সাহায্য ও বিজয় চেয়ে দোয়া করা যুদ্ধের অন্যতম নীতি। কেননা সাহায্য ও বিজয় আল্লাহ্‌র হাতেই নিবদ্ধ। রসূলুল্লাহ্ সা. ও তাঁর পরবর্তীকালে তাঁর সাহাবিদের এটাই রীতি ছিলো।

১. আবু দাউদ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন:

'দুটো দোয়া কখনো ফেরত দেয়া হয় না: আযানের সময়ে যে দোয়া করা হয় এবং যুদ্ধের সময় যখন দু'পক্ষ সংঘাতে লিপ্ত হয় তখন যে দোয়া করা হয়।'

২. মহান আল্লাহ্ বলেন: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ 'যখন তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্য চেয়েছিলে আর তৎক্ষণাত আল্লাহ্ তোমাদের দোয়া কবুল করেছিলেন।' (সূরা আনফাল: আয়াত ৯)

৩. তিনটি সহীহ হাদিস গ্রন্থে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি আওফা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. একটি যুদ্ধে শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার পূর্বে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, তারপর জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে বললেন: 'হে জনতা, ... তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার জন্য উদগ্রীব হবে না, আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তা ও শান্তি চাও। কিন্তু যখন শত্রুর মুখোমুখি হতে বাধ্য হও, তখন ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন করো এবং জেনে রাখবে, তরবারির ছায়ার নীচে বেহেশত রয়েছে।' তারপর বললেন: 'কিতাব নাযিলকারী, মেঘমালাকে সঞ্চালনকারী ও কাফেরদের বাহিনীগুলোকে পর্যুদস্তকারী হে আল্লাহ, তাদেরকে পরাজিত করো এবং তাদের উপর আমাদেরকে বিজয়ী করো।'

৪. যুদ্ধে লিপ্ত হবার সময় তিনি এরূপ দোয়া করতেন: 'হে আল্লাহ্, তুমি আমার বাহু ও সহায়, তোমার সাহায্যেই আমি শত্রুর চক্রান্ত মোকাবিলার কৌশল খুঁজে পাই, তোমার দেয়া শক্তির বলেই আমি শত্রুর উপর আক্রমণ করি এবং তোমার সাহায্যেই আমি লড়াই করি।' -আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি ও ইবনে মাজাহ।

৫. বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. আহ্যাব যুদ্ধের (খন্দক যুদ্ধের) দিন এরূপ দোয়া করেন: 'হে কিতাব নাযিলকারী ও ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ, কাফের বাহিনীগুলোকে পর্যুদস্ত করো, হে আল্লাহ্ তাদেরকে পরাভূত করো ও কম্পিত করো।'

বাইশতম অধ্যায়

যুদ্ধ ও সন্ধি

ইসলাম মানবজাতিকে আল্লাহ্‌র দীন গ্রহণের দাওয়াত দেয়াকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে, যাতে এ দীন দ্বারা ইহকালে ও পরকালে সুখ-শান্তি লাভ করত তার অধীনে নিরাপদ জীবন উপভোগ করতে পারে। আল্লাহ্‌র দীনকে বিজয়ী করা ও তাঁর ওহিকে সর্বত্র প্রচার করার কাজে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে মুসলিম উম্মাহ্‌কেই নিযুক্ত করা হয়েছে। একইভাবে পৃথিবীর সকল জাতিকে মুক্ত ও স্বাধীন করার কাজও মুসলিম উম্মাহ্‌র দায়িত্বের আওতাভুক্ত।

এ দিক দিয়ে মুসলিম জাতি সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি। এ বিবেচনায় অন্যান্য জাতির সামনে তার মর্যাদা ছাত্রের সামনে শিক্ষকের মর্যাদার সমান। তার এ মর্যাদা যতোদিন বহাল আছে, ততোদিন তার উপর এ দায়িত্বও যথারীতি অর্পিত রয়েছে যে, সে গোটা মুসলিম উম্মাহ্‌র জাতিসত্তাকে সংরক্ষণ করবে, তার প্রাপ্য অধিকার হস্তগত করার জন্য যথাসাধ্য সংগ্রাম ও চেষ্টা-সাধনা করবে, আল্লাহ্ তার জন্য যে মর্যাদা ও স্থান নির্ধারণ করেছেন, তাতে সমাসীন হওয়া ও থাকার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। এ ক্ষেত্রে যে কোনো পর্যায়ের শৈথিল্য প্রদর্শন মস্ত বড় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে এবং আল্লাহ্ এর পরিণামে লাঞ্ছনা, অপমান ও পতন এমনকি ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হওয়া অবধারিত করেন। মুসলিম উম্মাহ্ যতোদিন তার উপরোক্ত লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জন না করবে (নিজের প্রতিরক্ষা ও সকল জাতিকে স্বাধীন করা) ততোদিন ইসলাম তার জন্য শৈথিল্য ও উদাসিনতাকে নিষিদ্ধ এবং সন্ধি ও আপোষ রফাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। এমতাবস্থায় আপোষ ও সন্ধি ইসলামের দৃষ্টিতে কাপুরুষতা ও হীনতা ছাড়া আর কিছু নয়। এ প্রসংগে আল্লাহ্ বলেন:

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ○

'সুতরাং তোমরা হীনবল হয়োনা এবং সন্ধির প্রস্তাব করোনা। তোমরাই প্রবল, আল্লাহ তোমাদের সংগে আছেন, তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো ক্ষুণ্ণ করবেননা।' (সূরা মুহাম্মদ: আয়াত ৩৫) অর্থাৎ আকিদা-বিশ্বাস ও মতাদর্শের দিক দিয়ে, ইবাদতের দিক দিয়ে, চরিত্রের দিক দিয়ে, রীতি-নীতি, জ্ঞান ও কর্মের দিক দিয়ে তোমরাই সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন।

ইসলামে শান্তি ও সন্ধি করা হয় শক্তি ও ক্ষমতার আসন থেকে, দুর্বলতার আসন থেকে নয়। এ জন্যই ইসলাম শান্তি ও সন্ধিকে শর্তহীন করেনি, বরং শত্রু আগ্রাসন চিরতরে ত্যাগ করবে ও তা থেকে বিরত থাকবে, পৃথিবীতে কোনো যুলুম-অত্যাচার অবশিষ্ট থাকবেনা, কেউ কারো ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করবেনা এ শর্তের সাথে যুক্ত করেছে। এর যে কোনো একটি কারণ পাওয়া গেলে আল্লাহ্ যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন। এটাই সেই যুদ্ধ, যার জন্য জীবন বাজি রাখা যায় এবং অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দেয়া যায়।

পৃথিবীতে ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্ম এমন পাওয়া যাবেনা, যা তার অনুসারীদেরকে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, সত্যের জন্য, অক্ষম ও দুর্বলদের জন্য এবং সম্মানজনক জীবনের জন্য যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। কুরআনের আয়াতসমূহ এবং রসূলুল্লাহ্ সা. ও তাঁর পরবর্তী খলিফাগণের বাস্তব জীবন পর্যালোচনা করলে যে কেউ এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবে। মহান আল্লাহ্ মুসলিম উম্মাহ্‌র উপর যথা সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে জিহাদ করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এই বলে: وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ 'আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করো যেভাবে জিহাদ করা উচিত।' (সূরা হাজ্জ: আয়াত ৭৮)

এ আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে যে, এই জিহাদ হচ্ছে কার্যকর ঈমান, যা ব্যতীত দীন পূর্ণাংগ হয়না। আল্লাহ্ অন্যত্র বলেছেন:

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ○ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ○

'মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি'-এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করেই অব্যাহতি দেয়া হবে? আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম, আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী।' (সূরা আনকাবুত: আয়াত ২ ও ৩)

এখানে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এটাই মুমিনদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র চিরাচরিত রীতি এবং জান্নাত বা আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভের জন্য এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। আল্লাহ্ আরো বলেন:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ط أَلَآ إِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ۝

'তোমরা কি মনে করো, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে যদিও এখনো তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসেনি? অর্থ-সংকট ও দু:খ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রসূল ও তাঁর সাথে ঈমান আনয়নকারীগণ বলে উঠেছিল, আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে? হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটেই।' (সূরা বাকারা: আয়াত ২১৪)

আর এ জন্যই আল্লাহ্ জিহাদের লক্ষ্যে অস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করাকে বাধ্যতামূলক করেছেন :

وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ .....

'তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এ দ্বারা তোমরা আল্লাহ্‌র শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে সন্ত্রস্ত করবে।' (সূরা আনফাল: আয়াত ৬০)

প্রস্তুতি কখন কেমন হওয়া দরকার, তা পরিস্থিতি ও পরিবেশের আলোকেই স্থির হয়ে থাকে। 'শক্তি' শব্দটির আওতায় এমন প্রত্যেক উপকরণই এসে যায়, যা শত্রু দমনে সহায়ক।

সহীহ হাদিসে এসেছে: 'জেনে রেখ, তীরন্দাযীই শক্তি, জেনে রেখো, তীরন্দাযীই শক্তি, জেনে রেখো, তীরন্দাযীই শক্তি।' প্রত্যেক সমর্থ ব্যক্তি কর্তৃক সতর্কতা অবলম্বন ও জনবল সংগঠিত করাও প্রস্তুতি রাখার পর্যায়ভুক্ত। যেমন আল্লাহ বলেছেন:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا۝

'হে মুমিনগণ! সতর্কতা অবলম্বন করো, অত:পর হয় দলে দলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও অথবা এক সংগে অগ্রসর হও।' (সূরা আন নিসা: আয়াত ৭১)

বস্তুত স্থলপথে, নৌপথে ও আকাশপথে প্রস্তুতি নেয়া ব্যতীত সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভব নয়। কঠিন কিংবা সহজ, আনন্দ কিংবা বিবাদ সকল অবস্থায় শত্রুর মুকাবিলা করতে বের হবার আদেশ দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন: اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا 'হালকা অবস্থায় হোক বা ভারি অবস্থায় হোক, অভিযানে বের হয়ে পড়ো।' (সূরা তাওবা: আয়াত ৪১)

(অর্থাৎ যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র বেশি বা কম হোক, সর্বাবস্থায় শত্রুর মুকাবিলা করতে হবে।)

ইসলাম বস্তুগত শক্তির চেয়ে আত্মিক শক্তির উপর অধিক নির্ভর করে। এ জন্য মনোবল ও উচ্চাকাংখাকে উজ্জীবিত করে এভাবে:

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ط وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا۝ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ج وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا۝

'সুতরাং যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তারা যেন আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে। আর কেউ আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করলে সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক তাকে মহাপুরস্কার দান করা হবে। তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা সংগ্রাম করবে না আল্লাহ্‌র পথে এবং অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য? যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, এ জনপদ, যার অধিবাসীরা যালিম, তা থেকে আমাদেরকে বের করুন, তোমার নিকট থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক করো এবং তোমার নিকট থেকে কাউকে আমাদের সহায় করো।' (সূরা নিসা: আয়াত ৭৪-৭৫)

তিনি মুমিনদেরকে এ বলে সান্ত্বনা দেন যে, তারা যদি দু:খ-কষ্ট ভোগ করেও থাকে, তবে সেটা শুধু তারা একাই ভোগ করেনা, তাদের শত্রুরাও তা ভোগ করে থাকে। অথচ উভয়ের চূড়ান্ত ফলাফলে আকাশ পাতাল পার্থক্য। আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَهِنُوْا فِى ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ط اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ج وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَالَا يَرْجُوْنَ ط

'শত্রু সম্প্রদায়ের সন্ধানে তোমরা হতাশ হয়োনা। যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও তবে তারাও তো তোমাদের মতোই যন্ত্রণা পায় এবং আল্লাহ্র নিকট তোমরা যা আশা করো, তারা তা আশা করেনা।' (নিসা: ১০৪)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطٰنِ ج اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۝

'যারা মুমিন তারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে এবং যারা কাফের তারা তাগুতের পথে সংগ্রাম করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো, শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল।' (সূরা আন নিসা, আয়াত:৭৬)

অর্থাৎ মুমিনদের রয়েছে সুউচ্চ ও মহৎ লক্ষ্য। তারা একটা নির্দিষ্ট মিশনের জন্য সংগ্রাম করে। সে মিশন হচ্ছে সত্যের মিশন, কল্যাণের মিশন এবং আল্লাহ্র দীনকে বিজয়ী করার মিশন।

শত্রুর সম্মুখীন হয়ে দৃঢ় ও অবিচল থাকার আদেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ۝ وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

'হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কাফের বাহিনীর সম্মুখীন হবে তখন তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবেনা। সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা দলে স্থান গ্রহণ ব্যতীত কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে তো আল্লাহ্র বিরাগভাজন হবে এবং তার আশ্রয় জাহান্নাম। আর তা কত নিকৃষ্ট!' (সূরা আনফাল, আয়াত: ১৫-১৬)

নৈতিক ও আত্মিক শক্তি অর্জনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ সূরা আনফালের ৪৫ ও ৪৬ নং আয়াতে বলেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

'হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কোনো দলের সম্মুখীন হবে তখন অবিচল থাকবে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও। তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবেনা, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে; আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।'

সূরা তাওবার ১১১ নং আয়াতে আল্লাহ্ মুমিনদের অদম্য মনোবলের উল্লেখ করে জানান যে, এ অদম্য মনোবলের দাবি অনুসারেই তারা আত্মরক্ষার যুদ্ধে হয় হত্যাকারী হয় নতুবা নিহত হয়, এ দুটি ব্যতীত তাদের তৃতীয় কোনো অবস্থা নেই। আল্লাহ বলেন:

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ قف وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ط وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ط وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

'আল্লাহ্ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন এর বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে, হয় নিহত করে নতুবা নিহত হয়। তাওরাত ইনজিল ও

কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের জন্য সে প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে ? তোমরা যে সওদা করেছো, সে সওদার জন্য আনন্দ করো এবং এটাই মহা সাফল্য।' নিধন করলে তারা বিজয়ী আর নিহত হলে শহীদ।

সূরা তাওবার ৫২ নং আয়াতে বলেন : قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ 'বলো, তোমরা আমাদের দুটি মংগলের একটিরই তো প্রতীক্ষা করছ।'

আল্লাহ্‌র পথে নিহত হওয়া অনন্তকালের জন্য মৃত্যু নয়, বরং তা হচ্ছে শ্রেষ্ঠতর ও চিরস্থায়ী জীবনে স্থানান্তরিত হওয়ার নাম। আল্লাহ্‌র পথে নি:শেষ হওয়াই হলো আসল স্থায়ী জীবন। এ কথাই আল্লাহ্ বলেছেন সূরা আলে ইমরানের ১৬৯, ১৭০ ও ১৭১ আয়াতে:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ○ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ
اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ○
يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لا وَّ اَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

'যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করোনা। বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে জীবিকা প্রাপ্ত। আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পেছনে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে এ জন্য যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দু:খিতও হবেনা। আল্লাহ্‌র অবদান ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এ কারণে যে, আল্লাহ্ মুমিনদের শ্রমফল নষ্ট করেননা।'

সূরা আনফালের ১২ নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেন যে, তিনি মুজাহিদদের সাথেই থাকেন, কখনো তাদেরকে ত্যাগ করেননা:

اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا
الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ○

'স্মরণ করো, তোমাদের প্রতিপালক ফিরিশতাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং মুমিনগণকে অবিচলিত রাখো, যারা কুফরি করে আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবো, সুতরাং তাদের ঘাড়ে এবং সর্বাংগে আঘাত হানো।'

সূরা সাফ্‌ফের ১০, ১১, ১২ ও ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ মুমিনদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় উত্তম উত্তম প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ○ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ
وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ○
وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ○

'হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহা সাফল্য। আর তিনি দান করবেন তোমাদের বাঞ্ছিত আরো একটি অনুগ্রহ:আল্লাহ্‌র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়, মুমিনদেরকে এ সুসংবাদ দাও।'

এ পদ্ধতিতেই কুরআন প্রথম যুগের মুসলমানদেরকে গড়ে তুলেছে। তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি করেছে দুর্জয়

ঈমান, যা হক ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্ত ফায়সালা করতো আর তাদেরকে এভাবেই আল্লাহর সাহায্য, বিজয় ও প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ্ বলেন:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝

'হে মুমিনগণ ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে সাহায্য করো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন।' (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ৭)

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ط

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার এবাদত করবে, আমার সাথে কোনো শরীক করবেনা।' (সূরা নূর, আয়াত: ৫৫)

যুদ্ধের সময় অবিচল থাকা ওয়াজিব: শত্রুদের সাথে সম্মুখ সমরের সময় অবিচল থাকা ওয়াজিব এবং পালানো হারাম। আল্লাহ্ বলেন:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ۝ وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

'হে মুমিনগণ ! তোমরা যখন কাফের বাহিনীর সম্মুখীন হবে তখন তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবেনা। সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা দলে স্থান গ্রহণ ব্যতীত কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে তো আল্লাহ্‌র বিরাগভাজন হবে এবং তার আশ্রয় জাহান্নাম। আর তা কত নিকৃষ্ট !' (সূরা আনফাল, আয়াত: ১৫-১৬)

উভয় আয়াতই প্রমাণ করে, দৃঢ়পদে ময়দানে স্থির থাকা ওয়াজিব এবং পালানো হারাম কেবল দুটি অবস্থা ব্যতীত। ঐ দু অবস্থায় শত্রুর মোকাবিলা থেকে সরে যাওয়া বৈধ:

প্রথম অবস্থা: যুদ্ধের জন্য স্থানান্তরিত হওয়া। অর্থাৎ এক রণাঙ্গন থেকে অন্য রণাঙ্গনে যুদ্ধের প্রয়োজন অনুযায়ী যাওয়া। সংকীর্ণ স্থান থেকে প্রশস্ত স্থানে, প্রকাশ্য স্থান থেকে আড়ালযুক্ত স্থানে কিংবা নীচু স্থান থেকে উঁচু স্থানে যাওয়া যেতে পারে। অনুরূপ যুদ্ধের ময়দানে অধিকতর ও অনুকূল হয় এমন স্থান পাল্টানো অনুমোদনযোগ্য।

দ্বিতীয় অবস্থা: মুসলমানদের কোনো দলের সাথে যুক্ত হওয়া, চাই তাদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে হোক কিংবা তাদের কাছ থেকে সাহায্য নেয়ার জন্য হোক, এটা অনুমোদন যোগ্য। এ দলের অবস্থান নিকটে হোক বা দূরে হোক, তাতে কিছু আসে যায়না।

সাঈদ ইবনে মানসুর বর্ণনা করেন, উমর রা. বলেন: 'আবু উবায়দা যদি আমার দলে যুক্ত হতো তবে আমি তাকে যুক্ত হতে দিতাম।' অথচ তখন আবু উবায়দা ইরাকে ও উমর রা. মদিনায় ছিলেন।

উমর রা. বলেন: 'আমি দল বদলকারী প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দল।' (তাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত।)

ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ্ সা. যখন ফজরের নামাযের পূর্বে নিজ গৃহ থেকে বের হলেন, তখন একদল মুসলমান শত্রুর মোকাবিলা থেকে পালিয়ে এসে রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট উপস্থিত হলো। তারা বললো: আমরা পালিয়ে এসেছি। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: বরঞ্চ তোমরা যুদ্ধের প্রতিই অনুরক্ত। আমি সকল মুসলমানের আশ্রয় স্থল।'

বস্তুত এ দুটি অবস্থায়ই একজন যোদ্ধার পক্ষে শত্রু থেকে পালানো জায়েয। এটা বাহ্যত পালানোর মতো মনে হলেও আসলে তা শত্রুর বিরুদ্ধে অধিকতর কার্যকর অবস্থান গ্রহণের প্রস্তুতি ও প্রচেষ্টা।

এ দুটি অবস্থা ছাড়া আর সব অবস্থায় যুদ্ধ থেকে পলায়ন কবীরা গুনাহ ও যন্ত্রণাদায়ক আযাবের কারণ। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: 'তোমরা সাতটা ধ্বংসাত্মক পাপ থেকে বিরত থাকবে। লোকেরা বললো: হে রসূলুল্লাহ্, সেগুলো কী কী? তিনি বললেন: আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা, জাদু করা, আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কৃত প্রাণ হনন, এতিমের মাল আত্মসাৎ করা, যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সতী ও সহজ-সরল মুসলিম নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ রটনা।'

যুদ্ধে মিথ্যা বলা ও ধোঁকা দেয়া: প্রতিশ্রুতি ভংগ বা শান্তি বিঘ্নিত করার পর্যায়ে না পড়লে শত্রুকে বিপথগামী করার জন্য যুদ্ধে মিথ্যা বলা ও ধোঁকা দেয়া জায়েয। এ ধরনের এক ধোঁকা হলো সেনাপতি কর্তৃক শত্রুদেরকে এরূপ ধারণা দেয়া যে, তার বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা এতো বেশি এবং তার অস্ত্র এতো শক্তিশালী যে, তাকে পরাস্ত করা অসম্ভব। বুখারি জাবির রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'যুদ্ধ এক ধরনের প্রতারণা।'

উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা রা. থেকে মুসলিম বর্ণনা করেন: মানুষ সাধারণত যেসব কথাবার্তা বলে, তাতে রসুল সা. কোনো মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন বলে আমি শুনিনি চারটি ক্ষেত্র ব্যতীত: ১. যুদ্ধে, ২. মানুষের পারস্পরিক বিবাদ নিস্পত্তিতে, ৩. স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর সাথে বাক্যালাপে এবং ৪. স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর সাথে বাক্যালাপে।'

দ্বিগুণ শত্রু বাহিনী থেকে পলায়ন: ইতিপূর্বে বলেছি, এক রণাঙ্গন থেকে আরেক রণাঙ্গনে যাওয়া এবং এক বাহিনী থেকে অন্য বাহিনীতে স্থানান্তরের জন্য পালানো জায়েয। সেটি হলো, শত্রু যখন দ্বিগুণের চেয়ে বেশি হয়। দ্বিগুণ বা তার কম হলে পালানো হারাম। আল্লাহ্ বলেন:

اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ط فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ج وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ۝

'এখন আল্লাহ্ তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশো জন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শো জনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক সহস্র থাকলে আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তারা দু'সহস্রের উপর বিজয়ী হবে। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন।' (সূরা আনফাল, আয়াত: ৬৬)

'মুহাযযাব' গ্রন্থে বলা হয়েছে: 'শত্রুর সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণের অধিক হলে পলায়ন জায়েয।' তবে মুসলমানদের যদি এ মর্মে ধারণা প্রবলতর হয় যে, তারা ধ্বংস হবেনা, তবে টিকে থাকাই উত্তম, আর ধ্বংস হওয়ার ধারণা প্রবলতর হলে দুটি মত রয়েছে:

প্রথমত সরে যাওয়া বাধ্যতামূলক। কেননা আল্লাহ বলেন: وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ-

'তোমরা নিজের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করোনা।' (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৫)

দ্বিতীয়ত সরে যাওয়া মুস্তাহাব, বাধ্যতামূলক নয়। কেননা তারা নিহত হলে শহীদ হবে।

আর যদি কাফেরদের সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণের চেয়ে বেশি না হয়, তবে সেক্ষেত্রে ধ্বংসের আশংকা প্রবলতর না হলে পলায়ন জায়েয হবেনা, আর প্রবলতর হলে দু'রকম মত রয়েছে:

প্রথমত জায়েয সূরা বাকারার উল্লেখিত ১৯৫ নং আয়াত অনুসারে।

দ্বিতীয়ত একই আয়াতের প্রকাশ্য মর্ম অনুসারে। শেষোক্ত মতটিই ফকীহদের নিকট সঠিক।

হাকেম বলেছেন: এ ক্ষেত্রে কী করণীয়, তা যোদ্ধার প্রবলতর ধারণা ও বিচক্ষণতার উপর নির্ভরশীল। তার প্রবলতর ধারণা যদি এ রকম হয় যে, প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে, তবে পলায়ন বৈধ হবেনা। আর যদি

প্রবলতর ধারণা এ রকম হয় যে, ধ্বংস হয়ে যাবে, তবে অন্য যে কোনো মুসলিম বাহিনীর সাথে গিয়ে যুক্ত হওয়া জায়েয,তা যতো দূরেই থাকনা কেন। তবে শর্ত হলো,জিহাদ থেকে পালানোর ইচ্ছা না থাকা।

ইবনুল মাজেশুন ও ইমাম মালেকের মতে, দুর্বলতা সংখ্যার দিক দিয়ে নয়, শক্তির দিক দিয়ে বিবেচ্য। এমন কি শত্রু যদি একজনও হয় এবং সে যুদ্ধ বিদ্যায় অধিকতর পারদর্শী, অস্ত্র বলে অধিকতর বলীয়ান এবং অধিকতর শক্তিশালী হয়, তবে তার মোকাবিলা থেকে প্রতিপক্ষ একজন মুসলমানের পালানো বৈধ। এ মতটি অধিকতর প্রকাশ্য।

যুদ্ধে দয়া-দাক্ষিণ্য: ইসলাম একদিকে যেমন অনিবার্য প্রয়োজনে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছে, অপর দিকে তেমনি তাকে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সীমিতও করেছে। তাই যুদ্ধ চলাকালে শুধুমাত্র যুদ্ধরত ব্যক্তিকেই হত্যা করা যাবে, অন্য কাউকে নয়। যে ব্যক্তি যুদ্ধে লিপ্ত নয়, তাকে হত্যা করা বা কোনোভাবে হয়রানি করা বৈধ নয়। অনুরূপ ইসলাম নারী, শিশু, রোগী, বৃদ্ধ, সন্যাসী, উপাসক ইত্যাকার নিষ্ক্রিয় মানুষকে হত্যা করাও নিষিদ্ধ করেছে। নিষিদ্ধ করেছে নিহতের লাশ বিকৃত করাও। এমনকি জীবজন্তু হত্যা করা, শস্য ও পানি বিনষ্ট করা, পুকুরগুলোকে দূষিত করা ও ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত বা ভাংচুর করাও নিষিদ্ধ করেছে। অনুরূপ আহত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে মেরে ফেলার জন্য পুন আঘাত করা, পলায়নপর শত্রুর পিছু ধাওয়া করা ও তল্লাশী চালানোও নিষিদ্ধ। কারণ যুদ্ধ হলো চিকিৎসার উদ্দেশ্যে অস্ত্রোপাচারের মতো , যা রোগ পীড়িত স্থানের সীমার বাইরে যাওয়া কোনক্রমেই অনুমোদনযোগ্য নয়।

এ বিষয়ে সুলায়মান ইবনে বারীদা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন: 'রসূলুল্লাহ্ সা. যখনই কাউকে কোনো বাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ করতেন, তখন বিশেষভাবে আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলার জন্য তাঁকে ও তাঁর সহগামী মুসলমানদেরকে উপদেশ দিতেন, অত:পর বলতেন: আল্লাহ্‌র নামে ও আল্লাহ্‌র পথে অভিযানে যাও, যারা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, তবে বাড়াবাড়ি করোনা, বিশ্বাসঘাতকতা ও ওয়াদা খেলাফি করোনা, কারো দেহ বিকৃত করোনা, কোনো শিশুকে হত্যা করোনা।'

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার রা. থেকে নাফে' বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ্ সা. এর নেতৃত্বে পরিচালিত কোনো একটি যুদ্ধে জনৈকা মহিলাকে নিহত পাওয়া গেলো। এতে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করলেন। (মুসলিম)।

রাবাহ ইবনে রবী 'বর্ণিত হাদিসে আছে, সম্ভবত পূর্বের হাদিসে উল্লেখিত মহিলাকে দেখে রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: 'যুদ্ধ করা এ মহিলার অভিপ্রায় ছিলনা।' অত:পর তাঁর সাহাবিদের দিকে তাকিয়ে তাদের একজনকে বললেন: তুমি খালিদ ইবনে ওয়ালীদের নিকট চলে যাও। সে যেন কোনোক্রমেই কোনো শিশু, চাকর ও নারীকে হত্যা না করে।'

আব্দুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ সা. আহত ব্যক্তিকে মেরে ফেলতে ও মৃতের দেহ বিকৃত করতে নিষেধ করেছেন।

ইমরান ইবনুল হাছিন বলেন: রসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে সদকা দিতে উৎসাহিত করতেন এবং মৃতদেহ বিকৃত করতে নিষেধ করতেন। উসামাকে সিরিয়ায় পাঠানোর সময় আবু বকর যে বিদায়ী নির্দেশনা দিয়েছিলেন তাতে ছিলো: 'বিশ্বাসঘাতকতা করবেনা, বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করবেনা, প্রতিশ্রুতি ভংগ করবেনা, লাশ বিকৃত করবেনা, শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদেরকে হত্যা করবেনা, খেজুরের গাছ কাটবেনা ও পোড়াবেনা, কোনো ফলবান গাছ কাটবেনা, খাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত ছাগল, গরু, ও উট যবাই করবেনা, উপাসনালয়ে সার্বক্ষণিক উপাসনায় নিয়োজিত যোগী-সন্যাসী ও তাদের উপাস্যদেরকে অব্যাহতি দেবে।'

উমর ইবনুল খাত্তাব রা.ও একই নীতি অনুসরণ করতেন। এক চিঠিতে তিনি লেখেন:

'বাড়াবাড়ি ও আত্মসাৎ করোনা, বিশ্বাস ঘাতকতা করোনা, শিশুদেরকে হত্যা করোনা আর কৃষকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।' শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদেরকে হত্যা করতে সেনাপতিদেরকে তিনি নিষেধ করেন। বিশেষ করে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যাওয়া ও আক্রমণ পরিচালনার সময় তাদের হত্যা থেকে বিরত থাকতে কঠোরভাবে আদেশ দেন।'

শত্রুর উপর নৈশ হামলা: আত্মরক্ষার যুদ্ধে অনিবার্য প্রয়োজনে শত্রুর উপর নৈশকালীন আক্রমণ চালানো জায়েয আছে। ইমাম তিরমিযি বলেন: একদল আলেম নৈশ আক্রমণকে বৈধ ও অপর দল মাকরূহ আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক বলেন: এটা বৈধ। মোশরেকদের ঘরবাড়িতে রাতের বেলা আক্রমণ চালানো এবং তাদের সাথে তাদের নারী ও শিশুদেরকেও হতাহত করা সম্পর্কে রসুলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: 'ঐ সব নারী এবং শিশুও মোশরেকদেরই অন্তর্ভুক্ত।' (বুখারি ও মুসলিম)।

ইমাম শাফেয়ি বলেন: মোশরেকদের নারী ও শিশুদের হত্যায় নিষেধাজ্ঞা কেবল তখনই কার্যকর হবে, যখন তাদেরকে চেনা যায় এবং পৃথকভাবে পাওয়া যায়। তবে নৈশ হামলায় নারী ও শিশু হতাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তা জায়েয।

যুদ্ধের পরিসমাপ্তি: নিম্নোক্ত জিনিসগুলোর যে কোনো একটি সংঘটিত হলেই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে:

১. যুদ্ধরত পক্ষের সকলে বা একাংশ ইসলাম গ্রহণ করলে ও আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করলে। এরূপ অবস্থায় তারা মুসলমান গণ্য হবে। তাদের অধিকার অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় এবং তাদের কর্তব্যও অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় হবে।

২. নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তারা যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা করলে। এরূপ অবস্থায় তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করা বাধ্যতামূলক, যেমন হুদায়বিয়ার সন্ধিতে তিনি করেছিলেন।

৩. অমুসলিম পক্ষ জিযিয়া দিয়ে নিজ ধর্মে বহাল থাকবার আগ্রহ প্রকাশ করলে। এর মাধ্যমে তারাও মুসলমানদের সাথে একত্রে সহাবস্থানের অধিকার লাভ করবে।

৪. যুদ্ধরত অমুসলিম পক্ষ পরাজয় বরণ করলে এবং মুসলমান পক্ষ তাদের উপর বিজয় লাভ করলে। পরাজিত অমুসলিমরা অত:পর মুসলমানদের জন্য গনিমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদে পরিণত হবে।

৫. কখনো কখনো শত্রুপক্ষের একাংশ মুসলমানদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে। সেরূপ ক্ষেত্রে প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে। অনুরূপ তাদের কেউ যখন মুসলমানদের শাসিত বা অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশ করার অনুমতি চায়। এ জিনিসগুলো নিম্নরূপ:

১. সন্ধি চুক্তি। ২. নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চুক্তি। ৩. গনিমত। ৪. শত্রুদের একাংশ কর্তৃক মুসলমানদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা।

সন্ধি ও যুদ্ধবিরতি: যুদ্ধবিরতি চুক্তি হলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংঘর্ষ বন্ধের ব্যাপারে একমত হওয়া। এটা কখনো সন্ধিতেও পর্যবসিত হতে পারে। দুই অবস্থায় এটা বাধ্যতামূলক হবে:

প্রথম অবস্থা: যখন শত্রুরা যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা করবে। শত্রুরা এ দ্বারা প্রতারণার ইচ্ছা পোষণ করলেও এ ধরনের প্রার্থনা মঞ্জুর করা বাধ্যতামূলক। তবে এরূপ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন ও যে কোনো অনাকাংখিত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি থাকা চাই। আল্লাহ সূরা আনফালের ৬১ ও ৬২ নং আয়াতে বলেন:

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ

'তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে ও আল্লাহ্র উপর নির্ভর করবে। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায় তবে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।'

হুদাইবিয়ার অভিযানে রসূলুল্লাহ্ সা. মক্কার মোশরেকদের সাথে সন্ধি চুক্তি করেছিলেন এবং দশ বছরের জন্য তাদের সাথে যুদ্ধবিরতি ও সম্প্রীতি স্থাপন করেছিলেন। সে চুক্তিটি রক্তপাত বন্ধে ও শান্তির অন্বেষায় সম্পাদিত হয়েছিল।

বারা' রা. বর্ণনা করেন: 'যখন রসূলুল্লাহ্ সা. ও তাঁর সাথীদেরকে কাফেররা উমরার জন্য মক্কায় প্রবেশে বাধা দিলো, তখন হুদায়বিয়াতে তাঁর সাথে এক সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষর করলো। সন্ধির বিষয়বস্তু ছিলো এই যে,

রসূল সা. ও মুসলমানরা এ বছর মদিনায় ফিরে যাবে, পরবর্তী বছর উমরা পালন করতে মক্কায় আসবে, তখন তারা নিজেদের সাথে তরবারি ও তার খাপ ছাড়া আর কিছু বহন করে নিতে পারবেনা, মক্কাবাসীদের কেউ তাদের সাথে মদিনায় যেতে চাইলে তাকে নিতে পারবেনা, তবে তাদের সাথে আগমনকারীদের কেউ মক্কায় থেকে যেতে চাইলে তাকে থাকতে বাধা দিতে পারবেনা ও সাথে করে মদিনায় নিয়ে যেতে পারবেনা এবং তখন তারা মক্কায় তিনদিনের বেশি থাকতে পারবেনা। সন্ধি চুক্তিতে দশ বছরের জন্য যুদ্ধবিরতি, অনাক্রমণ ও উভয়পক্ষের লোকজনের পরস্পর থেকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছিল। চুক্তি সম্পাদনের সময় রসূল সা. আলি রা. কে বললেন: আমাদের দু'পক্ষের মধ্যকার শর্তাবলী লেখো এবং শুরুতে লেখো: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। অন্য বর্ণনা মতে, কাফেররা বললো: আমরা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম জানি না। আমরা যা জানি সেটা লেখো: 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' এরপর রসূলুল্লাহ্ বললেন: লেখো, 'এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদের স্থিরকৃত চুক্তি।' সংগে সংগে মোশরেকরা বললো: আমরা যদি তোমাকে আল্লাহ্‌র রসূল বলে মনে করতাম তবে তো তোমার অনুসরণই করতাম। বরঞ্চ লেখো:'আব্দুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ।' তৎক্ষণাত রসূলুল্লাহ্ সা. আলিকে আল্লাহ্‌র রসূল' শব্দটি মুছে ফেলার আদেশ দিলেন।' আলি রা. বললেন: 'আল্লাহ্‌র কসম, এটা আমি মুছে ফেলতে পারবোনা।' রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: শব্দটি কোথায় আমাকে দেখাও। আলি রা. দেখানোর পর রসূলুল্লাহ্ সা. তা মুছে ফেললেন এবং আলি রা. লিখলেন: 'আব্দুল্লাহ্‌র ছেলে।' .

পরের বছর রসূলুল্লাহ সা. মক্কায় তিন দিন অবস্থান করলেন। তৃতীয় দিন মোশরেকরা আলি রা. কে বললো: 'আজ তোমাদের নেতার শর্ত অনুযায়ী শেষ দিন। তাকে আজ মক্কা থেকে বেরিয়ে যেতে বলো।' আলি রা. রসূলুল্লাহ সা. কে বিষয়টি জানালে রসূল সা. বললেন: ঠিক আছে। অত:পর বেরিয়ে গেলেন।

মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা. বর্ণনা করেন: দুপক্ষ এ মর্মে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে যে, দশ বছর পর্যন্ত উভয় পক্ষ কোনো যুদ্ধ করবেনা। সকল মানুষ নিরাপদে বসবাস করবে, (উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো চুরি, ডাকাতি হবেনা, খেয়ানত হবেনা, এমনকি অতীত নিয়ে কোনো কথাও হবেনা, সকলের মন থাকবে পরিষ্কার এবং পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করবে।) (বুখারি, মুসলিম ও আবু দাউদ)।

দ্বিতীয় অবস্থা: নিষিদ্ধ মাসসমূহের উপস্থিতি। এ সব মাসে যুদ্ধের সূচনা করা হারাম। মাসগুলো হলো: যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব। তবে শত্রুরা যুদ্ধের সূচনা করলে আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য মুসলমানদের যুদ্ধ করা শুধু বৈধই নয়, ওয়াজিব। অনুরূপ যুদ্ধ চলা অবস্থায় এ মাসগুলো এসে পড়লে এবং শত্রুরা যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজি না হলে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া বৈধ। আল্লাহ্ বলেন:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ

'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহ্‌র বিধানে আল্লাহ্‌র নিকট গণনায় মাস বারটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ, এটাই প্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এ মাসগুলোতে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করোনা।' (সূরা তাওবা, আয়াত ৩৬)।

বিদায়ী ভাষণে রসূলুল্লাহ সা. বলেন: 'হে মানবমন্ডলী, মাসকে পিছিয়ে দেয়া কেবল কুফ্‌রি বৃদ্ধি করা, যা দ্বারা কাফেরগণকে বিভ্রান্ত করা হয়। তারা ওটাকে কোনো বছর বৈধ করে এবং কোনো বছর অবৈধ করে, যাতে তারা আল্লাহ্ যেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলোর গণনা পূর্ণ করতে পারে। আল্লাহ্ যেদিন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সেদিনের আকৃতিতেই কাল ঘুর্ণায়মান। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহ্‌র নিকট গণনায় মাস বারটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, তিনটি মাস ক্রমাগত এবং একটা আলাদা: যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব। রজবের অবস্থান জুমাদা ও শাবানের মাঝখানে। শুনে রাখো. আমি কিন্তু পৌছিয়ে দিয়েছি। হে আল্লাহ্, তুমি সাক্ষী থাকো।'

কোনো কোনো বর্ণনায় এটাকে রহিত বলা হয়েছে। কিন্তু ঐ বর্ণনা দুর্বল। কেননা তাতে রহিত হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই।

যিম্মার চুক্তি: যিম্মা অর্থ প্রতিশ্রুতি দান ও নিরাপত্তা দান: যিম্মার চুক্তির অর্থ হলো, শাসক বা তার স্থলাভিষিক্ত কর্মকর্তা কোনো কাফের বা আহলে কিতাবকে দুটি শর্তের অধীন তাদের কুফ্‌রির উপর বহাল থাকার অনুমতি দেবেন।

প্রথম শর্ত: সঠিকভাবে ইসলামি বিধিনিষেধের আনুগত্য করা।

দ্বিতীয় শর্ত: জিযিয়া প্রদান। যিনি চুক্তি সম্পাদন করেন তিনি আজীবন এবং তারপর তার বংশধরদের উপর এ চুক্তি প্রযোজ্য হবে। এ চুক্তির উৎস হলো সূরা তাওবার ২৯ নং আয়াত:

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ۝

'যাদের প্রতি কিতাব নাযিল হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনেনা এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করেনা, এবং সত্য দীন অনুসরণ করেনা, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া দেয়।'

ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন, মুগীরা নেহাওয়ান্দ যুদ্ধের সময় বলেন: 'আমাদের নবি আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেনো তোমাদের সাথে ততোক্ষণ যুদ্ধ করি, যতোক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর অথবা জিযিয়া দাও।' যিম্মার চুক্তি ততোদিন কার্যকর থাকবে যতোদিন এমন কিছু না ঘটে, যা এই চুক্তি বাতিল করে দেয়।

যিম্মার চুক্তির অধীনস্থদের (অর্থাৎ যিম্মীদের) অবশ্য পালনীয় বিধিসমূহ: যিম্মীদের উপর ইসলামের দু'ধরনের বিধিমালা কার্যকর হবে:

প্রথম ধরন: আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিধিমালা। তাই ইসলামের মূলনীতিসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো লেনদেন বা চুক্তি, যেমন সুদ বা অন্য কোনো হারাম লেনদেনের চুক্তি, সম্পাদন করা তাদের জন্য বৈধ নয়।

দ্বিতীয় ধরন: ইসলামের নির্ধারিত শাস্তিসমূহ। এ সব শাস্তি যে সব অপরাধের জন্য অবধারিত হয়, তার কোনোটিতে জড়িত হলে তারা এ সব শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে এবং তাদের উপর এ সব দন্ড কার্যকর করা হবে। দু'জন বিবাহিত ইহুদি ব্যভিচার করলে রসূলুল্লাহ্ সা. তাদের উপর রজমের শাস্তি (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) কার্যকর করেছিলেন। তবে ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাস, এবাদত ও পারিবারিক বিধান, যথা বিয়ে-তালাক ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধিসমূহের ব্যাপারে তারা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে ফিকহী মূলনীতি অনুসারে: 'তাদেরকে ও তাদের ধর্মকে অব্যাহতি দাও' আর যদি তারা আমাদের আদালতে তাদের মধ্যকার কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে তবে আমাদের আদালত হয় ইসলামি আইন অনুযায়ী বিচার করবে, নতুবা মামলা খারিজ করে দেবে। আল্লাহ বলেন:

فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ج وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ط وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ۝

'তারা যদি তোমার নিকট আসে তবে তাদের বিচার-নিষ্পত্তি করে দেবে, অথবা তাদেরকে উপেক্ষা করবে। তুমি যদি তাদেরকে উপেক্ষা করো, তবে তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা। আর যদি বিচার নিষ্পত্তি করো তবে ন্যায়বিচার করো। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।'

এটা গেলো প্রথম শর্ত প্রসংগে। এখন আমরা জিযিয়ার শর্ত সম্পর্কে আলোচনা করছি।

তেইশতম অধ্যায়

জিযিয়া

সংজ্ঞা: জিযিয়া হচ্ছে সে কর, যা মুসলিমদের নিকট থেকে নিরাপত্তামূলক আশ্রয় ও প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত আহলে কিতাব সম্প্রদায়ভূক্ত ব্যক্তির উপর ধার্য করা হয়।

জিযিয়া শরিয়ত সম্মত হওয়ার প্রমাণ: জিযিয়া প্রবর্তন ও প্রচলনের উৎস সূরা তাওবার ২৯ আয়াত:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ○

'যাদের প্রতি কিতাব নাযিল হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনেনা এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করেনা এবং সত্য দীন অনুসরণ করেনা, তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া দেয়।'

ইমাম বুখারি ও তিরমিযি আব্দুর রহমান ইবনে আওফ থেকে বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ সা. হিজরের (আরব উপদ্বীপের একটি শহর) অগ্নি উপাসকদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করেছিলেন। তিরমিযি আরো বর্ণনা করেন: তিনি বাহরাইনের অগ্নি উপাসকদের নিকট থেকেও জিযিয়া আদায় করেছেন। আর উমর রা. পারস্য থেকে এবং উসমান রা. পারস্যবাসী অথবা বারবার জাতির কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করেন।

শরিয়তে জিযিয়া প্রবর্তনের যৌক্তিকতা?" মুসলমানদের উপর যাকাত ফরয করার পাশাপাশি ইসলাম যিম্মীদের উপর জিযিয়া ধার্য করেছে, যাতে উভয় পক্ষ সমান হয়ে যায়। কেননা মুসলমানগণ ও যিম্মীরা একই পতাকার নীচে একই দেশের নাগরিক হিসাবে বসবাস করে থাকে। তারা একই হারে সকল অধিকার ও রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। এ জন্যই আল্লাহ্ যিম্মীদের উপর মুসলমানদেরকে জিযিয়া প্রদান অপরিহার্য কর্তব্যরূপে ধার্য করেছেন তাদের জানমাল ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও যে মুসলিম দেশে তারা বসবাস করছে তাতে তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করার বিনিময়ে। আর এ কারণেই জিযিয়া দেয়ার পর তাদেরকে রক্ষা করা এবং কেউ তাদেরকে উত্যক্ত করতে ও কষ্ট দিতে চাইলে তা প্রতিহত করা মুসলমানদের অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

জিযিয়া কাদের কাছ থেকে নেয়া হবে: সকল অমুসলিম সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই জিযিয়া নেয়া হবে, চাই সে আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিষ্টান) অগ্নি উপাসক বা অন্য কোনো সম্প্রদায়ভূক্ত হোক এবং চাই সে আরব হোক বা অনারব হোক। এটা ইমাম মালেক, আওযায়ি ও সিরীয় ফকীহদের মত। ইমাম শাফেয়ি বলেছেন: আহলে কিতাব ও অগ্নি উপাসকদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করা হবে, চাই তারা আরব হোক বা অনারব হোক। কিন্তু মূর্তিপূজারীদের নিকট থেকে আদৌ জিযিয়া নেয়া হবেনা। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন: আরব অমুসলিমদের কাছ থেকে কোনো জিযিয়া গ্রহণ করা হবেনা, তাদেরকে হয় ইসলাম গ্রহণ করতে হবে, নতুবা যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে।

তবে আহলে কিতাবের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণের বিষয়টি কুরআন থেকে এবং অগ্নি উপাসক ও অন্য অমুসলিমের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণের বিষয়টি সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত।

ইবনুল কাইয়েমের অভিমত: আল্লামা ইবনুল কাইয়েম বলেন: 'যেহেতু অগ্নি উপাসকরা এমন একটা মুশরিক সম্প্রদায়, যাদের কোনো কিতাব নেই, তাই তাদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা দ্বারা অন্য সকল মুশরিক সম্প্রদায়ের নিকট থেকেও জিযিয়া গ্রহণের বৈধতা প্রমাণিত হয়। রসূলুল্লাহ্ সা. যে আরবের পৌত্তলিকদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করেননি, তার কারণ হলো, তারা জিযিয়ার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। জিযিয়ার আয়াত নাযিল হয়েছে তাবুক অভিযানের পূর্বে। যখন রসূলুল্লাহ্ সা. আরবদের সাথে যুদ্ধের পর্ব সমাপ্ত করেছেন এবং তাদের সকলের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন। একই কারণে তিনি তার সাথে ইতিপূর্বে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ইহুদিদের কাছ থেকেও জিযিয়া গ্রহণ করেননি। কেননা ঐ আয়াত তখনো নাযিল হয়নি। আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর

তিনি আরবের খ্রিষ্টানদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করেছেন। অগ্নি উপাসকদের কাছ থেকেও নিয়েছেন। তখন যদি কোনো পৌত্তলিক অবশিষ্ট থাকতো ও জিযিয়া দিতে চাইতো তবে তিনি তা তার কাছ থেকেও নিতেন, যেমন অন্যান্য মূর্তিপূজারী, অগ্নি উপাসক ও খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে নিয়েছেন। এক কাফেরের কুফরির সাথে অন্য কাফেরের কুফরির কোনো পার্থক্য নেই এবং এক সম্প্রদায়ের কুফরিকে আর এক সম্প্রদায়ের কুফরির চেয়ে নিকৃষ্টতর করে দেখানোতেও কোনো লাভ-ক্ষতি নেই। পৌত্তলিকদের কুফরি অগ্নি উপাসকদের কুফরির চেয়ে খারাপ এ কথা বলারও যুক্তিপ্রমাণ নেই। মূর্তি ও আগুনের পূজারীদের মধ্যে আবার কিসের পার্থক্য ? বরঞ্চ অগ্নি উপাসকের কুফরি জঘন্যতর। পৌত্তলিকরা তো এক আল্লাহ্‌কেই প্রধান রব মনে করতো এবং আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে সৃষ্টিকর্তা মনে করতোনা। তারা বলতো: তারা তাদের দেব-দেবীর পূজা এজন্যই করে, যেনো তারা তাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। তারা অগ্নি উপাসকদের মতো বিশ্বের দু'জন স্রষ্টায় বিশ্বাস করতোনা। একজনকে মংগলের এবং অপরজনকে অমংগলের স্রষ্টা মনে করতোনা। পৌত্তলিকরা কখনো অগ্নি উপাসকদের মতো আপন মা, বোন ও মেয়েকে বিয়ে করা বৈধ মনে করেনি। তারা ইবরাহীম আ. এর ধর্মের অবশিষ্টাংশে বিশ্বাস করতো। অথচ অগ্নি উপাসকরা আদৌ কোনো কিতাবের অনুসারী ছিলনা। তারা কোনো নবীর ধর্মের অনুসারীও ছিলনা। আকিদা- বিশ্বাসেও না, আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতিতেও না।

এই রটনার কোনো ভিত্তি নেই। তাদের কিতাব ছিলো এবং শরিয়তও ছিলো, কিন্তু তাদের এক রাজা নিজ কন্যাকে ধর্ষণ করায় উভয়টি তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। আর যদি বা সত্য বলে মেনে নেয়া হয়, তথাপি এ দ্বারা তারা আহলে কিতাব প্রমাণিত হয় না। কেননা তাদের কিতাব তুলে নেয়া হয়েছে এবং তাদের শরিয়ত বাতিল হয়েছে। তাই দুটোর কোনোটাই আর অবশিষ্ট নেই।

পক্ষান্তরে এ কথা সুবিদিত যে, আরবরা ইবরাহীম আ. এর ধর্মের উপর বহাল ছিল। (যদিও বিকৃত অবস্থায়) ইবরাহীম আ. এর কিতাবও ছিল, শরীয়তও ছিল। অগ্নি উপাসকদের কোনো নবি, ধর্ম ও কিতাব ছিলো-এ কথা যদি সত্যও হয় তবে তারা সেগুলোকে যতোখানি বিকৃত করেছে আরবের পৌত্তলিকরা ইবরাহীম আ. এর ধর্মকে অতোখানিও বিকৃত করেনি। অগ্নি উপাসকদের মধ্যে নবিদের আনীত শরিয়তের কোনো উপাদানই পাওয়া যায়না। অথচ আরবদের মধ্যে ছিটেফোঁটা হলেও পাওয়া যেতো। সুতরাং পৃথিবীর নিকৃষ্টতম ধর্মের অনুসারী অগ্নি উপাসকদেরকে কোনোভাবেই আরবের মুশরিকদের চেয়ে উত্তম মনে করার কোনোই কারণ নেই।'

জিযিয়া গ্রহণের শর্তাবলী: জিযিয়া গ্রহণে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করা চাই। এ জন্য যাদের কাছ থেকে জিযিয়া নেয়া হবে তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তাবলী অবশ্য পালনীয়:

১. জিযিয়া দাতার পুরুষ হওয়া।
২. জিযিয়া দাতার পূর্ণ বয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্ক হওয়া।
৩. জিযিয়া দাতার স্বাধীন মানুষ হওয়া।

কেননা সূরা তাওবার ২৯ আয়াত, যা জিযিয়ার আয়াত নামে পরিচিত, তাতে 'স্বহস্তে জিযিয়া দান' এর যে উল্লেখ রয়েছে, তা দ্বারা শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ বুঝায়। তাই কোনো মহিলা, শিশু, ক্রীতদাস ও পাগলের জিযিয়া দেয়া লাগবেনা। অনুরূপ, যে দরিদ্র ব্যক্তিকে দান-সদকা দেয়া হয়, যার অর্থোপার্জনের ক্ষমতা নেই, অন্ধ ও অচল এবং উপাসনালয়ের যোগী-সন্ন্যাসী প্রভৃতির জিযিয়া দিতে হবেনা। তবে ধনাঢ্য হলে দিতে হবে।

ইমাম মালেক রা. বলেন: আহলে কিতাবের শিশু ও মহিলাদের জিযিয়া দিতে হবেনা। কেবল প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের জিযিয়া দিতে হবে। আসলাম বর্ণনা করেন, উমর রা. সেনাপতিদের কাছে লিখে পাঠান: 'প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ব্যতীত আর কারো উপর জিযিয়া আরোপ করোনা।'আর পাগল অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর পর্যায়ভূক্ত।

জিযিয়ার পরিমাণ: আবু দাউদ, তিরমিযি. নাসায়ি ও ইবনে মাজায় মুয়ায রা. থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ্ সা. যখন তাকে ইয়ামান প্রেরণ করেন তখন প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের নিকট থেকে এক দিনার অথবা সমমূল্যের 'মায়াফিরা' নামক ইয়ামানী বস্ত্র আদায় করার আদেশ দেন। পরবর্তীকালে উমর রা. এর

পরিমাণ বাড়িয়ে স্বর্ণের মালেকদের উপর বছরে বার দিনার এবং রৌপ্যের মালেকদের উপর বছরে চল্লিশ দিরহাম ধার্য করেন। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. ইয়ামানবাসীর দারিদ্র্য সম্পর্কে এবং উমর রা. সিরিয়াবাসীর প্রাচুর্য ও সামর্থ্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন, মুজাহিদকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: সিরিয়াবাসীর এমন কী বৈশিষ্ট্য যে, তাদের উপর চার দিনার আর ইয়ামানবাসীর উপর এক দিনার ধার্য করা হলো? মুজাহিদ জবাব দিলেন: এটা করা হয়েছিল প্রাচুর্য দেখা দেয়ার আগে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদও এই মতের অনুসারী। আহমদ বলেন: ধীনর উপর আটচল্লিশ দিরহাম, মধ্যবিত্তের উপর চব্বিশ দিরহাম এবং দরিদ্রের উপর বারো দিরহাম নির্ধারিত। সুতরাং সিরিয়া ও ইয়ামানের উপর ধার্যকৃত জিযিয়া সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন। ইমাম শাফেয়ি ও এক বর্ণনা অনুযায়ী আহমদের মত হলো. এক দিনার শুধু সর্বনিম্ন জিযিয়া। সর্বোচ্চ জিযিয়ার কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। ওটা শাসকদের ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল। ইমাম মালেক এবং অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমদও বলেন এবং এই মতটিই অগ্রগণ্য যে, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন জিযিয়ার কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। এটা শাসকদের ইজতিহাদ ও বিচার-বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। তারা প্রত্যেক মানুষের অবস্থা অনুযায়ী জিযিয়া ধার্য করবেন। কারো উপর তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত জিযিয়া ধার্য করা হবেনা।

অতিরিক্ত জিযিয়া: যিম্মীদের উপর এ মর্মে শর্ত আরোপ করা জায়েয আছে যে, কোনো মুসলমান তাদের এলাকা অতিক্রম করলে তার আতিথেয়তার জন্য উমর রা. যিম্মীদের উপর একদিন ও এক রাতের আতিথেয়তা. পুল-ব্রীজ মেরামত এবং তাদের এলাকায় কোনো মুসলমান নিহত হলে তার দিয়াত দেয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করেন। আসলাম বর্ণনা করেন: সিরিয়ার একদল যিম্মী উমর রা. এর কাছে এসে অভিযোগ করলো যে, মুসলমানরা আমাদের এলাকা অতিক্রম করার সময় তাদের আতিথেয়তায় ছাগল ও মুরগী যবাই করতে আমাদেরকে বাধ্য করে। উমর রা. বললেন: 'তোমরা যা খাও তাই তাদেরকে খাওয়াবে, এর বেশি কিছু নয়।'

আহলে কিতাবের জন্য কষ্টকর হয় এমন কিছু নেয়া অবৈধ: রসূলুল্লাহ্ সা. আহ্‌লে কিতাবের প্রতি কোমল আচরণ ও নমনীয়তা প্রদর্শন করার আদেশ দিয়েছেন এবং তাদের সাধ্যের অতীত কোনো কিছু তাদের উপর চাপাতে নিষেধ করেছেন। ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সা. এর মুখনি:সৃত সর্বশেষ বাক্য ছিলো: 'তোমরা যিম্মীদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পালন করো।'

রসূলুল্লাহ সা. আরো বলেছেন: 'চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকের উপর কেউ যুলুম করলে কিংবা তার উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু চাপালে আমিই তার বিরুদ্ধে (কেয়ামতের দিন) বিচার প্রার্থী হবো।' ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন:'যিম্মীদের সম্পদ থেকে কেবল উদ্বৃত্তাংশই গ্রহণ করা যেতে পারে।'

ইসলাম গ্রহণ করলে জিযিয়া রহিত: যে যিম্মী ইসলাম গ্রহণ করবে তাকে আর জিযিয়া দিতে হবেনা। কেননা ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন: কোনো মুসলমানের উপর জিযিয়া নেই-(আহমদ আবু দাউদ)। আবু উবায়দা বর্ণনা করেন: জনৈক ইহুদি ইসলাম গ্রহণ করার পরও তার কাছে জিযিয়া দাবি করা হলো। তাকে বলা হলো: তুমি তো (জিযিয়া থেকে) নিস্কৃতি পাওয়ার জন্যই ইসলাম গ্রহণ করেছ। সে বললো: ইসলামে নিষ্কৃতি লাভের অবকাশ আছে। পরে বিষয়টি উমর রা. এর নিকট উত্থাপিত হলে তিনি বললেন: ইসলামে নিষ্কৃতি লাভের অবকাশ আছে। অত:পর তিনি লিখে দিলেন: ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে জিযিয়া নেয়া যাবেনা।

মুসলমানদের সাথে একত্রে অথবা স্বতন্ত্রভাবে বসবাসকারী উভয়ের সাথে যিম্মার চুক্তি বৈধ: মুসলমানদের সাথে একত্রে ও মুসলিম শাসনের অধীনে বসবাসকারীর সাথে যেমন এ চুক্তি জায়েয আছে, তেমনি মুসলমানদের সাহচর্য থেকে দূরে স্বতন্ত্রভাবে বসবাসকারীর সাথেও জায়েয আছে। রসূলুল্লাহ সা. নাজরানের খ্রিষ্টানদের সাথে চুক্তি করেছিলেন। অথচ তখন তারা তাদের নিজস্ব আবাসভূমিতে বসবাস করছিল। তাদের সাথে কোনো মুসলমান ছিলনা। এ চুক্তিতে লিপিবদ্ধ ছিলো: তাদের জানমাল ও সম্ভ্রম রক্ষা, তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা, তাদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং তাদের প্রতি কেউ যুলুম করলে তার সুবিচারের প্রতিশ্রুতি। পরবর্তীকালের খলিফাগণ এ

চুক্তি বাস্তবায়নে যত্নবান ছিলেন। খলিফা হারুনুর রশীদ এ চুক্তি লংঘনের ইচ্ছা করলে ইমাম আবু হানিফার শিষ্য ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান তাকে নিষেধ করেন। চুক্তিটি ছিলো নিম্নরূপ:

'নাজরান ও তার সন্নিহিত এলাকার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আশ্রয় ও আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ সা. এর পক্ষ থেকে যিম্মা (নিরাপত্তা) চুক্তি ঘোষিত হলো। এ চুক্তি উক্ত এলাকার অধিবাসীদের অধীনস্থদের উপরও কার্যকর হবে, চাই তারা সংখ্যায় বেশি হোক বা কম হোক। তাদের কোনো বিশপকে বিশপগিরি থেকে, কোনো সন্যাসীকে তার সন্যাস থেকে এবং কোনো পুরোহিতকে তার পৌরহিত্য থেকে অপসারণ করা হবেনা। কাউকে দুর্বল গণ্য করা হবেনা কিংবা কারো উপর জাহেলিয়াত যুগের কোনো রক্তপণ চাপানো হবেনা। কারো কোনো ক্ষতি করা হবেনা এবং কারো উপর কোনো দু:সাধ্য কাজ চাপানো হবেনা। কোনো সৈন্যবাহিনী তাদের ভূখন্ড মাড়াবেনা। কেউ কোনো প্রাপ্য দাবি করলে সুবিচার সহকারে তার নিষ্পত্তি করা হবে। কেউ অত্যাচারীও হবেনা, কেউ অত্যাচারিতও হবেনা। তাদের কেউ ভবিষ্যতে সুদ খেলে সে আমার নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হবে।

ইবনুল কাইয়েম বলেছেন: এ দ্বারা জানা যায়, নতুন কোনো রীতি চালু করা বা সুদ খাওয়া চলবেনা মর্মে শর্ত আরোপিত থাকলে সুদ খাওয়া ও নতুন রীতি চালু করা দ্বারা যিম্মা চুক্তি ভেংগে যাবে। তাদের একজনকে অন্যের যুলুমের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হবে না। এই চুক্তিপত্রে যা কিছু লিপিবদ্ধ আছে তার ভিত্তিতে চিরস্থায়ীভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আশ্রয় ও আল্লাহ্‌র নিরক্ষর নবি ও রসূল মুহাম্মদ সা. এর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ঘোষিত হলো, যতোদিন না আল্লাহ্‌ তাঁর বিধিব্যবস্থা নিয়ে আসেন।'

সুতরাং কোনো গোত্রপতি যদি এ চুক্তিকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায় এবং জনগণের উপর যুলুম করে, তবে তা প্রতিহত করতে হবে।

ইমাম সারাখ্‌সী তাঁর গ্রন্থ 'আলমাবসূতে' বলেছেন: 'যিম্মা চুক্তিবদ্ধ কোনো শাসক যদি চায় যে, তাকে তার রাজত্বে যেমন খুশি তেমন শাসন চালাতে দেয়া হোক, যথা হত্যা, শূলে চড়ানো ইত্যাদি, যা মুসলিম শাসনাধীন দেশে করা অবৈধ, তবে সেটা তাকে করতে দেয়া যাবেনা। কেননা কোনো যুলুম প্রতিহত করা যেখানে সম্ভব, সেখানে যুলুম চলতে দেয়া হারাম। তাছাড়া পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামি বিধান মেনে চলা যিম্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক। তাই যিম্মা চুক্তির দাবির বিপরীত কিছু করার শর্ত আরোপ করলে তা বাতিল হবে। আর এর ভিত্তিতে তার সাথে সন্ধি ও যিম্মী চুক্তি করা হলে তাতে ইসলাম বিরোধী যে সব শর্ত থাকবে তা বাতিল গণ্য হবে। কেননা রসূলুল্লাহ্‌ সা. বলেছেন: 'আল্লাহ্‌র কিতাবের পরিপন্থী যে কোনো শর্ত বাতিল হবে।'

যিম্মা চুক্তি কখন বাতিল হয়: জিযিয়া দেয়া বন্ধ করলে, মুসলিম শাসকের চালু করা আইন বা সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকার করলে, কোনো মুসলমানের উপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ চালিয়ে হত্যা করলে, মুসলমানকে তার ধর্ম পালনে বাধা দান বা ধর্মান্তরিত করলে, কোনো মুসলমান নারীর সাথে ব্যভিচার করলে, তাকে বিয়ে করে সহবাস করলে, সমকাম করলে, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই ও অপহরণ করলে, গোয়েন্দাগিরি করলে বা কাউকে গোয়েন্দাগিরি করতে সাহায্য করলে ও প্রশ্রয় দিলে। কিংবা আল্লাহ্‌, তাঁর রসূল, তাঁর কিতাব বা তার দীনের বিরুদ্ধে অশোভন উক্তি করলে যিম্মা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এ সব কর্মকাণ্ড দ্বারা মুসলমানদের শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, নৈতিক, ধর্মীয় ও সম্ভ্রমগত অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়।

একবার ইবনে উমর রা. কে জানানো হলো যে, (যিম্মা চুক্তির অধীন আশ্রিত) জনৈক সন্নাসী রসূলুল্লাহ সা. কে গালাগাল করে। তিনি বললেন: আমি শুনলে তাকে হত্যা করতাম। কেননা আমরা তাকে এ বিষয়ে নিরাপত্তা দান করিনি।' অনুরূপ কোনো যিম্মী দারুল হারবে (মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত বা বৈরী ঘোষিত অমুসলিম এলাকায়) আশ্রয় নিলেও যিম্মা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। তবে কোনো প্রকাশ্য পাপ কাজ করলে বা কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে অপবাদ বা কুৎসা রটালে যিম্মা চুক্তি বাতিল হবেনা। আর যখন কোনো যিম্মীর যিম্মা চুক্তি বাতিল হবে, তখন তার পরিবারভুক্ত মহিলা ও সন্তানদের যিম্মা চুক্তি বাতিল হবেনা। কোনো চুক্তি লংঘনের কাজটা তার একার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। তাই তার পরিণতিও তার একার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

চুক্তি লংঘনের পরিণতি: কোনো যিম্মী যিম্মা চুক্তি লংঘন করলে সে যুদ্ধবন্দীতে পরিণত হবে। এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে হত্যা করা হারাম। কেননা ইসলাম তার পূর্ববর্তী যাবতীয় গুনাহ মোচন করে দেয়।

মসজিদে ও মুসলিম এলাকায় অমুসলিমের প্রবেশ: মসজিদুল হারামে, অন্যান্য মসজিদে ও মুসলিম এলাকায় অমুসলিমদের প্রবেশ সম্পর্কে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। কাফেরদের প্রবেশ বিষয়ে মুসলিম দেশ ও আঞ্চলসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:

প্রথম শ্রেণী: হারাম শরীফ। কোনো কাফের, চাই সে যিম্মী হোক বা আশ্রয়প্রাপ্ত হোক, তার জন্য হারাম শরীফে প্রবেশ বৈধ নয়। কেননা সূরা তাওবার ২৮ নং আয়াতে স্পষ্টভাবেই বলা আছে:

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ج

'হে মুমিনগণ ! মুশরিকরা অপবিত্র; সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামে না আসে।'

ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ও মালেক এই মতই ব্যক্ত করেছেন। কাফেরদের এলাকা থেকে যদি কোনো দূত আসে এবং ইমাম মসজিদুল হারামের অভ্যন্তরে থাকেন, তবে ঐ দূতকে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে দেয়া হবেনা। বরং ইমাম নিজে মসজিদ থেকে বেরিয়ে তার সাথে দেখা করবেন অথবা অন্য কাউকে তার সাথে দেখা করতে ও বার্তা শ্রবণ করতে হারামের বাইরে পাঠাবেন। তবে ইমাম আবু হানিফা ও কুফার ফকিহগণ যিম্মীদের জন্য হারাম শরীফে প্রবেশ বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। কিন্তু তারা সেখানে মুসাফিরের ন্যায় অবস্থান করতে পারবে, স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবেনা। (ইমাম আবু হানিফার এই মত ইমাম, শাসক বা শাসকের স্থলাভিষিক্তের অনুমতি সাপেক্ষ।) এমনকি তাঁর মতে একজন যিম্মীর কাবা শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশও বৈধ।

দ্বিতীয় শ্রেণী: আরবের অবশিষ্টাংশ: হেজাযের অবস্থান হচ্ছে: ইয়ামামা, ইয়ামান ও নাজদের মাঝখানে আর মদিনা শরীফ এর অন্তর্ভুক্ত। কারো কারো মতে, মদিনার অর্ধেক তাহামা ও অর্ধেক হেজাযের অন্তর্গত। আবার কেউ কেউ বলেন, সমগ্র মদিনা হেজাযের অন্তর্ভুক্ত। (ইসলামি পরিভাষা অনুসারে এটাই বিশুদ্ধ মত।) কালবির মতে, তাই পাহাড়দ্বয় ও ইরাক অভিমুখী সড়কের মধ্যবর্তী অঞ্চল হচ্ছে হিজায। হারবীর মতে. তাবুকও হেজাযের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কাফেররা অনুমতি নিয়ে হেজাযে প্রবেশ করতে পারে। তবে সেখানে তিন দিনের বেশি থাকতে পারবেনা। ইমাম আবু হানিফার মতে, এখানে তাদের স্থায়ী বসবাসেও বাধা নেই।

অধিকাংশ আলিমের প্রমাণ হলো, ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত মুসলিমের এই হাদিস: 'রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: আরব উপদ্বীপ থেকে আমি ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বহিষ্কার করবোই। সেখানে আমি মুসলমান ব্যতীত আর কাউকে থাকতে দেবনা। 'হযরত আবু বকর এ আদেশ পালন করার সময় পাননি। কিন্তু উমর রা. তাঁর খিলাফতকালে তাদেরকে নির্বাসিত করেছেন এবং ব্যবসায়ী হিসাবে আগতদেরকে তিন দিন অবস্থানের অনুমতি দিয়েছেন। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: আরব উপদ্বীপে দুটি ধর্ম একত্রে অবস্থান করবে না।' -(মুয়াত্তা ইমাম মালেক)।

মুসলিম শরীফে জাবির রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'শয়তানের আশা নেই যে, নামাযীরা আরব উপদ্বীপে আর কখনো তার কথামত চলবে, তবে সে তাদের মধ্যে কলহ-কোন্দল সৃষ্টির ব্যাপারে হতাশ হয়নি।' সাইদ ইবনে আব্দুল আযীয বলেছেন: 'আরব উপদ্বীপের সীমানা উপত্যকা থেকে ইয়ামানের শেষ সীমা, ইরাকের সীমান্ত ও সমুদ্র পর্যন্ত।' অন্যান্যদের মতে, আরব উপদ্বীপের সীমা এডেনের শেষ সীমা থেকে ইরাকের গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত দৈর্ঘে এবং জেদ্দা ও তার সন্নিহিত এলাকা থেকে সমুদ্র তীর ও সিরিয়া পর্যন্ত প্রস্থে।

তৃতীয় শ্রেণী: প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী বাদে অবশিষ্ট সমগ্র মুসলিম বিশ্ব। এ সব দেশে ও আঞ্চলে চুক্তি, নিরাপত্তামূলক আশ্রয় ও যিম্মাচুক্তি সহকারে কাফেরদের বসবাসের অনুমতি রয়েছে। তবে ইমাম শাফেয়ির মতে তারা কোনো মুসলমানের অনুমতি ব্যতীত মসজিদে প্রবেশ করতে পারবেনা। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন: বিনা অনুমতিতেও প্রবেশ করতে পারবে। ইমাম আহমদ ও মালেক বলেন: অনুমতিসহ বা অনুমতি ব্যতীত কোনোভাবেই কাফেররা মসজিদে প্রবেশ করতে পারবেনা।

চব্বিশতম অধ্যায়

গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ

সংজ্ঞা: গনিমত এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'চেষ্টা সাধনার বলে যা অর্জিত হয়।' জনৈক কবি বলেন: 'পৃথিবীর দিকে দিকে সফর করেছি, অত:পর গনিমত পেয়ে সানন্দে ফিরে এসেছি।' ইসলামি পরিভাষায় গনিমত হলো 'যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ।'

গনিমত মোটামুটি তিন প্রকার: ১. অস্থাবর সম্পদ ২. বন্দী ৩. দখলীকৃত ভূমি।

গনিমতকে আনফালও বলা হয়, যা 'নফল' এর বহুবচন। অর্থাৎ অতিরিক্ত। এই নামকরণের কারণ হলো, এটা মুসলমানদের অতিরিক্ত সম্পদ। প্রাগইসলামিক জাহেলিয়তের যুগে যখন পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হতো এবং এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর বিজয় লাভ করতো, তখন বিজিত পক্ষের নিকট থেকে গনিমত গ্রহণ করতো এবং তা যোদ্ধাদের মধ্যে বিতরণ করতো। তার মধ্য থেকে একটা বিরাট অংশ গোত্র প্রধানের জন্য নির্দিষ্ট করতো। জনৈক কবি এদিকে ইঙ্গিত করে বলেন: 'তোমার জন্য এক চতুর্থাংশ গনিমত, আর তুমি যা যা পছন্দ করো, ও নিজের জন্য বাছাই করো, বণ্টনের আগে যা কিছু যোদ্ধাদের হস্তগত হয় এবং বণ্টনের পরে যা কিছু উদবৃত্ত থাকে।'

একমাত্র শেষ নবীর উম্মতের জন্য গনিমত হালাল: আল্লাহ্ তায়ালা গনিমত শুধুমাত্র শেষ নবির উম্মতের জন্য হালাল করেছেন। এ সব সম্পদ গ্রহণকে হালাল ঘোষণা করে আল্লাহ্ বলেন:

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

'অতএব যা তোমরা লাভ করেছ তা বৈধ ও উত্তম মনে করে ভোগ কর ও আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (আনফাল, আয়াত ৬৯)

সহিহ্ হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, গনিমত একমাত্র মুসলিম উম্মাহ্র জন্য নির্দিষ্ট। পূর্বতন কোনো নবির উম্মতের জন্য এর কিছুই হালাল ছিলনা। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ রা. থেকে বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'আমাকে এমন পাঁচটা জিনিস দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্বের কোনো নবিকে দেয়া হয় নি:

১. শত্রুরা আমার ভয়ে এক মাসের দূরত্ব থেকেই ভীত থাকে এবং এদ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে।

২. মাটিকে আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ বানানো হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের যে কোনো ব্যক্তির নিকট নামাযের সময় উপস্থিত হলে সে যেন (মাটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করে অর্থাৎ তায়াম্মুম করে মাটির উপরেই) নামায পড়ে নেয়।

৩. আমার জন্য গনিমত হালাল করা হয়েছে। অথচ আমার পূর্বে কারো জন্য এটা হালাল করা হয়নি।

৪. আমাকে (কেয়ামতের দিন) সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হয়েছে।

৫. আমি (কেয়ামত পর্যন্ত) সমগ্র মানবজাতির নিকট প্রেরিত হয়েছি।' এর কারণ বুখারি ও মুসলিম আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'আমাদের পূর্ববর্তী কারো জন্য গনিমত হালাল করা হয়নি। কারণ আল্লাহ্ আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখেছেন। তাই এটাকে আমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন।'

গনিমতের প্রাপক: রসূলুল্লাহ সা. ও মুশরিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে সমস্ত সংঘর্ষ ঘটে, তা ছিলো দ্বিতীয় হিজরির ১৭ই রমযান বদর প্রান্তরে। এ সংঘর্ষ রসূল সা. ও মুসলমানদের জন্য বিরাট বিজয় ও অভাবনীয় সাফল্য নিয়ে আসে। আর এবারই মুসলমানরা নবুয়তের পর সর্বপ্রথম বিজয়ের স্বাদ উপভোগ করলো এবং আল্লাহ্ তাদের সে শত্রুদেরকে তাদের হাতে পরাভূত করলেন, যারা তাদেরকে দীর্ঘ পনেরো বছর ব্যাপী অত্যাচার ও নির্যাতন করে আসছিল, তাদেরকে তাদের ভিটেমাটি ও সহায়সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত করেছিল শুধুমাত্র এ কারণে যে, তারা বলেছিল–আল্লাহ্ই আমাদের একমাত্র প্রতিপালক। পরাজিত মোশরেকরা যুদ্ধের ময়দানে প্রচুর ধন-সম্পদ ফেলে পালিয়েছিল এবং মুসলমানরা তা সংগ্রহ

করেছিল। পরে এ সম্পদ কে পাবে তা নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে। যারা শত্রুদের পিছু ধাওয়া করেছিল তারা পাবে, না যারা রসূলুল্লাহ্ সা. কে ঘিরে রেখেছিল ও এ সব সম্পদ কুড়িয়েছিল তারা পাবে? পবিত্র কুরআন এ বিতর্কের ফায়সালা করে এ বলে যে, গনিমতের ব্যাপারে নীতিনির্ধারণ করবেন একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূল। সূরা আনফালের প্রথম আয়াতেই আল্লাহ্ বলেন:

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ط قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ 'লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বলো: যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ ও রসূলের।'

গনিমত বন্টনের পদ্ধতি: গনিমত কিভাবে বন্টন করতে হবে আল্লাহ তায়ালা তাও বলে দিয়েছেন।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

'জেনে রাখো, যুদ্ধে তোমরা যা লাভ করো তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র, রসূলের, রসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, দরিদ্রদের এবং পথচারীদের জন্য, যদি তোমরা ঈমান রাখো আল্লাহর প্রতি। আর যা মীমাংসার দিন আমি আমার বান্দার প্রতি নাযিল করেছিলাম তার প্রতি, যখন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।' (সূরা আনফাল, আয়াত ৪১)

সুতরাং এ আয়াতটি সে সব প্রাপকের মধ্যে এক পঞ্চমাংশ বন্টনের সুষ্ঠু বিধান দিয়েছে, যাদের বিবরণ আল্লাহ্ এ আয়াতে দিয়েছেন। তারা হচ্ছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল, আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম, দরিদ্র ও পথচারী। এখানে আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়েছে কেবল বরকত লাভের উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূলের অংশ ব্যয়িত হবে দরিদ্রদের মধ্যে, অস্ত্র সরঞ্জামাদি, জিহাদ ও অনুরূপ জনকল্যাণমূলক কাজে।

আমর ইবনে আব্‌সা রা. থেকে আবু দাউদ ও নাসায়ি বর্ণনা করেন: 'রসূলুল্লাহ্ সা. আমাদেরকে সাথে নিয়ে গনিমতের একটা উটের পাশে নামায পড়লেন। সালাম ফেরানোর পর উটের পার্শ্বদেশ থেকে একটা পশম তুলে নিয়ে বললেন: তোমাদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে এক পঞ্চমাংশ তোমাদের মধ্যে ফিরে আসবে।' অর্থাৎ তা থেকে দরিদ্রদের এবং জিহাদ ও অস্ত্রসস্ত্র বাবদ ব্যয় করা হবে। রসূলুল্লাহ সা. এর নিজের ব্যয় নির্বাহ হবে বনু নযীরের যে সম্পত্তি আল্লাহ্ রসূল সা. কে প্রদান করেছেন, তা থেকে। মুসলিম উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন: বনু নযীরের জমিজমা ও ধনসম্পদ আল্লাহ্ রসূলুল্লাহ্ সা.কে প্রদান করেছিলেন। সেগুলো মুসলমানরা যুদ্ধ করে দখল করেনি। সেগুলো শুধুমাত্র রসূল সা. এর জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। তা থেকে রসূল সা. এর বাৎসরিক ব্যয় নির্বাহ হতো। যা উদ্বৃত্ত থাকতো তা তিনি আল্লাহর পথে জিহাদের প্রস্তুতি, ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ে ব্যয় করতেন। আর রসূলের স্বজনের অংশ দ্বারা বুঝানো হয়েছে বনু হাশেম ও বনূ আবদুল মুত্তালেব গোত্রের লোকজনকে, যারা রসূলুল্লাহ্ সা.কে সব সময় সাহায্য ও সহায়তা করতেন। যে সব স্বজন তার প্রতি বৈরী ছিলো ও তার প্রতি অত্যাচার চালাতো, তারা নয়।

ইমাম বুখারি ও আহ্‌মদ জুবাইর ইবনে মুত্‌য়িম রা. থেকে বর্ণনা করেন: খয়বরের যুদ্ধের গনিমত থেকে রসূলুল্লাহ্ সা. আত্মীয়-স্বজনের অংশ বন্টন করেন বনু হাশেম ও বনু আব্দুল মুত্তালিবের মধ্যে। তখন আমি ও উসমান ইবনে আফ্‌ফান এসে বললাম: 'হে রসূলুল্লাহ্, বনুহাশেমের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা অস্বীকার করিনা। কেননা আল্লাহ আপনাকে তাদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন বানিয়েছেন। কিন্তু আমাদের বনু মুত্তালিব ভুক্ত ভাইদের ব্যাপারে কী? আপনি তাদেরকে দিলেন এবং আমাদেরকে বাদ দিলেন। অথচ আপনার মোকাবিলায় তারা ও আমরা সমান মর্যাদার অধিকারী।'

রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: 'বনুল মুত্তালিব জাহেলিয়ত ও ইসলাম, কোনো যুগেই আমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেনি। আসলে বনুল মুত্তালিব ও বনুহাশেম এক ও অভিন্ন।' এ সময় তিনি দু'হাতের আঙ্গুলগুলোকে পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। তিনি বললেন: তাদের মধ্য থেকে ধনী ও দরিদ্র, নিকটবর্তী ও দূরবর্তী,

নারী ও পুরুষ সকলেই হিসসা পাবে। 'পুরুষ পাবে নারীর দ্বিগুণ।' ইমাম আবু হানিফা বলেন: তারা দরিদ্র হলে দারিদ্র্যের কারণে তাদের অংশ দেয়া হবে। ইমাম শাফেয়ি বলেন: তাদেরকে রসূলের আপনজন হিসাবে অংশ দেয়া হবে। ইবনে আব্বাস, ইমাম যয়নুল আবেদীন ও ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত হয়েছে: তাদের মধ্যকার ধনী, দরিদ্র, নারী , পুরুষ, শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক সবাই সমান অংশ পাবে। কেননা আত্মীয়তার বিচারে তারা সমান। তাছাড়া যেহেতু তাদের উপর যাকাত হারাম, তাই তাদেরকে এ হিসসাটা দিয়ে ক্ষতিপুরণ দেয়া হয়েছে। উপরন্তু আল্লাহ্ তাদের জন্য এ অংশ বরাদ্দ করেছেন এবং রসূল সা. এটা তাদের মধ্যে বন্টন করেছেন। হাদিসে এ কথা বলা হয়নি যে, তিনি তাদের কাউকে অন্য কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ির যুক্তি হলো, তারা আত্মীয়তার সুবাদেই এ হিসসার অধিকারী হয়েছে। তাই এটা উত্তরাধিকারের মত। রসূলুল্লাহ সা. তাঁর চাচা আব্বাস রা. কেও হিসসা দিতেন। অথচ তিনি ধনী ছিলেন। আর তাঁর ফুফু ছফিয়াকেও দিতেন। ইয়াতীমের যে অংশটা মুসলিম ইয়াতীম শিশুদের প্রাপ্য, সেটি সম্পর্কে কারো কারো মত হলো, ওটা শুধু দরিদ্র ইয়াতিমদের প্রাপ্য। অন্যরা বলেন: দরিদ্র বা ধনী উভয় শ্রেণীর ইয়াতিমদের প্রাপ্য। কারণ তারা ধনী হলেও দুর্বল শ্রেণীভুক্ত। বায়হাকি সহিহ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন, জনৈক ব্যক্তি বলেছেন:

'রসূলুল্লাহ সা. যখন ওয়াদিউল কুরায় একটি ঘোড়ার পিঠে বসেছিলেন তখন আমি এসে বললাম: হে আল্লাহ্র রসূল সা., আমরা গনিমতের ব্যাপারে কী বলবো ? তিনি বললেন: 'এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র, আর অবশিষ্ট চার পঞ্চমাংশ সৈন্যদের।' আমি বললাম: 'তাহলে কেউ কারো চেয়ে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত নয়।'? তিনি বললেন: 'না , আর এ অংশটা তুমি নিজের পকেট থেকেও বের করছনা। তুমি তোমার মুসলমান ভাই এর চেয়ে বেশি হকদার নও।'

অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: 'যে গ্রামবাসী আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে, তার অংশ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের, অত:পর তা তোমাদের।'

অবশিষ্ট চার পঞ্চমাংশ সেনাবাহিনীকে দেয়া হবে। কেবলমাত্র পুরুষ, স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিস্ক সৈন্যরাই তা পাবে। নারী, ক্রীতদাস, শিশু ও পাগল কোনো অংশ পাবেনা। কেননা পুরুষ প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিস্ক হওয়া অংশ প্রাপ্তির শর্ত। সবল, দুর্বল, যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ও যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বিরত–সবাই সমভাবে গনিমতের অংশ পাবে। ইমাম আহমদ সা'দ ইবনে মালেক থেকে বর্ণনা করেন: আমি (সাদ) বললাম: হে রসূলুল্লাহ্, এক ব্যক্তি মুসলমানদের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করে। তবুও তার ও অন্যদের অংশ সমান হবে? রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: 'ওহে সাদ: তোমরা কি তোমাদের মধ্যকার দুর্বলদের ওসিলা ব্যতীত জীবিকা ও সাহায্য পেয়ে থাক ?'

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' গ্রন্থে বলা হয়েছে: 'সেনাপতি যাকে সেনাবাহিনীর স্বার্থে এবং প্রয়োজনে কোথাও পাঠায়, যেমন ডাকপিয়ন, অগ্রবর্তী সেনা ও গোয়েন্দা, সেও হিসসা পাবে, যদিও সে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে, যেমন খলিফা উসমান বদর যুদ্ধে গনিমতের অংশ পেয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী রসূলুল্লাহ সা. এর কন্যা রুকাইয়া অসুস্থ থাকায় তাঁর নির্দেশে যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। অত:পর রসূলুল্লাহ সা. তাঁকে বললেন: 'যারা বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে, তাদের মতই সওয়াব ও গনিমতের অংশ তুমিও পাবে।' –(বুখারি: ইবনে উমর)। পদাতিক সৈন্যকে এক অংশ ও অশ্বারোহী সৈন্যকে তিন অংশ দেয়া হবে। একাধিক সহিহ হাদিস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ্ সা. অশ্বারোহী সৈন্যকে তিন অংশ ও পদাতিককে এক অংশ দিতেন। এর কারণ হলো, ঘোড়ার জন্য কিছু বাড়তি ব্যয় বহন করতে হয় এবং তার জন্য সহিসের দরকার হয়। তাছাড়া যুদ্ধে একজন অশ্বারোহী সৈন্য পদাতিক অপেক্ষা তিনগুণ অবদান রাখতে সক্ষম। ইমাম আবু হানিফার মতে, অশ্বরোহী পদাতিকের দ্বিগুণ পাবে। তবে এ মতটি সহিহ হাদিসের পরিপন্থী। কোনো কোনো আলিমের মতে, আরবি ঘোড়া ও অনারব ঘোড়ার আরোহী সমান। অন্যেরা বলেন: সমান নয় এবং আরবি ঘোড়ার আরোহী না হয়ে গনিমতের অংশ পাবেনা, যেমন অশ্বারোহী অংশ পায়না। ঘোড়া ব্যতীত অন্য কোনো জন্তুর আরোহীকে গনিমতের অংশ দেয়া হয়না। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. ঘোড়া ব্যতীত আর কোনো জন্তুর আরোহীকে অংশ দিয়েছেন এমন প্রমাণ নেই। বদরের যুদ্ধে সত্তরটি উট ছিলো এবং

কোনো যুদ্ধেই উট অনুপস্থিত ছিলনা। কেননা এটাই আরবদের সংখ্যাগরিষ্ঠের বাহন ছিলো। তিনি যদি উট চালকদেরকে অংশ দিতেন, তবে তা আমাদের গোচরিভূত হতো। রসূলুল্লাহ্ সা. পরে তাঁর সাহাবীগণও উটের চালকদেরকে গনিমতের অংশ দেননি।

একাধিক ঘোড়ার জন্য অংশ দেয়া হয়না। কেননা রসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর সাহাবীদের থেকে এরূপ বর্ণিত হয়নি যে, তারা একাধিক ঘোড়ার জন্য অংশ দিয়েছেন। তাছাড়া শত্রুরাও যেহেতু একাধিক ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করেনা, তাই আমাদের যোদ্ধাদের বেলায়ও অনধিক এক ঘোড়ার জন্যই অংশ দেয়া হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেন: একাধিক ঘোড়াধারীকেও অংশ দেয়া হবে। কেননা অন্য সবার তুলনায় সে অধিকতর স্বনির্ভর ও অধিকতর উপকারী। ঘোড়া চাই ধার করে আনা হোক বা ভাড়া করে আনা হোক কিংবা জবরদখল করে আনা হোক, তার চালককে অংশ দেয়া হবে। জবরদখলকৃত ঘোড়ার জন্য যে গনিমত বঞ্চিত হবে তা তার মালিকের প্রাপ্য হবে।

গনিমতের অতিরিক্ত অংশও গনিমত : শাসক ইচ্ছা করলে কতক যোদ্ধাকে তার প্রাপ্য হিসসার চেয়ে এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ পরিমাণ বেশি দিতে পারেন। যদি এরূপ অতিরিক্ত দেন তবে তাকেও গনিমতেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা যাবে। এরূপ অতিরিক্ত সে যোদ্ধাকেই দেয়া যায়, যে নিজেকে এর যোগ্য প্রামাণ করে। এটা ইমাম আহমদ ও আবু উবায়দের মত। ইমাম মালেকের মতে অতিরিক্ত গনিমত বাইতুল মালের প্রাপ্য একপঞ্চমাংশ থেকে দেয়া হবে। ইমাম শাফেয়ি বলেন: এটা দেয়া হবে এক পঞ্চমাংশের এক পঞ্চমাংশ থেকে এবং এটা শাসকের হিসসা। এর প্রমাণ হাবিব ইবনে মুসলিমা বর্ণিত হাদিস, যা আবু দাউদ ও 'তিরমিযি বর্ণনা করেছেন: রসূলুল্লাহ্ সা. সেনাদলগুলোকে প্রথমে এক পঞ্চমাংশ দেয়ার পর এক চতুর্থাংশ অতিরিক্ত দিতেন। আর প্রত্যাবর্তনের পরে এক পঞ্চমাংশের পর একতৃতীয়াংশ অতিরিক্ত দিতেন।' রসূলুল্লাহ সা. এর সেনাপতিত্বে সংঘটিত একটি যুদ্ধে সালমা ইবনুল আক্ওয়া' অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করায় তাকে পদাতিক ও অশ্বারোহীর হিসসা সংযুক্ত করে পাঁচটি হিসসা দান করেন।

নিহত সৈনিকের সাথে থাকা যুদ্ধ সরঞ্জাম হত্যাকারীর প্রাপ্য: নিহত কাফের সৈনিকের সাথে থাকা অস্ত্র, যুদ্ধ সরঞ্জাম ও যুদ্ধের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পূর্ণরূপে তার হত্যাকারীর একক প্রাপ্য। তবে নগদ অর্থ ও মনিমুক্তা ইত্যাদি থাকলে তা গনিমত গণ্য হবে এবং গনিমতের নিয়মেই তা বন্টন করা হবে। কখনো কখনো সেনাপতি সৈনিকদেরকে যুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্য নিহতদের সাথে থাকা সাজ সরঞ্জাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং অন্যান্য সৈনিকদেরকে বাদ দিয়ে শুধু হত্যাকারী সৈনিককে তা প্রদান করেন। রসূলুল্লাহ সা. হত্যাকারী সৈনিককে এগুলো প্রদানের ফায়সালা করেছিলেন, পঞ্চমাংশ হিসাবে বন্টন করেন নি। (আবুদাউদ)

তবে ইবনে আবি শায়বা আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণনা করেন: মরুযুদ্ধে বারা ইবনে মালেক মরজুবানকে তার বাহন জন্তুর পিঠে আরোহী থাকা অবস্থায় হত্যা করেন। তার সাথে থাকা অস্ত্র ও সাজসরঞ্জামের মূল্য দাঁড়ায় তিরিশ হাজার মুদ্রা। এ ঘটনা যখন উমর ইবনুল খাত্তাব রা. জানতে পারলেন, তখন তিনি আবু তালহাকে বললেন: 'আমরা এতদিন নিহত সৈনিকের সাথে থাকা সাজসরঞ্জাম ভাগ করতামনা, হত্যাকারীকেই পুরোটা দিয়ে দিতাম। কিন্তু যে সব জিনিস বারা'র দখলে এসেছে তা অত্যধিক মূল্যবান। এটা খুমুসের (পঞ্চমাংশের) নিয়মে বন্টন করা ছাড়া গত্যন্তর দেখছি না।'

ইমাম ইবনে সিরীন বলেন: আনাস ইবনে মালেক আমাকে বলেছেন: নিহত শত্রুসেনার কাছ থেকে উদ্ধার পাওয়া যুদ্ধ সরঞ্জাম বন্টন করার ঘটনা এটাই প্রথম। সালমা ইবনুল আক্ওয়া' বর্ণনা করেন: 'একবার মোশরেকদের জনৈক গোয়েন্দা রসূলুল্লাহ্ সা. এর কাছে এলো। তিনি তখন সফরে ছিলেন। সে তাঁর সাহাবিদের সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে সটকে পড়লো। রসূলুল্লাহ সা. বললেন: ওকে খুঁজে বের কর এবং হত্যা কর। অত:পর আমি তাকে হত্যা করলাম এবং রসূলুল্লাহ সা. তার কাছ থোকে পাওয়া যুদ্ধ সরঞ্জাম আমাকে দিলেন।'

গনিমতে যাদের অংশ নেই: ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, গনিমতের অংশ পাওয়ার শর্ত হলো প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, সুস্থমস্তিষ্ক হওয়া, পুরুষ হওয়া এবং স্বাধীন হওয়া। যার মধ্যে এ সব শর্ত পূরণ হবেনা সে গনিমতের কোনো অংশ পাবেনা, যদিও অংশ বহির্ভূতভাবে কিছু পেতে পারে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব বলেছেন: বালকরা ও গোলামরা প্রাথমিক যুগে যুদ্ধে উপস্থিত থাকলে গনিমত থেকে কিছু পেত। ইমাম আবু দাউদ উমাইর রা. থেকে বর্ণনা করেন: আমি (উমাইর) আমার মনিবদের সাথে খয়বর যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছিলাম। তখন রসূলুল্লাহ্ আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তাকে জানানো হলো যে, আমি একজন গোলাম। তখন আমাকে নগণ্য কিছু জিনিস দিলেন। ইবনে আব্বাস রা. কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মহিলা ও গোলাম যখন অন্যদের সাথে রণাঙ্গনে হাজির হয়, তখন তারা কোনো নির্দিষ্ট অংশ পাবে কিনা? তিনি জবাব দিলেন: তারা নির্দিষ্ট কোনো অংশ পাবেনা। তবে তাদেরকে সকলের গনিমত থেকে কিছু দেয়া যেতে পারে। উম্মে আতিয়া রা. বলেন: আমরা (মহিলারা) রসূলুল্লাহ্ সা. এর সাথে রণাঙ্গনে যেতাম, আহত ও রোগীদের সেবা ও পরিচর্যা করতাম এবং তিনি আমাদেরকে গনিমত থেকে কিছু দিতেন। ইমাম তিরমিযি ইমাম আওয়াযি সূত্রে বর্ণনা করছেন: রসূলুল্লাহ সা. খয়বরে বালকদেরকে গনিমতের অংশ দিয়েছেন। তবে এখানে অংশ অর্থ সামান্য কিছু দান।

এযিদ ইবনে হরমুয থেকে বর্ণিত, নাজ্দা আল-হারুবী ইবনে আব্বাস রা.কে পাঁচটি প্রশ্নের জবাব চেয়ে চিঠি লিখেছিল: রসূলুল্লাহ সা. কি মহিলাদেরকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ করতেন? তিনি কি তাদেরকে কোনো অংশ দিতেন? তিনি কি বালকদেরকে হত্যা করতেন? কখন এতিমের এতিমত্বের অবসান হয়? এক পঞ্চমাংশ গনিমত কার প্রাপ্য?

ইবনে আব্বাস বললেন: আমি যদি তথ্য লুকিয়ে রাখতে চাইতাম তবে প্রশ্নকর্তার চিঠির জবাব দিতামনা। তারপর চিঠির জবাবে লিখলেন: তুমি আমার কাছে জানতে চেয়েছ রসূলুল্লাহ্ সা. মহিলাদেরকে নিয়ে যুদ্ধে যেতেন কিনা? হাঁ, তাদেরকে নিয়ে তিনি যুদ্ধে যেতেন। তারা শুধু আহতদের চিকিৎসা ও পরিচর্যা করতো। অত:পর তিনি তাদেরকে গনিমত থেকে কিছু দিতেন। তবে কোনো নির্দিষ্ট অংশ দিতেননা। রসূলুল্লাহ সা. বালকদেরকে হত্যা করতেননা, তুমি করনা তো? তুমি আরো জানতে চেয়েছ এতিমের এতিমত্ব কখন ঘোচে? আল্লাহর কসম, অনেক পুরুষ এমন আছে, যে গোফ-দাঁড়ি গজানোর পর পর্যন্ত নিজের জন্য আয়, রোজগারে সক্ষম হয়না। কাজেই সে যখন আয়-রোজগারে সক্ষম হবে, তখন তার এতিমত্বের অবসান ঘটবে। তুমি আরো জিজ্ঞাসা করেছ, 'খুমুস' (এক পঞ্চমাংশ) কার কার প্রাপ্য? আমরা বলতাম: ওটা আমাদের প্রাপ্য। কিন্তু মুসলমানরা আমাদের দেয় নি।' (বুখারি ব্যতীত পাঁচটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ)

মজুররা ও অমুসলিমরা কোনো অংশ পায়না: যে সকল মজুর জীবিকা উপার্জনে সৈন্যদের সাথে কাজ করে তারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেও গনিমতের কোনো অংশ পাবেনা। কেননা তারা যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক ছিলনা এবং যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরও হয়নি। আধুনিক সেনাবাহিনীও এই শ্রেণীভুক্ত। এটা একটা পেশা ও প্রযুক্তি। পক্ষান্তরে অমুসলিম যিম্মীদের কাছ থেকে যখন সাহায্য চাওয়া হয় এবং তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে শরীক হয়, তখন তাদের ব্যাপারে ফকীহ্দের মধ্যে মতভেদ ঘটেছে।

হানাফিদের বক্তব্য হলো, তাদেরকে যৎকিঞ্চিৎ দান-দাক্ষিণ্য দেয়া যাবে, কিন্তু কোনো অংশ দেয়া যাবেনা। এক বর্ণনা অনুসারে এটা ইমাম শাফেয়িরও মত। ইমাম শাফেয়ি থেকে আরো একটা মত বর্ণিত আছে, তা হলো: শাসক তাদেরকে এমন সম্পদ থেকে মজুরি দেবে যার কোনো নির্দিষ্ট মালিক নেই। তা যদি দিতে নাপারে, তবে রসূলুল্লাহ্ সা. এর অংশ তাদেরকে দেবে। ইমাম সাওরি ও আওযায়ি বলেছেন, তাদেরকে অংশ দেয়া হবে।

গুলুল (গনিমতের মাল চুরি করা)

গুলুল হারাম: গুলুল হলো গনিমতের মাল চুরি করা। এটা হারাম। কেননা গুলুল মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়, তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, এবং তাদেরকে যুদ্ধের পরিবর্তে লুটপাটের দিকে আকৃষ্ট করে। আর এ সবই পরাজয়কে অবধারিত করে তোলে। এ জন্য মুসলমানদের সর্বসম্মত মত এই যে, গুলুল কবীরা গুনাহ্। মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ط وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ج

'অন্যায়ভাবে কোনো বস্তু গোপন করা নবির পক্ষে অসম্ভব। কেউ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করলে সে কেয়ামতের দিন অন্যায়ভাবে গোপনকৃত জিনিস সাথে নিয়ে আসবে।' (সূরা আলে ইমরান: ১৬১) রসূলুল্লাহ সা. গুলুলকারীকে শাস্তি দেয়ার আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি স্বয়ং তার আসবাবপত্র জ্বালিয়ে দিয়েছেন ও তাকে প্রহার করেছেন, যাতে অন্যেরা সাবধান হয় এবং এ ধরনের কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকে। ইমাম আবুদাউদ ও তিরমিযি উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ বলেছেন: 'যখন তোমাদের নিকট কারো গুলুল ধরা পড়ে তখন তার মালপত্র জ্বালিয়ে দাও এবং তাকে প্রহার কর।' উমর রা. বলেন: আমরা এক ব্যক্তির মালপত্রের মধ্যে এক জিলদ কুরআন পেয়ে সালেমকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: ওটা বিক্রি করে দিন এবং তার মূল্য সদকা করে দিন। আমর ইবনে সুয়াইব রা. থেকে বর্ণিত: রসূল সা. আবু বকর রা. ও উমর রা. গুলুলকারীর মালপত্র জ্বালিয়ে দিতেন এবং তাকে প্রহার করতেন।

তবে রসূলুল্লাহ্ সা. থেকে অন্য কিছু হাদিস এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি গুলুলকারীর মালপত্র পোড়ানোর আদেশ দেননি এবং তাকে প্রহারও করেননি। এ থেকে বুঝা যায়, শাসক যে রূপ কল্যাণকর মনে করেন সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। জ্বালিয়ে দেয়া হবে ও প্রহার করা হবে। নচেৎ যা কল্যাণকর বিবেচিত হয়, তাই করা হবে।

বুখারি আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন: কিরকিরা নামক এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সা. এর আসবাবপত্র প্রহরায় নিয়োজিত ছিল। সে মারা গেলে রসূল সা. বললেন: সে দোযখবাসী। তখন লোকেরা তাকে দেখতে গেল ও তার মালপত্র অনুসন্ধান করে দেখলো, সে একটা জামা লুকিয়ে রেখেছে।

ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন: খয়বর যুদ্ধের দিন জনৈক সাহাবি মারা যান। এ খবর শুনে রসূলুল্লাহ সা. উপস্থিত মুসলমানদেরকে বললেন: 'তোমাদের সাথীর জানাযার নামায তোমরা পড়।' (অর্থাৎ তিনি নিজে পড়তে অনীহা প্রকাশ করলেন) একথা শুনে জনতার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তখন রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: 'তোমাদের সাথী আল্লাহর পথে গুলুল করেছে।' তখন লোকেরা তার মালপত্র তল্লাশি চালিয়ে ইহুদিদের একটি রেশমি পোশাক পেল, যার মূল্য দুই দিরহামের চেয়েও কম।

গনিমত বন্টনের পূর্বে খাদ্য জাতীয় জিনিস দ্বারা উপকৃত হওয়া: উল্লেখিত কড়াকড়ি থেকে খাবার জিনিস এবং পশুর খাদ্যকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। মুসলিম যোদ্ধারা যতোদিন শত্রুর ভূমিতে অবস্থান করবে ততদিন ভাগবাটোয়ারা না করা হলেও উক্ত দুটি দ্রব্য দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

১. ইমাম বুখারি ও মুসলিম আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল রা. থেকে বর্ণনা করেন ; তিনি বলেন: 'আমি খয়বর যুদ্ধের দিন এক থলিভর্তি চর্বি পেলাম, এবং তা আড়ালে রেখে দিয়ে বললাম: আজ আমি কাউকে এ থেকে কিছুই দেবনা। পরক্ষণে পাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, রসূলুল্লাহ্ সা. মুচকি হাসছেন।

২. ইমাম আবুদাউদ, হাকেম ও বায়হাকি বর্ণনা করেন, ইবনে আবি আওফা বলেন: 'আমরা খয়বর যুদ্ধের দিন কিছু খাদ্যদ্রব্য পেলাম। এক একজন করে আসছিল, তা থেকে যতটা প্রয়োজন খেয়ে নিচ্ছিল এবং তারপর চলে যাচ্ছিল।

৩. ইমাম বুখারি ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: আমরা আমাদের যুদ্ধবিগ্রহে মধু ও

আঙ্গুর পেতাম এবং তা খেতাম, কিন্তু সাথে নিয়ে যেতামনা। একই হাদিসে ইমাম আবুদাউদের বর্ণনা মোতাবেক এ কথাও রয়েছে: তা থেকে খুমুস নেয়া হতোনা।'

ইমাম মালিক 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে বলেন: মুসলমানরা যখন শত্রুর ভূমিতে প্রবেশ করবে তখন তাদের খাদ্যদ্রব্য খাবে, এতে আমি আপত্তির কিছু দেখিনা। বন্টনের আগে যে খাদ্যই তাদের হস্তগত হবে তা খেতে পারবে। তিনি আরো বলেন: 'উট, গরু ও ছাগলকেও আমি খাদ্যদ্রব্য হিসাবেই বিবেচনা করি। মুসলমানরা শত্রুর দেশে প্রবেশের পর অন্যান্য খাদ্যের মত এগুলোও খেতে পারবে।' তিনি আরো বলেন: 'বন্টনে সকল মানুষ উপস্থিত হওয়া ও বন্টন হওয়া এই সব খাবার যদি না খাওয়া হয় তবে তাতে সৈন্যদের ক্ষতি হবে। তাই প্রয়োজনীয় ও ন্যায়সংগত পরিমাণে এ সব খাদ্যদ্রব্য থেকে খাওয়াকে আমি আপত্তিকর মনে করিনা। তবে এসব থেকে কিছু জমা করে রেখে পরবর্তীতে পরিজনের নিকট ফিরে যাওয়ার সময় এ থেকে কিছু নিয়ে যাওয়া সমীচীন নয়।

শত্রুর নিকট কোনো মুসলমান যে সম্পদ পাবে, তা শত্রুর গণ্য হবে: যখন যোদ্ধারা মুসলমানদের কাছে সে সম্পদ ফেরত চায়, যা শত্রুদের কাছে ছিল, তখন সে সম্পদের মালিকরাই তা পাওয়ার বেশি হকদার। ঐ সম্পদে যোদ্ধাদের কোনো প্রাপ্য নেই। কেননা ওগুলো যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা গনিমত নয়।

১. ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন: তার একটা উট হারিয়ে গেল এবং একজন শত্রু তা হস্তগত করলো। পরে মুসলমানরা তার উপর বিজয়ী হয় এবং রসূল সা. এর জীবদ্দশায় তা ঐ শত্রুকে ফেরত দেয়া হয়।

২. ইমরান ইবনে হাছীন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: 'মোশরেকরা মদিনায় গবাদিপশুর উপর আক্রমণ চালালো এবং রসূলুল্লাহ্ সা. এর উটনী 'আযবা' ও জনৈক মুসলিম নারীকে অপহরণ করলো। রাতে যখন শত্রুরা ঘুমিয়ে ছিলো, তখন মহিলা চুপিসারে উঠে উটগুলোর মধ্য থেকে কোন্‌টি নিয়ে পালানো যায়, তা স্থির করার জন্য একে একে প্রত্যেকটি উটের উপর হাত রাখতে লাগলো। সে যে উটের উপরই হাত রাখে, সেটিই গর্জন করে ওঠে। অবশেষে 'আয্‌বার' কাছে এলে তাকে অত্যন্ত অনুগত পেল। তার উপর আরোহণ করে সে মদিনা অভিমুখে যাত্রা করলো। পথিমধ্যে সে মান্নত করলো যে, আল্লাহ্ তাকে উদ্ধার করলে এ উটটিকে কুরবানী করবে। মহিলা মদিনায় পৌঁছলে উটনীটাকে সবাই চিনে ফেললো। লোকেরা মহিলাকে রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট নিয়ে গেল। মহিলা রসূলুল্লাহ্ সা. কে তার মান্নতের কথা জানালো। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: উটনীটাকে তুমি খুবই খারাপ প্রতিদান দিতে চেয়েছ। আদম সন্তান যে জিনিসের মালিক নয়, তাতে তার কোনো মান্নত শুদ্ধ নয়। আর কোনো গুনাহ্‌র কাজে মান্নত চলেনা।'

অনুরূপ কোনো যুদ্ধরত কাফের ইসলাম গ্রহণ করলে সে সময় তার কাছে কোনো মুসলমানের মাল থাকলে, তখন সে মাল তার মালিকের নিকট ফেরত দেয়া হবে।

যুদ্ধরত কাফির ইসলাম গ্রহণ করলে: কোনো যুদ্ধরত কাফের যখন ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম রাষ্ট্রের দিকে হিজরত করে এবং দারুল হারবে (যুদ্ধরত দেশে) তার স্ত্রী, সন্তান ও সহায়সম্পদ রেখে যায়, তখন ইসলাম গ্রহণের ফলে ঐ নওমুসলিমের সন্তান ও সহায়সম্পদ পূর্ণ নিরাপত্তা লাভের অধিকারী হবে। ঐ দেশের উপর মুসলমানরা বিজয়ী হলে তার স্ত্রী, সন্তান ও সম্পদ গনিমতের অন্তর্ভুক্ত হবেনা। রসূল সা. বলেন: 'কাফেররা ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার কাছে নিরাপদ হয়ে যাবে।'

❖❖❖

পঁচিশতম অধ্যায়

যুদ্ধবন্দী

যুদ্ধবন্দীরাও গনিমতের আওতাভুক্ত। যুদ্ধবন্দী দু প্রকার: প্রথম প্রকার: নারী ও শিশু।

দ্বিতীয় প্রকার: যুদ্ধরত বয়স্ক কাফির পুরুষ, যখন মুসলমানদের নিকট জীবিত ধরা পড়ে।

যুদ্ধরত পুরুষ কাফিরদের উপর মুসলমানরা বিজয়ী হলে ও তারা গ্রেফতার হলে তাদেরকে দয়া প্রদর্শন করত মুক্তিদান, মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তি দান অথবা হত্যা করা এ তিনটি পদক্ষেপের মধ্যে যেটি অধিকতর উপকারী ও কল্যাণকর মনে হবে, তা গ্রহণের জন্য ইসলাম শাসককে ক্ষমতা প্রদান করেছে।

মুক্তিপণ অর্থসম্পদ দিয়েও দেয়া যায়, বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমেও দেয়া যায়। বদরযুদ্ধে অর্থ সম্পদের মাধ্যমেই নেয়া হয়েছিল। তবে বিশুদ্ধ রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ্ সা. বনুআকীলের একজন মুশরিকের বিনিময়ে তাঁর দুজন সাহাবীকে মুক্ত করেছিলেন। (ইমাম আহ্মদ ও তিরমিযি, ইমাম তিরমিযি কর্তৃক বিশুদ্ধ বলে অভিহিত) মহান আল্লাহ্ বলেন:

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ط حَتّٰى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا قف

'তোমরা যখন কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর, তখন তাদের গর্দানে আঘাত হানবে, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে, অত:পর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। (তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে) যতক্ষণ যুদ্ধ তার অস্ত্র নামিয়ে না ফেলে।' (সূরা মুহাম্মদ, ৪)

ইমাম মুসলিম আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ্ সা. তখন আশিজন বন্দীকে মুক্তি দিয়েছিলেন, যারা ফজরের নামাযের সময় রসূলুল্লাহ্ সা. ও তার সাহাবীগণকে হত্যা করার জন্য 'তানয়িম' পর্বতের উপর থেকে নেমে এসেছিল। এ বিষয়েই সূরা আল-ফাত্হের ২৪ আয়াতের নিম্নোক্ত অংশটি নাযিল হয়:

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ -

'তিনিই মক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর।'

আর মক্কা বিজয়ের দিন তিনি মক্কাবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন: 'খাও তোমরা মুক্ত।' এতদসত্ত্বেও বৃহত্তর কল্যাণের প্রয়োজনে বন্দীকে হত্যা করা শাসকের জন্য বৈধ। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সা. ও এরূপ করেছেন বলে প্রমাণিত আছে। তিনি নযর ইবনুল হারেস ও উকবা ইবনে মুয়াইত্কে বদর যুদ্ধের দিন এবং আবু ইজ্জত আল জুমহীকে ওহুদ যুদ্ধের দিন হত্যা করেন। এ সম্পর্কেই আল্লাহ্ বলেন:

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ط

'দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোনো নবির জন্য সংগত নয়।' (সূরা আনফাল: আয়াত ৬৭)

অধিকাংশ আলেম এই মতই সমর্থন করেন যে, উপরোক্ত তিনটি পদক্ষেপের যে কোনোটি গ্রহণ করার অধিকার শাসকের রয়েছে।

কিন্তু হাসান ও আতা রহ. বলেন: বন্দীকে হত্যা করা যাবেনা, বরং হয় ক্ষমা করে মুক্ত করে দিতে হবে, নচেৎ মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দিতে হবে। ইমাম যুহরি ও মুজাহিদসহ একদল আলেম বলেন: কাফের বন্দীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা আদৌ বৈধ নয়। অপর দিকে ইমাম মালেক বলেন: মুক্তিপণ ব্যতীত মুক্তি দেওয়া জায়েয নয়। হানাফিদের মতে যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তি দেয়া জায়েয নেই, চাই মুক্তিপণের বিনিময়ে হোক অথবা মুক্তিপণ ছাড়া হোক।

যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচরণ: ইসলাম যুদ্ধবন্দীদের সাথে মানবিক ও সদয় আচরণ করেছে। ইসলাম তাদেরকে সম্মান ও সহৃদয়তা প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে এবং যারা তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন করে তাদের প্রশংসা করে থাকে। যেমন আল্লাহ্ বলেন:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۝

'খাবারের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবী, ইয়াতিম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে এবং বলে: কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে খাদ্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট থেকে প্রতিদান চাইনা, কৃতজ্ঞতাও চাইনা।' (সূরা দাহ্‌র: আয়াত ৮-৯)

আবু মূসা আশয়ারি রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন:'তোমরা বন্দীকে মুক্ত কর। নিমন্ত্রণকারীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর, ক্ষুধার্তকে অন্ন দান কর এবং রুগ্নব্যক্তিকে পরিচর্যা কর।'

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সুমামা ইবনে উসাল মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়ে রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট নীত হলে তিনি বললেন: 'ওর বন্দীদশার প্রতি তোমরা সৌজন্য প্রদর্শন কর, তোমাদের সবার নিকট থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে তাকে পাঠাও। অত:পর সাহাবিগণ রসূলুল্লাহ্ সা. এর দুধেল উটনীর দুধ সকালে ও সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠাতেন।' রসূলুল্লাহ্ সা. তাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। সে তা প্রত্যাখ্যান করে বললো: আপনি যদি মুক্তিপণ চান তবে কতটা সম্পদ আপনার অভিপ্রেত, তা দাবি করুন। তখন রসূলুল্লাহ্ সা. তার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করলেন এবং বিনা মুক্তিপণে তাকে মুক্তি দিলেন। এ আচরণ পরবর্তীকালে তাকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

সহীহ হাদিসগ্রন্থসমূহে বনুল মুস্তালিক যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে: এ বন্দীদের মধ্যে (পরবর্তীকালে উম্মুল মুমিনীন) জুয়াইরিয়া বিনতে হারেসও ছিলেন। তাঁর পিতা হারেস ইবনে আবু যিরার বহুসংখ্যক উট নিয়ে মদিনায় উপস্থিত হন তার কন্যাকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে। পথিমধ্যে মদিনা থেকে কয়েক মাইল দূরবর্তী 'আকীক' নামে একটি পার্বত্য উপত্যকায় তার প্রিয় দুটি উট লুকিয়ে রেখে যায়। রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট উপস্থিত হয়ে সে বললো ; 'হে মুহাম্মদ, আপনারা আমার মেয়েকে গ্রেফতার করেছেন। এই নিন তার মুক্তিপণ।' রসূলুল্লাহ্ সা. তৎক্ষণাৎ বললেন: আকীকের অমুক পাহাড়ের উপত্যকায় যে উট দুটো লুকিয়ে রেখে এসেছ তা কোথায়? হারিস তৎক্ষণাত বলে উঠলো: 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্নাকা রসূলুল্লাহ' (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহ্‌র রসূল) আল্লাহ্‌র কসম, এ গোপনতথ্য আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ আপনাকে জানায়নি। হারিসের সাথে তার দুই ছেলেও ইসলাম গ্রহণ করলো। সে সাথে তার মেয়েও ইসলাম গ্রহণ করলো। রসূলুল্লাহ্ সা. তৎক্ষণাৎ তাকে বিয়ে করার জন্য তার পিতার নিকট প্রস্তাব পাঠালেন এবং তাকে বিয়ে করলেন। তখন মুসলমানরা বললো: আমাদের হাতে আটক এ সকল বন্দী এখন রসূলুল্লাহ্ সা. এর শ্বশুরকূলীয় আত্মীয়-স্বজন। তাই তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে বিনা পণে মুক্তি দেয়া হলো। হযরত আয়েশা রা. বলেন: 'আমার জানা নেই আর কোনো মহিলা তার গোত্রের জন্য জুয়াইরিয়ার চেয়ে বেশি কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে।' কেননা রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে তাঁর বিয়ে হওয়ার সুবাদে বনুল মুসতালিকের একটি পরিবারের একশো সদস্য মুক্তি পেয়েছে। বস্তুত এ মহান উদ্দেশ্যেই রসূলুল্লাহ্ সা. জুয়াইরিয়াকে বিয়ে করেন। কেবল জৈবিক কামনা চরিতার্থ করার জন্যই তাঁকে বিয়ে করেননি; বরং শরিয়তের একটি লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যেই তাকে বিয়ে করেন। যদি কেবল জৈবিক কামনা চরিতার্থ করাই তাঁর উদ্দেশ্য হতো তাহলে জুয়াইরিয়াকে যুদ্ধবন্দিনী হিসেবে দাসী বানিয়ে রাখতে পারতেন।

❖❖❖

ছাব্বিশতম অধ্যায়

মানুষকে দাস-দাসীতে পরিণত করা

কুরআন মজীদে এমন কোনো উক্তি নেই, যা মানুষকে দাস-দাসীতে পরিণত করা বৈধ করে, অধিকন্তু তাতে মানুষকে স্বাধীন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এমন প্রমাণও কোথাও নেই যে, রসূলুল্লাহ্ সা. কোনো বন্দীকে দাস-দাসীতে পরিণত করেছেন, বরং তিনি মক্কার বন্দীদেরকে বনুল মুসতালিকের বন্দীদেরকে এবং হুনাইনের বন্দীদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। তাছাড়া এ মর্মেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রসূলুল্লাহ সা. জাহেলি যুগে তার নিকট যে সকল দাস-দাসী ছিলো তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং তাকে যে সকল দাস-দাসী উপহার দেয়া হয়েছিল তাদেরকেও তিনি মুক্তি দিয়েছেন।

এতদসত্ত্বেও মুসলমান যুদ্ধবন্দীদেরকে শত্রুপক্ষ দাস-দাসী হিসাবে গ্রহণ করার পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে খুলাফায়ে রাশেদীন কিছু সংখ্যক বন্দিকে দাস-দাসীতে পরিণত করেছিলেন। তাই বলে তারা সকল অবস্থায় মানুষকে দাস-দাসী বানানোর বৈধতা দেননি, ঠিক যেমনটি পূর্বতন শরীয়তসমূহে ও মানব রচিত আইনে দেয়া হতো। তারা এটাকে শুধুমাত্র সে সব যুদ্ধে সীমিত রেখেছেন, যা মুসলমানরা আইন সংগত কারণে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছিল। এ ছাড়া অন্য সকল অবস্থায় বন্দিকে দাস-দাসীতে পরিণত করাকে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং তা কোনো অবস্থায়ই হালাল হয়না। ইসলাম একদিকে যেমন দাসত্বের উৎসগুলোকে খুবই সংকুচিত করে দিয়েছে এবং তাকে অতিমাত্রায় সীমিত করে দিয়েছে, অপর দিকে তেমনি দাস-দাসীদের সাথে অত্যন্ত মহানুভব আচরণ করেছে এবং তাদের স্বাধীন হওয়ার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। নিম্নে এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হলো:

দাস-দাসীদের সাথে আচরণ: ইসলাম দাস-দাসীদের পর্যাপ্ত সম্মান প্রদর্শন করেছে, তাদের সাথে উদারতা ও মহানুভবতার আচরণ করেছে এবং তাদের প্রতি স্নেহ ও মমত্বের হাত প্রসারিত করেছে। তাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার বানায়নি এবং অপবাদ ও দোষারোপের পাত্রে পরিণত করেনি। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখুন:

১. দাস-দাসীদের প্রতি সহৃদয় আচরণ করার উপদেশ দিয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন:

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّ بِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۝

'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করোনা, এবং পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর।' (সূরা নিসা: আয়াত ৩৬)

আলি রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীর ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর।'

২. এমনভাবে তাদেরকে ডাকতে ইসলাম নিষেধ করেছে, যা দ্বারা তাদের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ পায়। যেমন রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: তোমরা এরূপ বলোনা: 'আমার দাস বা দাসী' বরং এভাবে বল: 'আমার সংগী, আমার সংগিনী বা আমার ভৃত্য।'

৩. ইসলাম দাস-দাসীকে মুনিবের অনুরূপ খাদ্য ও পোশাক দিতে আদেশ দিয়েছে। ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: তোমাদের পরিচারক-পরিচারিকাগণ তোমাদের ভাইবোন। আল্লাহ্

তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। যার ভাই তার অধীনে থাকবে, সে নিজে যা খায় তাকেও যেন তাই খাওয়ায় এবং নিজে যা পরে তাকেও যেন তাই পরায় এবং তাদেরকে অতিশয় কষ্টসাধ্য কোনো কাজ করতে যেন বাধ্য না করে। আর যদি অতিশয় কষ্টসাধ্য কোনো কাজে বাধ্য করতেই হয় তবে তাদেরকে ঐ কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য কর।'

৪. তাদের উপর যুলুম-নির্যাতন করতে ইসলাম নিষেধ করেছে। ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'যে ব্যক্তি তার দাস-দাসীকে থাপ্পড় দেয় বা প্রহার করে তার কাফফারা হচ্ছে তাকে মুক্ত করে দেয়া।'

আবু মাসউদ আনসারী রা. বলেছেন: আমি যখন একজন দাসকে প্রহার করছিলাম তখন সহসা আমার পেছনে একটা শব্দ শুনতে পেলাম। তাকিয়ে দেখি রসূলুল্লাহ্ সা. দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন: 'হে আবু মাসউদ, শুনে নাও, তুমি এ দাসটির উপর যতখানি ক্ষমতাবান, আল্লাহ্ তোমার উপর তার চেয়েও বেশি ক্ষমতাবান।' তখন আমি বললাম, সে আল্লাহ্র ওয়াস্তে স্বাধীন। তিনি বললেন: 'এ কাজটা না করলে তোমাকে আগুন স্পর্শ করতো।' কোনো মুনিব তার দাস-দাসীর সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে একথা প্রামাণিত হলে তাকে স্বাধীন করার নির্দেশ দেয়ার অধিকারও ইসলাম আদালতকে দিয়েছে।

৫. ইসলাম দাস-দাসীদেরকে লেখাপড়া ও পরিশীলিত আচরণ শেখানোর আহ্বান জানায়। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন, 'যে ব্যক্তির নিকট একজন দাসী রয়েছে, অত:পর সে তাকে লেখাপড়া শেখায় তার প্রতি মহানুভব আচরণ করে (অর্থাৎ তাকে মুক্তি দেয়) ও তাকে বিয়ে করে, সে ইহকালে ও পরকালে দুটি পুরস্কার পাবে। একটি পুরস্কার লেখাপড়া শেখানো ও বিয়ে করার জন্য, অপর পুরস্কার স্বাধীন করার জন্য।'

স্বাধীন করার পদ্ধতি: ইসলাম দাস মুক্ত করার বহু পথ উন্মুক্ত করেছে। যেমন:

১. একে আল্লাহ্র রহমত ও বেহেশত প্রাপ্তির উপায় হিসাবে চিহ্নিত করেছে। আল্লাহ্ বলেন:

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ○ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْعَقَبَةُ ○ فَكُّ رَقَبَةٍ ○

'অত:পর দুর্গম পথ অতিক্রম করেনি। আপনি জানেন কি, সে দুর্গম পথ কী? তাহলো কোনো দাসকে মুক্ত করা।' (সূরা বালাদ: আয়াত ১১, ১২, ১৩)

একবার জনৈক বেদুইন রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট এসে বললো: হে রসূলুল্লাহ্, আমাকে এমন কাজের সন্ধান দিন, যা আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন: দাস মুক্ত করা ও দাসত্ব স্খালন করা। বেদুইন বললো: হে আল্লাহ্র রসূল, দুটো এক জিনিস নয় কি? তিনি বললেন, না, দাস মুক্ত করা হলো তোমার এককভাবে দাস মুক্ত করে দেয়া। আর দাসত্ব স্খালন হলো তার মূল্য পরিশোধে সহায়তা করা।

২. দাস মুক্ত করা ভুলক্রমে হত্যার অপরাধের কাফফারা। আল্লাহ্ বলেন:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ......

'কেউ কোনো মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করলে একটি মু'মিন দাস মুক্ত করা বিধেয়।' (সূরা নিসা: ৯২)

৩. এটা কসম ভংগ করারও কাফ্ফারা। আল্লাহ্ বলেন:

فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ط

'এর (কসম ভংগ করার) কাফফারা হলো তোমরা সাধারণত তোমাদের পরিবারের লোকদেরকে যে মধ্যম ধরনের খাদ্য খেতে দাও, তা থেকে দশজন দরিদ্রকে খাদ্য দান করা অথবা তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করা, অথবা একজন দাস-দাসী মুক্ত করা।' (সূরা মায়িদা: আয়াত ৮৯)

৪. যিহারের ক্ষেত্রেও দাস-দাসী মুক্ত করা কাফফারা। আল্লাহ্ বলেন:

وَالَّذِينَ يُظٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ط

'যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে (অর্থাৎ স্ত্রীকে বলে 'তুমি আমার নিকট আমার মায়ের পিঠ সদৃশ', জাহেলি যুগে লোকেরা এ কথা উচ্চারণ করে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করতো) এবং পরে নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তবে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস বা দাসী মুক্ত করতে হবে।' (সূরা মুজাদালাহ: আয়াত-৩)

৫. ইসলাম দাস-দাসীদেরকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়াকে যাকাতের অর্থ ব্যয়ের একটি অন্যতম খাত হিসাবে নির্ধারণ করেছে। আল্লাহ্ বলেন:

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِينِ وَالْعٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ

'যাকাত তো শুধু নি:স্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস-দাসী মুক্তির জন্য' (সূরা তাওবা: আয়াত ৬০)

৬. ইসলাম নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে দাস-দাসীদের মুক্ত করার আদেশ দিয়েছে। আল্লাহ্ বলেন:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَّءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِىٓ ءَاتٰكُمْ ط

'তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইলে তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণের সন্ধান পাও। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে তোমরা তাদেরকে দান করবে।' (সূরা নূর: আয়াত ৩৩)

৭. কেউ দাস-দাসী মুক্ত করার মান্নত করলে যখনই উদ্দেশ্য সফল হবে তখনই মান্নত পূরণ ওয়াজিব।

এ আলোচনা থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হলো যে, ইসলাম দাসত্বের উৎসগুলোকে সংকুচিত করেছে, দাস-দাসীদের সাথে মহানুভবতার আচরণ করেছে, স্বাধীনতার পথ সুগম করেছে এবং এই অবমাননাকর অবস্থা থেকে তাদেরকে চূড়ান্তভাবে মুক্ত করার লক্ষ্যে তাদের প্রতি এমন মমত্বের হাত প্রসারিত করেছে, যা যুগযুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সাতাশতম অধ্যায়

যুদ্ধরত কাফিরদের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত গনিমতের ভূমি

শক্তি প্রয়োগে দখলকৃত ভূমি: মুসলমানরা যখন কোন ভূমি গনিমত হিসাবে লাভ করে, যেমন যুদ্ধের মাধ্যমে শক্তি প্রয়োগে বিজিত ভূমি, যা থেকে তার অধিবাসীদেরকে তারা উচ্ছেদ করে দিয়েছে, তখন সেই ভূমির ব্যাপারে শাসক দু'ধরনের বন্দোবস্তের যে কোনো একটি গ্রহণের অধিকারী:

১. বিজয়ী মুসলিম যোদ্ধাদের মধ্যে তা বন্টন করে দেয়া। ইমাম মালেকের মতে ওয়াক্‌ফ করা বাধ্যতামূলক, বন্টন জায়েয নয়।

২. সর্বসাধারণ মুসলমানদের জন্য তা ওয়াক্‌ফ করে দেয়া। যদি সাধারণ মুসলমানদের জন্য তা ওয়াক্‌ফ করে দেয়, তবে ঐ ভূমির উপর চিরস্থায়ীভাবে ভূমিকর ভূমিতে সেচের পানির ব্যবস্থা থাকলে ভূমিকর আরোপ করা হবে, চাই চাষ হোক বা না হোক, আরোপ করবে, যা ঐ ভূমি যার দখলে থাকবে তার কাছ থেকে আদায় করা হবে, চাই সে মুসলমান হোক বা যিম্মী হোক।

এই ভূমিকর প্রতি বছর একবার আদায় করা হবে এবং তা ভূমির ভাড়া বলে গণ্য হবে। মূলত ভূমিকর আমীরুল মুমিনীন উমর রা. কর্তৃক তার বিজিত ভূমিতে আরোপিত হয়েছিল, তন্মধ্যে সিরিয়া, মিসর ও ইরাকের নাম উল্লেখযোগ্য।

কোনো এলাকা থেকে অধিবাসীরা ভয়ে কিংবা আপোসে বাস্তু ত্যাগ করলে: বিজীত ভূমি যেমন যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করা অথবা সাধারণ মুসলমানদের নামে ওয়াক্‌ফ করা জরুরী, তেমনি যে ভূখন্ড থেকে তার অধিবাসীরা বিজয়ী মুসলমানদের ভয়ে ত্যাগ করে অথবা যে ভূখন্ডের অধিবাসীদের সাথে মুসলমানদের এই মর্মে সমঝোতা হয় যে, ভূমির মালিকানা মুসলমানদের হবে, তবে অধিবাসীরা ভূমিকরের বিনিময়ে থাকতে পারবে, সে ভূখন্ডও তেমনি বিজয়ী যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করা অথবা সাধারণ মুসলমানদের নামে ওয়াক্‌ফ করা বাধ্যতামূলক। তবে উল্লেখ্য যে, যে ভূখন্ড সম্পর্কে এরূপ সমোঝাতা হয়–ভূমি অধিবাসীদের মালিকানাভুক্তই থাকবে এবং মুসলমানরা শুধু তার বাবদে ভূমিকর পাবে, সে ভূখন্ডের অধিবাসীদের উপর আরোপিত এ ভূমিকর জিযিয়ার মতো। তারা ইসলাম গ্রহণ করলে এ ভূমিকর রহিত হয়ে যাবে। আর ভূমি কর যেহেতু ভাড়ার পর্যায়ভুক্ত, তাই তার হার নির্ধারণের ক্ষমতা শাসকের। তিনি যেমন ভালো মনে করেন তেমন হার নির্ধারণ করবেন। কেননা এই হার স্থান ও কাল ভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে। উমর রা. যেরূপ হার নির্ধারণ করে গেছেন, হুবহু তা অনুসরণ করা জরুরী নয়। তবে উমর রা. এবং অন্যান্য শাসকগণ যেখানে যে হার নির্ধারণ করে গেছেন, সেখানে সেটাই বহাল থাকবে। হার নির্ধারণের কারণ পাল্টে যাওয়া ছাড়া তা পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই। কেননা তারা যেটা নির্ধারণ করেছেন সেটা তাদের আদেশ।

ভূমিকরভুক্ত ভূমি আবাদ করতে অক্ষম হলে: যে ব্যক্তির মালিকানায় এমন ভূমি রয়েছে, যার কর দিতে হয়, সে যদি সে ভূমিকে কাজে লাগাতে অক্ষম হয়, তবে তাকে দুটি কাজের যে কোনো একটি করতে বাধ্য করা হবে:

১. হয় সে ঐ ভূমি কাউকে ভাড়া দেবে (যেমন বর্গাচাষে দেয়া)
২. অথবা তা থেকে নিজের হাত গুটিয়ে নেবে।

কেননা ভূমি প্রকৃত পক্ষে মুসলমানদের সম্পদ। এ সম্পদকে পতিত রেখে তাদেরকে তার উপকারিতা থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কারো নেই।

গনিমত স্বরূপ প্রাপ্ত ভূমির উত্তরাধিকার : এই ভূমির মালিকানা উত্তরাধিকার সূত্রে মালিকের উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তরিত হবে যেভাবে মালিকের নিকট উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিত হয়েছিল।

❖❖❖

আটাশতম অধ্যায়

ফায়

ফা'য় হচ্ছে সে সম্পদ, যা মুসলমানরা তাদের শত্রুদের নিকট থেকে বিনা যুদ্ধে হস্তগত করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ সূরা হাশরের ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ নং আয়াতে বলেন:

وَمَآ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ مَآ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ جَاءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

'আল্লাহ্ ইহুদিদের নিকট থেকে তাঁর রসূলকে যে ফা'য় দিয়েছেন, সে জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করোনি: আল্লাহ্ তো যার উপর ইচ্ছা, তাঁর রসূলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আল্লাহ্ এই জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রসূলকে যা কিছু দিয়েছেন, তা আল্লাহ্র, তাঁর রসূলের, রসূলের স্বজনদের এবং ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই সম্পদ আবর্তন না করে।

রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে বারণ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাক এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর। এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করে, তারাই তো সত্যাশ্রয়ী। মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এ নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে, তারা মুহাজিরদেরকে ভালোবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাংক্ষা পোষণ করেনা।

আর তারা তাদের নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাগ্রস্ত হলেও; যারা কার্পণ্য থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম। যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক তুমিতো দয়াময়, পরম দয়ালু।'

এখানে আল্লাহ্ মদিনায় হিজরতকারীগণকে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারীরূপে উল্লেখ করেছেন। আর মদিনাবাসী আনসারগণকে মুহাজিরদেরকে আশ্রয়দানকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর এদের পরে কেয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে তাদের কথাও উল্লেখ করেছেন।

ফা'ইয়ের বন্টন ও বিতরণ: ইমাম মালেকের উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম কুরতুবী বলেন: 'এটি শাসকের দৃষ্টিভঙ্গি ও ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল। তিনি কোনো হার নির্ধারণ ছাড়াই তা থেকে নিজে গ্রহণ করবেন এবং ইজতিহাদের ভিত্তিতে তা থেকে আত্মীয়স্বজনকে দেবেন। আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা মুসলমানদের কল্যাণমূলক খাতে ব্যয় করবেন। চার খলিফাও এ কথাই বলেছেন এবং এই মত অনুসারে কাজ করেছেন। আর রসূলুল্লাহ সা. এর নিম্নোক্ত উক্তি দ্বারাও এটাই সাব্যস্ত হয়: 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে ফায় দিয়েছেন, তা থেকে খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) ব্যতীত আমার আর কিছুই প্রাপ্য নেই। আর সেই এক পঞ্চমাংশও তোমাদের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে।'

বস্তুত রসূলুল্লাহ্ সা. এক পঞ্চমাংশ বা এক তৃতীয়াংশের আকারে ফায় বন্টন করেননি। আয়াতে শুধু তাদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে যাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন জরুরী। কেননা তারাই এর প্রাপকদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ইমাম যুজাজ ইমাম মালেকের উক্তির সপক্ষে প্রমাণ দিতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্ বলেছেন:

'লোকে কী ব্যয় করবে, সে সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে, তা পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরদের জন্য।' (সূরা বাকারা: আয়াত ২১৫)

তবে কোনো ব্যক্তি যদি এ কটি শ্রেণীর বাইরে অন্য কাউকে দেয়া সমীচীন মনে করে, তবে তা দেয়া সর্বসম্মতভাবে জায়েয। ইমাম নাসায়ি বর্ণনা করেন, আতা বলেছেন:'আল্লাহ্র এক পঞ্চমাংশ ও রসূলের এক পঞ্চমাংশ একই জিনিস, রসূলুল্লাহ্ সা. এটা থেকেই নিজে নিতেন, অন্যকে দিতেন, যেখানে ইচ্ছা ব্যয় করতেন এবং যথা ইচ্ছা সম্পন্ন করতেন এবং তা দিয়ে যা ইচ্ছা তা-ই করতেন।

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' গ্রন্থে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবি রহ. বলেন: 'ফায় বন্টনের ব্যাপারে বিভিন্ন হাদিস রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট ফায় আসলে, তা সে দিনের মধ্যেই বন্টন করতেন। বিবাহিতকে দুই ভাগ ও অবিবাহিতকে এক ভাগ দিতেন। আর আবু বকর রা. স্বাধীন ব্যক্তি ও দাস-দাসীর মধ্যে এমনভাবে বন্টন করতেন যেন তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয়।'

আর উমর রা. প্রশাসনকে অশ্বারোহীর দল ও অন্যান্য প্রয়োজনের উপর অগ্রাধিকার দিতেন, ব্যক্তিকে তার প্রবীণতা অনুসারে, বিপদ মুসিবত অনুসারে, পরিজন অনুসারে ও প্রয়োজন অনুসারে অগ্রাধিকার দিতেন। এ সব মতভেদপূর্ণ বিষয়ে মূল কথা এই যে, তিনি ইজতিহাদের ভিত্তিতেই যা করণীয় মনে করতেন তাই করতেন। তাঁর আমলে যেটা সঠিক কল্যাণকর বিবেচিত হতো সেটাকেই অগ্রাধিকার দিতেন।

উনত্রিশতম অধ্যায়

নিরাপত্তা চুক্তি

শত্রুপক্ষের যুদ্ধরতদের মধ্যে কেউ নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে তার সে প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে। এ দ্বারা সে নিশ্চিত নিরাপত্তার অধিকারী হবে এবং কোনো ভাবেই তার উপর আক্রমণ চালানো জায়িয হবেনা। মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ○

'মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়, অত:পর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। কারণ তারা অজ্ঞ লোক।' (সূরা তাওবা: ৬)

নিরাপত্তা দানের ক্ষমতা কার কার আছে : নারী অথবা পুরুষ, স্বাধীন কিংবা দাস, যে শ্রেণীর মুসলিম নাগরিকই হোক, আইনত শত্রুপক্ষের যে কোনো নিরাপত্তা প্রার্থীকে নিরাপত্তা দানের অধিকারী। একমাত্র অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও অসুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি ব্যতীত কোনো মুসলমানকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক অথবা অসুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি কোনো শত্রুকে নিরাপত্তা দান করলে এই দু'জনের কারো নিরাপত্তা দানই বৈধ হবেনা। ইমাম আহমদ, আবুদাউদ, নাসায়ি ও হাকেম আলি রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'নিরাপত্তা দানের অধিকার সকল মুসলমানের সমান, নগণ্যতম একজন মুসলমান নাগরিকও এ অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। তারা অন্য সবার উপর ক্ষমতাবান। আর ইমাম বুখারি, আবুদাউদ ও তিরমিযির বর্ণনা মতে উম্মে হানি বিনতে আবি তালিব রা. বলেন: 'আমি বললাম: হে রসূলুল্লাহ্, আমি হুবায়রার অমুক সন্তানকে আশ্রয় দিয়েছি। অথচ উম্মে আলির ছেলে বলেছে, সে তাকে হত্যা করবে। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, হে উম্মে হানি, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমরাও তাকে আশ্রয় দিয়েছি।' (অর্থাৎ সে রাষ্ট্রের আশ্রয়ে আছে। সুতরাং তাকে কেউ হত্যা করতে পারবেনা।)

নিরাপত্তা দানের ফল: সুস্পষ্ট উক্তি কিংবা বোধগম্য ইঙ্গিতের মাধ্যমে কাউকে নিরাপত্তা দেয়া হয়ে থাকলে সে নিরাপত্তা প্রদত্ত ব্যক্তির উপর কোনো আক্রমণ বৈধ হবেনা। কেননা তাকে নিরাপত্তা দানের মাধ্যমে সে নিজের প্রাণকে হত্যা থেকে ও নিজের স্বাধীনতাকে গোলামিতে রূপান্তরিত হওয়া থেকে নিরাপদ করে নিয়েছে।

বর্ণিত আছে; উমর ইবনুল খাত্তাব রা. জানতে পারলেন যে, জনৈক মুজাহিদ একজন পারসিক যোদ্ধাকে বলেছেন যে, তোমার কোনো ভয় নেই। পরক্ষণেই তাকে হত্যা করেছে। তাই তিনি মুসলিম বাহিনীর সেনাপতিকে লিখলেন: 'আমি জানতে পেরেছি, তোমাদের কেউ কেউ (শত্রুপক্ষের) বড় বড় যোদ্ধাদেরকে খুঁজে বেড়ায়। যখন এ ধরনের কেউ কোন পাহাড়ের ভেতরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তাকে আঘাত করা দু:সাধ্য হয়, তখন তাকে বলে: 'তোমার কোনো ভয় নেই।' তারপর যেই তাকে নাগালে পায় অমনি হত্যা করে। আল্লাহ্র কসম, কেউ এরূপ কাজ করেছে জানতে পারলে আমি তাকে হত্যা করবো।'

ইমাম বুখারি তাঁর 'ইতিহাস' গ্রন্থে এবং ইমাম নাসায়ি বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে আশ্বাস দিল যে, তার রক্তপাত করা হবেনা, অত:পর তাকে হত্যা করলো, আমি সেই হত্যাকারীর দায়মুক্ত। যদিও নিহত ব্যক্তি কাফের হয়ে থাকে।' ইমাম বুখারি, মুসলিম ও আহমদ আনাস রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: 'প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের স্বতন্ত্র পতাকা থাকবে, যা দ্বারা তাকে কেয়ামতের দিন চেনা যাবে।'

নিরাপত্তা বা আশ্রয় দানের অধিকার কখন কার্যকর হয়: নিরাপত্তা বা আশ্রয় দানের অধিকার দেয়া মাত্রই আইনী স্বীকৃতি লাভ করে এবং যে মুহূর্তে এটা উচ্চারিত ও ঘোষিত হয় সেই মুহূর্ত থেকেই তা কার্যকর বিবেচিত হয়। তবে শাসক বা সেনাপতির পক্ষ থেকে স্বীকৃতি দেয়া ব্যতীত তা চূড়ান্তভাবে স্বীকৃতি পায় না। নিরাপত্তা দান যখন স্বীকৃতি লাভ করে এবং শাসক বা সেনাপতির পক্ষ থেকেও স্বীকৃতি পায়, তখন নিরাপত্তা প্রদত্ত ব্যক্তি যিম্মীতে পরিণত হয় এবং মুসলমানদের অধিকার ও কর্তব্য তারও অধিকার ও কর্তব্যে পরিণত হয়। এই নিরাপত্তা কেবল তখনই বাতিল করা বৈধ, যখন প্রমাণিত হয় যে, এই অধিকার মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে ব্যবহৃত হবে, যেমন সে তার স্বজাতি বা স্বগোত্রের গোয়েন্দা এবং মুসলমানদের উপর গোয়ন্দাগিরি চালায়।

দলগতভাবে নিরাপত্তা দান: মুসলিম নাগরিকদের মধ্য থেকে ব্যক্তিগতভাবে কোনো নাগরিক একজন বা দু'জনকে নিরাপত্তা দান করলে সে নিরাপত্তাই বৈধ। কিন্তু দলগতভাবে সামষ্টিক নিরাপত্তা প্রদান একমাত্র শাসকের পক্ষ থেকে দেয়া বৈধ। শাসক ইজতিহাদের মাধ্যমে অথবা মঙ্গল অমঙ্গল বিবেচনাপূর্বক নিরাপত্তা দান করবেন, যেমন কোনো অমুসলিম গোষ্ঠীকে যিম্মী হিসাবে গ্রহণ। এ ধরনের সামষ্টিক নিরাপত্তা প্রদানের অধিকার যদি ব্যক্তিগত পর্যায়ে সকল মুসলিম নাগরিককে দেয়া হয়, তবে তা জিহাদ বাতিল করণের মাধ্যম হয়ে দাঁড়াবে।

দূত নিরাপত্তা প্রাপ্ত ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত: দূতও নিরাপত্তা প্রাপ্ত ব্যক্তির মতো, চাই সে পত্রবাহক হয়ে আসুক, অথবা যুদ্ধরত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আসা-যাওয়া করুক, কিংবা হতাহতদের সরিয়ে নেয়ার সুবিধার্থে সাময়িক যুদ্ধবিরতির চেষ্টা করুক। (মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার) মুসাইলামার প্রেরিত দূত-দ্বয়কে রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছিলেন: 'দূতদেরকে হত্যা করা হয়না বলেই তোমাদের দু'জনকে হত্যা করলামনা, নচেৎ হত্যা করতাম।' ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু দাউদ, নঈম ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত। তখন রসূলুল্লাহ সা. মুসাইলামার চিঠি পড়ছিলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাদের উভয়ের মত কি? তারা বললো: মুসাইলামার মতই আমাদের মত। অর্থাৎ তারা উভয়ে মুসাইলামাকে নবি বলে বিশ্বাস করে।

একবার কুরাইশ আবু রাফে'কে রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট প্রতিনিধি করে পাঠায়। এখানে এসে তার মন ঈমান আনার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। সে বললো: হে রসূলুল্লাহ্, আমি কুরাইশের কাছে ফিরে যেতে চাইনা, আপনাদের কাছেই মুসলমান হিসাবে থেকে যেতে চাই। রসূলুল্লাহ সা. বললেন: আমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিনা এবং বার্তবাহককে আটকে রাখিনা। তুমি নিরাপদে ফিরে যাও এরপর যদি তোমার মনের বর্তমান অবস্থা বহাল থাকে তবে আমাদের কাছে ফিরে এসো (আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ি ও ইবনে হাব্বান)

ইমাম আবু ইউসুফের 'কিতাবুল খারাজে' ও ইমাম মুহাম্মাদের 'সিয়ারুল কবীরে' বলা হয়েছে: দূতের ব্যাপারে কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে, সেগুলো পূরণ করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব। কাফেররা যদি তাদের নিকট আটক মুসলিম বন্দীদেরকে হত্যাও করে তবুও তাদের দূতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা বৈধ নয়। আমরা কখনোই তাদের দূতকে হত্যা করবোনা। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'বিশ্বাসঘাতকতার বিনিময়ে প্রতিশ্রুতি পালন বিশ্বাস ঘাতকতার জবাবে বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে উত্তম।'

মুস্তামিন (নিরাপত্তামূলক আশ্রয়প্রার্থী)

সংজ্ঞা: মুস্তা'মিন হচ্ছে সেই যুদ্ধরত অমুসলিম, যে মুসলিম শাসিত অঞ্চলে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নিয়ে প্রবেশ করে, সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করা কিংবা অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অবস্থান করার ইচ্ছায় নয়, বরং একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত থাকার ইচ্ছা পোষণ করে, যা এক বছরের বেশি নয়। এক বছর অতিক্রম

করে গেলে এবং স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে সে যিম্মীতে পরিণত হবে এবং মুসলিম রাষ্ট্রের আনুগত্য ও বশ্যতায় যিম্মীর উপর যে সকল বিধি কার্যকর হয়ে থাকে তার উপরও সেগুলো কার্যকর হবে। মুস্তামিনের নিরাপদ অবস্থানে ও বসবাসে তার স্ত্রী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সন্তানরা এবং সকল কন্যা সন্তান, মা, দাদি, নানি এবং গৃহ পরিচারক ও পরিচারিকাগণ তার সাথে ততোদিন ইচ্ছা অবস্থান করতে পারবে। যখন কোনো যুদ্ধরত অমুসলিম কোনো বার্তাবাহক হয়ে বা আল্লাহ্‌র বাণী শ্রবণের উদ্দেশ্যে আসে, তখন কোনো চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি ছাড়াই সে নিরাপত্তা লাভ করবে। কিন্তু যখন ব্যবসার জন্য আসে এবং ক্ষমতা প্রাপ্ত কোনো নাগরিকের নিকট থেকে নিরাপত্তামূলক আশ্রয় লাভ করে, তখন সে মুস্তামিন গণ্য হবে। সূরা তাওবার ৬নং আয়াতে এতদসংক্রান্ত মূলনীতিটি বিধৃত হয়েছে:

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ○

'মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দেবে যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়। অত:পর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দেবে কারণ তারা অজ্ঞ লোক।'

মুস্তামিনের অধিকার: যুদ্ধরত অমুসলিম যখন মুসলিম শাসিত অঞ্চলে নিরাপত্তামূলক আশ্রয় নিয়ে প্রবেশ করে তখন সে তার জান, মাল, অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের অধিকার ততক্ষণ ভোগ করবে যতক্ষণ সে তার নিরাপত্তা চুক্তি মেনে চলবে এবং তা লংঘন করবে না। সে শত্রু দেশের নাগরিক কিংবা তাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে কেবল এইটুকু কারণে তার স্বাধীনতাকে খর্ব করা বা তাকে গ্রেফতার করা আদৌ বৈধ নয়। চাই সে গ্রেফতার দ্বারা কেবল সাময়িক আটক করার উদ্দেশ্য থাকুক বা যুদ্ধবন্দি হিসাবে স্থায়ীভাবে আটক করার উদ্দেশ্য থাকুক।

ইমাম সারাখ্‌সি বলেন: 'নিরাপদ আশ্রয় লাভের কারণে মুস্তামিনদের সম্পদ নিরাপত্তা লাভ করবে। তাই তা রাষ্ট্র কর্তৃক গ্রহণ করা বৈধ থাকবে না।' এমনকি সে যখন দারুল হারবে (বৈরী অমুসলিম দেশে) ফিরে যাবে। তখন তার প্রাণের নিরাপত্তা বাতিল হবে বটে, তবে তার সম্পদের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন থাকবে।'

'আল-মুগনী' গ্রন্থে বলা হয়েছে: 'একজন হারবী (মুস্তামিনের বিপরীত অর্থাৎ যুদ্ধরত অমুসলিম) যখন মুস্তামিন হয়ে অর্থাৎ নিরাপত্তামূলক আশ্রয়প্রাপ্ত হয়ে দারুল ইসলামে (মুসলিম শাসিত দেশে) প্রবেশ করে, অত:পর সেখানকার কোনো মুসলমান বা যিম্মীর নিকট তার সম্পদ গচ্ছিত রাখে অথবা ঋণ হিসাবে প্রদান করে, তারপর পুনরায় দারুল হারবে ফিরে যায়, তখন আমাদের দেখতে হবে সে কী পরিচয় নিয়ে বা কী উদ্দেশ্যে দারুল হারবে ফিরে গেছে। যদি দেখা যায়, সে ব্যবসায়ী বার্তাবাহক কিংবা স্বাস্থ্য পরিচর্যা মূলক বা বিনোদনমূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে গেছে, বা কোনো বিশেষ প্রয়োজনে গেছে অত:পর সে পুনরায় দারুল ইসলামে প্রত্যাবর্তন করে, তবে সে তার জান ও মালের পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে। কেননা এই ভ্রমণ দ্বারা দারুল ইসলামে অবস্থানের উদ্দেশ্য বাতিল হয়নি। তাই এ দ্বারা সে যিম্মীর সমমর্যাদার অধিকারী হয়েছে। পক্ষান্তরে সে যদি দারুল হারবে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে গিয়ে থাকে, তবে তার জানের নিরাপত্তা বাতিল হবে; কিন্তু মালের নিরাপত্তা বহাল থাকবে। কেননা সে দারুল ইসলামে নিরাপত্তা পেয়ে প্রবেশ করায় তার মালের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রয়েছে। দারুল হারবে প্রবেশের মাধ্যমে তার জানের নিরাপত্তা যখন বাতিল হয়েছে, তখন তার মালের নিরাপত্তা বাকি রয়েছে। কেননা বাতিল হওয়ার বিষয়টা জানের সাথে নির্দিষ্ট থাকায় তা জানের মধ্যেই সীমিত রয়েছে।'

মুস্তামিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য: দেশের শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করা ও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা থেকে বিরত থাকা তার কর্তব্য। সুতরাং গোয়েন্দাগিরি করা তার জন্য বৈধ নয়। সে যদি শত্রুদের পক্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করে, তবে তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যাবে।

মুস্তামিনের উপর ইসলামি আইন কার্যকর হবে: অর্থিক লেনদেনের বিষয়ে মুস্তামিনের উপর ইসলামি আইন কার্যকর হবে। তাই ক্রয় বিক্রয় ও অন্যান্য লেনদেন সংক্রান্ত চুক্তি ইসলামি বিধি-ব্যবস্থা অনুযায়ী সম্পাদিত হবে। ইসলামে নিষিদ্ধ থাকায় তাকে সুদী কারবার করতে দেয়া হবে না। অনুরূপ অপরাধের ক্ষেত্রে যখন সে কোনো মুসলমান যিম্মী বা তারই মতো অপর মুস্তামিনের অধিকার ক্ষুণ্ন করবে, তখন তাকে ইসলামি শরীয়া মোতাবেক শাস্তি দেয়া হবে। কেননা যালেমের নিকট থেকে মযলুমের ন্যায়বিচার আদায় করা রাষ্ট্রের এমন এক দায়িত্ব, যাতে কোনোই নমনীয়তা প্রদর্শন বৈধ নয়। আর যখন আল্লাহ্‌র কোনো হক নষ্ট করা হয়, যেমন ব্যভিচারের অপবাদ করা, তখন তাকে একজন মুসলমানের মতোই শাস্তি দেয়া হবে। কেননা এটা সেই সব অপরাধের অন্তর্ভুক্ত, যা ইসলামি সমাজকে বিকারগ্রস্ত করে দেয়। (এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন: যে সমস্ত অপরাধে নিরংকুশভাবে অথবা প্রধানত: আল্লাহর হক ক্ষুণ্ন হয়। সেগুলিতে মুস্তামিনের উপর ইসলামি শাস্তি চালু করা হবে না। তবে এই মতটি ফকিহ্‌গণের নিকট প্রাধান্য পায় নি।)

মুস্তামিনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা: মুস্তামিন যদি কখনো মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, অত:পর বন্দি হয় ও দাসে পরিণত হয়, তবে সে অবস্থায় তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। কেননা তখন তার সম্পত্তির উপর থেকে তার মালিকানা বিলুপ্ত হয়। তার উত্তরাধিকারীরাও তার সম্পত্তি পাবে না। এমনকি তারা দারুল ইসলামে কোনো বিশেষ মর্যাদাধারী হলেও নয়। কেননা তারা তার সম্পত্তির অধিকারী হতে পারবে তার মৃত্যুর পরে। অথচ এখনো সে জীবিত। এমতাবস্থায় তার সমস্ত সম্পত্তি গনিমত স্বরূপ বাইতুল মালে জমা হবে। আর কোনো মুসলমান বা জিম্মীর নিকট তার কোনো ঋণ প্রাপ্য থাকলে খাতকের উপর থেকে সে ঋণ রহিত হবে। কেননা তার কোনো আইন সঙ্গত দাবিদার নেই।

মুস্তামিনের উত্তরাধিকার: মুস্তামিন দারুল ইসলামে বা দারুল হারবে যেখানেই মারা যাক তার সম্পত্তির উপর তার মালিকানা বা স্বত্বাধিকার লুপ্ত হবে না এবং ইমাম শাফেয়ি ব্যতীত অন্যান্য ফকিহ্‌দের মতে তার উত্তরাধিকারীরা তার স্বত্বাধিকারী হবে। তার সম্পত্তিকে তার উত্তরাধিকারীদের মালিকানায় হস্তান্তর করা বা প্রেরণ করা ইসলামি রাষ্ট্রের কর্তব্য। যদি তার কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে তবে সেই সম্পত্তি মুসলমানদের এজমালী সম্পত্তিতে (ফাই) পরিণত হবে। (কাফেরদের কাছ থেকে বিনা যুদ্ধে অর্জিত সম্পত্তিকে ফাই বলা হয়।)

ত্রিশতম অধ্যায়

প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি

প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করা: প্রতিশ্রুতি ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা শান্তি রক্ষায় এর খুবই ভালো প্রভাব ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে বিরোধ নিস্পত্তিতে ও সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখায়ও এর রয়েছে বিরাট গুরুত্ব। আরব প্রবাদে বলা হয়েছে: 'যে ব্যক্তি মানুষের সাথে লেনদেনে যুলুম করে না, কথাবার্তায় মিথ্যার আশ্রয় নেয় না ও ওয়াদা করলে তার বরখেলাফ করে না, সে নিজের মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সাধন করে, নিজের ন্যায়নিষ্ঠতা প্রমাণ করে এবং তার সাথে সকলের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়ে যায়।' এ প্রবাদটি সম্পূর্ণ সত্য ও সঠিক । কেননা মানুষের সাথে সততাপূর্ণ আচরণ ও লেনদেন করা তাদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা এবং সত্য বলা যথার্থ মানবতা ও পরিপক্ক মনুষত্বের প্রমাণ, ন্যায়নিষ্ঠতার নিদর্শন এবং বন্ধুত্ব ও সৌভ্রাতৃত্বের নিশ্চয়তা দানকারী। আল্লাহ্ তায়ালা সকল ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পালনের আদেশ দিয়েছেন। চাই তা আল্লাহ্র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি হোক অথবা মানুষের সাথে। আল্লাহ্ সূরা মায়িদার ১নং আয়াতে বলেন: يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ 'হে মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো।' আর এ আদেশ পালন থেকে বিরত থাকা কবীরা গুনাহ এবং তা আল্লাহ্র ক্রোধ ও অসন্তোষ অনিবার্য করে তোলে। সূরা সাফ্ফের ২ ও ৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ○ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالَا تَفْعَلُوْنَ○

'হে মুমিনগণ! তোমরা যা করো না তা কেন বলো? তোমরা যা করো না তোমাদের তা বলা আল্লাহ্র নিকট অতিশয় অসন্তোষ জনক।'

মানুষ যে কোনো অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি দিক, তাকে সে জন্য দায়ী থাকতে হবে ও জবাবদিহি করতে হবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন: وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا○ 'প্রতিশ্রুতি পালন করো। প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। (বনী ইসরাইল: আয়াত ৩৪) প্রতিশ্রুতিজনিত অধিকার ধর্মীয় অধিকারের উপরও অগ্রগণ্য। আল্লাহ্ বলেন:

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ط

'আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমার নেই। আর দীন সম্পর্কে যদি তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে নয়।' (আনফাল: ৭২)

বস্তুত: প্রতিশ্রুতি পালন ঈমানের অঙ্গ বিশেষ। রসূল সা. বলেন: 'প্রতিশ্রুতি পালন ঈমানের অঙ্গীভূত।' প্রতিশ্রুতি পালন এমন পুণ্যের কাজ যার প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ○ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ○ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ○

'যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের নামাযে যত্নবান থাকে তারাই হবে অধিকারী। অধিকারী হবে ফিরদাউসের, যাতে তারা স্থায়ী হবে।' (সূরা মুমিনুন ; আয়াত ৮-১১)

প্রতিশ্রুতি পালন নবিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিলো। যেমন আল্লাহ্ বলেন:

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ز اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا○

'স্মরণ করো, এই কিতাবে উল্লিখিত ইসমাঈলের কথা । সে ছিলো প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিলো রসূল -নবি। ' (সূরা মারইয়াম: আয়াত ৫৪)

এই মহৎ নৈতিক গুণে রসূলুল্লাহ্ সা. ছিলেন সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবুল হামসা বলেন: 'রসূলুল্লাহ্ সা. নবুয়ত লাভের পূর্বে আমি তাঁর সাথে একটি জিনিস কেনাবেচা করেছিলাম এবং সে ব্যাপারে মূল্যের কিছু বাকি অংশ তাঁর প্রাপ্য ছিলো। আমি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আপনি এই স্থানে থাকতে থাকতেই আমি আপনার নিকট ফিরে আসছি। পরে রসূলুল্লাহ্ সা. আমাকে বললেন: হে যুবক! তুমি আমাকে চরম কষ্ট দিয়েছ। আমি এই জায়গায় তিন দিন ধরে তোমার অপেক্ষায় রয়েছি।'

হিজরতের পরে রসূলুল্লাহ সা. ইহুদিদের সাথে একটা চুক্তি সম্পাদন করেন। সে চুক্তিতে তিনি তাদেরকে তাদের ধর্মের উপর বহাল রাখেন এবং তাদের সম্পদের নিরাপত্তা দেন কেবল এই শর্তে যে তারা তার বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সাহায্য করবে না। কিন্তু তারা সেই চুক্তি ভঙ্গ করে। অত:পর এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আর ভঙ্গ করবে না বলে অঙ্গীকার করে। অত:পর পুনরায় তা ভঙ্গ করে। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ সূরা আনফালের ৫৫ ও ৫৬ নং আয়াত নাযিল করেন। আয়াত দুটিতে আল্লাহ্ বলেন:

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ○ اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِىْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ○

'আল্লাহ্র নিকট নিকৃষ্টতর জীব তারাই, যারা কুফ্রী করে এবং ঈমান আনে না। তাদের মধ্যে যাদের সাথে তুমি চুক্তিতে আবদ্ধ, তারা প্রত্যেকবার চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তারা সাবধান হয় না।'

সালাবা আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার করে যে, আল্লাহ্ তার জীবিকায় প্রশস্ততা দান করলে ও সচ্ছল করলে সকল হকদারকে হক দান করবে। পরে যখন আল্লাহ্ সচ্ছলতা দান করেন এবং সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য দান করলেন, তখন সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করলো এবং আল্লাহ্র বান্দাদের হক প্রদানে কার্পণ্য দেখাতে লাগলো। তখন তার সম্পর্কে আল্লাহ্ সূরা তাওবার ৭৫,৭৬ ও ৭৭ নং আয়াত নাযিল করলেন:

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ○ فَلَمَّا اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ○ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ○

'তাদের মধ্যে কতক আল্লাহ্র নিকট অঙ্গীকার করেছিল আল্লাহ্র নিজ কৃপায় আমাদেরকে দান করলে আমরা নিশ্চয়ই সাদাকা দিবো এবং সৎ হবো। অত:পর যখন তিনি নিজ কৃপায় তাদেরকে দান করলেন তখন তারা এ বিষয়ে কার্পণ্য করলো এবং বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরালো। পরিণামে তাদের অন্তরে কপটতা স্থিত করলেন আল্লাহ্র সাথে তাদের সাক্ষাৎ দিবস পর্যন্ত। কারণ তারা আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল এবং তারা ছিলো মিথ্যাবাদী।'

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. -এর মৃত্যু আসন্ন হলে তিনি বললেন: 'কুরাইশের এক ব্যক্তি আমার মেয়েকে বিয়ে করার জন্য পয়গাম পাঠিয়েছিল এবং আমার পক্ষ থেকে তাকে প্রায় প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ্র কসম, আমি এক তৃতীয়াংশ মুনাফেকী নিয়ে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবো না। তোমাদের সকলকে সাক্ষী রেখে আমি বলছি, আমি তার সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দিলাম।' তিনি তার কথা 'এক তৃতীয়াংশ মুনাফেকী ......' দ্বারা রসূলের এই হাদিসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন: তিনটি জিনিস যার ভেতরে থাকবে সে যতোই নামায রোযা করুক ও নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করুক, সে মুনাফিক: কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তার খেলাফ করে ও আমানত রাখলে তার খেয়ানত করে।'

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীদের নিন্দা করে আল্লাহ্ সূরা নাহ্লের ৯১ ও ৯২ নং আয়াতে বলেন:

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ۭ تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ۭ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ۭ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

‘তোমরা আল্লাহ্‌র (সঙ্গে কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ করো যখন পরস্পরে অঙ্গীকার করো এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে তোমাদের যামিন করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না। তোমরা যা করো আল্লাহ্ তা জানেন। তোমরা সে নারীর মতো হয়ো না, যে তার সূতা মজবুত করে পাকানোর পর তার পাক খুলে নষ্ট করে দেয়। তোমরা তোমাদের শপথ পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য ব্যবহার করে থাকো, যাতে এক দল অন্যদল অপেক্ষা অধিক লাভবান হও। আল্লাহ্ এদ্বারা কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। তোমাদের যে বিষয়ে মতভেদ আছে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তা নিশ্চয়ই সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করে দেবেন।’

প্রতিশ্রুতির শর্তাবলী: যে সকল প্রতিশ্রুতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও পালন করা ওয়াজিব, তার জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো প্রজোয্য:

১. যেন শরিয়তের কোনো সর্বসম্মত বিধির বিরোধী না হয়। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: ‘আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই এমন যে কোনো শর্ত বাতিল, চাই একশটা শর্ত হোক না কেন্।’

২. প্রতিশ্রুতি যেন উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে হয়। কেননা জোর জবরদস্তিতে স্বাধীন ইচ্ছা প্রত্যাখ্যাত হয়। যে চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির মূলে স্বাধীনতা থাকে না তার প্রতি কারো সম্মান বা শ্রদ্ধা থাকে না।

৩. প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, সন্দেহ ও সংশয় মুক্ত হওয়া চাই। যাতে চুক্তি বাস্তবায়নের সময় তার ব্যাখ্যা নিয়ে কোনো দ্বিমত বা বিরোধের অবকাশ না থাকে।

প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি ভঙ্গ করা: নিম্নোক্ত অবস্থাসমূহের কোনো একটি ব্যতীত অন্য কোনো অবস্থায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা বৈধ নয় ।

১. যখন তা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য থাকে এবং সেই সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। অথবা নির্দিষ্ট পরিস্থিতির মধ্যে সীমিত থাকে এবং সেই পরিস্থিতি পাল্টে যায়।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযি বর্ণনা করেন, আমর ইবনে আবাসা বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সা. কে বলতে শুনেছি ‘যার মধ্যে ও অন্য কোনো দলের মধ্যে কোনো চুক্তি থাকে, সে যেন ততোক্ষণ পর্যন্ত তা লংঘন বা ভঙ্গ না করে, যতোক্ষণ তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে না যায় এবং প্রতিপক্ষের পক্ষ থেকেও তা লঙ্ঘিত না হয়।’

পবিত্র কুরআনে সূরা তাওবার ৪নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন:

اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

‘তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোনো ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদকাল চুক্তি পালন করবে। আল্লাহ্ মুত্তাকীদের পছন্দ করেন।’

২. শত্রুপক্ষ যখন চুক্তি ভঙ্গ করে আল্লাহ্ বলেন:

فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ○

'যাবৎ তারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে তোমরাও তাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে। আল্লাহ্ মুত্তাকীদের পছন্দ করেন।' (সুরা তাওবা: আয়াত ৭)

وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ لا اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ○ اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ط اَتَخْشَوْنَهُمْ ج فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ○

'তাদের চুক্তির পর তারা যদি তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীন সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে, তবে কাফেরদের প্রধানদের সাথে যুদ্ধ করো। তারা এমন লোক, যাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই নয়। সম্ভবত: তারা নিরস্ত হতে পারে। তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং রসূলের বহিষ্করণের জন্য সংকল্প করেছে? তারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় করো? মুমিন হলে আল্লাহ্কে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে সমীচীন। (সুরা তাওবা: আয়াত ১২-১৩)

৩. যখন বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতিশ্রুতি ভংগের সুস্পষ্ট আলামত পরিদৃষ্ট হয়।

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ○

'তুমি যদি কোনো সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা পোষণ করো তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথ বাতিল করবে। আল্লাহ্ বিশ্বাস ভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন না।' (সূরা আনফাল: আয়াত ৫৮)

বিশ্বাসঘাতকতা এড়াতে চুক্তি বাতিলের নোটিশ প্রদান জরুরি: মুসলমানদের সাথে কোনো সম্প্রদায়ের সম্পাদিত চুক্তি ঐ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে লংঘন করা হয়েছে বা হবে-এ কথা মুসলিম শাসক জানতে পারলে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া জায়েয নয়। যতোক্ষণ না তাদেরকে চুক্তি বাতিল করার নোটিশ প্রদান করা হয় এবং এ সংবাদ দূরের ও কাছের লোকেরা জানতে পারে, যাতে তারা অতর্কিত আক্রমণের শিকার না হয়। আল্লাহ্ সূরা আনফালের ৫৮ নং আয়াতে বলেন:

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ○

'তুমি যদি কোনো সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভঙ্গের আংশকা পোষণ করো তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথ বাতিল করবে। আল্লাহ্ বিশ্বাস ভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন না।'

বস্তুত: ইসলামের মূলনীতি হলো 'বিশ্বাসঘাতকতার বিনিময়ে বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়া বিশ্বাসঘাতকতার বিনিময়ে বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে উত্তম।'

'আস্ সিয়ারুল কবীর' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান শায়বানি বলেন: 'মুসলমানদের আমীর যদি শত্রুপক্ষের রাজার নিকট বার্তাবাহক পাঠিয়ে জানিয়ে দেয় যে , চুক্তি বাতিলের কারণ সংঘটিত হয়েছে বিধায় চুক্তি বাতিল করা হয়েছে, তাহলেও তৎক্ষণাৎ তাদের উপর ও তাদের রাজ্যের আশে পাশে আক্রমণ চালানো মুসলমানদের জন্য সমীচীন নয়। তাদের রাজা যাতে রাজ্যের সর্বত্র চুক্তি বাতিলের খবর পৌঁছানোর জন্য পর্যন্ত সময় পায়, এবং আমরা তাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে না বসি, সে জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। এতদসত্ত্বেও মুসলমানরা যখন নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে, শত্রুদেশটির জনগণ তাদের রাজার কাজ থেকে কোনো সংবাদ পায়নি, তখন তাদেরকে চুক্তি বাতিলের খবর না জানানো পর্যন্ত তাদের উপর আক্রমণ না চালানো মুসলমানদের জন্য মুস্তাহাব। কেননা এটা প্রচ্ছন্ন প্রতারণা। স্পষ্ট প্রতারণা ও প্রচ্ছন্ন প্রতারণা উভয়টি থেকেই মুসলমানদের বিরত থাকা কর্তব্য।

ইমাম মুহাম্মদ র. বর্ণনা করেন: আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের শাসনকালে সাইপ্রাসবাসী একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটায়। ফলে তিনি তাদের সাথে কৃত সন্ধিচুক্তি বাতিল করতে মনস্থ করেন। এ ব্যাপারে তৎকালীন ফকীহ্ লাইস বিন সাদ ও মালেক ইবনে আনাসের নিকট পরামর্শ চাইলে লাইস ইবনে সাদ লিখলেন: 'সাইপ্রাসবাসী সব সময়ই মুসলমানদের সাথে প্রতারণা ও শত্রুদের (রোমবাসী) সাথে দহরম মহরম পাতানোর অভিযোগে অভিযুক্ত। ও দিকে আল্লাহ্ তো বলেছেন: 'যদি তুমি কোনো সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা পোষণ করো, তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথ বাতিল করবে।' আমি মনে করি, আপনি তাদের চুক্তি বাতিল করে দিয়ে তাদেরকে একবার অবকাশ দিন' (অর্থাৎ আক্রমণ করতে একবার অপেক্ষা করুন) আর মালেক ইবনে আনাস তার ফতোয়ায় লিখলেন: 'সাইপ্রাসবাসীর নিরাপত্তা ও প্রতিশ্রুতি অনেক প্রাচীন ও তাদের শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় চলে আসছে। কোনো শাসক তাদের সন্ধি বাতিল করেছে এবং তাদেরকে তাদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করেছে বলে আমার জানা নেই। আমি মনে করি, তাদের বিরুদ্ধ অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করা পর্যন্ত তাদের চুক্তি বাতিল ত্বরান্বিত করুন। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন: 'তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে।' (সূরা তাওবা: ৪)

এরপরও যদি তারা সঠিক পথে না চলে এবং তাদের প্রতারণা পরিহার না করে এবং আপনি দেখতে পান যে, বিশ্বাসঘাতকতা তাদের মধ্যে স্থায়ী হয়ে গেছে, তাহলে চুক্তি বাতিল করার পর তাদের উপর আক্রমণ চালাবেন, তবে জয়যুক্ত হতে পারবেন।'

রসূল সা.-এর কয়েকটি চুক্তি: ১. আরব গোত্রসমূহের মধ্য থেকে বনু যামরা গোত্রের সাথে রসূলুল্লাহ সা. চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তির ভাষ্য নিম্নরূপ:

'এটা বনু যাম্‌রার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ সা. -এর চুক্তিপত্র। চুক্তি সম্পাদিত হলো যে, বনু যাম্‌রা তাদের জান ও মাল নিয়ে নিরাপদে থাকবে, যারা তাদের উপর আক্রমণ চালাবে তাদের মোকাবিলায় তারা সাহায্য পাওয়ার হকদার হবে। যতোক্ষণ না বনু যাম্‌রা আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপারে যুদ্ধরত না হয়, এবং রসূলুল্লাহ্ সা. যখন তাদেরকে সাহায্যের জন্য আহবান জানাবে তখন তারা তাঁর প্রতি সাড়া দেবে। এর বিনিময়ে তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নিরাপত্তা লাভ করবে এবং তাদের মধ্যে যারা সৎ ও খোদাভীরু তারা সাহায্য লাভের হকদার।'

২. অনুরূপ মদিনায় সর্বপ্রথম বসবাস শুরু করার সময় তিনি ইহুদিদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেন। নিম্নে তার ভাষ্য দেয়া হলো:

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

'এটা (আল্লাহ্‌র রসূল) নবী মুহাম্মদ সা. -এর পক্ষ থেকে কুরাইশ বংশোদ্ভূত মুমিন মুসলমান, মদিনাবাসী, তাদের অনুসারী, পরবর্তী কালে তাদের সাথে যোগদানকারী ও তাদের সাথে জিহাদকারী মুমিন ও মুসলমানদের জন্য তারা অন্য সকল মানুষ থেকে পৃথক একটা স্বতন্ত্র উম্মাহ্।

কুরাইশ বংশোদ্ভূত মুহাজিরগণ তাদের বিদ্যমান অবস্থায় বহাল থাকবে। পরস্পরে নিহতদের দিয়াত আদান প্রদান করবে এবং পরস্পরে ন্যায়সংগত ও সুবিচার মূলক পন্থায় বন্দি মুক্ত করবে।

বনু আওফও তাদের বিদ্যমান অবস্থায় বহাল থাকবে। তারা পরস্পরে পূর্বের প্রাপ্য দিয়াতের আদান প্রদান করবে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী ন্যায়সংগত ও সুবিচারমূলক পন্থায় মুমিনদের মধ্যে বন্দি মুক্ত করবে।

(খাজরাজ শাখা) বনুল হারিস তাদের বিদ্যমান অবস্থায় বহাল থাকবে, পরস্পরে পূর্বের দিয়াত লেনদেন করবে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী ন্যায়সংগত ও সুবিচারমূলক উপায়ে মুমিনদের মধ্যে বন্দি বিনিময় করবে। বনু সায়েদা তাদের বর্তমান অবস্থায় বহাল থাকবে পূর্বের দিয়াত লেনদেন করবে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী ন্যায়সংগত ও সুবিচারমূলক পন্থায় মুমিনদের মধ্যে বন্দী বিনিময় করবে।

বনু জুশাম তাদের বর্তমান অবস্থায় বহাল থাকবে, পূর্বের দিয়াত লেনদেন করবে। এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী ন্যায়সংগত ও সুবিচারমূলক উপায়ে মুমিনদের মধ্যে বন্দি বিনিময় করবে।

বনু নাজ্জার তাদের বর্তমান অবস্থায় বহাল থাকবে, তাদের পূর্ববর্তী দিয়াতসমূহ লেনদেন করবে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী নিজ বন্দিদেরকে ন্যায়সংগত ও সুবিচারমূলক পন্থায় মুমিনদের মধ্যে বন্দি মুক্ত করবে।

বনু উমার ইবনে আওফ তাদের বর্তমান অবস্থায় বহাল থাকবে, তাদের পূর্ববর্তী দিয়াতসমূহ লেনদেন করবে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী ন্যায়সংগত পন্থা ও সুবিচারমূলক উপায়ে মুমিনদের মধ্যে বন্দি মুক্ত করবে।

বনু নবীত তাদের বর্তমান অবস্থায় বহাল থাকবে। তাদের পূর্ববর্তী দিয়াতসমূহ যথারীতি লেনদেন করবে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী ন্যায়সংগত উপায়ে ও সুবিচারমূলক পন্থায় মুমিনদের মধ্যে বন্দি মুক্ত করবে।

বনু আওস তাদের বর্তমান অবস্থায় বহাল থাকবে, তাদের পূর্ববর্তী দিয়াতসমূহ যথারীতি লেনদেন করবে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী ন্যায়সংগত উপায়ে ও সুবিচারমূলক পন্থায় মুমিনদের মধ্যে বন্দি মুক্ত করবে।

মুমিনরা তাদের মধ্যে কোনো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। তাকে দিয়াত বা মুক্তিপণ থেকে সুবিবেচনা প্রসূতভাবে কিছু দেবে। আর কোনো মুমিন যেন কোনো মুমিনের মুক্ত দাসের সাথে তার মুনিবের অনুপস্থিতিতে সাক্ষাৎ না করে। খোদাভীরু মুমিনদের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে তাদের মধ্যকার যে কোনো অত্যাচারী বা অপরাধীর উপর, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী বা তাদের উপর আগ্রাসন পরিচালনাকারীর উপর এবং অন্যায়ভাবে কোনো দান বা প্রাপ্য দাবিকারীর উপর। এ ধরনের অন্যায় কারীর উপর মুমিনদের সকলের সামষ্টিক দমনমূলক ও প্রতিরোধমূলক কর্তৃত্ব থাকবে, চাই সে তাদের কারো সন্তানই হোক না কেন।

কোনো মুমিন কোনো কাফেরের বিনিময়ে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে না এবং কোনো কাফেরকে কোনো মু'মিনের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে না। আল্লাহ্র নিরাপদ আশ্রয় সকলের ব্যাপারে সমান। যে কোনো সাধারণ মুসলমান যে কাউকে আশ্রয় দেয়ার অধিকারী। মুমিনরা সকলে পরস্পরের বন্ধু। যে ইহুদি আমাদের অনুসরণ করবে, সে সাহায্য ও সহানুভূতি লাভের অধিকারী। তার উপর কেউ যুলুম করতে পারবে না এবং যুলুম করতে কাউকে সাহায্যও করা যাবে না। মুমিনদের সন্ধি সবার ক্ষেত্রে সমান। আল্লাহ্র পথে লড়াইতে এক মুমিনকে বাদ দিয়ে আর এক মু'মিনের সাথে সন্ধি গ্রহণযোগ্য হবে না। একমাত্র সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতেই হবে সন্ধি। (এ থেকে জানা যায়, কোনো একটি মুসলিম দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা গোটা মুসলিম উম্মাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল।)

আমাদের যুদ্ধরত প্রতিটি সেনাদল পালাক্রমে যুদ্ধ করবে। মুমিনরা আল্লাহ্র পথে যে রক্ত ঝরায়, তার বদলা পাবে। মুত্তাকী মুমিনগণ সর্বোত্তম ও দৃঢ়তম হিদায়াতের পথে রয়েছে। কোনো মুশরিক কুরাইশের কারো জীবন ও সম্পত্তিকে আশ্রয় দেবে না এবং কোনো মু'মিনের বিপক্ষে গিয়ে তার সহায়তা করবে না। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিনা অপরাধে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তাকে কিসাস স্বরূপ হত্যা করা হবে। তবে নিহতের অভিভাবক বা উত্তরাধিকারী দিয়াতে রাজি হলে দিয়াত দিয়ে রেহাই পাবে। এ ধরনের খুনীর বিরুদ্ধে সকল মুমিন একত্র থাকবে। তার বিরোধিতা করা ছাড়া অন্য কিছু তাদের জন্য বৈধ নয়।

এই চুক্তিপত্রে যা কিছু আছে, তার প্রতি সমর্থনদানকারী এবং আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাসী কোনো মু'মিনের পক্ষে কোনো অপরাধীকে সাহায্য করা বা আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়া জায়েয নয়। যে ব্যক্তি তাকে সাহায্য করবে বা আশ্রয় দেবে, কেয়ামতের দিন তার উপর আল্লাহ্র লা'নত ও গযব পড়বে। তার কাছ থেকে এজন্য কোনো বিনিময় ও ক্ষতিপুরণ গ্রহণ করা হবে না অপরাধীকে সাহায্য করা যাবে না– এতে এ কথাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তোমাদের মধ্যে যে কোনো বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে তা নিস্পত্তির জন্য আল্লাহ্ ও মুহাম্মদ সা. -এর নিকট উপস্থাপন করা হবে। ইহুদিরা যতোদিন মুসলমানদের সহযোগী হয়ে লড়াই করবে, ততোদিন তারাই তাদের যোদ্ধাদের ব্যয় বহন করবে। বনু আওফ গোত্রের ইহুদিরা

মুমিনদের সহযোগী একটি গোষ্ঠী। ইহুদিদের জন্য তাদের নিজ ধর্ম এবং মুসলমানদের জন্য তাদের নিজ ধর্ম। তাদের নিজেদের জন্য ও তাদের মুক্ত দাসদের জন্যও তাদের নিজস্ব ধর্ম থাকবে।

বনু নাজ্জারের ইহুদিরা বনু আওফের ইহুদিদের ন্যায়। বনুল হারেস গোত্রের ইহুদিরা বনু আওফের ইহুদিদের ন্যায়, বনু সায়েদার ইহুদিরা বনু আওফের ইহুদিদের ন্যায়। বনু জুশামের ইহুদিরা বনু আওফের ইহুদিদের ন্যায়, বনুল আওফের ইহুদিরা বনু আওফের ইহুদিদের ন্যায় এবং বনু সালাবার ইহুদিরা বনু আওফের ইহুদিদের ন্যায় অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। তবে যে অত্যাচারী ও পাপাচারী, সে কেবল নিজেকে ও নিজের পরিবার-পরিজনকে ধ্বংস করে। সালাবার শাখা জাফনা সালাবার মতোই সুযোগ-সুবিধা পাবে। তবে সৎকাজ ও পাপাচার পৃথক জিনিস। সালাবার মুক্ত দাসরা তাদের সমান। ইহুদিদের স্বগোত্রীয়রা তাদের সমান। মুহাম্মদ সা. -এর অনুমতি ব্যতীত তাদের কেউ তাদের মধ্য থেকে বের হয়ে যেতে পারবে না।

কোনো জখমই প্রতিশোধ বিহীন থাকবে না। যে হত্যা করবে, সে নিজের জীবন দিয়ে নতুবা পরিবার-পরিজনকে দিয়ে তার বদলা দেবে কেবল অত্যাচারিত ব্যতীত। সে এই চুক্তির বলে অত্যাচারের ক্ষতিপুরণ পাবে। ইহুদিরা তাদের যোদ্ধাদের ব্যয় বহন করবে। মুসলমানরা তাদের যোদ্ধাদের ব্যয় বহন করবে। এই চুক্তি মান্যকারীদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করবে, ইহুদি ও মুসলমানগণ পরস্পর সাহায্য করে তাদের উপর জয়যুক্ত হবে। তাদের মাঝে থাকবে হিতাকাংখিতা, সদুপদেশ ও সৎকর্ম। কোনো পাপকাজ থাকবে না।

কোনো ব্যক্তি তার মিত্রের উপর অত্যাচার করবে না। অত্যাচারিতের জন্য সর্ব প্রকারের সাহায্যের পথ উম্মুক্ত। ইহুদিরা যতোক্ষণ যুদ্ধরত থাকবে, ততোদিন তারা মুমিনদের সাথে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করবে। এই চুক্তি মান্যকারীদের জন্য মদিনার মধ্যস্থল নিরাপদ ও পবিত্র। প্রতিবেশী নিজের মতোই, যতোক্ষণ ক্ষতি সাধন ও পাপ কাজ না করে। কোনো পবিত্র স্থানে তার অধিবাসীদের অনুমতি ব্যতীত কাউকে আশ্রয় দেয়া হবে না।

এই চুক্তির আওতাভূক্তদের মধ্যে যখনই এমন কোনো ঘটনা বা বিতর্ক ঘটবে, যার পরিণামে বিপর্যয়ের আশংকা থাকে, তার নিস্পত্তির জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল মুহাম্মদ সা. -এর নিকট তা উপস্থাপন করা হবে। আল্লাহ এই চুক্তির সর্বাধিক তাকওয়া ও পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। কুরাইশ ও কুরাইশকে সাহায্যকারী কাউকে আশ্রয় দেয়া চলবে না। মদিনার উপর যে আক্রমণ চালাবে, তাকে রুখে দেয়ার জন্য মদিনাবাসীর মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা চালু থাকবে। তাদেরকে যখন সন্ধির আহ্বান জানানো হবে তখন তারা সন্ধি করবে। আর তারা যখন শত্রুদেরকে সন্ধির আহ্বান জানাবে, তখন তারা মুমিনদের কাছে সন্ধির আচরণ পাওয়ার অধিকারী হবে, কেবল ধর্মের কারণে যুদ্ধরত ব্যক্তি ব্যতীত। প্রত্যেক গোষ্ঠী তাদের সন্নিহিত অংশ থেকে তাদের ব্যয় নির্বাহ করবে। আওসের ইহুদিরা, তারা স্বয়ং ও তাদের মুক্ত দাসেরা এই চুক্তি মান্যকারীদের সমানাধিকার পাবে, এই চুক্তি মান্যকারীদের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সদাচার লাভ করবে। সদাচার পাপাচার থেকে পৃথক। প্রত্যেক উপার্জনকারী নিজের জন্যই উপার্জন করে। আল্লাহ্ এই চুক্তির সবচেয়ে সত্য ও কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই চুক্তি কোনো অত্যাচারী ও পাপাচারীর জন্য রক্ষাকবচ নয়। যে ব্যক্তি মদিনার বাইরে যাবে সে নিরাপদ। যে ব্যক্তি মদিনার ভেতরে অবস্থান করবে সেও নিরাপদ, কেবল যুলুমকারী ও পাপাচারী ব্যতীত। আল্লাহ্ মুত্তাকী ও সৎকর্মশীলের সহায়। আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ সা. মুত্তাকী ও সৎকর্মশীলের সহায়।

(ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ হায়দারাবাদীকৃত 'আর রিসালাতুল খালিদা থেকে উদ্ধৃত। লেখক দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদে উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক আইনের অধ্যাপক ছিলেন।)

◆◆◆

একত্রিশতম অধ্যায়

শপথ

শপথের সংজ্ঞা: ইসলামি শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ্‌র নাম বা তার গুণাবলীর মধ্য হতে কোনো একটি গুণের উল্লেখ করে কোনো বিষয়কে নিশ্চিত করা বা সত্য প্রমাণিত করাকে শপথ বা কসম বলা হয়, অথবা যা দ্বারা শপথকারী তার কোনো কাজ করা বা বর্জন করার সংকল্পকে আরো জোরদার করে।

আল্লাহ্‌র নাম বা গুণের উল্লেখ ব্যতীত কসম হয় না: আল্লাহ্‌র নাম বা গুণাবলীর মধ্য হতে কোনো গুণের উল্লেখ ব্যতিরেকে কোনো শপথ বা কসম শুদ্ধ হয় না। যেমন: আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্‌র মর্যাদার কসম, আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব বা শ্রেষ্ঠত্বের কসম, আল্লাহ্‌র বড়ত্ব, শক্তি, ইচ্ছা ও জ্ঞানের কসম ইত্যাদি। অনুরূপ, কুরআন মজীদ বা তার কোনো সূরা বা আয়াতের কসম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন:

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ○ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ○

'আকাশে রয়েছে তোমাদের রিয্‌কের উৎস ও প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু। অতএব আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ, অবশ্যই তোমাদের কথা বলার মতোই এই সবই সত্য।' (সূরা যারিয়াত: আয়াত ২২ ও ২৩) আল্লাহ্ আরো বলেন:

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ○ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ○

'আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির, নিশ্চয়ই আমি সক্ষম তাদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর মানব গোষ্ঠীকে তাদের স্থলবর্তী করতে এবং এতে আমি অক্ষম নই।' (সূরা মা'আরিজ: আয়াত ৪০ ও ৪১)।

ইবনে উমর রা. বলেন: রসূল সা. এরূপ শপথ করতেন, 'হৃদয়সমূহ পরিবর্তনকারীর শপথ।'

আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. যখন অত্যধিক গুরুত্ব সহকারে দোয়া করতেন তখন বলতেন, 'সেই সত্তার শপথ যার হাতে আবুল কাসেমের (অর্থাৎ মুহাম্মদ সা. -এর) প্রাণ।'

শপথের বিভিন্ন রূপ: 'আল্লাহ্‌র দিনের শপথ', 'আল্লাহ্‌র জীবনের শপথ' এবং 'তোমার শপথ' এ শব্দগুলো সহযোগে শপথ করলে তা শপথ বলে গণ্য হবে। কেননা এগুলোর অর্থ আল্লাহ্‌র শপথ বা আল্লাহ্ অধিকারের শপথ। আল্লাহ্‌র কসম বললে হানাফি ও মালেকিদের মতে তা শপথ গণ্য হবে। কেননা তার অর্থ 'আল্লাহর নামে শপথ' করছি।' শাফেয়িদের মতে, এ দ্বারা নিয়ত ব্যতীত শপথ হবে না। শপথকারী যদি এ দ্বারা শপথের নিয়ত করে তবে তা শপথ হবে, নচেৎ শপথ হবে না। ইমাম আহমদ থেকে দু'রকমের মতামত জানা যায়। বিশুদ্ধতর মত হলো, শপথ হবে। 'আল্লাহ্‌র জীবনের শপথ' হানাফি ও মালেকিদের মতে শপথ গণ্য হয়। কেননা এর অর্থ হলো, আল্লাহ্‌র আয়ুকাল ও স্থিতির শপথ। ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক বলেন: নিয়ত ব্যতীত এ দ্বারা শপথ হবে না। 'তোমার শপথ' ও 'আল্লাহ্‌র নামে শপথ' করলাম এ দুটি কথা দ্বারা কতক ফকিহের মতে শপথ অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু অধিকাংশের মতে শুধু শপথের নিয়ত থাকলেই শপথ হবে।

শাফেয়ি মাযহাবের মতে, আল্লাহ্‌র নামের উল্লেখ করা হলেই শপথ হবে, নচেৎ শপথ হবে না, চাই নিয়ত করুক বা না করুক। ইমাম মালেক রহ. বলেন: শপথকারী যদি বলে, আল্লাহর নামে শপথ করলাম, তাহলে তা শপথ। আর যদি বলে শপথ করলাম বা তোমার নামে শপথ করলাম তাহলে নিয়ত ব্যতিরেকে শপথ হবেনা।

যে ব্যক্তি বলে: 'যদি এরূপ করি তবে আমার উপর এক মাস রোযা রাখা বাধ্যতামূলক হবে.' অথবা 'এরূপ করলে আল্লাহ্‌র ঘরে হজ্জ করতে যাওয়া বাধ্যতামূলক হবে।' অথবা 'যদি এরূপ করি তবে আমার উপর সমস্ত হালাল জিনিস হারাম হয়ে যাবে।' কিংবা যদি বলে: 'যদি এরূপ করি তবে আমার মালিকানাধীন সব কিছু সদকা হয়ে যাবে' তবে এ সব কথা ও এ জাতীয় অন্য সব কথা বলার পর শপথ ভংগ করলে শপথের কাফফারা ওয়াজিব হবে। তবে কেউ কেউ বলেন, কাফফারা দিতে হবে না। কারো কারো মতে শপথ ভংগ করলে যার শপথ করছে তা করা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে।

নিজেকে অমুসলিম বা ইসলাম বহির্ভূত গণ্য করা হয় এমন শপথ করলে: যদি কেউ বলে: 'এরূপ করলে আমি ইহুদি বা খ্রিষ্টান বা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দায়মুক্ত' এবং তারপর সেই কাজ করে, তবে ইমাম শাফেয়িসহ কিছু সংখ্যক আলিমের মতে এটা কোনো শপথ নয় এবং কোনো কাফফারাও তার দিতে হবে না। কেননা কুরআন ও হাদিসে এ ধরনের শপথকারীকে ধমক ও ভর্ৎসনা ব্যতীত আর কিছু করা হয়নি।

আবু দাউদ ও নাসায়ি বারিদা থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি এরূপ শপথ করবে যে, 'এরূপ করলে আমি ইসলাম থেকে বহির্ভূত' সে যদি মিথ্যা বলে থাকে, তবে যেমন বলেছে তেমন হবে। আর যদি সত্য বলে থাকে তবে সে কখনো নিখুঁতভাবে ইসলামের দিকে ফিরে আসতে পারবে না। (অর্থাৎ সে যদি নিজেকে ভয় দেখানো ও সতর্ক করার ইচ্ছা পোষণ করে থাকে তবে কাফের হবে না। তবে তাকে অবিলম্বে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' পড়তে হবে ও তাওবা করতে হবে। আর যদি কাফের হওয়ার নিয়ত করে থাকে, নাউজুবিল্লাহ। তবে যার শপথ করেছে তা করলে কাফের হয়ে যাবে।) সাবিত বিন যুহ্হাক থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের নামে শপথ করে, তবে সে যেমন বলেছে তেমনই হবে।' হানাফি ইমামগণ, আহ্মদ, ইসহাক, সুফিয়ান ও আওযায়ির মতে, এটাও শপথ এবং ভংগ করলে কাফ্ফারা দিতে হবে।

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করা নিষিদ্ধ: যেহেতু আল্লাহ্র নামে বা তার কোনো একটি গুণের উল্লেখ করে শপথ না করলে শপথ শুদ্ধ হয় না, তাই অন্য কোনো নামে শপথ করা হারাম। কেননা যার নামে শপথ করা হয় তাকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করা অনিবার্য। অথচ আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করা অবৈধ। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে, যথা নবী, ওলি, পিতা, কা'বা শরীফ বা অনুরূপ কিছুর শপথ করে, তার শপথ শুদ্ধ হবে না এবং এ ধরনের শপথ ভংগ করলে কাফফারাও দিতে হবে না। তবে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শনের জন্য তার গুনাহ হবে।

১. ইবনে উমর রা. বলেন: একটি কাফেলায় রসূলুল্লাহ্ সা. উমর রা. কে স্বীয় পিতার নামে শপথ করতে শুনে সমগ্র কাফেলাকে সম্বোধন করে বললেন: তোমরা শোনো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের পিতার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। কেউ শপথ করতে চাইলে একমাত্র আল্লাহর নামে শপথ করবে, নতুবা চুপ করে থাকবে। উমর রা. বলেছেন ; আল্লাহ্র কসম, রসূলুল্লাহ্ সা. -এর এই নিষেধাজ্ঞা শোনার পর থেকে আমি আর কখনো আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নামে শপথ করিনি।

২. ইবনে উমর রা. এক ব্যক্তিকে কা'বা শরীফের শপথ করতে শুনে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি: 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করে সে মোশরেক।'

৩. আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: তোমাদের মধ্যে কেউ যদি 'লাত ও উয্যার শপথ' বলে শপথ করে, তবে সে যেন তৎক্ষণাৎ বলে: 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু'। আর যদি কেউ অন্য একজনকে বলে, এসো, তোমার সাথে জুয়া খেলবো, তবে তার তৎক্ষণাৎ সদকা করা উচিত। (লাত ও উয্যা মক্কাবাসীর দুটি মূর্তির নাম। তারা জাহেলি যুগে এ দুটির নামে শপথ করতো।)

৪. ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন: 'যে ব্যক্তি আমানতের নামে শপথ করে সে আমাদের লোক নয়।' অর্থাৎ আমাদের আদর্শের অনুসারী নয়।

৫. ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসায়ি আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: তোমরা তোমাদের পিতা বা মাতার নামে বা দেবদেবীর নামে শপথ করো না। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নামে শপথ করো না। সত্য কথা ব্যতীত অন্য কিছুর উপর শপথ করো না।'

যার নামে শপথ করা হয় তার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্য না থাকলে: আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা নিষিদ্ধ হয়েছে তখনি, যখন তার উদ্দেশ্য হয় সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন। সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন যদি উদ্দেশ্য না হয়, বরং কেবলমাত্র বক্তব্যের সত্যতার উপর জোর দেয়ার উদ্দেশ্যে শপথ করা হয়, তাহলে সেটা মাকরূহ হবে। কেননা এর সাথে নিষিদ্ধ শপথের সাদৃশ্য রয়েছে। তাছাড়া এতে

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সত্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে বলে ধারণা জন্মে। রসূলুল্লাহ সা. জনৈক বেদুইন সম্পর্কে বলেছিলেন: 'লোকটির বাবার শপথ, সে সফলকাম হয়েছে।' ইমাম বায়হাকি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ ধরনের শপথ করা আরবদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিলো এবং কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই মুখ দিয়ে অহরহ উচ্চারিত হতো। ইমাম নববী এই ব্যাখ্যার সমর্থন করে বলেছেন: ব্যাখ্যাটি সন্তোষজনক।

সৃষ্টির নামে শপথ করা: আরবদের রীতি ছিলো, শপথ করে যে বাক্য শুরু করা হয়, তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতো এবং কথাটার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার প্রতি মনোযোগ দিতো। তারা বুঝতো যে, বক্তার কসম খাওয়া তার কাংখিত বক্তব্যের বিশেষ গুরুত্বের প্রমাণ এবং কথার যথার্থতা ও সত্যতার প্রতীক। কুরআনেও এই বাকরীতি অনুসৃত হয়েছে এবং বহু জিনিসের নামে শপথ করা হয়েছে। সূরা কাফ: আয়াত ১। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে কুরআন। যেমন বলা হয়েছে 'মহান কুরআনের শপথ।' এ ছাড়া কিছু কিছু সৃষ্টির শপথও করা হয়েছে। যেমন: 'সূর্য ও তার কিরণের শপথ।' (সূরা ওয়াশ শাম্স, আয়াত ১) আবার সূরা ওয়াল লাইলের প্রথম দু'আয়াতে বলা হয়েছে: 'কসম রাত্রির, যখন সে আচ্ছন্ন করে, আর কসম দিবসের যখন সে উদ্ভাসিত হয়। এ সব শপথের পেছনে অনেক নিগূঢ় ও মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। যেমন শপথ দ্বারা কিছু শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা, যা এ সব জিনিসে রয়েছে। এ সব জিনিস নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে, যাতে তা থেকে প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হয়।

আল্লাহ কুরআনের নামে শপথ করেছেন এ কথা ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে যে, এটি যথার্থই আল্লাহর বাণী এবং এতেই দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ ও শান্তির যাবতীয় উপকরণ রয়েছে। ফেরেশতাদের নামে শপথ করে বুঝিয়েছেন যে, তারা আল্লাহ্র অনুগত বান্দা এবং তারা কোনো উপাস্য দেবতা নন। সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের শপথ করে এর রকমারি উপকারিতার বিষয়টি ব্যক্ত করা হয়েছে। আর এগুলোতে অহরহ যে পরিবর্তন ঘটে, তা থেকে তার নশ্বরতা প্রমাণিত হয় এবং তাদের যে একজন সুনিপুণ স্রষ্টা রয়েছেন তাও জানা যায়। তাই সেই মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ও তার প্রতি মনোযোগী হওয়ায় অবহেলা করা অনুচিত।

আল্লাহ কোথাও কোথাও বাতাস, তুর পর্বত, কলম, ও রাশিচক্র সম্বলিত আকাশের শপথ করেছেন। কেননা এ সবই আল্লাহ্র নিদর্শন এবং এগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা মানুষের কর্তব্য। এসব শপথের মাধ্যমে আল্লাহ্ যে সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তা হচ্ছে আল্লাহর একত্ব, রসূলুল্লাহ্ সা. -এর রিসালাত। মানুষের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া ও কিয়ামত। কেননা এগুলো হচ্ছে ইসলামের মৌল তত্ত্ব যা মানুষের মনে গভীরভাবে বদ্ধমূল হওয়া প্রয়োজন।

আল্লাহ্র সৃষ্টির নামে শপথ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট। আমাদের জন্য একমাত্র আল্লাহর নামে বা তার গুণাবলীর কোনো একটির নামে ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করা বৈধ নয়।

শপথের শর্ত ও উপাদান: শপথ শুদ্ধ হওয়ার শর্ত হলো শপথকারীর সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, মুসলমান হওয়া, শপথ পূরণ করার সামর্থ্য থাকা ও স্বাধীনতা। সুতরাং কেউ যদি কারো চাপে বাধ্য হয়ে শপথ করে তবে সে শপথ শুদ্ধ নয়। আর শপথের উপাদান হচ্ছে শপথে ব্যবহৃত ভাষা।

শপথ সম্পর্কে শরিয়তের বিধি: শপথ সম্পর্কে শরিয়তের বিধি এই যে, শপথকারী যে কাজের জন্য শপথ করবে তা পূর্ণ করা, যাতে সে শপথ থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। আর পূর্ণ না করলে শপথ ভংগ করার দায়ে দোষী হবে এবং তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে।

শপথ কতো প্রকার ও কী কী: শপথ তিন প্রকার: ১.অর্থহীন শপথ ২.ইচ্ছাকৃত শপথ ৩.মিথ্যা শপথ

অর্থহীন শপথ ও তার বিধি: অর্থহীন শপথ হলো, যে শপথে প্রকৃতপক্ষে শপথ করার কোনো ইচ্ছা থাকে না। কেবল কথার কথা হিসাবেই তা উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমন: আল্লাহ্র কসম, তোমাকে খেতেই হবে, আল্লাহ্র কসম, তোমার আসতেই হবে, ইত্যাদি।

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেছেন: মানুষের অহরহ 'আল্লাহ্র কসম, না' 'আল্লাহ্র কসম! হাঁ' 'আল্লাহ্র কসম! কখনো না' ইত্যাকার কথাবার্তা সম্পর্কেই এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল: 'তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না' (সূরা বাকারা: আয়াত ২২৫) বুখারি, মুসলিম।

ইমাম মালেক, হানাফি ইমামগণ, ইমাম লায়েস ও আওযায়ী বলেন: অর্থহীন শপথ হলো সঠিক ও সত্য মনে করে কোনো বিষয়ে শপথ করা এবং পরে তার বিপরীত সত্য উদঘাটিত হওয়া। একে ভুল শপথও বলা যেতে পারে। ইমাম আহমদ রহ. থেকে দু'ধরনের মতামত বর্ণিত হয়েছে, যা উপরোক্ত দুই মযহাবের মতামতের মতোই।

অর্থহীন শপথের বিধি: এ ধরনের শপথে কোনো কাফফারাও নেই, কোনো দায়দায়িত্বও নেই।

ইচ্ছাকৃত শপথ ও তার বিধি: ইচ্ছাকৃত শপথ হলো শপথকারী যা বুঝে-শুনে সংকল্পবদ্ধ হয়েই করে। এ শপথ শপথকারীর উদ্দেশ্য ও প্রতিজ্ঞার প্রতীক। এটা মোটেই অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন নয় যে, প্রচলিত রীতিপ্রথা মোতাবেক আপনা থেকেই মুখে উচ্চারিত হবে। কারো কারো মতে, ইচ্ছাকৃত শপথ ভবিষ্যতের কোনো কাজ করা বা না করার সংকল্প ব্যক্ত করে থাকে। এর বিধি হলো: শপথ ভংগ বা লংঘন করলে অবশ্যই কাফফারা দিতে হবে। নিম্নোক্ত দুটি আয়াতে এ সংক্রান্ত বিধান দ্রষ্টব্য:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

'তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ ও ধৈর্যশীল।' (সূরা বাকারা: আয়াত ২২৫)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ج فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ط فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ط ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ط وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

'আল্লাহ তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে করো, তার জন্য তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। আর এর কাফফারা হলো দশজন মিসকীনকে তোমাদের পরিবারের লোকদেরকে খাওয়ানো মধ্যম মানের খাদ্য দান করা, অথবা পরিধেয় বস্ত্র দান করা, অথবা একজন দাস/দাসী মুক্ত করা। কিন্তু যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না তার জন্য তিন দিন রোজা রাখা। এ হলো তোমাদের শপথের কাফফারা যখন তোমরা শপথ করবে। তোমরা তোমাদের শপথসমূহ রক্ষা করো। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা শোকর আদায় করো।' (সূরা মায়িদা: আয়াত ৮৯)।

মিথ্যা শপথ ও তার বিধি: মিথ্যা শপথ হলো যা দ্বারা অন্যের অধিকার হরণ করা হয় অথবা খেয়ানত ও পাপ কাজ সংঘটিত করার ইচ্ছা করা হয়। এটা কবীরা গুনাহসমূহের অন্যতম। এতে কোনো কাফফারা নেই। কেননা যে সব গুনাহ থেকে কাফফারা দিয়ে উদ্ধার পাওয়া যায় এটা তার চেয়ে মারাত্মক। (ইমাম শাফেয়ির মতে ও ইমাম আহমদের একটি মত অনুসারে এতে কাফফারা দিতে হবে।) আরবিতে এর নাম 'গামুস' অর্থাৎ নিমজ্জিতকারী। এই নামকরণের কারণ হলো এ শপথ মানুষকে জাহান্নামের আগুনে নিমজ্জিত করে। এ ধরনের শপথকারীর উপর তাওবা করা ওয়াজিব, সে সাথে এ দ্বারা কারো অধিকার নষ্ট হয়ে থাকলে তার সে অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। আল্লাহ্ বলেন:

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

'পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করোনা। করলে পা স্থির হওয়ার পর পিছলে যাবে এবং আল্লাহ্র পথে বাধা দানের কারণে তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করবে। তোমাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।' (সূরা নাহ্ল: আয়াত ৯৪)

১. ইমাম আহমদ ও আবুশ শায়খ রহ. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: পাঁচটি গুনাহের কোনো কাফফারা নেই: আল্লাহ্র সাথে শরিক করা, সংগত কারণ ব্যতীত কোনো প্রাণ নিধন করা, কোনো মুমিনকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া, মিথ্যা শপথের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ অপহরণ করা।'

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: 'কবীরা গুনাহ হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে শরিক করা। পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, আত্মহত্যা করা ও মিথ্যা শপথ করা।'

৩. ইমরান ইবনে হাসীন রা. থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেন, রসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে এবং তার কারণে কেউ জেল খাটতে বাধ্য হবে বা সরকারিভাবে অন্য কোনো ক্ষতির শিকার হবে, সে যেন দোযখে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে।'

শপথের ভিত্তি, নিয়ত ও প্রচলিত রীতি: শপথের আইনগত ভিত্তি হচ্ছে সমাজে প্রচলিত রীতিপ্রথার উপর, আভিধানিক অর্থও নয়, ইসলামি পরিভাষার উপরও নয়। যেমন কেউ শপথ করলো যে, সে গোশত খাবে না, তার পর মাছ খেলো। এতে তার শপথ ভংগ হবে না, যদিও আল্লাহ্ মাছকেও গোশত নামে আখ্যায়িত করেছেন। (সূরা নাহ্লের ১৪ নং আয়াত দ্রষ্টব্য) তবে কেউ যদি নিয়ত করে থাকে যে, তার কথিত গোশতের মধ্যে মাছও অন্তর্ভুক্ত অথবা তার স্বজাতির প্রচলিত ভাষায় মাছও গোশতের অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে মাছ খেলে শপথ ভংগ হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো জিনিসের শপথ করে কিন্তু মনে মনে অন্য নিয়ত করে, তার নিয়তই ধর্তব্য হবে, মুখে উচ্চারিত কথা নয়। তবে অন্য কেউ যদি তাকে কোনো বিশেষ জিনিসের ব্যাপারে শপথ করায়, তাহলে যে ব্যক্তি শপথ করিয়েছে, তার নিয়তই ধর্তব্য হবে, শপথকারীর নিয়ত নয়। অন্যথায় আদালতের বিচারের ক্ষেত্রে শপথের কোনো স্বার্থকতা থাকবে না।

ইমাম নববী বলেন: শপথ সব সময় শপথকারীর নিয়ত অনুযায়ী বিচার্য হবে। একমাত্র বিচারক বা তার প্রতিনিধি যখন তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ বা দাবি সম্পর্কে তাকে শপথ করতে বলবেন তখনই এর ব্যতিক্রম হবে। এ ক্ষেত্রে বিচারক বা তার প্রতিনিধির নিয়তই বিধান। এখানে শপথকারীর নিজস্ব ভিন্নমুখী নিয়ত শুদ্ধ হবে না। এই ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সব ক্ষেত্রে শপথকারীর নিজস্ব নিয়ত শুদ্ধ। বিচারক বা তার প্রতিনিধির নিয়ত অনুসারে কৃত শপথ ভংগ করলে সে ভংগকারী গণ্য হবে না, যদিও বাতিল উদ্দেশ্যে কৃত শপথ হারাম।

অন্য কারো দ্বারা বাধ্য হয়ে শপথ করা ব্যতীত সব সময় যে শপথকারীর নিয়তই বিধান, তার প্রমাণ হলো, সুয়াইদ ইবনে হানযালা থেকে ইমাম আবুদাউদ ও ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত এই হাদিস। সুয়াইদ বলেন: ওয়ায়েল ইবনে হাজারকে সাথে নিয়ে আমরা রসূলুল্লাহ্ সা. -এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হলাম। পথিমধ্যে ওয়ায়েলের একজন শত্রু তাকে পাকড়াও করলো। আমার সাথীরা ওয়ায়েলকে রক্ষা করার জন্য কোনো শপথ করতে ইতস্তত করতে লাগলো। আমি শপথ করে বললাম: সে আমার ভাই। এতে সে ওয়ায়েলকে ছেড়ে দিলো। অতপর আমরা রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট এলাম। আমি তাকে জানালাম যে, আমার সাথীরা শপথ করে ওয়ায়েলকে ভাই বলতে রাজি হয় নি। কিন্তু আমি শপথ করে তাকে ভাই বলেছি। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: তুমি সত্য বলেছ। মুসলমান মুসলমানের ভাই।'

তবে যে ক্ষেত্রে অন্য কেউ শপথ করায়, সে ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি শপথ করায়, তার নিয়তই যে বিধান, এর প্রমাণ ইমাম মুসলিম ইমাম আবুদাউদ ও তিরমিযি কর্তৃক আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস। রসূলুল্লাহ্

সা. বলেছেন: 'যে ব্যক্তি শপথ করায় তার নিয়ত অনুসারেই শপথ বিচার্য।' অন্য বর্ণনা মোতাবেক: 'তোমার প্রতিপক্ষ তোমার কথা যে শপথে বিশ্বাস করবে সেটাই তোমার শপথ।' এখানে প্রতিপক্ষ হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে এমন অবস্থায় শপথ করিয়েছে যখন উভয়ে শপথের দাবিদার।

ভুলবশত বা অনিচ্ছা বশত শপথের বিপরীত করলে শপথ ভংগ হবেনা: যে ব্যক্তি কোনো কাজ না করার শপথ করে অত:পর সেই কাজ ভুলক্রমে বা অনিচ্ছাবশত: করে, সে শপথ ভংগের দায়ে দোষী হবে না। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: আল্লাহ আমার উম্মাতকে ভুলত্রুটি, অনিচ্ছা ও তাদেরকে কোনো কিছুর জন্য বাধ্য করার দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। (ভুল: যেমন ভুলক্রমে এমন কিছু করা, যা করা সাধারণভাবে গুনাহ, অথবা ভুলক্রমে এমন কিছু করা থেকে বিরত হওয়া, যা করা অবশ্য কর্তব্য। অনিচ্ছা যেমন যা অন্যায় বা অবৈধ তা বৈধ বা ন্যায়সংগত মনে করে করা, অথবা যা অবশ্যকরণীয় তা অনুচিত মনে করে করা থেকে বিরত থাকা, অথবা ওজর বা অক্ষমতা বশত: বিরত থাকা। বাধ্য হওয়া: যেমন কোনো অপশক্তির চাপে বাধ্য হয়ে কোনো গুনাহর কাজ করা অথবা দেশের অন্যায় আইনের কারণে কোনো অবৈধ কাজ করতে বাধ্য হওয়া উল্লেখ্য, যে কাজ করার শপথ করা হয়, তা না করলে এবং যে কাজ না করতে শপথ করা হয় তা করলে শপথ ভংগ বা লংঘন হয়। (অনুবাদক)

বাধ্য হয়ে শপথ করলে তা মানা জরুরি নয়: কোনো ব্যক্তিকে কোনো কাজ করার জন্য শপথ করতে কেউ বাধ্য করলে তার জন্য সে শপথ পূর্ণ করা জরুরি নয় এবং সেই শপথের বিপরীত কাজ করলে সে শপথ ভংগকারী হবে না। এর প্রমাণ প্রথমত: উপরোক্ত হাদিস। দ্বিতীয়ত: যাকে বাধ্য করা হয়, তার স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হয়। যার স্বাধীনতা থাকে না, শরিয়তের কোনো হুকুম মানার দায়িত্ব তার থাকে না। এ জন্য ইমাম আহমদ, শাফেয়ি ও মালেকের মতে যাকে বাধ্য করা হয় তার শপথ বৈধই হয় না। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা মনে করেন, শপথ বৈধ হয়, কিন্তু তা পূর্ণ করতে সে বাধ্য নয়।

শপথে ইনশাআল্লাহ্ বলা: যে ব্যক্তি শপথে ইনশাআল্লাহ্ (অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি চান) বলাটা যুক্ত করে সে শপথের বিপরীত কাজ করলে শপথ ভংগ হবেনা। কেননা ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি কোনো শপথ করে এবং বলে: 'ইনশাআল্লাহ', সে শপথ ভংগের জন্য দায়ি হবেনা। (আহমদ, ইবনে হাব্বান, ইবনে হাব্বান হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন)

শপথের পুনরাবৃত্তি: কোনো ব্যক্তি এক বা একাধিক ব্যাপারে বারংবার শপথ করে তা ভংগ করলে ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী ইমাম আহমদ বলেন: প্রত্যেক শপথে পৃথক কাফ্‌ফারা দিতে হবে। হাম্বলীদের মতে, যে ব্যক্তি কাফ্‌ফারা দেয়ার আগেই একাধিক শপথ করে তখন তার প্রত্যেক শপথে একই ধরনের কাফ্‌ফারা দেয়া ওয়াজিব নয়। তার উপর একটা কাফ্‌ফারাই ওয়াজিব হবে। আর যদি কাফ্‌ফারার ধরন ভিন্ন হয়, যেমন যিহার ও আল্লাহ্‌র নামে শপথ, তাহলে পৃথক পৃথকভাবে দুটো কাফ্‌ফারা দিতে হবে।

শপথের কাফ্‌ফারা: কাফ্‌ফারার শাব্দিক অর্থ হলো: এমন ঢাকনা বা পর্দা, যা কোনো জিনিসকে পুরোপুরিভাবে ঢেকে দেয়। আর ইসলামের পরিভাষায় এ দ্বারা সে সব কাজকে বুঝায়, যা কিছু পাপকাজকে এমনভাবে ঢেকে দেয় ও মোচন করে দেয় যে, অত:পর দুনিয়া ও আখেরাতে তার কর্তার উপর তার আর কোনোই দায়দায়িত্ব বর্তায়না। ইচ্ছাকৃত শপথ ভংগের কাফ্‌ফারা প্রথমত নিম্নোক্ত তিনটির যে কোনো একটি:

১. দশজন দরিদ্রকে খাদ্য দান।

২. দশজন দরিদ্রকে বস্ত্র দান।

৩. একজন দাস/দাসী মুক্ত করা।

দ্বিতীয় এই তিনটির কোনোটিই করতে যে সমর্থ নয়, তার জন্য তিন দিন রোযা রাখা। উল্লেখিত প্রথম

তিনটি নীচ থেকে উপরের দিকে পর্যায়ক্রমিক। অর্থাৎ খাদ্য দান সর্বনিম্ন, বস্ত্র দান মধ্যম ও দাস/দাসী মুক্ত করা সর্বোচ্চ। আল্লাহ্ বলেন: 'এর কাফ্ফারা হলো, দশজন মিস্কীনকে তোমাদের পরিবারের লোকদেরকে যা খাওয়াও, তা থেকে মধ্যম মানের খাদ্য দান করা, অথবা পরিধেয় বস্ত্র দান করা, অথবা একজন দাস বা দাসী মুক্ত করা। কিন্তু যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখেনা, তার জন্য তিন দিন রোযা রাখা। এ হলো তোমাদের শপথের কাফ্ফারা যখন তোমরা শপথ করবে। তোমরা তোমাদের শপথসমূহ রক্ষা করো। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।' (সূরা মায়িদা: আয়াত ৮৯)

কাফ্ফারার যৌক্তিকতা: শপথ ভংগ করা দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা ও অপূর্ণ রাখার নাম। কাজেই এ জন্য কাফ্ফারা নির্ধারিত হওয়া এর ক্ষতিপূরণের জন্য জরুরি। কাফফারা হলো:

খাদ্য দান: খাদ্যের পরিমাণ ও মান শরিয়ত নির্ধারণ করে দেয় নি। যে ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা হয়, সে ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হবে প্রচলিত রীতি-প্রথার আলোকে। সুতরাং মানুষ তার পরিবারের লোকদেরকে সচরাচর যে মানের ও যে পরিমাণের খাদ্য পরিবেশন করে থাকে, সেই মান ও পরিমাণ অনুযায়ীই কাফফারার খাদ্য নির্ণিত হবে। বিশেষ বিশেষ উৎসবাদিতে বা অনুষ্ঠানাদিতে যে উঁচু মানের খাদ্য পরিবেশিত হয় সে অনুযায়ীও নয়, এবং সময় সময় যে নিম্নমানের খাদ্য পরিবেশিত হয় সে অনুযায়ীও নয়। কোনো মানুষের বাড়িতে যদি বেশির ভাগ সময়ে গোশত, সবজি ও গমের রুটি খাওয়ার অভ্যাস ও রীতি চালু থাকে, তাহলে এর চেয়ে নিম্নমানের খাদ্য প্রদান করলে কাফফারা আদায় হবে না। হয় এর সমমানের অথবা এর চেয়ে উৎকৃষ্ট মানের খাদ্য বিতরণ করতে হবে। কেননা সমমানের খাদ্যই মধ্যম। আর উৎকৃষ্ট মানের খাদ্য দিলে মধ্যম মানেরও হবে এবং কিছু বেশিও দেয়া হবে। ব্যক্তি ও দেশভেদে এই মধ্যমমান বিভিন্ন হতে পারে।

ইমাম মালেক রা. এর মতানুসারে মদিনায় এক 'মুদ' (একটা বিশেষ পরিমাপের নাম) খাদ্য যথেষ্ট। সে সাথে তিনি এও বলেন: যে সকল দেশের জীবন-যাপনের মান আমাদের জীবন যাপনের মান থেকে ভিন্ন, তাদের বেলায় আমি মনে করি তাদের নিজ নিজ দেশের জীবন যাপনের মানের মধ্য থেকেই মধ্যম মান নির্ণয় করতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন: 'তোমাদের পরিবারের লোকদেরকে যে খাদ্য দিয়ে থাক, তার মধ্য থেকে মধ্যম মানের খাদ্য দিও।' ইমাম আবু দাউদ ও তার শিষ্যদের অভিমতও অদ্রূপ। ইমাম আবু হানিফা ব্যতীত অন্যান্য ফকীহগণ শর্ত আরোপ করেছেন যে, দশজন মিসকীন মুসলমানদের মধ্য থেকে হতে হবে। ইমাম আবু হানিফার মতে যিম্মীদের (মুসলিম দেশে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিকদের) মধ্যে যারা দরিদ্র তাদেরকে দিলেও চলবে। তাঁর মতে, একজন মিসকীনকে দশদিন খাওয়ালেও দশজন মিসকীনকে খাওয়ানোর পর্যায়ভুক্ত হবে। অন্যরা বলেন, এতে একজন মিসকীনকে খাওয়ানো গণ্য হবে।

মনে রাখতে হবে, খাদ্য দেয়ার মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় করা কেবল সামর্থ্যবান লোকদের জন্যই নির্দিষ্ট। এ সামর্থ্য দ্বারা বুঝতে হবে, নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনের অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় নির্বাহের পর যা উদ্বৃত্ত থাকে তা থেকে এই পরিমাণ খাদ্য দিতে সক্ষম হওয়া। কোনো কোনো আলিম উদ্বৃত্তের পরিমাণ পঞ্চাশ দিরহাম আবার কেউ কেউ বিশ দিরহাম নির্ধারণ করেছেন। প্রথমোক্ত মতটি কাতাদার এবং দ্বিতীয় মত ইবরাহীম নখ্য়ির।

পরিধেয় বস্ত্র: মানুষ পোশাক হিসাবে যে কাপড়-চোপড় ব্যবহার করে থাকে এবং যাকে পোশাক নামে আখ্যায়িত করা হয় তা-ই কাফ্ফারা হিসাবে যথেষ্ট হবে। এর ন্যূনতম মান ধরা হবে দরিদ্র লোকেরা সচরাচর যা পরে থাকে। কেননা আয়াতে শুধু খাদ্যের বেলায় মধ্যম মানের শর্ত আরোপ করা হয়েছে, বস্ত্রের বেলায় মধ্যম মানের শর্ত আরোপ করা হয়নি। কাফফারা দাতার পরিবারের লোকেরা সচরাচর যা পরে থাকে সে মানের পোশাক দিলেও চলবে। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের মতে প্রত্যেক

দরিদ্রকে বিশুদ্ধভাবে নামায পড়তে পারে এমন পোশাক দিতে হবে। পুরুষ হলে পুরুষের অনুপাতে, নারী হলে নারীর অনুপাতে।

দাস মুক্তি: এর অর্থ দাস বা দাসীকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেয়া, চাই সে মুসলমান হোক বা কাফের। কেননা আয়াতে মুসলমান হওয়ার শর্তের উল্লেখ নেই। এটা ইমাম আবু হানিফা, আবু সাওর ও ইবনুল মুনযিরের অভিমত। কিন্তু অন্যান্য ফকিহের মতে, মুসলমান হওয়া শর্ত। তাদের মতে হত্যার কাফ্ফারায় যেমন মুসলমান দাসদাসী মুক্ত করার শর্ত আরোপিত হয়েছে (সূরা নিসার ৯২ আয়াতানুসারে) এ কাফ্ফারায় সে বিধি অনুসৃত হবে।

আর্থিক সামর্থ্য না থাকলে রোযা রাখা: এ তিনটির কোনোটাই সম্পন্ন করার যার আর্থিক সঙ্গতি নেই, তার উপর তিন দিন রোযা রাখা ওয়াজিব। অসুস্থতার কারণে রোযা রাখার সাধ্য না থাকলে সুস্থ হওয়ার পর রোযা রাখবে। রোযা রাখার ক্ষমতা ফিরে না এলে আল্লাহর ক্ষমাই তার জন্য যথেষ্ট।

কাফ্ফারার এ রোযা এক নাগাড়ে রাখা শর্ত নয়। তাই এক নাগাড়ে রাখলেও চলবে বিরতি দিয়ে রাখলেও চলবে। হানাফি ও হাম্বলিদের পক্ষ থেকে একনাগাড়ে রোযা রাখার যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তা সঠিক নয়।

খাদ্য ও বস্ত্রের মূল্য প্রদান: ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ও মালেকের মতে খাদ্য ও পোশাকের মূল্য দিলে কাফ্ফারা আদায় হবেনা। ইমাম আবু হানিফার মতে আদায় হবে।

শপথ ভংগ করার পূর্বে ও পরে কাফ্ফারা আদায় করা: ফকিহগণ একমত হয়ে বলেছেন, শপথ ভংগ হওয়া ব্যতীত কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়না। অগ্রিম দেয়া জায়েয কি না তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ ফকিহের মতে শপথ ভংগ করার আগে আগাম কাফ্ফারা দেয়াও জায়েয, ভংগ করার পরে বিলম্বে দেয়াও জায়েয। মুসলিম, আবুদাউদ, ও তিরমিযিতে বর্ণিত হয়েছে: 'যে ব্যক্তি কোনো শপথ করে, এবং পরে বুঝতে পারে যে, যে কাজের জন্য সে শপথ করেছে, তা না করে অন্য কিছু করাই ভালো, সে যেনো শপথের কাফফারা দিয়ে দেয় এবং যা ভালো মনে হয়, সেটি করে।'

এ হাদিস থেকে শপথ ভংগ করার আগেই কাফ্ফারা দেয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

আর শপথ ভংগ করার আগেই কাফ্ফারা দেয়ার পর শপথ ভংগ শুরু করা পাপ কাজ শুরু করা গণ্য হবেনা। কেননা যে কাজের শপথ করা হয়েছিল, আগাম কাফফারা তাকে বৈধ করে দিয়েছে। ইমাম মুসলিমও বর্ণনা করেছেন, রসূল সা. বলেছেন: 'যে ব্যক্তি কোনো কাজ করার শপথ করে এবং পরে দেখতে পায়, অন্য একটি কাজ তার চেয়ে ভালো, তবে সে যেনো তা করে ও শপথের কাফফারা দেয়।'

যে ফকিহগণ আগাম কাফ্ফারা দেয়া বৈধ মনে করেন, তাদের যুক্তি এই যে, যে ব্যক্তি কাফফারা না দিয়েই শপথ ভংগ করে, সে একটা পাপ কাজ শুরু করে। অথচ সে কাফফারা আদায় করার আগেও মারা যেতে পারে। রসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক অগ্রিম কাফফারা প্রদানের অনুমতি দানের যুক্তি হয়তো এটাই।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য হলো, যেহেতু শপথ ভংগ করার পূর্বে কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ সংঘটিত হয়না, তাই শপথ ভংগ করার পরে ব্যতীত কাফ্ফারা শুদ্ধ হয়না। তিনি রসূলুল্লাহ্ সা. এর উক্তি 'সে যেন তার শপথের কাফফারা দিয়ে দেয় এবং যেটা ভালো সেটা করে'-এর ব্যাখ্যা এভাবে করেন: অর্থাৎ সে যেন কাফফারা আদায়ের ইচ্ছা পোষণ করে। যেমন সূরা নাহ্লের ৯৮ নং আয়াতে আছে: যখন তুমি কুরআন পড়বে তখন আল্লাহ্র কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো' 'এখানে যখন তুমি কুরআন পড়বে' এর অর্থ হলো, 'যখন তুমি কুরআন পড়তে ইচ্ছা করবে।' যাহোক, অধিকাংশ ফকিহদের মতটিই অগ্রগণ্য। অর্থাৎ আগাম কাফফারা বৈধ।

বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরে শপথ ভংগ করা বৈধ: মূলত শপথকারীর জন্য শপথ পূর্ণ করাই কর্তব্য। তবে বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরে শপথ পূর্ণ না করাও বৈধ। আল্লাহ্ বলেন:

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

'তোমরা সৎকাজ, আত্মসংযম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন থেকে বিরত থাকবে এ মর্মে শপথ করার জন্য আল্লাহ্র নামকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করোনা।' (সূরা বাকারা: আয়াত ২২৪) অর্থাৎ আল্লাহর নামে শপথকে তোমরা সৎকাজ, আত্মসংযম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের অন্তরায় বানাবেনা। আল্লাহ্ সূরা তাহ্রীমের ২নং আয়াতে বলেন: قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ج

'আল্লাহ্ তোমাদের শপথ থেকে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন।' অর্থাৎ কাফফারা আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ্ শপথ থেকে অব্যাহতি লাভের ব্যবস্থা শরিয়তে বিধিবদ্ধ করেছেন।

ইমাম আহমদ এবং বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেন, রসূল সা. বলেছেন: 'যখন তুমি কোনো কাজের জন্য শপথ করবে, অত:পর সে কাজটি ছাড়া অন্য কিছুতে অধিকতর কল্যাণ নিহিত আছে বলে মনে করবে, তখন যেটি অধিকতর কল্যাণকর, সেটি করবে এবং তোমার শপথের জন্য কাফফারা আদায় করবে।'

যে জিনিসের বাবদে শপথ করা হয়, তার ভিত্তিতে শপথের প্রকারভেদ: যে জিনিসের বাবদে শপথ করা হয়, তার ভিত্তিতে শপথ পাঁচ প্রকার।

১. কোনো ফরয বা ওয়াজিব কাজ করা ও হারাম কাজ বর্জন করার শপথ। এ ধরনের শপথ ভংগ করা হারাম। কেননা এ দ্বারা আল্লাহ্ তার বান্দাদেরকে যে সব কাজের আদেশ দিয়েছেন বা যে সব কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, সেগুলিকেই জোরদার করা হয়েছে।

২. কোনো ফরয বা ওয়াজিব কাজ বর্জন করা ও হারাম কাজ করার শপথ। এ ধরনের শপথ ভংগ করা ওয়াজিব। কেননা এটা গুনাহ্র কাজ করার পথ। ভংগ করার সাথে সাথে কাফ্ফারা দেয়াও ওয়াজিব।

৩. বৈধ কাজ করার শপথ। এ ধরনের শপথ ভংগ করা মাকরূহ এবং শপথ পূর্ণ করা মুস্তাহাব।

৪. মুস্তাহাব কাজ বর্জন ও মাকরূহ কাজ করার শপথ। এ ক্ষেত্রে শপথ ভংগ করা মুস্তাহাব, শপথ দীর্ঘায়িত করা মাকরূহ ও কাফ্ফারা দেয়া ওয়াজিব।

৫. মুস্তাহাব কাজ করা বা মাকরূহ কাজ বর্জন করার শপথ। এটা ইবাদাতের শামিল। এ শপথ পূর্ণ করা মুস্তাহাব ও ভংগ করা মাকরূহ।

বত্রিশতম অধ্যায়

মান্নত

সংজ্ঞা: নযর বা মান্নত হচ্ছে মূলত শরিয়তে বাধ্যতামূলক নয়, এমন কোনো মহৎ সৎ কাজকে নিজের উপর বাধ্যতামূলক করা। এ কাজটি এরূপ প্রতিজ্ঞামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে করা হতে পারে: 'এতো টাকা সদ্‌কা করা আল্লাহ্‌র জন্য আমার উপর বাধ্যতামূলক।' অথবা 'আল্লাহ্ যদি আমার অমুক রোগীকে নিরাময় দান করেন তাহলে তিন দিন রোযা রাখা আমার জন্য বাধ্যতামূলক' ইত্যাদি।

একজন স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তি ছাড়া মান্নত শুদ্ধ নয়। চাই সে কাফেরই হোক না কেন।

মান্নত একটি প্রাচীন ইবাদত: আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন শরীফে উল্লেখ করেছেন যে, মরিয়াম আ. এর মাতা তার গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে মান্নত করে বলেছিলেন:

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۚ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

'স্মরণ করো, যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক, আমার গর্ভে যা আছে, তা আমি একান্ত তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি এটি আমার নিকট থেকে কবুল করো, তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (আলে ইমরান: আয়াত ৩৫) আর আল্লাহ্ মরিয়ামকে আদেশ দিয়েছিলেন এই বলে:

فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا لا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا ○

'তুমি মানুষের মধ্যে কাউকে দেখলে বলবে: 'আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতা অবলম্বনের মান্নত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোনো মানুষের সাথে কথা বলবো না।'

জাহেলি যুগে মান্নত: জাহেলি যুগের মানুষ তাদের দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে যে সব মান্নত মানতো, সূরা আনয়ামের ১৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ তার উল্লেখ করেছেন। এ সব মান্নতের উদ্দেশ্য ছিলো ঐ সব দেব দেবীর নৈকট্য অর্জন, দেব-দেবীকে দিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট সুপারিশ করানো ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করিয়ে দেয়া। আল্লাহ্ বলেন:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ○

৮'আর আল্লাহ্ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, তা থেকে তারা কিছু অংশ আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে: এটা আল্লাহ্‌র অংশ এবং এটা আমাদের দেবতাদের অংশ। তারপর যে অংশ তাদের দেবতাদের জন্য, তাতো আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছেনা, কিন্তু যে অংশ আল্লাহ্‌র জন্য তা তাদের দেবতাদের কাছে পৌঁছে যায়। তারা যা ফায়সালা করে তা কতো নিকৃষ্ট।'

ইসলামে মান্নত বৈধ: কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা মান্নত শরিয়ত সম্মত বলে প্রমাণিত। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ বলেন: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ط 'যা কিছু তোমরা ব্যয় করো অথবা যা কিছু তোমরা মান্নত করো, আল্লাহ্ তা জানেন।' (সূরা বাকারা: আয়াত ২৭০)

আল্লাহ্ আরো বলেন: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ○

'অত:পর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে, তাদের মান্নত পূর্ণ করে এবং প্রাচীন গৃহের তাওয়াফ করে।' (সূরা হজ্জ: আয়াত ২৯)

আল্লাহ্ আরো বলেন: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ○ 'তারা মান্নত পূর্ণ করে এবং সে দিনের ভয় করে যার বিপত্তি হবে ব্যাপক।' (সূরা দাহ্‌র: আয়াত ৭)

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হুকুম পালনের মান্নত করে তার উচিত আল্লাহ্র হুকুম পালন করা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা করার মান্নত করে, তার আল্লাহ্র অবাধ্যতা করা অনুচিত।' (বুখারি ও মুসলিম, আয়েশা রা.)।

ইসলাম যদিও মান্নতকে বৈধ করেছে, তবে সে এটিকে পছন্দ করেনা। ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. মান্নত করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: মান্নত কোনো কল্যাণ বয়ে আনেনা। এ দ্বারা কেবল কৃপণতা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় খোঁজা হয়।' (বুখারি ও মুসলিম)।

মান্নত কখন শুদ্ধ হয় এবং কখন অশুদ্ধ: মান্নত যখন আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে করা হয় তখন শুদ্ধ ও কার্যকর হয় এবং তা পূরণ করা বাধ্যতামূলক। আর যখন আল্লাহ্র নাফরমানী ও গুনাহর কাজ করার মান্নত করা হয় তখন তা শুদ্ধ হয়না, যেমন কবরের উপর মান্নত করা, পাপাচারী লোকদের উদ্দেশ্যে মান্নত করা, মদ খাওয়া, হত্যা করা, নামায বর্জন করা বা পিতামাতাকে কষ্ট দেয়া ইত্যাদির মান্নত করা। এ ধরনের মান্নত করলে তা পূরণ করা ওয়াজিব তো নয়ই, বরং হারাম এবং এর জন্য কোনো কাফফারাও দিতে হয়না। কেননা এ জাতীয় মান্নত বৈধই হয়না। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, কোনো গুনাহ্র কাজে মান্নত চলেনা। (মুসলিম ইমরান ইবনে হুসাইন সূত্রে)।

শাফেয়ি ও মালেকি ফকিহগণসহ অধিকাংশ ফকিহের মতে কাফফারা ওয়াজিব, যাতে মান্নতকারী সতর্ক হয়। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদের মতে কাফফারা নেই।

যে মান্নত মুবাহ্: আগেই বলেছি, আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের উপযুক্ত ইবাদাত হলে মান্নত বৈধ, আর গুনাহ্র কাজের মান্নত বৈধ নয়। মুবাহ্ মান্নতের উদাহরণ এ রকম: 'এই রেলগাড়িতে চড়া বা এই কাপড় পরা আল্লাহর জন্য আমার উপর ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক'। অধিকাংশ আলিমের মতে এটা কোনো মান্নতই নয় এবং এ জন্য কোনো কাফফারা দিতে হবেনা।

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন: রসূলুল্লাহ্ সা. ভাষণ দেয়ার সময় জনৈক বেদুইনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সে রোদে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বললেন: তোমার কী হয়েছে? সে বললো: আমি মান্নত করেছি যে, রসূলুল্লাহ্ সা. -এর ভাষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি রোদে দাঁড়িয়ে থাকবো। রসূল সা. বললেন: এটা কোনো মান্নত নয়। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় এমন কাজের জন্যই একমাত্র মান্নত করা যায়।'

ইমাম আহমদ রা. বলেন: এ ধরনের মান্নতও কার্যকর। তবে মান্নতকারী ইচ্ছা করলে মান্নত পূরণও করতে পারে, নাও করতে পারে। তবে না করলে কাফফারা দেয়া বাধ্যতামূলক। আর 'রওযাতুন নাদিয়া' গ্রন্থের লেখক এই মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে বলেছেন, মুবাহ জিনিসের মান্নতও মান্নত রূপে আখ্যায়িত হবার যোগ্য এবং অন্য সকল মান্নতের ন্যায় এটাও পূর্ণ করা বাধ্যতামূলক। আবু দাউদ বর্ণিত এ হাদিসটি এই মতের সমর্থক: জনৈকা মহিলা বললো: 'হে রসূল, আমি মান্নত করেছি, আপনি যুদ্ধ থেকে অক্ষত ফিরে এলে আপনার মাথার উপর ঢোল বাজাবো'। তিনি মহিলাকে বললেন: তোমার মান্নত পূর্ণ করো।

ঢোল বাজানো যদি মুবাহ না হয়ে থাকে, তবে অবশ্যিই মাকরূহ বা মাকরূহের চেয়েও খারাপ। কোনো ক্রমেই তা ইবাদত নয়। যদি মুবাহ হয়ে থাকে তাহলে এ হাদিস দ্বারা মুবাহ কাজের মান্নত পূর্ণ করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। আর যদি মাকরূহ হয়ে থাকে, তাহলে মাকরূহ কাজের মান্নত পূরণ করার আদেশ দ্বারা তো মুবাহ কাজের মান্নত পূরণের বাধ্যবাধকতা অধিকতর সুষ্ঠুভাবেই প্রমাণিত হয়।

শর্তযুক্ত মান্নত ও শর্তহীন মান্নত: মান্নত কখনো শর্তযুক্ত হয়। আবার কখনো হয় শর্তহীন। শর্তযুক্ত মান্নত হয় তখন যখন কোনো সুখকর কিছু ঘটে বা বিপদ দেখা দেয় এবং মানুষ আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন ও বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে উদগ্রীব হয়ে পড়ে। যেমন বলে: আল্লাহ্ যদি আমার রোগীকে রোগমুক্ত করেন তবে আমি তিনজন মিসকীনকে আহার করাবো অথবা আল্লাহ্ যদি আমার অমুক আশা পূর্ণ করেন তবে আমি অমুক পুণ্যের কাজ করবো। এরূপ ক্ষেত্রে যে অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞা করা হয়, আশা পূরণ হলে তা পুরা করা অবশ্য কর্তব্য।

শর্তহীন মান্নত হলো, কোনো শর্তের সাথে যুক্ত না করেই কিছু করার প্রতিজ্ঞা করা। যেমন এরূপ বলা

যে, 'আমি আল্লাহ্‌র জন্য দু'রাকআত নামায পড়ার মান্নত করলাম।' এ ক্ষেত্রে যা প্রতিজ্ঞা করা হলো, তা পালন করা বাধ্যতামূলক। কেননা এটা রসূলুল্লাহ্ সা. এর এ উক্তির আওতায় পড়ে: 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র হুকুম পালনের মান্নত করে তাকে আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করতে হবে।'

মৃতদের নামে মান্নত: হানাফি ফকিহদের গ্রন্থাবলীতে আছে: সাধারণত অজ্ঞ লোকেরা মৃত ব্যক্তিগণের নামে যে সকল মান্নত করে এবং সম্মানিত আওলিয়াদের মাজারে নগদ টাকা পয়সা, মোমবাতি ও সুগন্ধী দ্রব্য ইত্যাদি দিয়ে তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে চায়, তা সর্ব সম্মতভাবে বাতিল ও হারাম। এই সব মৃত আওলিয়াগণের নামে কৃত মান্নতের উদাহরণ হলো এ রকম: 'হে আমার অমুক হুযুর, আমার অমুক খোয়ানো জিনিস যদি ফেরত পাই, অথবা আমার অমুক উদ্দেশ্য যদি সফল হয়, তাহলে আপনার নামে এতো পরিমাণ নগদ অর্থ, খাদ্যদ্রব্য, মোমবাতি বা সুগন্ধী দ্রব্য মান্নত করবো।' এ ধরনের মান্নত হারাম হওয়ার কারণ তিনটি:

১. এতে সৃষ্টির নামে মান্নত করা হয়। অথচ সৃষ্টির নামে মান্নত জায়িয নেই। কেননা মান্নত একটা ইবাদত এবং ইবাদত পাওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কারো নেই।

২. যার নামে মান্নত করা হয়েছে সে মৃত। আর মৃত ব্যক্তির কোনো মালিকানা স্বত্ব থাকেনা।

৩. মান্নতকারী যদি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো মৃত ব্যক্তির কোনো কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা আছে, তাহলে তার এই বিশ্বাস প্রত্যক্ষ কুফরী। এ থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাওয়া উচিত।

অবশ্য যদি কেউ বলে: হে আল্লাহ! তুমি যদি আমার অমুক রোগীকে রোগমুক্ত করো, কিংবা অমুক খোয়া যাওয়া জিনিস ফিরিয়ে দাও, বা আমার অমুক উদ্দেশ্য সফল করো, তাহলে আমি তোমার নামে অমুক ওলির মাজারের কাছে অবস্থানকারী দরিদ্র লোকদেরকে আহার করাবার মান্নত করলাম, অথবা অমুক মসজিদের জন্য বিছানা বা চাটাই কিনে দেয়া বা তাতে আলো জ্বালানোর খরচ নির্বাহ করা বা যারা উক্ত মসজিদের সেবায় নিয়োজিত আছে তাদেরকে অর্থ দানের মান্নত করলাম, তবে এতে দরিদ্রদের উপকারিতা নিহিত থাকায় তা জায়িয আছে। কেননা এখানে মান্নত আল্লাহ্‌র জন্যই করা হয়। আর মান্নতের অর্থ যাদের প্রাপ্য, তারা উক্ত প্রতিষ্ঠানের সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত থাকার কারণেই ওলি বা মসজিদের উল্লেখ করা হয়। এভাবে মান্নতকৃত অর্থ বা জিনিসপত্র কোনো ধনাঢ্য বা দরিদ্র নয় এমন সম্ভ্রান্ত, উচ্চপদস্থ, বা জ্ঞানী লোকের জন্য ব্যয় করা জায়িয নেই। শরিয়তে ধনী লোকদের জন্য কোনো অর্থ ব্যয় বিধিসম্মত নয়।

কোনো নির্দিষ্ট স্থানে ইবাদত করার মান্নত: কেউ যদি কোনো নির্দিষ্ট স্থানে নামায, রোযা, কুরআন পাঠ বা ইতিকাফ করার মান্নত করে, তাহলে দেখতে হবে সে নির্দিষ্ট স্থানটি শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো বিশেষ মর্যাদা বা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কিনা, যেমন তিনটি প্রধান পবিত্র মসজিদে (মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদুল আকসা) নামায পড়া। যদি তেমন কোনো বিশেষ মর্যাদা বা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হয়ে থাকে, তাহলে মানত পূরণ করা বাধ্যতামূলক। অন্যথায় বাধ্যতামূলক নয়।

শাফেয়ি মযহাব মতে কোনো ব্যক্তি যখন কোনো নির্দিষ্ট শহরের অধিবাসীদেরকে কোনো দান-সদকা দেয়ার মান্নত করে তবে তার উপর উক্ত শহরে মান্নত পূরণ করা বাধ্যতামূলক। আর যদি কোনো নির্দিষ্ট শহরে রোযা রাখার মান্নত করে, তবে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের পন্থা হিসাবে রোযা রাখা তো তার উপর বাধ্যতামূলক, কিন্তু রোযা রাখার স্থান হিসেবে সে শহর নির্দিষ্ট করা বাধ্যতামূলক নয়। সে অন্য যে কোনো স্থানেও রোযা রাখতে পারবে। আর যদি কোনো শহরে নামায পড়বে বলে মান্নত করে তবে এ জন্য ঐ শহরই নির্দিষ্ট হবেনা। সে অন্য কোথাও নামায পড়তে পারবে। কেননা স্থানভেদে নামাযে কোনো পার্থক্য নেই। তবে কেউ যখন মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদুল আকসা এই তিনটি মসজিদের কোনো একটিতে নামায পড়ার মান্নত করে, তখন এ তিনটি মসজিদের বিরাট মর্যাদার কারণে মান্নতকৃত মসজিদেই নামায পড়া বাধ্যতামূলক হবে। অবশ্য মসজিদুল হারামের মান্নত করলে সমগ্র হারাম শরীফের যে কোনো স্থানে নামায পড়লে মান্নত পূরণ হয়ে যাবে। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: 'তিনটি মসজিদ ব্যতীত

আর কোনো পবিত্র স্থানের উদ্দেশ্যে সফর করা চলবেনা। মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ ও মসজিদুল আকসা।'

সদকা মান্নতের স্থান নির্দিষ্ট করণের পক্ষে শাফেয়িদের দালিলিক প্রমাণ হচ্ছে, আমর ইবনে শুয়াইব রা. বর্ণিত হয়েছে: জনৈকা মহিলা রসূল সা. এর কাজে এসে বললো: হে রসূলুল্লাহ্, আমি মান্নত করেছি, জাহেলি যুগের মানুষ যে জায়গায় গবাদিপশু জবাই করতো, আমিও সেখানে একটা পশু জবাই করবো। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: কোনো মূর্তির নামে? মহিলা বললো: না । তিনি পুনরায় বললেন: কোনো দেবতার জন্য? মহিলা বললো, না। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, তাহলে নির্দ্বিধায় তোমরা মান্নত পূরণ কর।'

হানাফি ফকিহগণ বলেছেন: যে ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট স্থানে দুরাকআত নামায পড়া বা নির্দিষ্ট শহরের দরিদ্রদের মধ্যে সদকা বিতরণের মান্নত করবে, ইমাম আবু হানিফা ও তার দুই শিষ্যের মতানুসারে ঐ স্থান ব্যতীত অন্য স্থানেও তার মান্নত আদায় করা জায়িয। কেননা মান্নতের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। নৈকট্য অর্জনে কোনো নির্দিষ্ট স্থানের কোনো হাত নেই। আর যদি কেউ মসজিদুল হারামে দুরাকআত নামায পড়ার মান্নত করে, অত:পর সে তার চেয়ে কম মর্যাদা সম্পন্ন কোনো স্থানে বা একেবারেই মর্যাদাহীন স্থানে নামায পড়ে, তবে তাদের মতে মান্নত পূর্ণ হবে। কেননা আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন এবং তা যে কোনো স্থানে পূর্ণ হয়।

বিশেষ কোনো পুণ্যবান ব্যক্তির নামে মান্নত করা: যে ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট মহান ব্যক্তির দারিদ্র্য ও প্রয়োজনের কারণে তার জীবদ্দশায় তাকে সদকা দেয়ার মান্নত করে তবে এ মান্নত শুদ্ধ হবে। এটা পরোপকার ও জনসেবামূলক কাজ বলে গণ্য হবে, যার জন্য ইসলাম উৎসাহ দিয়েছে। কিন্তু তিনি যদি মৃত হন এবং মান্নতকারীর উদ্দেশ্য হয় উক্ত মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য চাওয়া ও তার দ্বারা নিজের চাহিদা পুরণ, তা হলে এটা হবে গুনাহের মান্নত, যা পুরণ করা নাজায়িয।

রোযার মান্নত করে ও তা পুরণে অক্ষম হলে: যে ব্যক্তি বিধিসম্মত রোযা রাখার মান্নত করে এবং তা পুরণে অসমর্থ হয় অত্যধিক বায়োবৃদ্ধ হওয়া বা নিরাময়ের আশা নেই এমন রোগের কারণে, তার জন্য রোযা না রাখা ও কসমের কাফফারা দেয়া অথবা প্রতি রোযা বাবদ একজন দরিদ্রকে আহার করানো বৈধ। কেউ কেউ বলেছেন: সতর্কতার খাতিরে তার কাফফারা দেয়া ও দরিদ্রকে আহার করানো এই দুটোই জরুরি।

আর্থিক সদ্কা প্রদানের শপথ: যে ব্যক্তি তার সমুদয় সম্পদ সদকা করার শপথ করে অথবা এরূপ বলে: 'আমার সম্পদ আল্লাহ্র পথে উৎসর্গীত' সে অধিকাংশ সম্পদ দান করার শপথকারী গণ্য হবে এবং তার উপর শপথের কাফফারা দেয়া বাধ্যতামূলক হবে। এটা ইমাম শাফেয়িরও মত। ইমাম মালেকের মতে, তাকে এক তৃতীয়াংশ সম্পদ দান করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেন: জমি ও গবাদি পশুসহ যে সম্পদে যাকাত ধার্য নেই, তা বাদে যে সম্পদে যাকাত ধার্য আছে তার সব দান করতে হবে।

মান্নতের কাফ্ফারা: মান্নতকারী যখন মান্নত পূরণে অসমর্থ বা মান্নত প্রত্যাহার করে, তখন তার উপর শপথের কাফফারা ধার্য হবে। উকবা ইবনে আমের রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: **'মান্নতের কাফ্ফারা যখন নির্ধারণ করা হয় না, তখন কসমের কাফ্ফারাই মান্নতের কাফ্ফারা।'** –(ইবনে মাজা, তিরমিযি, তিরমিযির মতে এটি বিশুদ্ধ হাদিস)।

রোযার মান্নত পুরণ করার আগেই মৃত্যু হলে

ইবনে মাজা বর্ণনা করেন, জনৈকা মহিলা রসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলো: আমার মা কিছু রোযার মান্নত করেছিলেন, কিন্তু তা পূরণের আগেই তিনি মারা গেছেন। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: তার উত্তরাধিকারীর উচিত তার পক্ষ থেকে রোযা রেখে দেয়া।

◆◆◆

তেত্রিশতম অধ্যায়

ব্যবসা

জীবিকা অন্বেষণে অতি প্রত্যুষে বের হওয়া: ইমাম তিরমিযি সাখার গামেদি থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'হে আল্লাহ, আমার উম্মতের প্রত্যুষে জীবিকা উপার্জনের চেষ্টায় বরকত দাও।' তিনি যখনই কোনো ছোট বা বড় বাহিনী কোথাও পাঠাতেন, দিনের প্রথম ভাগেই পাঠাতেন। সাখার একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি যখন কোনো ব্যবসায়ী বহর কোথাও পাঠাতেন দিনের প্রথম ভাগেই পাঠাতেন। ফলে তিনি ধনাঢ্যে পরিণত হন এবং বিপুল ধন-সম্পদ অর্জন করেন।

হালাল উপার্জন: আলি রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: আল্লাহ তাঁর বান্দাকে হালাল সম্পদ উপার্জনে ব্যস্ত দেখতে ভালোবাসেন (তাবারানি ও দায়লামি)।

মালেক ইবনে আনাম রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: প্রত্যেক মুসলমানের উপর হালাল অর্থ উপার্জন করা ওয়াজিব। (তাবারানি)।

রাফে' ইবনে খাদীজ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা.কে জিজ্ঞাসা করা হলো: হে রসূলুল্লাহ্, কোন্ উপার্জন অধিকতর পবিত্র? তিনি বললেন: মানুষ নিজ হাতে যা উপার্জন করে ও যে কোনো সৎ ব্যবসা। (আহমাদ, বায্যার, তাবারানি)। (অর্থাৎ যে ব্যবসা হারাম ও প্রতারণা থেকে মুক্ত। কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প হচ্ছে উপার্জনের মূল উৎস। তবে এর মধ্যে যেটি নিজ হাতে করা হয় এবং যে সম্পদ জেহাদ থেকে গনিমত হিসেবে অর্জিত হয় সেটা অধিকতর পবিত্র ও বরকতময়। আবার কারো কারো মতে ব্যবসা ও বাণিজ্যই অধিকতর পবিত্র ও বরকমতয় ব্যবস্থা।)

ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত শরিয়তের বিধি জানা ওয়াজিব: আয়-রোযগারের চেষ্টায় নিয়োজিত প্রত্যেকেরই কিভাবে আয়-রোযগার সঠিক ও হালাল হয় এবং কিভাবে হারাম ও ত্রুটিপূর্ণ হয় তা জানা অবশ্য কর্তব্য, যাতে তার লেনদেন সঠিক হয় এবং আয়-ব্যয় ত্রুটিমুক্ত হয়। বর্ণিত আছে, উমর রা. বাজারে ঘোরাফেরা করতেন, কোনো কোনো ব্যবসায়ীকে চাবুক মারতেন এবং বলতেন: 'যে ব্যক্তি শরিয়তের বিধান জানে সে ব্যতীত আমাদের বাজারে কেউ ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবেনা। কেননা যে শরিয়তের বিধান জানেনা, সে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সুদ খাবেই।'

আজকাল বহু মুসলমান লেনদেনের নিয়ম-কানুন জানার প্রয়োজন উপলব্ধি করেনা এবং এ দিকটি অবহেলা করে থাকে। তারা শুধু বাড়তি মুনাফা অর্জনে ও আয় বৃদ্ধিতেই উদগ্রীব থাকে এবং হারাম উপার্জনের তোয়াক্কা করেনা। এটা মারাত্মক অন্যায়। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর কর্তব্য, এ অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা, হালাল-হারাম বাছ-বিচার করে চলা, উপার্জনকে বৈধ ও হালাল রাখা এবং সাধ্যমত সন্দেহভাজন লেনদেনও এড়িয়ে চলা। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: 'প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা ফরয।' সুতরাং যে ব্যক্তি হালাল খাবার খেতে, হালাল সম্পদ উপার্জন করতে এবং মানুষের আস্থা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ইচ্ছুক, তার এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নু'মান ইবনে বশীর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'হালাল সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত এবং হারামও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত। এই দু'য়ের মাঝে কিছু সন্দেহজনক জিনিস রয়েছে। (যেগুলো সম্পর্কে শরিয়তে পক্ষে ও বিপক্ষে প্রমাণ রয়েছে এবং ফকিহদের মধ্য মতভেদ রয়েছে।) যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে বাঁচার জন্যে সন্দেহজনক জিনিস বর্জন করে তার সুস্পষ্ট হারাম থেকে রক্ষা পাওয়া অধিকতর নিশ্চিত হবে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক গুনাহের কাজ করার ধৃষ্টতা দেখায়, তার সুস্পষ্ট গুনাহতে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গুনাহের কাজগুলো আল্লাহ্র সুরক্ষিত চারণক্ষেত্র। যে ব্যক্তি এই চারণক্ষেত্রের নিকট দিয়ে ঘোরে তার এতে প্রবেশ করার সম্ভাবনা থাকে।' (বুখারি ও মুসলিম)।

ব্যবসার সংজ্ঞা: ব্যবসায়ের আভিধানিক অর্থ বিনিময় করা, তা যে ধরনেরই হোক না কেন। আর শরিয়তের পরিভাষায় দু'পক্ষের সম্মতিক্রমে একটি দ্রব্য দ্বারা অপর দ্রব্যের বিনিময় করা অথবা শরিয়ত সম্মত উপায়ে কোনো জিনিসের বিনিময়ে কোনো সম্পদ হস্তান্তর করা।

শরিয়তে ব্যবসার স্থান: কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা (মুসলিম জাতির সর্বসম্মত মত) দ্বারা ব্যবসা শরিয়ত সম্মত বলে প্রমাণিত। কুরআনে সূরা বাকারার ২৭৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا ‘আল্লাহ্ বেচাকেনাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।’

আর রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: ‘সর্বোত্তম উপার্জন হলো মানুষের শ্রম দ্বারা এবং যে কোনো সৎ (ভেজাল ও প্রতারণামুক্ত) ব্যবসা দ্বারা উপার্জন।’

রসূলুল্লাহ্ সা. এর যুগ থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম জাতি ব্যবসায়ের বৈধতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ঐকমত্য পোষণ করে এসেছে।

ব্যবসার বৈধতার যৌক্তিকতা: মহান আল্লাহ্ ব্যবসা তথা বেচাকেনাকে তাঁর বান্দাদের সুবিধার্থে বৈধ করেছেন। প্রত্যেক মানুষেরই খাদ্য বস্ত্র ইত্যাদির প্রয়োজন হয়ে থাকে। মানুষ যতোক্ষণ বেঁচে থাকে, ততোক্ষণ তার জীবন ধারণের জন্যে এ সব জিনিস একেবারেই অপরিহার্য। কোনো মানুষের পক্ষে একাকী নিজের জন্যে এ সব প্রয়োজনীয় জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত করে রাখা সম্ভব নয়। কেননা সে এ সব জিনিস অন্যের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে বাধ্য। এ জন্যে বিনিময়ের চেয়ে পূর্ণাংগ কোনো ব্যবস্থা নেই। সে অন্যের কাছে থাকা যে সব জিনিসের মুখাপেক্ষী, তা তার কাছ থেকে গ্রহণের বিনিময়ে নিজের কাছে থাকা যে সব জিনিস তার অপ্রয়োজনীয়, তা তাকে দেবে। এটাই বিনিময় পদ্ধতি এবং এটাই ব্যবসার মূলকথা।

বৈধভাবে ব্যবসা সম্পন্ন হওয়ার ফল: ব্যবসার চুক্তি, তার মূল উপাদানসমূহ ও শর্তাবলী সম্পন্ন হওয়ার ফল দাঁড়াবে এই যে, বিক্রেতা তার পণ্যের মালেকানা স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করতে বাধ্য হবে এবং ক্রেতা তার মূল্যের মালেকানা বিক্রেতার নিকট হস্তান্তর করতে বাধ্য হবে। সে সাথে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্যে তার নিকট যে জিনিসের মালেকানা হস্তান্তর হয়েছে, তা সর্ব প্রকার বিধি সম্মত ব্যবহার বৈধ হয়ে যাবে।

ব্যবসার উপাদান: ব্যবসা ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (সম্মতি দান বা গ্রহণ) দ্বারা সম্পন্ন হয়। ছোট-খাট জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় এর ক্ষেত্রে ইজাব ও কবুলের প্রয়োজন হয়না। পণ্য ও মূল্যের সরাসরি লেনদেনই যথেষ্ট। সমাজে প্রচলিত ও সুবিদিত রীতি-প্রথাই এ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। ইজাব ও কবুলের জন্য কোনো নির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা নেই। কেননা চুক্তির ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের উদ্দেশ্যই বিবেচ্য বিষয়, শব্দ নয়। (ব্যবসায় হচ্ছে মানুষের পারস্পরিক লেনদেনের আওতাভুক্ত এবং আন্তরিক সম্মতিই এর ভিত্তি। এই সম্মতি যদি গোপন ও অব্যক্ত থাকে, তবে তা অপর পক্ষের জানা সম্ভব নয়। এ জন্য অন্তরের সম্মতির অভিব্যক্তি ঘটে, এমন শব্দ বা বাক্যকে শরিয়ত সম্মতির প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে এবং তার উপরই শরিয়তের বিধি নির্ভরশীল বলে ঘোষণা করেছে। ইজাব হলো ক্রেতা ও বিক্রেতা এই দুই পক্ষের যে কোনো এক পক্ষ থেকে প্রথম প্রকাশিত প্রস্তাব। আর কবুল হলো প্রস্তাবের জবাবে অপর পক্ষ থেকে প্রকাশিত পরবর্তী বক্তব্য বা প্রতিক্রিয়া। প্রস্তাবক বা ইজাবকারী ক্রেতা বা বিক্রেতা যে কেউ হতে পারে। অনুরূপ কবুলকারীও যে কোনো পক্ষ হতে পারে।) যে শব্দ বা বাক্য বিনিময় ভিত্তিক লেনদেন এবং আদান-প্রদানে সম্মতি বুঝায় অথবা উভয় পক্ষের মধ্যে সম্মতিসূচক মনোভাব ব্যক্ত করে কিংবা মালেকানা স্বত্ব প্রদানের অর্থ জ্ঞাপনকারী কোনো লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় বা শব্দ উচ্চারিত হয়, তাতেও ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়। যেমন বিক্রেতা কর্তৃক বলা: বিক্রি করলাম, প্রদান করলাম, মালেকানা প্রদান করলাম, অথবা এটা তোমার, অথবা মূল্য দাও। কিংবা ক্রেতা কর্তৃক বলা ক্রয় করলাম বা গ্রহণ করলাম, বা সম্মত হলাম বা মূল্য নাও।

ইজাব ও কবুলের শর্ত: ইজাব ও কবুল হচ্ছে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যম। এই ইজাব ও কবুল বিশুদ্ধ হওয়া তিনটি শর্ত পূরণের উপর নির্ভরশীল:

প্রথমত উভয় পক্ষ একই বৈঠকে থাকা অবস্থায় কোনো ক্ষতিকর ব্যবধান ছাড়াই পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করবে।

দ্বিতীয়ত যে পণ্য ও মূল্যের উপর উভয় পক্ষের সম্মতি জরুরি, তার উপর উভয় পক্ষের ইজাব ও কবুলের মিল থাকা চাই। মিল না থাকলে ক্রয়বিক্রয় বৈধ হবেনা। সুতরাং বিক্রেতা যদি বলে: 'তোমার নিকট এই কাপড়খানি পাঁচ পাউন্ডে বিক্রয় করলাম।' আর ক্রেতা যদি বলে: 'আমি চার পাউন্ডে কিনতে রাজী', তাহলে দু'পক্ষের মধ্যে বিক্রয় সম্পন্ন হবেনা। কেননা ইজাব ও কবুলে মিল নেই। তৃতীয়ত ইজাব ও কবুল অতীতকাল বাচক বাক্য দ্বারা সম্পন্ন হওয়া চাই। যেমন বিক্রেতা বলবে: 'আমি বিক্রি করলাম' আর ক্রেতা বলবে: 'আমি রাজি হলাম' ভবিষ্যত বোধক শব্দ দ্বারা ইজাব ও কবুল করা হলে তা শরিয়তের দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতিশ্রুতি রূপে গণ্য হবে, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি নয়।

লিখিতভাবে ক্রয়বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন: মৌখিক ইজাব ও কবুল দ্বারা যেমন ক্রয়বিক্রয় সম্পন্ন হয়, তেমনি লিখিতভাবে প্রস্তাব প্রদান ও তা গ্রহণের মাধ্যমেও ক্রয়বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে থাকে। তবে লিখিতভাবে ক্রয়বিক্রয় সম্পাদনের শর্ত এই যে, এক পক্ষ অপর পক্ষ থেকে দূরে অবস্থান করবে অথবা লিখিতভাবে চুক্তি সম্পাদনকারী বোবা হওয়ার কারণে কথা বলতে সক্ষম হবেনা। যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে একই বৈঠকে অবস্থান করে এবং তাদের পরস্পরে বাক্যালাপে কোনো বাধাবিপত্তি বা ওযর না থাকে, তাহলে লিখিতভাবে ইজাব কবুল দ্বারা ক্রয়বিক্রয় সম্পন্ন হবেনা। কেননা এটা কথার বিকল্প বা সমকক্ষ নয়। কথা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা প্রকাশ্য ও স্বচ্ছ মাধ্যম। তবে বাক্যালাপের বিকল্প পথ অবলম্বনের যথার্থ কারণ থাকলে লিখিতভাবে ইজাব কবুল করা যাবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে শর্ত, যাকে উদ্দেশ্য করে লিখিত প্রস্তাব দেয়া হয়েছে সে যেন যে স্থানে চিঠিটা পড়া হয়েছে, সে স্থানে থাকা অবস্থায়ই তা গ্রহণ করে।

দূতের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন: বাক্যালাপ ও চিঠির মাধ্যমে যেমন ক্রয়বিক্রয় সম্পন্ন হয়, তেমনি তা দুই পক্ষের এক পক্ষের প্রেরিত দূতের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়। তবে শর্ত হলো, যার নিকট দূত পাঠানো হয়েছে সে বার্তা পাওয়ার অব্যবহিত পর তা গ্রহণ করবে। এ দুপন্থায় যখনই প্রস্তাব গৃহীত হবে তখনই ক্রয়বিক্রয় সম্পন্ন হবে, চাই প্রস্তাব প্রেরক প্রস্তাব গ্রহণের কথা জানুক বা না জানুক।

বোবার ক্রয়বিক্রয়: বোবারা যে সকল সুবিদিত পন্থায় ইশারার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে, সে ইশারার মাধ্যমেই ক্রয়বিক্রয় সম্পন্ন হয়, ঠিক যেমন মুখের কথা দ্বারা সম্পন্ন হয়। অবশ্য বোবা যদি লিখতে জানে, তবে ইশারার পরিবর্তে লেখার মাধ্যমেও ক্রয়বিক্রয় সম্পন্ন করতে পারবে। কোনো কোনো ফকিহ কিছু নির্দিষ্ট শব্দ দ্বারা ইজাব ও কবুল শুদ্ধ হওয়ার শর্ত আরোপ করলেও কুরআন ও সুন্নাহতে তার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

ব্যবসা শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী: ক্রয়বিক্রয় বা ব্যবসার কিছু শর্ত রয়েছে। ব্যবসার বিশুদ্ধতা ও বৈধতার জন্যে সেই শর্তাবলী পূরণ জরুরি। এই শর্তসমূহের কয়েকটি ক্রেতা-বিক্রেতার সাথে এবং অপর কতগুলো পণ্য বা মূল্যের সাথে সম্পৃক্ত। মূল্য: যা খোয়া গেলে বা নষ্ট হলে ক্রয়বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়না। হস্তান্তরের পূর্বে এর পরিবর্তন সাধনও বৈধ। পণ্য: যা নষ্ট হলে ক্রয়বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়না। এবং তার প্রাপ্যতা রহিত হয়না। ত্রুটিযুক্ত হলে তার ক্রয়বিক্রয় বাতিল হয়ে যায়। রদবদল করা জায়েয নেই।

ক্রেতা-বিক্রেতার শর্ত: ক্রেতা বা বিক্রেতা হওয়ার শর্ত হলো প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ও সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া। সুতরাং পাগল, মাতাল ও অপ্রাপ্তবয়স্কের ক্রয়বিক্রয় বা ব্যবসা সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন বৈধ নয়। যে পাগল মাঝে মাঝে সুস্থমস্তিষ্ক হয় এবং মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়, তার সুস্থাবস্থায় সম্পাদিত চুক্তি শুদ্ধ এবং অসুস্থাবস্থার চুক্তি অশুদ্ধ। তবে যে বালক বা কিশোর ভালোমন্দ বুঝে, তার সম্পাদিত চুক্তি অভিভাবকের অনুমোদন সাপেক্ষে বৈধ। অভিভাবক অনুমোদন করলে তা আইনত গ্রহণযোগ্য।

পণ্য সংক্রান্ত শর্ত: পণ্যের বৈধতার জন্য ছয়টি শর্ত রয়েছে: ১. পবিত্র হওয়া ২. উপকারী হওয়া ৩. ক্রেতা বা বিক্রেতার তার উপর মালেকানা স্বত্ব থাকা। ৪. হস্তান্তরযোগ্য হওয়া। ৫. পরিচিত হওয়া ৬. বিক্রীত পণ্য হস্তান্তরিত হওয়া। শর্ত কয়টির বিশদ বিবরণ নিম্নে দেয়া গেল:

প্রথম শর্ত: পণ্যের পবিত্র হওয়া জরুরি। কেননা জাবির রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: আল্লাহ্ মদ, মৃত জন্তু, শূকর ও মূর্তির বিক্রয় হারাম ঘোষণা করেছেন। লোকেরা বললো: হে রসূলুল্লাহ্ 'মৃত জন্তুর

চর্বির কথা কি ভেবে দেখেছেন? তা দ্বারা তো নৌকায় ও চামড়ায় রং দেয়া হয় এবং লোকেরা তা দ্বারা বাতি জ্বালায়।' রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: না, ওটা হারাম। অর্থাৎ এর বেচাকেনা হারাম। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. একই হাদিসে জনৈক ইহুদী কর্তৃক তা বিক্রয়ের নিন্দা করেছেন। এ কারণে ক্রয়বিক্রয় ব্যতীত মৃত জন্তুর চর্বির এমন ব্যবহার বৈধ, যা আহারের পর্যায়ে পড়েনা এবং মানুষের শরীরে প্রবেশ করেনা। সুতরাং এ দ্বারা চামড়ায় রং দেয়া ও বাতি জ্বালানো বৈধ। এ হাদিসের ব্যাখ্যা প্রসংগে আল্লামা ইবনুল কাইয়িম 'আলামুল মুওয়াক্কিঈন' নামক গ্রন্থে বলেন:

'মৃত জন্তুর চর্বি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা. এর উক্তি 'ওটা হারাম' সম্পর্কে দুটি বক্তব্য পাওয়া যায়: কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ এ সব কাজ হারাম। অন্যরা বলেন: এর অর্থ এটা বিক্রয় করা হারাম যদিও ক্রেতা তা এ সব কাজে ব্যবহারের জন্যেই আয় করে। এ দুটি বক্তব্য এ প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে হবে যে, প্রশ্নটা কি উল্লেখিত উপকারিতার জন্য বিক্রয় করা সংক্রান্ত, না উল্লিখিত উপকারিতা সংক্রান্ত? প্রথমেই চর্বির এ সকল উপকারিতাকে নিষিদ্ধ করার তথ্য জানাননি, যার পরিপ্রেক্ষিতে তারা এ প্রয়োজনীয়তা তাঁকে জানিয়েছে। বরং তিনি তাদেরকে শুধু এ কথাই জানিয়েছেন যে, চর্বি বিক্রি নিষিদ্ধ। আর এর ফলে তারা তাঁকে জানিয়েছে যে, তারা এ সব উপকারিতার জন্যই চর্বি বিক্রি করে থাকে। ফলে রসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে চর্বি বিক্রয় করার অনুমতি দেননি। কিন্তু তাদেরকে এ সব কাজে চর্বি ব্যবহার করতেও নিষেধ করেননি। কেননা কোনো জিনিসের বিক্রয় অবৈধ হলেও তার উপকারিতা গ্রহণ করা বৈধ হতেও পারে। এরপর রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'আল্লাহ্ ইহুদিদেরকে অভিসম্পাত করুন, আল্লাহ্ যখন মৃত জন্তুর চর্বি হারাম করলেন, তখন তারা তাকে দ্রবীভূত করে বিক্রয় করলো এবং তার মূল্য ভোগ করলো।'

প্রথমোক্ত তিনটি জিনিস অর্থাৎ মদ, মৃত জন্তু ও শূকরের বিক্রয় নিষিদ্ধ করার কারণ অধিকাংশ আলিমের মতে এগুলো অপবিত্র। এ থেকে প্রত্যেক অপবিত্র জিনিসই বিক্রয় করা হারাম সাব্যস্ত হয়। তবে হানাফি ও যাহেরি মাযহাবের ফকিহগণ যে সব জিনিসে শরিয়ত সম্মত উপকারিতা আছে, তার বিক্রয় বৈধ বলে মত দিয়েছেন। তারা বলেন: যে সকল গোবর ও বর্জ্য ক্ষেতখামারে ব্যবহার করা জরুরী এবং যা জ্বালানী বা সার হিসাবে উপকারী, তা বিক্রয় করা জায়িয।

তদ্রূপ, অন্য যে সব নাপাক জিনিস পানাহার ব্যতীত অন্যান্য কাজে ব্যবহারযোগ্য, তার বিক্রয় বৈধ, যেমন নাপাক তেল, যা দ্বারা বাতি জ্বালানো যায়, এবং রং দেয়া যায়। রং যদি কোনো কোনো কারণে নাপাক হয়ে যায়, তবে তা রং দেয়ার জন্য বিক্রয় করা যায়। বায়হাকি সহিহ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর রা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো: তেলে ইঁদুর পড়লে কি করা যাবে? তিনি বললেন: 'তা দ্বারা বাতি জ্বালাও ও চামড়ায় রং কর।' একবার রসূলুল্লাহ সা. মাইমুনা রা. এর একটা মৃত ছাগল দেখতে পেলেন। দেখেই বললেন: তোমরা এর চামড়া খুলে পাকিয়ে কাজে লাগাতে পারনি? লোকেরা বললো: হে রসূল, ওটা তো মৃত জন্তু। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: আল্লাহ্ তো শুধু ওটা খাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন। অর্থাৎ খাওয়া ব্যতীত অন্যান্যভাবে তা দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ। যতক্ষণ খাওয়া ব্যতীত অন্যান্য কাজে এ দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ থাকবে, ততোক্ষণ তা বিক্রয় করা বৈধ থাকবে, যদি তা বিক্রয়ের উদ্দেশ্য হয় বৈধ উপকার গ্রহণ করা।

তবে জাবির রা. বর্ণিত হাদিসের জবাব এই যে, ঐ নিষেধাজ্ঞা ছিলো প্রাথমিক যুগে। পরে যখন ইসলাম মুসলমানদের মনে বদ্ধমূল হয়েছে, তখন খাওয়া ব্যতীত অন্যান্য কাজে তার ব্যবহার অনুমোদিত হয়েছে।

প্রসংগত উল্লেখ্য, ফিকহুস সুন্নাহর প্রথম খন্ডে মদের অপবিত্রতা সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। মদ বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, মদ মানুষকে দেয়া আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত বিবেক– বুদ্ধি ছিনিয়ে নেয়। এ ছাড়া এর অন্যান্য ক্ষতি তো রয়েছেই, যা আমরা দ্বিতীয় খন্ডে আলোচনা করেছি। আর শূকর একে তো অপবিত্র, উপরন্তু তা এমন সব ক্ষতিকর রোগজীবাণু বহন করে, যা আগুনে ফুটালেও মরে না। এছাড়া শূকর লম্বা ক্রিমিও বহন করে, যা মানবদেহ থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য চুষে খায়। আর মৃত জন্তুর বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো অধিকাংশ জন্তুই কোনো না কোনো রোগেই মারা যায়। সুতরাং তার গোশত খাওয়া স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর। উপরন্তু এগুলোর প্রতি প্রত্যেক মানুষেরই মনে স্বাভাবিক ঘৃণা

ও বিতৃষ্ণার প্রবণতা তো রয়েছেই। আর যে সব জন্তুর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, সেগুলো অতি দ্রত বিকৃত হয়ে যায়। কারণ তাতে রক্ত আটকে থাকে। রক্ত আগুনে ফুটালেও মরে না, এমন রোগজীবাণুর জন্ম ও লালনের উৎকৃষ্টতম উৎস। একই কারণে প্রবাহমান রক্ত খাওয়া ও বিক্রয় করা হারাম।

দ্বিতীয় শর্ত: পণ্যটি উপকারী হওয়া চাই। সাপ, ইঁদুর ও কীটপতংগ, যার কোন উপকারিতা নেই, বিক্রয় করা জায়েয নেই। তবে বিড়াল, মৌমাছি, বাঘ, সিংহ ও শিকার করার যোগ্য এবং চামড়া দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এমন জন্তু বিক্রয় করা জায়েয। পরিবহনের জন্যে হাতি বিক্রয় করা জায়েয। অনুরূপ ময়ূর, তোতা ও সুদর্শন পাখিগুলো বিক্রয় করা বৈধ, চাই তার গোশত হালাল হোক বা না হোক। কেননা কিছু কিছু পাখির ডাক শোনা আনন্দ দায়ক। আবার কতক পাখি দেখে এ আনন্দ পাওয়া যায় এবং বৈধ বিনোদন হয়। শিকারের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যতীত কুকুর বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। কেননা রসূলুল্লাহ সা. এটা বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। তবে যে সকল কুকুরকে পোষ মানানো সম্ভব, যেমন পাহারার কুকুর ও কৃষিকাজে ব্যবহৃত কুকুর, সেগুলোর বিক্রয় ইমাম আবু হানিফার মতে জায়েয। কিন্তু আতা ও নাখয়ির মতে, শিকারী কুকুর ব্যতীত আর কোনো কুকুর বিক্রয় জায়েয নেই। যে কুকুর বিক্রয় করা অবৈধ, তা যদি কেউ হত্যা করে তবে ইমাম শওকানি বলেছেন: যে সকল ফকিহ্ কুকুর বিক্রয় করা অবৈধ বলেন, তাদের মতে, তার মূল্য দিতে সে বাধ্য নয়। আর যারা বিক্রয় করা বৈধ মনে করেন, তাদের মতে মূল্য দিতে বাধ্য। ইমাম মালিকের মতে কুকুর বিক্রয় করা অবৈধ, কিন্তু তার হত্যাকারী তার মূল্য দিতে বাধ্য। কোনো কোনো বর্ণনা মতে ইমাম মালেক কুকুর বিক্রয় করা মাকরূহ মনে করেন। ইমাম আবু হানিফা বলেন: কুকুর বিক্রয় করা জায়েয এবং তার হত্যাকারী তার মূল্য দিতে বাধ্য।

গানের যন্ত্র বিক্রয় করা: সংগীত ক্ষেত্রবিশেষে বৈধ। যে সংগীতের উদ্দেশ্য কোনো বৈধ উপকার অর্জন করা, তা গাওয়াও হালাল, শোনাও হালাল। এভাবে তা একটা বৈধ উপকারিতায় রূপান্তরিত হয় ও তার সাজসরঞ্জামের ক্রয়বিক্রয়ও জায়েয। এর সুনির্দিষ্ট কার্যকারিতা রয়েছে। বৈধ সংগীতের উদাহরণ:

১. শিশুদের সান্ত্বনা ও মন ভোলানোর জন্য গাওয়া মায়েদের গান।
২. বিভিন্ন পেশায় কর্মরতদের কাজের সময়ে গাওয়া গান, যাতে তাদের শ্রমের কষ্ট লাঘব হয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধি পায়।
৩. আনন্দোৎসবের প্রচার বৃদ্ধির লক্ষ্যে গাওয়া গান।
৪. উৎসবাদিতে আনন্দ প্রকাশের লক্ষ্যে গাওয়া গান।
৫. জিহাদে উদ্দীপনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গাওয়া গান।

অনুরূপ প্রত্যেক ইবাদতের জন্য প্রেরণা ও কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য গাওয়া গান। গান বা সংগীত কথা ছাড়া কিছু নয়। সংগীতের কথা ভালো হলে সংগীত ভালো। আর কথা খারাপ হলে সংগীত খারাপ। সংগীতে অশ্লীল, পাপ ও অনৈতিক কাজের প্ররোচনা থাকলে, ইবাদত থেকে উদাসীন করে দেয় এমন কথা থাকলে সে সংগীত হালাল থাকবেনা।

সংগীত মূলত হালাল। কেবল পাপ ও অশ্লীলতার প্ররোচক কথাই তাকে হালালের গণ্ডির বাইরে নিক্ষেপ করে। যেসব হাদিসে সংগীত নিষিদ্ধ বলা হয়েছে, সেগুলিকে এই প্রেক্ষাপটেই বিবেচনা করতে হবে।

সংগীত যে মূলত হালাল, তার প্রমাণ হলো:

১. ইমাম বুখারি ও মুসলিম আয়েশা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন: একবার ঈদের দিন আয়েশার রা. নিকট দু'জন দাসী গান গাইছিল ও ঢোল বাজাচ্ছিল। রসূলুল্লাহ সা. কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছিলেন। এ সময় আবু বকর রা. সেখানে এসেই দাসীদ্বয়কে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন। সংগে সংগে রসূলুল্লাহ্ সা. মুখ খুললেন এবং বললেন: 'হে আবু বকর, ওদেরকে গাইতে দাও। এখন ঈদের দিন।'

২. ইমাম আহমদ ও তিরমিযি বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. একটি যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর জনৈকা কৃষ্ণাংগ দাসী এসে বললো; 'হে রসূলুল্লাহ্, আমি মান্নত করেছি যে, আল্লাহ্ আপনাকে অক্ষতভাবে ফিরিয়ে আনলে আপনার সামনে বসে ঢোল বাজাবো ও গান গাইবো।' রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: মান্নত মেনে থাকলে বাজাও। অমনি সে ঢোল বাজাতে লাগলো।'

৩. বহু সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী সম্পর্কে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা গান ও বাজনা শুনতেন। সাহাবীদের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে জা'ফর এবং তাবেয়ীদের মধ্য থেকে উমর ইবনে আব্দুল আযীয, বিচারপতি শুরাইহ ও মদিনার মুফতি আব্দুল আযীয ইবনে মুসলিমার নাম উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় শর্ত: পণ্যটি বিক্রেতার মালেকানাভুক্ত অথবা মালিকের অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়া চাই, যাতে তার উপর ক্রয়বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে। অনুমতি পাওয়ার পূর্বে ক্রয়বিক্রয় হলে তা হবে 'ফুযুলি' ব্যবসা।

ফুযুলি ব্যবসা: ফুযুলি ব্যবসা হলো, যার নামে পণ্য ক্রয় বা বিক্রয় করা হয়, তার অনুমতি ছাড়া ক্রয় বা বিক্রয় করা। যেমন স্ত্রীর মালেকানাধীন পণ্য তার অনুমতি ব্যতীত বিক্রয় করা অথবা স্ত্রীর পণ্য তার অনুমতি ছাড়াই কোনো পণ্য ক্রয় করা, কিংবা কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির মালেকানাভুক্ত জিনিস তার অনুমতি ছাড়া বিক্রয় করা বা তার জন্যে তার অনুমতি ব্যতীত কিছু ক্রয় করা, যেমন সচরাচর হয়ে থাকে। ফুযুলি ব্যবসার চুক্তি বৈধ। তবে তার কার্যকারীতা মালেক বা তার বৈধ অভিভাবক বা উত্তরাধিকারীর অনুমতির উপর নির্ভরশীল ও অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। অনুমতি দিলে কার্যকরী হবে, না দিলে বাতিল হবে। উরওয়া বারেকী থেকে ইমাম বুখারি বর্ণিত এ হাদিসটি এর প্রমাণ: 'রসূলুল্লাহ্ সা. আমাকে এক দিনার দিয়ে তাঁর জন্য একটা ছাগল কিনতে পাঠালেন। আমি তাঁর জন্যে ঐ এক দিনার দিয়ে দুটো ছাগল কিনলাম। একটা এক দিনারে বিক্রয় করে রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট একটা ছাগল ও এক দিনার নিয়ে ফিরে এলাম। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: 'তোমার ব্যবসায়ে আল্লাহ্ বরকত দিন।'

ইমাম আবুদাউদ ও তিরমিযি হাকিম ইবনে হিযাম রা. থেকে বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ্ সা. তাঁকে (হাকিমকে) এক দিনার দিয়ে একটা কুরবানীর জন্তু ক্রয় করতে পাঠালেন। হাকিম একটা কুরবানীর জন্তু এক দিনার দিয়ে কিনে তা দুই দিনারে বিক্রয় করলেন। পুনরায় এক দিনার দিয়ে অন্য একটা জন্তু কিনে রসূলুল্লাহ্ সা. এর কাছে জন্তু ও দিনারটি নিয়ে ফিরে এলেন এবং এভাবে এক দিনার মুনাফা করলেন। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: 'আল্লাহ তোমার ব্যবসায় বরকত দিন।'

প্রথম হাদিসটিতে বলা হয়েছে, উরওয়া রসূলুল্লাহ্ সা. এর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর জন্য দ্বিতীয় ছাগলটি কিনলেন এবং তার অনুমতি ব্যতিরেকেই সেটি আবার বিক্রয় করলেন। পরে তিনি যখন রসূলুল্লাহ্ সা. এর কাছে ফিরে গেলেন এবং তাকে ব্যাপারটা জানালেন, তখন রসূলুল্লাহ্ সা. তার এ কাজ সঠিক হয়েছে বলে মত দিলেন এবং তার জন্যে দোয়া করলেন। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, দ্বিতীয় ছাগলটি কেনা ও তা বিক্রয় করা বৈধ হয়েছে। এ থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, বিনা অনুমতিতে অন্যের জিনিস ক্রয় ও বিক্রয় করা জায়েয। কেবল মালিকের অনুমতির উপর তার কার্যকারিতা নির্ভর করে যাতে তার এ কাজ ছাড়া মালিকের কোনো ক্ষতি না হয়।

আর দ্বিতীয় হাদিসে বলা হয়েছে যে, হাকিম ইবনে হিযাম প্রথমে একটি ছাগল কিনে তা বিক্রয় করেন এবং তা রসূলুল্লাহ্র সা. এর মালেকানাভুক্ত হলো। তারপর রসূলুল্লাহ্ সা. এর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর জন্য আরেকটি ছাগল কিনলেন। তাঁর এ কাজ রসূলুল্লাহ সা. অনুমোদন করলেন, তার নিয়ে আসা ছাগল কুরবানী করার আদেশ দিলেন এবং তার জন্যে দোয়া করলেন। এ থেকে জানা গেল যে, তাঁর প্রথম ছাগল বিক্রয় ও দ্বিতীয় ছাগল ক্রয় বৈধ হয়েছে। বৈধ না হলে তিনি তার কাজটির স্বীকৃতি দিতেন না এবং তাকে তার চুক্তি বাতিল করার আদেশ দিতেন।

চতুর্থ শর্ত: বিক্রীত বা ক্রীত পণ্যটি আইনত ও কার্যত হস্তান্তরযোগ্য হওয়া চাই। কার্যত হস্তান্তরযোগ্য নয়, এমন পণ্য বিক্রয় করা বৈধ নয়, যেমন পানিতে বিচরণরত মাছ। ইবনে মাসউদ রা. থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, তোমরা পানিতে থাকা মাছ ক্রয় করো না। কেননা এটা একটা ধোঁকা। হাদিসটি ইমরান ইবনুল হুছাইন রা. কর্তৃকও রসূলুল্লাহ্ সা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

ডুবুরীর সম্ভাব্য অর্জন ক্রয় করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন: একজন পেশাদার ডুবুরী বললো, এইবার ডুব দিয়ে যা পাবো তা তোমাকে এত টাকার বিনিময়ে দেব। মায়ের গর্ভে থাকা বাচ্চার ব্যাপারটিও তদ্রূপ। অনুরূপ ছুটে যাওয়া যে পাখি তার আবাস স্থলে ফিরে আসতে অভ্যস্ত নয়, তার ক্রয়বিক্রয়ও অবৈধ। আর যদি ফিরে আসতে অভ্যস্ত হয়, চাই রাতের বেলায়ই আসুক না কেন, তাহলেও অধিকাংশ

আলেমের মতে মৌমাছি ছাড়া অন্য কোনো পাখি ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. মানুষের কাছে যা নেই তার ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা ব্যতীত অন্য তিন ইমামের মতে, বাসা থেকে বিচ্ছিন্ন রেশম কীট ও মৌমাছির ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। যদি তা তার বাসায় আটক অবস্থায় থাকে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা তাকে দেখতে পায়।

হানাফিদের মতে মৌমাছি ব্যতীত অন্যান্য পাখি ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। কেননা তা হস্তান্তর করা সম্ভব। ষাঁড়, পাঁঠা, এবং উট, ঘোড়া ও অন্যান্য পুরুষ প্রাণীর বীর্য বিক্রয় করাও অবৈধ। ইমাম বুখারি প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সা. এটি নিষিদ্ধ করেছেন। কেননা এর কোন আকার-আয়তন, পরিমাণ ও মূল্য নির্দিষ্ট করা বা জানা যায় না, এবং হস্তান্তর করাও সম্ভব নয়। অধিকাংশ আলেমের মতে, প্রজনন কাজে পুরুষ জন্তু বিক্রয় ও ভাড়া দেয়া হারাম। তবে শর্ত আরোপ ব্যতীত পুরুষ প্রাণীর দ্বারা প্রজননের জন্যে স্বেচ্ছায় যা দেয়া হয়, তাতে আপত্তি নেই। ইমাম মালেক, হাম্বলী ও শাফেয়িদের একটি দল এবং ইমাম হাসান ও ইবনে সিরীনের মতানুসারে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে যৌন সংগমের উদ্দেশ্যে ষাঁড় ভাড়া দেয়া জায়েয আছে। অপর দিকে অজ্ঞতা ও অস্বচ্ছতার কারণে গাভীর ওলানে থাকা দুধ দোহনের আগে বিক্রয় করা জায়েয নয়।

ইমাম শওকানী বলেছেন: অবশ্য কেউ যদি নির্দিষ্ট পরিমাণে বিক্রয় করে তবে তা বৈধ। যেমন বিক্রেতা যদি বলে: 'আমার গাভীর দুধ থেকে তোমার নিকট এক সা' বিক্রয় করলাম। এ ধরনের বিক্রয় জায়েয হওয়ার পক্ষে হাদিস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা এখানে অজ্ঞতা, অস্বচ্ছতা ও প্রবঞ্চনার অবকাশ থাকেনা। অণুরূপ, ধাত্রীর স্তনের দুধও প্রয়োজনে বিক্রয় করা জায়েয আছে। কিন্তু পশুর পিঠে থাকা অবস্থায় পশম বিক্রয় করা জায়েয নেই। কেননা এখানে বিক্রীত পণ্য ও অবিক্রীত পণ্য মিশ্রিত থাকায় পণ্য হস্তান্তর সম্ভব নয়।

এক বর্ণনা অনুযায়ী কেটে দেয়ার শর্তে পশুর পিঠের পশম বিক্রয় করা জায়েয আছে। কেননা এতে বিক্রীত পশমের পরিমাণও জানা থাকে এবং তা হস্তান্তর করাও সম্ভব।

ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. স্বাদ আস্বাদন করা বা চেখে দেখার পূর্ব পর্যন্ত খোর্মা বিক্রয়, পিঠের উপর থাকা অবস্থায় পশম বিক্রয় এবং দুধের ভেতরে থাকা অবস্থায় ঘি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। (দারা কুতনি) আর যে পণ্য আইনত হস্তান্তর করা সম্ভব নয়, যেমন বন্ধকী ও ওয়াকফকৃত বস্তু, তা বিক্রয় বৈধ নয়। পশু ও তার শিশু সন্তানের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দুটোর একটি বিক্রয় করাও বৈধ নয়। কেননা রসূলুল্লাহ সা. পশুকে নির্যাতন করতে নিষেধ করেছেন। তবে কোনো কোনো আলেমের মতে এটা জায়েয, যেমন পশুকে যবাই করা জায়েয। এই মতটিই অগ্রগণ্য। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ বিক্রয় করা অধিকাংশ ফকিহের মতে জায়েয। তবে ঋণগ্রস্ত নয় এমন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করা হানাফি, হাম্বলি ও যাহেরি মযহাব অনুসারে জায়েয নয়। কেননা বিক্রেতা বিক্রীত ঋণ ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করতে সক্ষম নয়। ঋণগ্রস্তের উপর হস্তান্তরের শর্ত আরোপ করা হলে তা-ও জায়েয নয়। কেননা এটা অবিক্রেতার উপর শর্ত আরোপের শামিল। এ ধরনের শর্ত অবৈধ এবং অবৈধতার কারণে বিক্রয়ও অবৈধ হতে বাধ্য।

পঞ্চম শর্ত: পণ্য ও তার মূল্য জ্ঞাত হওয়া চাই। দুটোই যদি অজ্ঞাত হয় অথবা দুটোর একটা অজ্ঞাত হয়, তাহলে বিক্রয় বৈধ হবেনা। কেননা এতে অস্বচ্ছতা ও প্রবঞ্চনার অবকাশ রয়েছে। নির্দিষ্ট পণ্যকে চাক্ষুস দর্শন করাই পণ্য সম্পর্কে অবগতির জন্য যথেষ্ট হবে, চাই তার পরিমাণ জানা হোক বা না হোক, যেমন গুচ্ছ বিক্রয় বা নিলাম বিক্রয়ে হয়ে থাকে। তবে যে পণ্য কারো দায়িত্বে রক্ষিত আছে, তার মান ও পরিমাণ ক্রেতা ও বিক্রেতার জানা অপরিহার্য। আর মূল্যের মান কেমন, পরিমাণ কতো ও তা প্রদানের মেয়াদ কি, জানা জরুরি। যে পণ্য চুক্তি সম্পাদনের বৈঠকে অনুপস্থিত, যে পণ্য দর্শন করা কষ্টকর বা ক্ষতির ঝুকিপূর্ণ এবং যে পণ্য গুচ্ছ ধরে বিক্রয় হয়, সে পণ্যের বেচাকেনা সম্পর্কে আলাদা আলাদা বিধিমালা রয়েছে। এই বিধিমালা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

যে পণ্য চুক্তি সম্পাদনের বৈঠকে অনুপস্থিত: চুক্তি সম্পাদনের বৈঠকে অনুপস্থিত এমন পণ্যের বিক্রয় এ শর্তে জায়েয যে, তার সম্পর্কে যথাযথ তথ্য জ্ঞাত হওয়া যায় এমন বিবরণ প্রদত্ত হওয়া চাই।

পরে যদি দেখা যায়, বিবরণের সাথে পণ্যের মিল রয়েছে, তা হলে ক্রয়বিক্রয়ের চুক্তি বাধ্যতামূলক হবে। আর যদি গরমিল পাওয়া যায় তবে ক্রেতা বা বিক্রেতা উভয়েরই চুক্তি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা থাকবে। ইমাম বুখারি প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর রা. বলেন: আমি আমীরুল মুমিনীন উসমান এর নিকট ওয়াদিতে একটা জমি তার খয়বরের একটা জমির বিনিময় বিক্রয় করেছি।' আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি কোনো জিনিস না দেখে খরিদ করে, দেখার পর সে তা ফেরত দিতে পারবে। (দারা কুতনি, বায়হাকি)

দেখায় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে বা কষ্টকর, এমন পণ্যের বিক্রয়: যে পণ্যের বিবরণ দেয়া হয় অথবা প্রথাসিদ্ধভাবে গুণাগুণ জানা যায়, সে পণ্যের বিক্রয় বৈধ। যেমন সংরক্ষিত খাদ্য, বোতলজাত ওষুধ, অক্সিজেন, বেনজিন বা গ্যাসের সিলিন্ডার ইত্যাদি, যা ব্যবহারের সময় ব্যতীত খোলা হয়না, কেননা তা খুললে ক্ষতি বা কষ্টের ঝুঁকি আছে। যে সকল শস্যের দানা বা ফল মাটির নীচে অদৃশ্য অবস্থায় থাকে যেমন আলু, পিঁয়াজ, ওল ইত্যাদি, এ সবও তদ্রূপ। কেননা এসব পণ্য এক সাথে সমস্তটা বের করে বিক্রয় করাও সম্ভব নয়, খুচরো খুচরোভাবেও বিক্রয় করা সম্ভব নয়। কেননা এটা একদিকে যেমন কষ্টসাধ্য, অন্যদিকে তেমনি এতে পণ্য নষ্ট ও ব্যবহারের অযোগ্য হয়েও যেতে পারে। সাধারণত এ সব পণ্য সুপ্রশস্ত ক্ষেতের উপর চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে বিক্রয় হয়ে থাকে। কারণ ক্ষেতের যে ফসল মাটির নীচে অদৃশ্যভাবে বিরাজ করে, তা যেখানে যেমন আছে সেভাবে ছাড়া বিক্রয় করা সম্ভবপর হয়না। আর যখন দেখা যায় যে, বিক্রীত পণ্যের নমুনার সাথে তার এত বেশি গরমিল রয়েছে যে, দু'পক্ষের যে কোনো এক পক্ষের ক্ষতির শিকার হতে হয়, তবে সে ইচ্ছা করলে চুক্তি বহাল রাখতেও পারবে, বাতিলও করতে পারবে। যেমন কেউ ডিম কিনে যদি দেখতে পায় তা নষ্ট তবে সে তা রাখতেও পারবে, ফেরতও দিতে পারবে।

এটা মালেকি মায্হাবের মত। আল্লামা ইবনুল কাইয়েম 'আলামুল মুওয়া ক্কিঈন' গ্রন্থে এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে এরূপ ক্ষেত্রে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। কারণ এতে ধোঁকা ও অস্বচ্ছতা রয়েছে, যা নিষিদ্ধ। হানাফি মযহাব অনুসারে বিক্রয় বৈধ; কিন্তু দেখার পর বাতিল করা যাবে।

গুচ্ছ বিক্রয়: অজ্ঞাত পরিমাণ পণ্যের আনুমানিক বিক্রয় রসূলুল্লাহ সা. এর আমলে সাহাবীদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো। ক্রেতা ও বিক্রেতা একটা পণ্য চাক্ষুসভাবে প্রত্যক্ষ করার পর ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পদন করতো। পণ্যের সঠিক পরিমাণ জানা না থাকলেও অভিজ্ঞ লোকেরা এমনভাবে অনুমান করতো যে, খুব কমই ভুল করতো। কিছুটা ঠকার ঝুঁকি থাকলেও তা এত সামান্য যে, সাধারণত তার প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করা হতো। ইবনে উমর রা. বলেন: লোকেরা বাজারের কেন্দ্র স্থলে খাদ্যদ্রব্য অনুমানের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করতো। রসূলুল্লাহ সা. তা ক্রেতাদের কাছে না আনা পর্যন্ত বিক্রয় করতে নিষেধ করেন। সুতরাং জানা গেল, রসূলুল্লাহ্ সা. আনুমানিকভাবে গুচ্ছ বিক্রয় অনুমোদন করেছেন, কেবল বাজারে নিয়ে আসার আগে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। ইবনে কুদামার মতে, ঝুঁড়ি ধরে বিক্রয় করা সর্বসম্মতভাবে বৈধ,পরিমাণ জানা থাক বা না থাক।

৬ষ্ঠ শর্ত: বিক্রীত পণ্য যদি কোনো কিছুর বিনিময়ে বিক্রেতার ব্যবহারাধীন এসে থাকে, তবে তা তার দখলেও আসা চাই। নচেত বিক্রয় বৈধ হবেনা। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। যা নিম্নরূপ:

উত্তরাধিকার ও ওছিয়ত সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ, গচ্ছিত সম্পদ এবং কোনো বিনিময় ব্যতীত অর্জিত হয়েছে এমন সম্পদ দখলে আসার আগে ও পরে বিক্রয় করা জায়েয আছে। অনুরূপ, যে ব্যক্তি কোনো জিনিস ক্রয় করেছে, তা তার দখলে আসার পর বিক্রয় করা, দান করা কিংবা তাতে অন্য যে কোনো আইনানুগ হস্তক্ষেপ বৈধ। আর দখলে আসার আগে বিক্রয় ব্যতীত অন্য সব হস্তক্ষেপ বৈধ। বিক্রয় ব্যতীত অন্য সব হস্তক্ষেপ বৈধ হওয়ার কারণ এই যে, ক্রেতা কেবল চুক্তির মাধ্যমে তার মালেকানা অর্জন করেছে এবং সে তার মালেকানাভুক্ত সম্পত্তিতে যা ইচ্ছা করতে পারে। ইবনে উমর রা. বলেছেন: সামগ্রিকভাবে যা কিছু ক্রয় চুক্তির আওতায় আসে, তা ক্রেতার সম্পত্তি এটাই প্রচলিত রীতি। (বুখারি)।

দখলে আসার আগে বিক্রয় বৈধ না হওয়ার কারণ হলো, প্রথম বিক্রেতার নিকট পণ্যটি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। তেমন কিছু সংঘটিত হয়ে থাকলে বিক্রয়টা হবে প্রবঞ্চনামূলক। আর প্রবঞ্চনামূলক বিক্রয় সব সময়ই অবৈধ। চাই পণ্য স্থাবর সম্পত্তি হোক বা অস্থাবর সম্পত্তি হোক এবং চাই তার পরিমাণ নির্দিষ্ট হোক বা অনির্দিষ্ট হোক। কেননা ইমাম আহমদ ও বায়হাকি বর্ণনা করেছেন, হাকিম ইবনে হিযাম বলছেন: হে রসূল সা. আমি তো কত কিছুই খরিদ করি। তার মধ্যে আমার জন্য কি কি হারাম ও কি কি হালাল? তিনি বললেন: তুমি যখন কোনো জিনিস খরিদ করবে, তখন তা দখল না করা পর্যন্ত বিক্রয় করবেনা।' ইমাম বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন: রসূলুল্লাহ্ সা. এর আমলে লোকেরা গুচ্ছহারে খাদ্য-শস্য কিনলে তা নিজ কাফেলায় না নেয়া পর্যন্ত বিক্রয় বন্ধ রাখা হতো। তবে দখলে আসার আগে স্বর্ণ কিংবা রূপার একটি অপরটির বিনিময়ে বিক্রয়ের বৈধতা এই মূলনীতির ব্যতিক্রম। ইবনে উমর রা. রসূলুল্লাহ্ সা.কে দিনারের বিনিময়ে উট বিক্রয় করা এবং তার বদলে দিরহাম নেয়া যাবে কিনা জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে এর অনুমতি দিয়েছেন।

দখলে আনার অর্থ: স্থাবর সম্পত্তিতে দখল সম্পন্ন হয় তখনই, যখন যে ব্যক্তির নিকট মালেকানা হস্তান্তরিত হয়েছে তাকে উক্ত সম্পত্তি দ্বারা তার ইচ্ছামত উপকৃত হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়, যেমন সে যদি জমিতে চাষবাস, বাড়িতে বসবাস, বৃক্ষের ফল আহরণ ইত্যাদি করতে চায়, তবে তা যেন করতে পারে। আর স্থাবর সম্পত্তি, যথা খাদ্য, বস্ত্র, প্রাণী ইত্যাদিতে দখল সম্পন্ন হবে নিম্নোক্ত পন্থায়:

১. পণ্য যদি পরিমাণযোগ্য হয় তবে মাপ বা ওজন দ্বারা মেপে তার পরিমাণ নির্ধারণ।
২. পণ্যের পরিমাণ অজানা হলে তা যেন সে পরিমাণ নির্ধারণ ছাড়াই যেখানে ইচ্ছা স্থানান্তর করতে পারে।
৩. অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দখল সম্পন্ন হবে।
স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ নির্ধারণ করার মাধ্যমে যে দখল সম্পন্ন হয়, তার প্রমাণ বুখারি বর্ণিত হাদিস:

রসূলুল্লাহ সা. উস্‌মান ইবনে আফ্ফান রা. কে বললেন: 'তুমি যখন মেপে দেয়ার শর্ত আরোপ করেছ, তখন মেপে দাও।' এ থেকে প্রমাণিত হলো, মাপা বা ওজন করার মাধ্যমে পরিমাণ নির্ধারণের শর্ত করা থাকলে সেভাবে পরিমাণ নির্ধারণ করা বাধ্যতামূলক। সুতরাং খাদ্যদ্রব্য হোক বা অন্য কিছু হোক, মাপ বা ওজন দ্বারা পরিমাপ যোগ্য যে জিনিসে মালেকানা স্বত্ব প্রচলিত হয়, তাতে পরিমাণ নির্ধারণের মাধ্যমে দখল প্রতিষ্ঠা জরুরি। পণ্যের স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয় ইবনে উমর রা. থেকে বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত নিম্নের হাদিস দ্বারা:

'ইবনে উমর রা. বলেন: আমরা আরোহীদের কাছ থেকে পরিমাণ নির্ধারণ ছাড়াই খাদ্যদ্রব্য কিনতাম। সে খাদ্য অন্যত্র স্থানন্তরিত করার আগে বিক্রি করতে রসূলুল্লাহ্ সা. আমাদের নিষেধ করেছেন।' এ বিধি শুধু খাদ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং অন্য যে সকল জিনিস পরিমাণ নির্ধারণ ছাড়া বিক্রয় হয়, সেগুলোতেও কার্যকর। এ ছাড়া অন্য যে সব জিনিস সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহ্র কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই, সেগুলোতে দখল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সমাজে প্রচলিত রীতি অনুসৃত হবে। যেখানে কুরআন ও সুন্নাহ্র নির্দেশ আছে, সেখানে সে নির্দেশ অনুসৃত হবে। আর যেখানে কুরআন ও সুন্নার নির্দেশ নেই, সেখানে প্রচলিত রীতি কার্যকর হবে।

এর যৌক্তিকতা: দখল সম্পন্ন হওয়ার আগে পণ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার যুক্তি এই যে, বিক্রেতা পণ্য বিক্রয় করার পর ক্রেতা দখলে না নেয়া পর্যন্ত পণ্যটি বিক্রেতার দায়ভুক্ত থাকবে। এরপর পণ্যটি নষ্ট হয়ে গেলে ক্ষতির দায় পড়বে বিক্রেতার ঘাড়ে, ক্রেতার ঘাড়ে নয়। ক্রেতা যখন এই অবস্থায় পণ্যটি অন্যের নিকট বিক্রয় করে এবং তাতে মুনাফা পায়, তখন সে এমন একটি পণ্যে মুনাফা পায়, যাতে সে ক্ষতির দায় বহন করেনি। এ বিষয়ে আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সা. এমন মুনাফা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, যাতে ক্ষতির দায় বহন করা হয়নি। তাছাড়া যে ক্রেতা তার ক্রীত পণ্য দখলে নেয়ার আগে বিক্রয় করে, সে ঐ ব্যক্তির মত, যে অন্য একজনের নিকট কিছু সম্পদ এই উদ্দেশ্যে প্রদান করে, যাতে সে তার কাছ থেকে অনুরূপ অন্য একটি সম্পদ একটু অধিকতর পরিমাণে গ্রহণ করতে পারে। এ ক্রেতা একই পণ্যকে সুকৌশলে দুটো চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করে, যার

ফলে এটা সুদের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়। ইবনে আব্বাস রা. এই চাতুরী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তাকে দখলে না আসা পণ্যের বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: 'এটা হলো দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম, আর খাদ্য তো বিলম্বে পাওয়া যাবে।'

বিক্রয় চুক্তিতে সাক্ষী রাখা: সূরা বাকারার ২৮২ নং আয়াতে আল্লাহ্ বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের সময় সাক্ষী রাখার আদেশ দিয়েছেন: وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ص وَلَايُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ○

'তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা করো, তখন সাক্ষী রেখো, লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।'

কিছু সংখ্যক ফকিহের মতে সাক্ষী রাখার আদেশটি এখানে মুস্তাহাব ও মংগলজনক কাজে উদ্বুদ্ধ করার অর্থ সংবলিত, বাধ্যতামূলক অর্থ সংবলিত নয়।

তবে আতা এবং ইবরাহিম নাখয়ির মতে যতো ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ জিনিসই হোক না কেন, তার বিক্রয়ে সাক্ষী রাখতেই হবে। আবু জাফর তাবারীর মতে এ মতই অগ্রগণ্য।

ইমাম জাসসাস 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে লিখেছেন: ফকিহদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনোই মতভেদ নেই যে, এ আয়াতে চুক্তি লিপিবদ্ধ করা, সাক্ষী রাখা ও বন্ধক রাখার যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তার সবই মুস্তাহাব অর্থ সংবলিত ও উপদেশমূলক এবং দীন ও দুনিয়ার স্বার্থে এগুলিকে কল্যাণকর, সতর্কতামূলক ও মংগলজনক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর কোনোটিই বাধ্যতামূলক নয়। মুসলিম শাসিত বহু অঞ্চলে প্রাচীন ও মধ্যযুগে বহু ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন চুক্তি সাক্ষী না রেখেই সম্পাদিত হয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে। অথচ তাদের অঞ্চলের ফকিহগণ এ আদেশের কথা জেনেও এর প্রতিবাদ করেননি। সাক্ষী রাখা যদি বাধ্যতামূলক হতো তবে এটা বর্জনকারীর বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ না করে ছাড়তেননা। এদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা এটিকে মুস্তাহাব মনে করতেন এবং এটা রসূলুল্লাহ্ সা. এর আমল থেকে আমাদের আমল পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে চলে আসছে। সাহাবি ও তাবিইদের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর যদি সাক্ষী রাখা হতো, তবে তার বর্ণনা অবশ্যই ব্যাপকভাবে সর্বোচ্চ দৃঢ়তা ও বিশ্বস্ততার সাথে লিপিবদ্ধ হতো এবং তারা সাক্ষী না রেখে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতিবাদ ও নিন্দা করতেন। কাজেই তাদের মধ্যে সাক্ষী রাখার বর্ণনা যখন ব্যাপকভাবে পাওয়া যায় না এবং এটি বর্জনের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদও উচ্চারিত হয়েছে বলে জানা যায় না, তখন প্রমাণিত হয় যে, লেনদেনে ও ক্রয়-বিক্রয়ে সাক্ষী রাখা ও লেখা বধ্যতামূলক নয়।

বিক্রয়ের উপর বিক্রয়: বিক্রয়ের উপর বিক্রয় করা হারাম। কেননা ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'তোমাদের একজন তার অপর ভাইয়ের বিক্রয়ের উপর যেন বিক্রয় না করে।' (আহমদ, নাসায়ি)।

বুখারি ও মুসলিম আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: কোনো ব্যক্তি যেন তার অপর ভাইয়ের বিক্রয়ের উপর বিক্রয় না করে।' ইমাম আহমদ, নাসায়ি, আবু দাউদ ও তিরমিযি বর্ণনা করেন এবং তিরমিযি এ বর্ণনাকে হাসান আখ্যায়িত করেছেন: দুই ব্যক্তির নিকট একই জিনিস বিক্রয় করলে পণ্যটি প্রথমজনের প্রাপ্য হবে।'

ইমাম নববীর বিশ্লেষণে এর উদাহরণ এ রকম: 'কোনো ব্যক্তি কোনো পণ্য এই শর্তে বিক্রয় করবে যে, ক্রেতার পুনর্বিবেচনার সুযোগ থাকবে। অত:পর আরেকজন এসে তাকে অনুরোধ করবে যেন সে চুক্তি বাতিল করে, যাতে তা আরো কম মূল্যে বিক্রয় করে। আর অন্যের ক্রয়ের উপর ক্রয় করার উদাহরণ হলো, বিক্রেতার পুনর্বিবেচনার সুযোগ থাকবে, অত:পর কেউ এসে তাকে চুক্তি বাতিল করার অনুরোধ করবে, তার বিক্রীত পণ্য তার কাছ থেকে অধিকতর মূল্যে কিনতে পারে। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এ আচরণ নিষিদ্ধ ও পাপ। তবে কেউ এ ধরনের ক্রয় ও বিক্রয় করলে তা কার্যকর হবে। এটা হানাফি, শাফেয়ি ও অন্যান্য ফকিহের মত। তবে যাহেরি মাযহাবের দাউদ ইবনে আলির মতে কার্যকর হবে না। ইমাম মালেক থেকে বর্ণিত দুটি মতের একটিতে কার্যকর এবং অপরটিতে অকার্যকর। তবে নিলাম

বিক্রয় এর ব্যতিক্রম। সে ক্ষেত্রে এটা জায়েয। কেননা সেখানে বিক্রয় স্থায়ী নয়। রসূলুল্লাহ্ সা. থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি কোনো পণ্য বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন করে বলতেন, কে বেশি মূল্য দেবে?

দু'জনের কাছে বিক্রয় করলে পণ্য প্রথম ক্রেতার প্রাপ্য: কেউ একটি পণ্য প্রথমে একজনের কাছে বিক্রয় করার পর পুনরায় আর একজনের কাছে বিক্রয় করলে শেষের বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। কেননা বিক্রেতা যে পণ্য বিক্রয় করেছে, সে তার মালেক নয়। সেটি প্রথম ক্রেতার মালেকানায় চলে গেছে। এরূপ ঘটনায় দ্বিতীয় বিক্রয় পুণর্বিবেচনায় মেয়াদের মধ্যে বা তার পরে সম্পন্ন হোক, তাতে কিছু যায় আসেনা। কেননা পণ্য বিক্রয় করা মাত্রই তার মালেকানা থেকে বের হয়ে গেছে। সামুরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'যে মহিলাকে দু'জন অভিভাবক বিয়ে দেয়, সে প্রথম অভিভাবকের। আর কেউ একই পণ্য দু'জনের কাছে বিক্রয় করলে তা প্রথম ক্রেতার।'

বাকি বিক্রয় ও নগদ বিক্রয়: নগদ মূল্য প্রদান ও বিলম্বে মূল্য প্রদান উভয় উপায়ে বিক্রয় জায়েয। মূল্যের একাংশ তাৎক্ষণিকভাবে ও অপরাংশ বিলম্বে প্রদানও উভয় পক্ষের সম্মতি থাকলে বৈধ। মূল্য বিলম্বে পরিশোধে বিক্রেতা মূল্য বৃদ্ধি করলে তা বৈধ হবে। কেননা বিলম্বের জন্য মূল্যের কিছু অংশ প্রাপ্য রয়েছে। এটা হানাফি, শাফেয়ি ও অধিকাংশ ফকিহের মত।

দালালি বৈধ: ইমাম বুখারি বলেছেন: ইমাম ইবনে সিরীন, আতা, ইবরাহিম নাখয়ী ও হাসান দালালিকে দুষণীয় মনে করেননি। বিক্রয়ের কাজকে সহজতর করার উদ্দেশ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতাকে দালালি বলা হয়। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন: কেউ যদি কাউকে বলে, 'এই কাপড়টি বিক্রয় করে দাও একশো টাকার বেশি যা হবে তা তোমার' তবে এতে দোষের কিছু নেই। ইবনে সিরীন বলেছেন: 'এ জিনিসটি পঞ্চাশ টাকায় বিক্রয় করে দাও, এতে যা মুনাফা হবে তা তোমার অথবা তা তোমার ও আমার' তাহলে কোনো দোষ নেই। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'মুসলমানরা তাদের আরোপিত শর্তের অধীন।' (আহমদ, আবু দাউদ, হাকেম, বুখারি)।

বল প্রয়োগ জনিত বিক্রয়: অধিকাংশ ফকিহ্ নিজের পণ্য বিক্রয়ে বিক্রেতার স্বাধীনতার শর্ত আরোপ করেছেন অবৈধভাবে কাউকে তারা বিক্রয়ে বাধ্য করলে বিক্রয় বৈধ হবেনা। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۟

'হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা। কিন্তু তোমাদের পরস্পরে সম্মত হয়ে ব্যবসায় করা বৈধ।' (সূরা ৪ নিসা: আয়াত ২৯)।

শরিয়তের পরিভাষায় ব্যবসা এমন যে কোনো চুক্তির নাম, যা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়, যেমন বিক্রয় চুক্তি, ভাড়ার চুক্তি, ইত্যাদি। কেননা সাধারণত এসব চুক্তিতে মুনাফা অর্জনই মানুষের লক্ষ্য হয়ে থাকে। সুতরাং ব্যবসা বিক্রয়ের চেয়ে ব্যাপকতর।

রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'বিক্রয় শুধু পারস্পরিক সম্মতিক্রমেই হতে হবে।' তিনি আরো বলেছেন: 'আমার উম্মতকে সকল ভুল, ত্রুটি ও বলপ্রয়োগজনিত কাজ থেকে দায়মুক্ত করা হয়েছে।' (ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান, দারা কুতনি, তাবারানি, বায়হাকি ও হাকেম)

তবে ন্যায়সংগতভাবে কাউকে তার সম্পত্তি বিক্রয়ে বাধ্য করা হলে বিক্রয় শুদ্ধ ও কার্যকর হবে, যেমন রাস্তা প্রশস্ত করণ, মসজিদ বা কবরস্তান নির্মাণের জন্য, ঋণ পরিশোধের জন্য, স্ত্রীর বা পিতামাতার খোরপোশ দেয়ার জন্য। এ সব ক্ষেত্রে বল প্রয়োগে বিক্রয় বৈধ হবে এবং শরিয়তের সম্মতিকে বিক্রেতার সম্মতি গণ্য করা হবে। আব্দুর রহমান ইবনে কা'ব বলেন: মুয়ায ইবনে জাবাল একজন দানশীল যুবক ছিলেন। তিনি নিজের জন্য কিছুই সঞ্চয় করতেন না। ফলে তিনি ক্রমাগত ঋণগ্রস্ত হতে থাকেন এবং একসময় তার সমস্ত সম্পত্তি ঋণে জর্জরিত হয়ে যায়। অবশেষে তিনি রসূলুল্লাহ্ সা. এর কাছে এলেন এবং তাকে ঋণ থেকে অব্যাহতি দিতে তার ঋণদাতাদেরকে রাযী করার জন্য রসূলুল্লাহ্ সা. কে অনুরোধ করলেন। কিন্তু রসূল সা. মুয়াযের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে তার ঋণ পরিশোধ করে দিলেন এবং মুয়ায

একেবারেই নি:স্ব হয়ে গেলেন। অথচ তাঁর ঋণদাতারা রসূলুল্লাহ্ সা. এর অনুরোধে তাকে অব্যাহতি দিতো, এমন সম্ভাবনা ছিলো।

উপায়হীনের বিক্রয়: মানুষ কখনো কখনো ঋণ পরিশোধ করা অথবা কোনো আর্থিক প্রয়োজনে হাতে যা কিছু আছে তা ন্যায্য মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হয়। এ ধরনের বিক্রয় জায়েয আছে, তবে মাকরূহ, কিন্তু বাতিল করা হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধান হলো, বিপাকে পড়া ব্যক্তিকে সাহায্য করা ও ঋণ দেয়া, যাতে আপতিত সংকট থেকে মুক্তি পায়। আবু দাউদে বর্ণিত আছে, বনু তামীমের জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি (নাম অজ্ঞাত) বলেছেন: আলি ইবনে আবু তালেব রা. আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে বললেন: অচিরেই মানুষের উপর একটা মর্মান্তিক যুগ আসবে, যখন ধনী লোকেরা তাদের হাতে যে সম্পদ আছে তা নিয়ে কৃপণতা করবে, অথচ তাদেরকে তা করতে বলা হয়নি। আল্লাহ্ বলেছেন: 'তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাশয়তার কথা ভুলে যাবে না।' (সূরা ২ বাকারা: আয়াত ২৩৭) সংকটাপন্ন লোকদের জিনিসপত্র ক্রয় করা হয়। অথচ রসূলুল্লাহ সা. উপায়হীন ব্যক্তির জিনিসপত্র বিক্রয়, ধোঁকা দিয়ে বিক্রয় ও অপরিপক্ক শস্য বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।'

অত্যাচারের ভয়ে বিক্রয়: কোনো অত্যাচারী তার সম্পত্তি গ্রাস করতে পারে এই ভয়ে কোনো ব্যক্তি তা বিক্রয় করে এবং বিক্রয়ের সকল শর্ত পূরণ করত চুক্তি সম্পাদন করলে, এ বিক্রয় শুদ্ধ হবেনা। কেননা ক্রেতা ও বিক্রেতা প্রকৃত পক্ষে ক্রয় ও বিক্রয় কামনা করেনি এবং তারা ভান করেছে মাত্র। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ির মতে সকল শর্ত পূরণ হওয়ায় বিক্রয় শুদ্ধ হয়েছে। ইবনে কুদামা বলেন, এ বিক্রয় অবৈধ।

নির্দিষ্ট অংশ বাদে পণ্য বিক্রয়: কেউ যদি পণ্যের অংশ বিশেষ বাদ দিয়ে বিক্রয় করে, যেমন একটা গাছ বাদ দিয়ে অন্য সব গাছ, একটা ঘর বাদ দিয়ে সমগ্র বাড়ি কিংবা একটা অংশ বাদ দিয়ে সমস্ত জমি বিক্রয় করে, তবে বিক্রয় বৈধ। তবে অবশ্যই বাদ দেয়া অংশ চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট হওয়া চাই। জাবির রা. সূত্রে বর্ণিত; যৌথ মালেকানার যমি ও যৌথ মালেকানার গাছের ফল বিক্রয় ও একাংশ বাদে কোনো সম্পত্তি বিক্রয় করতে হলে অংশ চিহ্নিত না করে বিক্রয় করতে আল্লাহ্র রসূল নিষেধ করেছেন।' একাংশ বাদ রেখে বিক্রয় করলে এবং সে অংশ অজানা থাকলে বিক্রয় বৈধ হবেনা। কেননা এতে অস্বচ্ছতা ও ধোঁকার সম্ভাবনা থাকে।

ওজন ও মাপ সঠিক করা: আল্লাহ মাপ ও ওজন পূর্ণ করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ

'তোমরা ন্যায়সংগতভাবে মাপো ও ওজন কর।' (সূরা আনআম: আয়াত ১৫২)

আল্লাহ্ আরো বলেন: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا○

'তোমরা মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দিবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে, এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট।' (সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত ৩৫) আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ○ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ○ وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ○ أَلَا يَظُنُّ أُولٰئِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ○ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ○ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ○

'মন্দ পরিণাম তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে মহা দিবসে, যেদিন সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে।' (সূরা ৮৩ মুতাফফিকীন: আয়াত ১-৬)

দাঁড়িপাল্লার ওজনে বেশি মাপা মুস্তাহাব: সুয়াইদ ইবনে কায়েস রা. বলেন: আমি ও মাখরাফা আল আবদী 'হাজর' থেকে কিছু বস্ত্র নিয়ে মক্কায় এলাম। তখন রসূলুল্লাহ্ সা. হেঁটে আমাদের নিকট এলেন এবং পাজামার ব্যাপারে আমাদের সাথে দর কষাকষি করলেন। অত:পর আমরা সেটি তাঁর নিকট

বিক্রয় করলাম। সেখানে এক ব্যক্তি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করছিল। রাসূলুল্লাহ্ সা. তাকে বললেন: 'ওজন কর এবং বেশি মাপ।' –(তিরমিযি, নাসায়ি ও ইবনে মাজা, তিরমিযির মতে এটি হাসান ও সহিহ্ হাদিস)।

ক্রয়-বিক্রয়ে সদাশয়তা: ইমাম বুখারি ও তিরমিযি জাবির রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: 'আল্লাহ সে ব্যক্তিকে কবুল করুন, যে ক্রয়-বিক্রয় ও নিজের প্রাপ্য দাবি করার সময় সদাশয়তা প্রদর্শন করে।'

প্রতারণাপূর্ণ বিক্রয়: প্রতারণাপূর্ণ বিক্রয় বলতে এমন যে কোনো বিক্রয়কে বুঝায়, যাতে কোনো অজ্ঞতা, ঝুঁকি অথবা কোনো ধরনের জুয়া নিশ্চিত থাকে। ইমাম নববী বলেছেন: প্রতারণাপূর্ণ বিক্রয় নিষিদ্ধ করা শরিয়তের অন্যতম মূলনীতি। এর আওতায় বহুসংখ্যক বিধি রয়েছে। তবে দুটো জিনিস প্রতারণাপূর্ণ বিক্রয়ের আওতা বহির্ভূত:

প্রথমত যা বিক্রীত পণ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং তা আলাদা করলে পণ্যের বিক্রয় শুদ্ধ হয়না, যেমন ভবনের সাথে ভবনের ভিত্তি বিক্রয় এবং জন্তু বিক্রয়ের সাথে তার ওলানের দুধ বিক্রয়।

দ্বিতীয়ত যা সাধারণত ধর্তব্য মনে করা হয় না এবং উপেক্ষা করা হয়। কারণ হয় তা অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য, নতুবা তা মূল পণ্য থেকে পৃথক করে রাছাই করা বা নির্দিষ্ট করা কষ্টকর। যেমন নির্দিষ্ট ফি দিয়ে গণ শৌচাগারে প্রবেশ করা, যদিও সেখানে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পরিমাণ সময় ও পানি ব্যয় করে (এ ক্ষেত্রে ব্যয়িত সময় ও পানির পরিমাণ ভেদে ফিতে কমবেশি করা সম্ভব নয়।) অনুরূপ সংরক্ষিত খাবার ও তুলা মিশ্রিত জুব্বা বিক্রয়। যে সকল ক্ষেত্রে প্রতারণা সংঘটিত হয়, শরিয়ত তার কিছু বিবরণ দিয়েছে। জাহেলি যুগের কয়েকটি রীতি এখানে উল্লেখ করা হলো:

১. পাথর ছুঁড়ে জমির আয়তন নির্ধারণপূর্বক বিক্রয় নিষিদ্ধ: জালিলী যুগের লোকেরা যে জমির আয়তন নির্ধারিত নেই, পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে তার আয়তন নির্ণয় করে বিক্রয় করতো, নিক্ষিপ্ত পাথর যেখানে গিয়ে পড়তো, সেখানেই চিহ্নিত হতো বিক্রীত জমির শেষ সীমা। কখনো বা পণ্য ক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট করতে পাথর ছুঁড়ে মারা হতো। যে পণ্যটির উপর পাথর পড়তো, সেটি ক্রয় করা হতো। একে বলা হতো পাথর ছুঁড়ে বিক্রয়।

২. ডুবুরির ডুবের ভিত্তিতে বিক্রয় নিষিদ্ধ: ডুবুরি ডুব দিয়ে সমুদ্রের তলদেশ থেকে যা আহরণ করে আনবে বলে আশা করা হয়, লোকেরা আগে থেকেই ডুবুরীর কাছ থেকে তা কিনে নিত। ক্রেতা ও বিক্রেতা এ চুক্তি মানতে বাধ্য থাকতো এবং ডুবুরি কিছু না পেলেও ক্রেতাকে নির্ধারিত মূল্য দিতে হতো। আর ডুবুরি যা আহরণ করতো তার মূল্য নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বহুগুণ বেশি হলেও বিক্রেতা তা ক্রেতাকে দিতে বাধ্য থাকতো।

৩. জন্তুর পেটের বাচ্চা বিক্রয় নিষিদ্ধ: গবাদি পশুর গর্ভস্থ সন্তান প্রসবের আগেই বিক্রয় করা এবং তার ওলানের মধ্যে থাকা দুধ বিক্রয় করাও নিষিদ্ধ।

৪. স্পর্শের ভিত্তিতে বিক্রয় নিষিদ্ধ: পণ্যটি কেমন তা না জানা সত্ত্বেও এবং পারস্পরিক সম্মতি না থাকা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষের কাপড় বা পণ্য স্পর্শ করলেই বিক্রয় করা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে–এরূপ শর্তের ভিত্তিতে বিক্রয় নিষিদ্ধ।

৫. ছুঁড়ে মারার ভিত্তিতে বিক্রয় নিষিদ্ধ: ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে নিজের কাছে যা আছে তা ছুঁড়ে মারবে এবং তার ভিত্তিতেই উভয় পক্ষের সম্মতি না থাকলেও বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে, এরূপ বিক্রয় নিষিদ্ধ।

৬. খাদ্যশস্য বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট পাত্র দিয়ে মেপে ক্ষেতের ফসল বিক্রয় নিষিদ্ধ।

৭. শস্য বিক্রয়ের নির্ধারিত পাত্র দিয়ে মেপে খেজুর বিক্রয় নিষিদ্ধ।

৮. কাঁচা ফল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে বিক্রয় নিষিদ্ধ।

৯. একইভাবে জন্তুর পিঠে থাকা অবস্থায় পশম।

১০. দুধের ভেতরে থাকা অবস্থায় ঘি বিক্রয় এবং

১১. বাছুরের পেটে যে বাচ্চা হবে তা অগ্রিম বিক্রয় নিষিদ্ধ। এ সব জিনিস বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো পণ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা, অস্বচ্ছতা এবং প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা।

কেড়ে নেয়া, জবর দখল করা ও চোরাই মাল বিক্রয় করা হারাম: একটি জিনিস অন্যের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে বলে জানা থাকা সত্ত্বেও তা ক্রয় করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর হারাম। কেননা বিক্রেতা জিনিসটি তার মালিকের কাছ থেকে ন্যায়সঙ্গতভাবে গ্রহণ করেনি। ফলে তা মালিকের মালেকানা থেকে তার হাতে হস্তান্তরিত হয়নি। তাই জিনিসটি তার কাছ থেকে ক্রয় করার সমার্থক হবে, যে তার মালেক নয়। উপরন্তু এই ক্রয় গুনাহ ও আগ্রাসনের সাথে সহযোগিতার নামান্তর হবে। ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি একটা চোরাই মাল ক্রয় করে, অথচ সে জানে যে, পণ্যটি একটা চোরাই মাল, সে ঐ গুনাহ ও কেলেংকারিতে জড়িত।

মদ উৎপাদকের নিকট আঙ্গুর ও গোলযোগ চলাকালে অস্ত্র বিক্রয় অবৈধ: আঙ্গুর থেকে মদ উৎপাদন করা যার পেশা, তার কাছে আঙ্গুর বিক্রয় করা, দেশে গোলযোগে চলাকালে যে কারো কাছে এবং যুদ্ধরত ব্যক্তিদের নিকট সর্বাবস্থায় অস্ত্র বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। অনুরূপ, যে জিনিস দ্বারা হারাম ও নিষিদ্ধ কিছু করা ইচ্ছা করা হয়, তা বিক্রয় করাও হারাম। এ ধরনের বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হলে তা বাতিল গণ্য হবে। কেননা চুক্তির উদ্দেশ্য হলো ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের উপকৃত হওয়া। এই উপকার সাধিত হতে পারে প্রাপ্ত বিনিময় হস্তগত হওয়ার মাধ্যমে। বিক্রেতা মূল্য পেয়ে ও ক্রেতা পণ্য পেয়ে উপকৃত হবে। অথচ এখানে কাংখিত উপকার সাধিত হচ্ছে না। কেননা এতে একটা নিষিদ্ধ কাজ সম্পন্ন এবং অন্যায় ও অপরাধ জনক-কাজে সাহায্য করা হচ্ছে, যা শরিয়তে অবৈধ। আল্লাহ বলেছেন:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ○

'তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ায় পরস্পরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমা লংঘনে একে অপরকে সাহায্য করো না।' (সূরা ৫ মায়িদা: আয়াত ২)

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: মদকে, মদ পানকারীকে, মদ পরিবেশনকারীকে, মদের ক্রেতা-বিক্রেতাকে, প্রস্তুতকারী, প্রস্তুত করার ব্যবস্থাকারী, প্রেরণকারী ও যার নিকট প্রেরণ করা হয়-এই সকল ব্যক্তিকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। রসূলুল্লাহ্ সা. আরো বলেছেন: যে ব্যক্তি আঙ্গুর পাড়ার মওসুমে আঙ্গুর আটকে রাখলো, যাতে আঙ্গুর দিয়ে মদ প্রস্তুতকারীর কাছে তা বিক্রয় করতে পারে, সে যেন জেনে শুনে নিজের দোযখে প্রবেশের ব্যবস্থা করলো।'

উমর ইবনুল হাসীন বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. গোলযোগের সময় অস্ত্র বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ির মতে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন বৈধ। কেননা এর উদ্দেশ্য অবৈধ হলেও প্রচ্ছন্ন। এ ক্ষেত্রে বিষয়টা আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ। তিনিই শাস্তি দেবেন।

ইবনে কুদামা বলেন: যে ব্যক্তি সম্পর্কে এটা নিশ্চিত যে, সে আঙ্গুরের নির্যাস দিয়ে মদ বানাবে, তার নিকট আঙ্গুরের নির্যাস বিক্রয় করা হারাম। ক্রেতার মদ বানানোর সুপ্ত ইচ্ছা তার কথাবার্তা বা গতিবিধি দ্বারা জানা গেলে বিক্রয় বাতিল ও হারাম হয়ে যাবে। আর যদি মদ বানানোর ব্যাপারটা কেবল সম্ভাবনার পর্যায়েই থাকে, যেমন যার পেশা বা অবস্থা মোটেই জানা যায় না, অথবা সির্কা ও মদ দুটোই তৈরি করা যার পেশা, এবং সে মদ বানানোর ইচ্ছা ব্যক্তকারী কোনো কথা বলে না, তার নিকট বিক্রয় করা বৈধ। এই বিধি সে সকল জিনিসেই প্রযোজ্য যা দ্বারা হারাম কাজ করার সংকল্প গৃহীত হয়। যেমন যুদ্ধরত লোকদের নিকট, বা ডাকাতদের নিকট বা গোলযোগের সময় যে কোনো ব্যক্তির নিকট অস্ত্র বিক্রয় করা। অনুরূপ, নিজের বাড়ি এ জন্য ভাড়া দেয়া যে, সেখানে মদ বিক্রয় করা হবে ইত্যাদি। এ সব বিক্রয় হারাম ও এর জন্য সম্পাদিত চুক্তি বাতিল।

হারাম বস্তুর সাথে মিশ্রিত বস্তু বিক্রয়: হালাল ও হারাম উভয় প্রকার বস্তু একত্রে বিক্রয়ের চুক্তি করা হলে সে সম্পর্কে দুটি মতামত রয়েছে। কেউ বলেন: হালাল বস্তুর উপর চুক্তি বৈধ এবং হারাম বস্তুর

উপর চুক্তি অবৈধ। এটা ইমাম শাফেয়ির দুটি মতের একটি এবং ইমাম মালেকের মত। আবার কেউ বলেন: উভয় বস্তু সংক্রান্ত চুক্তিই অবৈধ ও বাতিল।

অধিক শপথ করা নিষেধ: ১. রসূলুল্লাহ্ সা. অধিক শপথ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন: 'শপথ পণ্যকে চালু করে, কিন্তু তার বরকত গ্রাস করে।' (বুখারি, আবু হুরায়রা) কেননা এর ফলে আল্লাহর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা কমে যায়। তাছাড়া এটা ক্রেতাকে ঠকানো ও প্রতারণার একটা কৌশলেও পরিণত হয়।

২. ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন: 'সাবধান, বিক্রয় করার সময় অধিক পরিমাণে শপথ করো না। কেননা এতে ব্যবসায়ের প্রসার ঘটে, কিন্তু অচিরেই ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পায়।'

৩. রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'ব্যবসায়ীরা পাপিষ্ঠ।' লোকেরা বললো: হে আল্লাহ্র রসূল, আল্লাহ্ কি ব্যবসায়কে হালাল করেন নি? তিনি বললেন: হাঁ, করেছেন। কিন্তু তারা শপথ করে গুনাহ্ করে এবং কথা বলতে গিয়ে মিথ্যা বলে।' (আহমদ)।

৪. ইবনে মাস্উদ রা. সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের সম্পদের উপর অন্যায়ভাবে শপথ করবে, সে যখন আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করবে তখন তিনি তার উপর ক্রুদ্ধ থাকবেন। অত:পর রসূল সা.. এর প্রমাণস্বরূপ আমাদের সামনে আল্লাহ্র কিতাব থেকে একটি আয়াত শোনালেন:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُولٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ص وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ۝

'যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্য বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোনো অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না। তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।' (আলে ইমরান, ৭৭)

৫. ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন: জনৈক বেদুইন রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট এসে বললো: হে রসূলুল্লাহ্, কবিরা গুনাহ কী কী? তিনি বললেন: আল্লাহ্র সাথে শরিক করা। সে বললো: তারপর কী? তিনি বললেন: মিথ্যা শপথ করা। সে বললো: মিথ্যা শপথ কী? তিনি বললেন: কোনো মুসলমানের সম্পত্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে আত্মসাৎ করা। মিথ্যা শপথ শপথকারীকে জাহান্নামের আগুনে নিমজ্জিত করে। কোনো কোনো ফকিহের মতে এর কোনো কাফ্ফারা নেই। কেননা এটা এত জঘন্য ও মারাত্মক পাপ যে, কাফফারা দিয়ে তা মোচন করা সম্ভব নয়।

৬. আবু উমামা রা. সূত্রে বর্ণিত, রসূল সা. বলেন: যে ব্যক্তি শপথ দ্বারা কোনো মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করে, আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব ও জান্নাত হারাম করে দেন। এক ব্যক্তি বললো: হে রসূল, যদি তা অতি নগণ্য জিনিসও হয়? প্রত্যুত্তরে রসূল সা. বললেন: গাছের একটা মরা ডালও যদি হয়।' (মুসলিম)।

মস্জিদের অভ্যন্তরে ক্রয়-বিক্রয়: ইমাম আবু হানিফা র. মসজিদে ক্রয়বিক্রয়ের অনুমতি দিলেও বিক্রয়ের সময় মসজিদে পণ্য উপস্থিত করা মসজিদের পরিচ্ছন্নতার খাতিরে মাকরূহ গণ্য করেছেন। ইমাম মালেক ও শাফেয়ি মসজিদে ক্রয়বিক্রয়কে বৈধ কিন্তু মাকরূহ আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম আহমদ এটিকে হারাম আখ্যায়িত করেছেন। রসূল সা. বলেছেন: তোমরা কাউকে মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখলে বলবে: 'আল্লাহ্ যেন তোমার ব্যবসা লাভজনক না করেন।'

জুমুয়ার আযানের সময় বিক্রয়: ওয়াক্তিয়া নামাযের সময় যখন সংকীর্ণ হয়ে আসে এবং যখন জুমুয়ার আযান হয় তখন বিক্রয় হারাম। ইমাম আহমদের মতে এই বিক্রয় অশুদ্ধ। আল্লাহ্ বলেছেন:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

'হে মু'মিনগণ! জুমুয়ার দিন যখন নামাযের আহ্বান জানানো হয় তখন আল্লাহ্র স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করো। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা জানতে।' (জুমুয়া: ৯)।

জুমুয়ার ব্যাপারে এ নিষেধাজ্ঞার স্বাভাবিক দাবি এই যে, নিষেধাজ্ঞা লংঘনপূর্বক যে বিক্রয় সম্পন্ন হবে তা অশুদ্ধ হবে। অন্যান্য নামাযকেও এরই আলোকে বিচার করতে হবে।

তাওলিয়া, মুরাবাহা ও ওয়াযিয়ার বৈধতা: তাওলিয়া, মুরাবাহা ও ওয়াযিয়া এই তিন ধরনের বিক্রয় বৈধ। তবে শর্ত এই যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের নিকট পণ্যের ক্রয় মূল্য জ্ঞাত থাকা চাই। তাওলিয়া হচ্ছে পণ্যকে আসল ক্রয়মূল্যে কোনো লাভ-লোকসান ছাড়া বিক্রয় করা। আর মুরাবাহা হলো ক্রয় মূল্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভসহ বিক্রয় করা। আর ওয়াযিয়া হলো ক্রয়মূল্যের চেয়েও কম মূল্যে বিক্রয় করা।

কুরআন শরীফ ক্রয় ও বিক্রয়: সকল ফকীহ্ একমত যে, কুরআন মজীদ ক্রয় করা বৈধ। কিন্তু বিক্রয় করা বৈধ কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে। হাম্বলীদের মতে বিক্রয় অবৈধ। অবশিষ্ট তিন মযহাবে বৈধ। ইমাম আহমদ বলেন: কুরআন শরীফ বিক্রয়ে আমি কোনো বৈধতা পাই না।

মক্কার ঘরবাড়ি বিক্রয় ও ভাড়া দেয়া: ইমাম আওয়াযি, ইমাম সাওরি, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আবু হানিফার মতে এটা বৈধ।

পানি বিক্রয়: নদির পানি, সমুদ্রের পানি, ঝর্নার পানি ও বৃষ্টির পানি সকল মানুষের মালেকানাভুক্ত। এ সব পানিতে কারো কোনো অগ্রাধিকার নেই। এ সব পানি যতক্ষণ তার আধারে থাকবে ততক্ষণ ক্রয়-বিক্রয় চলবেনা। আবুদাউদের বর্ণনা মোতাবেক রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন:

মুসলমানগণ তিনটি জিনিসের উপর সম্মিলিত মালেকানার অধিকারী: পানি, আগুন ও ঘাস।' ইয়াস মাযানি বর্ণনা করেন, তিনি দেখলেন একদল মানুষ পানি বিক্রয় করছে। তিনি বললেন: 'তোমরা পানি বিক্রয় করোনা। কেননা আমি রসূলুল্লাহ সা. কে পানি বিক্রয় করতে নিষেধ করতে শুনেছি।' তবে যখন কোনো ব্যক্তি পানি সংরক্ষণ করে, তখন সে তার মালেক হয়ে যায় এবং তখন তা বিক্রয় করা বৈধ হয়ে যায়। তদ্রূপ যখন কেউ নিজ মালেকানাভুক্ত যমিতে কোনো পুকুর খনন করে কিংবা ভূগর্ভ থেকে পানি উত্তোলনের জন্য কোনো যন্ত্র ব্যবহার করে, তখন তার জন্য পানি বিক্রয় করা বৈধ হয়ে যায়। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. যখন মদিনায় এলেন, তখন সেখানে 'রুমার কুয়া' নামে জনৈক ইহুদির একটা কুয়া ছিল। সে ঐ কুয়া থেকে জনসাধারণের নিকট পানি বিক্রয় করতো। রসূলুল্লাহ সা. তার এই পানি বিক্রয় এবং তার নিকট থেকে মুসলমানদের পানি ক্রয় বহাল রাখলেন। এটা সেদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল যেদিন উসমান রা. কুয়াটি কিনে মুসলমানদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন। এরূপ পরিস্থিতিতে পানি বিক্রয় করা, জংগলের কাঠ কেটে মালেক হওয়ার পর তা বিক্রয় করার সাথে তুলনীয়। মালেক হওয়ার আগে জংগলের কাঠ সবার জন্য অনুমোদিত। যখন কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি তার মালেক হয়ে যায় তখন তা বিক্রয় করা বৈধ। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'তোমাদের কেউ যদি একটা রশি জোগাড় করে তা দ্বারা কাঠের আঁটি বানিয়ে মানুষের নিকট বিক্রয় করে তবে সেটা ভিক্ষা করার চেয়ে ভালো। ভিক্ষুককে কেউ কিছু দিতেও পারে, নাও দিতে পারে।'

পানি বিক্রয় করার সময় সেখানে পানির পরিমাণ নির্ধারণের কোনো উপকরণ যথা মিটার থাকলে তা দিয়ে পরিমাণ নির্ণয় করা শরিয়তে বৈধ। আর যদি পরিমাপের কোনো উপকরণ না থাকে তবে সমাজে যে রীতি-প্রথা প্রচলিত আছে তা অনুসরণ করা হবে। এ হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থার বিধি। কোথাও অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করলে সেখানে পানির মালিকের উপর বিনামূল্যে পানি বিতরণ করা বাধ্যতামূলক হবে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'কেয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্ কথা বলবেন না: যে ব্যক্তি নিজের উদ্বৃত্ত পানি পথিককে দিতে অস্বীকার করে, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে পণ্য বিক্রয় করে, আর যে ব্যক্তি শাসকের আনুগত্যের অংগীকার করার পর শাসক তাকে পারিতোষিক দিলে অংগীকার পূর্ণ করে, নচেৎ অংগীকার ভংগ করবে।'

মূল্য ফেরত দিলে পণ্য ফেরত এ শর্তে বিক্রয়: নগদ অর্থের অভাব মেটাতে এ শর্তে জমি বিক্রয় করা হয় যে, যখনই ক্রেতা মূল্য ফেরত দিতে পারবে, তখনই বিক্রেতা জমি ফেরত দেবে। এ

ধরনের বিক্রয় বন্ধকের সাথে তুলনীয় এবং বন্ধকের বিধিই এখানে অনুসৃত হবে বলে অধিকাংশ ফকিহ মনে করেন।

অর্ডার অনুযায়ী নির্মিত পণ্য ক্রয়: ক্রেতার আদেশ মোতাবেক বানানো পণ্য ক্রয় ইসলামের আগমনের পূর্ব থেকে প্রচলিত। সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ একমত যে, এটা জায়েয। এক পক্ষের প্রস্তাব ও অপর পক্ষের সম্পত্তি এ ধরনের ক্রয় চুক্তির মূল উপাদান ও ভিত্তি। প্রচলিত রীতি প্রথা অনুযায়ী যে সকল পণ্য এভাবে আদেশ ও চাহিদা অনুযায়ী নির্মাণপূর্বক বিক্রয় করা হয়, তার সব কটিতেই এ চুক্তি বৈধ ও শুদ্ধ। এ ধরনের চুক্তির ফলে ক্রেতা ক্রীত পণ্যের ও বিক্রেতা বিক্রীত মূল্যের বৈধ মালেক গণ্য হবে।

চুক্তির বিশুদ্ধতার শর্তাবলী: যে বস্তু নির্মাণের আদেশ দেয়া হবে তার জাত, শ্রেণী, মান ও পরিমাণ ইত্যাদির এমন স্বচ্ছ বিবরণ পূর্বাহ্নে দিতে হবে, যাতে কোনোই অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা না থাকে এবং বিবাদ বিসংবাদের অবকাশ না থাকে। বিক্রেয় পণ্য ক্রয়ের সময় ক্রেতার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে যে, হয় সে পণ্যটি পূর্ণ মূল্য দিয়ে গ্রহণ করবে অথবা দেখার অবকাশ নিয়ে বিক্রয় বাতিল করে দেবে, চাই পণ্যটি প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী পেয়ে থাকুক বা না পেয়ে থাকুক। এটা ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদের অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফের মতানুসারে পণ্যটি প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী পাওয়া গেলে আর ক্রেতার কোনো স্বাধীনতা থাকবে না, তাকে পণ্যটি নিতেই হবে, যাতে বিক্রেতা ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়। কেননা ঐ ক্রেতা ব্যতীত অন্য কেউ নির্ধারিত মূল্যে নাও নিতে পারে।

ফল ও শস্যাদি বিক্রয়: পরিপক্কতা দৃশ্যমান হওয়ার আগে ফলমূল বিক্রয় এবং আঁটি শক্ত হওয়ার আগে শস্য বিক্রয় বৈধ নয়। কেননা এতে উক্ত ফল ও ফসল নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে।

১. বুখারী ও মুসলিম র. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ্ সা. (ক্রেতা ও বিক্রেতাকে) পরিপক্কতা দৃশ্যমান না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

২. ইমাম মুসলিম ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. না পাকা খেজুরের ছড়া সাদা না হওয়া ও নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত না হওয়া পর্যন্ত খেজুর বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

৩. বুখারি আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: তুমি কি দেখতে পাও, অন্যের দ্রব্যে তোমাদের কারো হস্তক্ষেপের কারণে যদি আল্লাহ্ ফল উৎপাদন বন্ধ করে দেন? (অর্থাৎ পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে ফল পাড়লে অবশিষ্ট ফল পরিপক্ক না হয়েই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।)

পরিপক্কতা দৃশ্যমান হওয়ার আগে ফল এবং দানা শক্ত হওয়ার আগে শস্য তাৎক্ষণিকভাবে কেটে নেয়ার শর্তে বিক্রয় করা হলে এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব হলে ও একত্রিত করা না হলে বিক্রয় শুদ্ধ হবে। কেননা এমতাবস্থায় তা নষ্ট হওয়া ও তাতে বিকৃতি দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকেনা। আর যদি কেটে নেয়ার শর্তে বিক্রয় করা হয় অত:পর ক্রেতা পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত না কাটে, তাহলে কেউ বলেন, বিক্রয় বাতিল হবে, কেউ বলেন বাতিল হবেনা, বরং এ সময়ে শস্যে যে বৃদ্ধি হয়েছে, তাতে উভয়ে অংশীদার হবে।

মূল মালিক বা ভূমি মালিকের নিকট বিক্রয়: উপরোল্লিখিত বিধি মূল মালেক ব্যতীত ও ভূমি মালেক ব্যতীত অন্য কারো নিকট বিক্রয় করা সংক্রান্ত। পরিপক্কতা দৃশ্যমান হওয়ার আগে মূল মালিকের নিকট বিক্রয় করলে বিক্রয় শুদ্ধ হবে। অনুরূপ পরিপক্কতা দৃশ্যমান হওয়ার আগে মূলসহ ফল বিক্রয় করলেও বিক্রয় শুদ্ধ হবে। একইভাবে পরিপক্কাতা দৃশ্যমান হওয়ার আগে শস্য ভূমি মালিকের নিকট বিক্রয় করলে বিক্রয় শুদ্ধ হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে ক্রেতা তার ক্রীত পণ্য পুরোপুরিভাবে হস্তগত করেছে।

পরিপক্কতা কিভাবে চেনা যাবে?: খেজুরের পরিপক্কতা লাল হওয়া ও হলুদ হওয়া দ্বারা চেনা যায়। ইমাম বুখারি ও মুসলিম আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. পরিপক্ক হওয়ার আগে ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আনাস রা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ফলের পরিপক্কতা কী? তিনি বললেন: লাল হওয়া ও হলুদ হওয়া।

আঙ্গুরের পরিপক্কতা চেনা যাবে নরম হওয়া, মিষ্টি পানি বের হওয়া ও হলুদ হওয়া দ্বারা। কালো আঙ্গুরের ক্ষেত্রে কালো হওয়া দ্বারা অন্য সমস্ত ফলের পরিপক্কতার আলামত হলো খেতে সুস্বাদু হওয়া ও পরিপক্কতা

দৃশ্যমান হওয়া। জাবির রা. থেকে ইমাম বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন: রসূলুল্লাহ সা. সুস্বাদু না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। শস্যাদির পরিপক্কতা দানা বা আঁটি শক্ত হওয়া দ্বারা চেনা যায়।

পর্যায়ক্রমে পরিপক্কতা অর্জনকারী ফল বিক্রয়: ফল বা শস্যের একাংশ পরিপক্ক হলে পরিপক্ক ও অপরিপক্ক উভয় অংশ একত্রে বিক্রয় করার চুক্তি হয়ে থাকলে একত্রে বিক্রয় বৈধ। অনুরূপ পৃথক পৃথকভাবে বিক্রয় করার চুক্তি হয়ে থাকলেও পরিপক্ক হওয়ার পর এক সাথে সমগ্র ফল বা শস্য বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিলে তা করা বৈধ। এ অবস্থাটা কল্পনা করা যায় সে ক্ষেত্রে, যখন গাছ এমন শ্রেণীর হয়, যা পর্যায়ক্রমে ফল উৎপাদন করে। যেমন ফলের মধ্যে আম, সবজির মধ্যে শসা, এবং ফুলের মধ্যে গোলাপ ইত্যাদি। এ অভিমত সকল মালেকি ফকিহের এবং হানাফি ও হাম্বলি ফকিহদের একাংশের। তাদের যুক্তি-প্রমাণ নিম্নে দেয়া গেল:

১. পরিপক্কতা দৃশ্যমান হয়েছে এমন ফল বিক্রয়ের বৈধতা শরিয়তে প্রমাণিত। কাজেই যার পরিপক্কতা দৃশ্যমান হয়নি তা পরিপক্ক ফলের আওতাধীন হবে এটাই স্বাভাবিক। তদ্রূপ যা বর্তমানে বিদ্যমান তার উপর যে চুক্তি হবে, সে চুক্তি অবিদ্যমান বস্তুকেও তার আওতায় নিয়ে আসবে। যখন সমগ্র ক্ষেত বা বাগানের ফসল বিক্রয়ের চুক্তি হবে তখনকার জন্য এ বিধি প্রযোজ্য। অংশ বিশেষের জন্য চুক্তি হলে প্রত্যেক অংশের বিধি স্বতন্ত্র।

২. এই প্রকারের বিক্রয় যদি অবৈধ হয় তবে তা দুটো নিষিদ্ধ জিনিষকে অনিবার্য করে তুলবে: ক. বিতর্কের সৃষ্টি হওয়া। খ. দ্রব্যাদি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকা।

বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার কারণ এই যে, প্রায়শ: বিশালায়তন বাগান বা খামারের উপরই চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতা প্রথম পর্যায়ের উৎপন্ন ফসল এমন এক সময়ে কিনতে বাধ্য হয়, যা এতটা দীর্ঘায়িত হয় যে, দ্বিতীয় পর্যায়ের ফসলও তখন বিক্রয়যোগ্য হয়ে যায় এবং তাকে প্রথম পর্যায়ের ফসল থেকে পৃথক করা সম্ভব হয়না। ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হয় এবং তাদের একজন অন্য জনের পণ্য আত্মসাৎ করে।

আর দ্বিতীয় নিষিদ্ধ জিনিসটার উদ্ভব হয় এভাবে যে, বিক্রেতা সব সময় এমন ক্রেতা খুঁজে পায় না যে, প্রথম পর্যায়ের উৎপন্ন ফসল কিনবে। তাই এর ফলে তার পণ্য নষ্ট হওয়া অনিবার্য হয়ে উঠে। সুতরাং এ ধরনের পরিস্থিতিতে বিক্রয় বৈধ। একে অবৈধ বলে রায় দেয়া হলে তা কঠোরতা ও অচলাবস্থা সৃষ্টি করবে, যা নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে অপসারণ করা হয়েছে: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ○
'তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি।' (সূরা হজ্জ: ৭৮)

ইবনে আবেদীন এই বক্তব্যকে অগ্রগণ্যরূপে গ্রহণ করেছেন এবং তদনুসারে শরিয়তের বিধান প্রণয়ন করেছেন। অধিকাংশ ফকিহের মতে এরূপ ক্ষেত্রে চুক্তি অবৈধ এবং প্রত্যেক পর্যায়ের ফসল পৃথকভাবে বিক্রয় করা বাধ্যতামূলক।

শীষে থাকা অবস্থায় গম বিক্রয় করা: শীষে থাকা অবস্থায় গম, খোসার ভেতরে থাকা তরকারী, সবজি এবং সরিষা, চাল, নারিকেল, বাদাম ইত্যাদি বিক্রয় করা বৈধ। কেননা এর প্রত্যেকটি শস্য বিশেষ। কাজেই এটা শীষে থাকা অবস্থায় বিক্রয় করা সম্পূর্ণ বৈধ। তবে মনে রাখতে হবে, রসূলুল্লাহ্ সা. শীষ পেকে না যাওয়া ও দুর্যোগমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। যেহেতু এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় অনিবার্য প্রয়োজনেই করা হয়, তাই কিছুটা অস্বচ্ছতা থাকা সত্ত্বেও একে অব্যাহতি দেয়া হয়। এটা হানাফি ও মালেকি মযহাবের অভিমত।

দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতির দায় রহিত করা: খরা, ঠান্ডা ও পানির অভাব ইত্যাকার যে সব দুর্যোগের শিকার হয়ে ফসলাদি নষ্ট হয়ে থাকে এবং যেগুলিতে মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না, তার ব্যাপারে শরিয়তে কিছু নির্দিষ্ট বিধিমালা রয়েছে। যখন পরিপক্কতা দৃশ্যমান হওয়ার পর ফল বা ফসল বিক্রয় করা হয় এবং বিক্রেতা তা ক্রেতার নিকট এভাবে হস্তান্তর করে যে, ফসল ক্ষেতেই থাকবে এবং ক্রেতা যখন যেভাবে ইচ্ছা তা কেটে বা পেড়ে নিতে পারবে, অত:পর কাটা বা পাড়ার সময় সমাগত হওয়ার আগেই ঐ

ফসল দুর্যোগে নষ্ট হয়ে যায়, তখন তা বিক্রেতার দায় হিসাবে গণ্য হবে, ক্রেতার উপর তার মূল্য পরিশোধের দায় বর্তাবে না। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. দুর্যোগের দায় রহিত করার আদেশ দিয়েছেন। (মুসলিম কর্তৃক জাবের রা. থেকে বর্ণিত।) অন্য বর্ণনা মোতাবেক রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: 'যদি তুমি তোমার ভাই এর নিকট কোনো ফল বিক্রয় কর, অত:পর তা দুর্যোগের শিকার হয়, তবে তার মূল্য বাবদ কিছু গ্রহণ করা তোমার জন্য হালাল হবেনা। করলে তুমি তোমার ভাই এর সম্পদ অন্যায় ভাবে গ্রহণের দায়ে দোষী হবে।'

তবে মনে রাখতে হবে, এ বিধান শুধু সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন বিক্রেতা ফল বা ফসলের মূল উৎস বাদে বিক্রয় করে বা মূলের মালেক ব্যতীত অন্য কারো নিকট বিক্রয় করে অথবা ক্রেতা পণ্য হস্তগত করতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বিলম্ব করে। নচেৎ এ সব ক্ষেত্রে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির দায় ক্রেতাকে বহন করতে হবে। আর যদি ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দুর্যোগের কারণে না হয় বরং মানুষের কর্মদোষে সংঘটিত হয়, তাহলে ক্রেতা ইচ্ছা করলে ক্রয় বাতিল করে বিক্রেতার নিকট থেকে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে, অথবা যে ব্যক্তির কর্মদোষে ক্ষতি হয়েছে তার নিকট মূল্য দাবি করতে পারবে। এ মতটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আবু উবাইদ এবং মুহাদ্দিসগণের একটি দলের। ইবনুল কাইয়েম এ মতটিকে অগ্রগণ্য বলে গ্রহণ করেছেন। 'তাহযীবে সুনানে আবুদাউদ' নামক গ্রন্থে বলেন: 'অধিকাংশ আলিমের অভিমত এই যে, দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির দায় রহিত করার আদেশটি মুস্তাহাব অর্থে গ্রহীত এবং মহানুভবতা সূচক, বাধ্যতামূলক অর্থে নয়। ইমাম মালেক বলেন: একতৃতীয়াংশ বা তার বেশি ক্ষতি হলে তা রহিত করা হবে, তার কম হলে রহিত করা হবেনা। ইমাম মালিকের শিষ্যগণ বলেন: দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি একতৃতীয়াংশের কম হলে তা ক্রেতার দায় গণ্য হবে, এর বেশি হলে বিক্রেতার।

হাদিসটির আদেশকে মুস্তাহাব অর্থে গ্রহণের প্রমাণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, দুর্যোগটি সংঘটিত হয়েছে পণ্যের উপর ক্রেতার স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। কেননা এখন সে যদি পণ্যটি বিক্রয় বা দান করতে চায় তবে তা তার জন্য বৈধ হবে।

রসূলুল্লাহ্ সা. যে পণ্যের দায় স্বীকৃত হয়নি, তা থেকে মুনাফা অর্জন করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং ঐ পণ্য বিক্রয় করা যখন শুদ্ধ, তখন প্রমাণিত হলো যে, ওটা তার দায়ভুক্ত। ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ সা. কোনো ফল বা ফসলের পরিপক্কতা দৃশ্যমান হওয়ার আগে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং পরিপক্কতা দৃশ্যমান হওয়ার পর দুর্যোগের ক্ষতি যদি বিক্রেতার দায়ভুক্ত হতো, তাহলে এ নিষেধাজ্ঞা নিরর্থক হতো।

বিক্রয়ের শর্তাবলী: বিক্রয়ের শর্তাবলী দু ধরনের: এক, শুদ্ধ ও বাধ্যতামূলক, দুই, চুক্তি বাতিলকারী। প্রথমটি হলো, যা চুক্তির সাথে সংগতিপূর্ণ। এটি আবার তিন প্রকার:

১. যে শর্ত বিক্রয়ের অনিবার্য দাবি, যেমন পণ্য হস্তান্তর ও মূল্য পরিশোধ করা শর্ত।

২. বিক্রয় চুক্তির কল্যাণার্থে যে শর্ত আরোপিত হয়, যেমন মূল্য বাকি রাখা, কিংবা মূল্যের অংশ বিশেষ বাকি রাখা অথবা বিক্রীত পণ্যে সুনির্দিষ্ট কোনো বৈশিষ্ট্য থাকা চাই মর্মে শর্ত আরোপ, যেমন জন্তুটি দুধেল বা গর্ভবতী হওয়া চাই, অথবা পাখিটি শিকারী হওয়া চাই ইত্যাদি। শর্ত পাওয়া গেলে বিক্রয় অনিবার্য হয়ে যাবে। আর শর্ত পুরণ না হলে ক্রেতা চুক্তি বাতিল করতে পারবে শর্ত পুরণ না হওয়ার কারণে। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'মুসলমানরা তাদের শর্তের অনুগত থাকবে।' ক্রেতার এ অধিকারও থাকবে যে, যে বৈশিষ্ট্যটি থাকা চাই মর্মে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তা যে পরিমাণে অনুপস্থিত, সে অনুপাতে পণ্যের মূল্য কম দিতে পারবে।

৩. এমন কোনো শর্ত আরোপ করা, যাতে ক্রেতা বা বিক্রেতার কোনো উপকারিতা বা স্বার্থ সংরক্ষিত হয়, যেমন বাড়ি বিক্রয় করার চুক্তিতে এরূপ শর্ত আরোপ করা যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মালেক তা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে, যথা একমাস বা দু'মাস তাতে বসবাস করতে পারবে। অনুরূপ, কোনো জন্তু এই শর্তে বিক্রয় করা যে, একটা নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত বিক্রেতা তাতে আরোহণ করে যেতে পারবে। কেননা বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন: জাবির রা. রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট একটা উট বিক্রয় করেন এবং

মদিনা পর্যন্ত তার উপর আরোহণ করার শর্ত আরোপ করেন। অনুরূপ, ক্রেতাও বিক্রেতার নিকট সুনির্দিষ্ট উপকারিতা লাভের শর্ত আরোপ করতে পারে। যেমন একটা নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত তার বিক্রীত পণ্য বিক্রেতার বাহনে করে পৌঁছে দেয়া ইত্যাদি। স্থান নির্দিষ্ট না হলে শর্ত শুদ্ধ হবে না, যেমন ক্রেতার বাড়িতে পণ্য পৌছানোর শর্ত আরোপ করা হলো। কিন্তু বিক্রেতা তার বাড়ি চেনে না। তা হলে এরূপ শর্ত শুদ্ধ হবে না। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা জনৈক নারীর কাছ থেকে এক আঁটি জ্বালানী কাঠ এই শর্তে কেনে যে, সে তা বহন করে পৌছে দেবে। শর্তটি প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু বিক্রেতা তাতে আপত্তি করে নি। এটা ইমাম আহমদ, আওযায়ি, আবু সাওর, ইসহাক ও ইবনুল মুনযিরের অভিমত। ইমাম শাফেয়ি ও হানাফি মযহাবের মতে এ বিক্রয় শুদ্ধ হবেনা। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. শর্ত সাপেক্ষে বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু এ মতটি সঠিক নয়। কেননা রসূল সা. একাধিক শর্ত সাপেক্ষে বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।

দ্বিতীয় প্রকার শর্ত: অশুদ্ধ শর্ত: এ ধরনের শর্ত আবার কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা:

১. যা গোটা চুক্তিকেই বাতিল করে দেয়, যেমন এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষের নিকট অন্য একটি চুক্তি সম্পাদনের শর্ত আরোপ করা। উদাহরণ স্বরূপ, বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে বলা: 'তোমার নিকট বিক্রয় করলাম এই শর্তে যে, তুমি আমার নিকট অমুক জিনিসটি বিক্রয় করবে বা ধার দেবে।' এ ধরনের শর্ত আরোপ যে অবৈধ, তার প্রমাণ: রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: পূর্বশর্ত আরোপ করে বিক্রয় বা একাধিক শর্তে বিক্রয় জায়েয নেই।' (তিরমিযি কর্তৃক বর্ণিত ও সহীহ্ আখ্যায়িত) ইমাম আহমদ বলেন: অনুরূপ অর্থবোধক যে কোনো শর্ত অবৈধ, যথা কেউ যদি বলে: 'তোমার নিকট বিক্রয় করলাম এই শর্তে যে, তুমি তোমার মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দেবে বা তোমার সাথে আমার মেয়েকে বিয়ে দেব। এ জাতীয় সকল শর্ত অশুদ্ধ। এটা ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ি ও অধিকাংশ ফকিহের অভিমত। ইমাম মালেক এ ধরনের শর্ত আরোপিত বিক্রয়কে অনুমোদন করেছেন, কিন্তু আরোপিত শর্তকে বাতিল গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন: বিক্রয় যখন বৈধ, তখন যে অশুদ্ধ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রতি আমি ভ্রূক্ষেপ করি না।

২. যে শর্ত আরোপ করা সত্ত্বেও বিক্রয় শুদ্ধ হয়, কিন্তু শর্ত বাতিল হয়। এটা হচ্ছে এমন শর্ত, যা বিক্রয় চুক্তির পরিপন্থী, যেমন বিক্রেতা ক্রেতার নিকট শর্ত আরোপ করবে যে, সে এই পণ্য আর কারো নিকট বিক্রয় বা দান করতে পারবে না। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'আল্লাহ্র কিতাবের পরিপন্থী যে কোনো শর্ত বাতিল, চাই তা একশো শর্তই হোক না কেন।' (বুখারি ও মুসলিম) এটা ইমাম আহমদ, হাসান, শাবী, নাসায়ি, ইবনে আবি লায়লা ও সাওরের মত। কিন্তু আবু হানিফা ও শাফেয়ি বলেন: বিক্রয় বাতিল।

৩. যে শর্ত দ্বারা আদৌ বিক্রয় সম্পন্ন হয় না। যেমন বিক্রেতা যদি বলে: 'অমুকের সম্মতি সাপেক্ষে বিক্রয় করবো, অথবা তুমি অমুক জিনিস এনে দিলে বিক্রয় করবো।' অনুরূপ, ভবিষ্যতের কোনো শর্তের উপর নির্ভরশীল যে কোনো বিক্রয় অবৈধ ও অচল।

বায়না বিক্রয়: বায়না বিক্রয় হলো, ক্রেতা কর্তৃক মূল্যের একাংশ বিক্রেতাকে প্রদান করা। অত:পর বিক্রয় সম্পন্ন হলে মোট মূল্য থেকে প্রদত্ত অংশ বাদ যাবে। নচেৎ বিক্রেতা প্রদত্ত অংশকে ক্রেতার উপহার হিসাবে গ্রহণ করবে। অধিকাংশ ফকিহের মতে এ ধরনের বিক্রয় অশুদ্ধ ও অচল। কেননা ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন: রসূলুল্লাহ সা. বায়না বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। ইমাম আহমদ এ হাদিসকে দুর্বল আখ্যায়িত ও বায়না বিক্রয়কে বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। তিনি এর প্রমাণ স্বরূপ নাফে' ইবনে আব্দুল হারিস থেকে বর্ণনা করেন যে, নাফে' সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার নিকট থেকে উমর রা. এর জন্য কারাগৃহ খরিদ করেন চার হাজার দিরহামের বিনিময়ে। উমর রা. সম্মত হলে বিক্রয় সম্পন্ন হবে, নচেৎ সাফওয়ান চারশো দিরহাম পাবে। ইবনে সিরীন ও ইবনুল মুসাইয়্যাব বলেন: ক্রেতা যদি পণ্যটি অপছন্দ করে তবে তা যদি ফেরত দেয় এবং সেই সাথে আরো কিছু ফেরত দেয়, তবে দিতে পারে। ইবনে উমর রা. এ বিক্রয় বৈধ বলে রায় দিয়েছেন।

সকল দোষ সম্পর্কে দায়মুক্ত হওয়ার শর্তে বিক্রয়: যে কোনো অজানা দোষক্রটি সম্পর্কে বিক্রেতা দায়মুক্ত–এই শর্তে বিক্রয় করলেও বিক্রেতা দায়মুক্ত হবে না। ক্রেতা পণ্যে খুঁত পেলেই তা

ফেরত দিতে পারবে। কেননা কোনো খুঁত বা ত্রুটি আছে কিনা তা বিক্রয়ের পরেই প্রমাণিত হয়। কাজেই পূর্বাহ্নে দায়মুক্তি দেয়া সম্ভব নয়, তবে বিক্রেতা যদি পূর্বাহ্নে পণ্যের দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করে কিংবা চুক্তির পর ক্রেতা তাকে দায়মুক্ত করে তা হলে বিক্রেতা দায়মুক্ত হবে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. যায়েদ ইবনে সাবিতের নিকট দায়মুক্তির শর্তে আটশো দিরহামের বিনিময়ে একটি দাস বিক্রয় করেন। পরে যায়েদ দেখতে পান তার মধ্যে একটা খুঁত রয়েছে। তাই তিনি ইবনে উমরকে দাসটি ফেরত দিতে চান। কিন্তু ইবনে উমর ফেরত নিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। ফলে উভয়ে উসমান রা.এর নিকট বিচার প্রার্থী হন। উসমান রা. ইবনে উমরকে বললেন: আপনি কি শপথ করতে পারবেন যে, এই খুঁত আপনার জানা ছিলনা? তিনি বললেন: না। তখন তিনি ইবনে উমরকে দাসটি ফেরত দিলেন। অত:পর ইবনে উমর সেটি এক হাজার দিরহামে বিক্রয় করেন। ইমাম আহমদ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন: এ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, তারা এই বিক্রয়ের বিশুদ্ধতা ও দায়মুক্তির শর্তের বৈধতার ব্যাপারে একমত ছিলেন। আর উসমান ও যায়েদ এই মর্মে একমত ছিলেন যে, বিক্রেতা যদি পূর্বাহ্নে খুঁত সম্পর্কে অবহিত থাকে তাহলে দায়মুক্তির শর্ত তাকে দায়মুক্তি দেবে না।

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিরোধ: ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যখন মূল্য নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং উভয়ের মধ্যে কোনো সাক্ষী প্রমাণ থাকে না, তখন বিক্রেতা শপথপূর্বক যা বলবে, সেটাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর ক্রেতাকে হয় বিক্রেতা যে মূল্য বলেছে তা দিয়ে পণ্যটি নিতে হবে, নতুবা শপথ করে বলতে হবে যে, সে এই মূল্যে ক্রয় করে নি, বরং আরো কম মূল্যে ক্রয় করেছে। ক্রেতা এভাবে শপথ করলে পণ্যটি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থেকে রেহাই পাবে এবং তা বিক্রেতাকে ফেরত দেয়া হবে, চাই পণ্যটি বহাল থাকুক বা নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকুক। এর ভিত্তি হাদিস, যা আব্দুর রহমান ইবনে কায়েস ইবনে আশয়াস থেকে ইমাম আবুদাউদ বর্ণনা করেছেন: 'আশয়াস আব্দুল্লাহর নিকট থেকে খুমুস বাবত আগত গোলামদের মধ্য থেকে কয়েকটি গোলাম বিশ হাজার মুদ্রায় খরিদ করলেন। অত:পর আব্দুল্লাহ্ তাদের মূল্য আদায় করতে তার নিকট দূত পাঠালেন। তখন আশ্‌য়াস বললেন: আমি তো এই গোলামগুলো দশ হাজার মুদ্রায় কিনেছি। আব্দুল্লাহ্ বললেন: তাহলে আপনি আমার ও আপনার বিরোধ মীমাংসার্থে একজন সালিশ নির্ধারণ করুন। আশ্‌য়াস বললেন: আপনিই আমার ও আপনার মধ্যে সালিশ। আব্দুল্লাহ্ বললেন: আমি রসূলুল্লাহ্ সা. কে বলতে শুনেছি: যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিরোধ দেখা দেবে এবং তাদের মধ্যে কোনো সাক্ষী থাকবে না, তখন পণ্যের মালেক যা বলবে, সেটাই গ্রহণযোগ্য হবে, নচেৎ বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে।' আলিমগণ এ হাদিস গ্রহণ করেছেন। শাফেয়ি এই হাদিসের সাধারণ মর্ম গ্রহণপূর্বক বলেছেন: ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে শপথ করে যেমন বলবে তেমন ফায়সালা হবে, যখন মূল্য, মেয়াদ, শর্ত, বন্ধক বা রাহন নিয়ে বিরোধ হবে, তখন উভয়ে শপথ করবে।'

অশুদ্ধ বিক্রয়ের বিধি: যে বিক্রয় শরিয়তের বিধান অনুযায়ী বিক্রয়ের সকল শর্ত ও উপাদান পূর্ণ করে সম্পাদন করা হয়, সেটাই শুদ্ধ ও বৈধ বিক্রয়। এ দ্বারা বিক্রীত পণ্য, তার মূল্যের মালেকানা স্বত্ব ও তা দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ হয়। কিন্তু যদি শরিয়তের বিধি লংঘিত হয়, তবে সেই বিক্রয় শুদ্ধ হবে না, বরং তা অশুদ্ধ, অবৈধ ও বাতিল হবে।

সুতরাং অশুদ্ধ ও অবৈধ বিক্রয় হচ্ছে সে বিক্রয়, যা ইসলাম অনুমোদন করেনি। তাই এই বিক্রয় অসম্পন্ন ও শরিয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ থেকে যায় এবং এ দ্বারা মালেকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়না। এমনকি ক্রেতা যদি পণ্য হস্তগত করে বা দখলে নিয়ে নেয় তবুও নয়। অবৈধ কাজ মালেকানা অর্জনের মাধ্যম হতে পারেনা।

ইমাম কুরতুবি বলেন: 'সুস্পষ্ট হারাম কাজ দ্বারা যাই সম্পাদিত হয়ে থাকুক না কেন, তা বাতিল। সে ক্ষেত্রে ক্রেতার করণীয় হবে পণ্যটি হুবহু ফেরত দেয়া। আর যদি তার হাতে আসার পর তা নষ্ট হয়ে থাকে তবে তার মূল্য নির্ধারিত থাকলে মূল্য পরিশোধ করবে, যেমন ভূমি, জীবজন্তু ও আসবাবপত্র। আর যে জিনিসের বিনিময় ওজন বা মাপ যোগ্য জিনিস দ্বারা দেয়া হয়, যেমন খাদ্যশস্য বা অনুরূপ অন্য কোনো দ্রব্য, তার বিনিময় উক্ত জিনিস দিয়ে পরিশোধ করবে।'

অশুদ্ধ বিক্রয়ে মুনাফা: হানাফি ফকিহ্দের মতে, অশুদ্ধ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতা যখন মূল্য হস্তগত করত তা ব্যবসায়ে খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করে, তখন ঐ বিক্রয় বাতিল করা, ক্রেতাকে মূল্য ফেরত দেয়া ও অর্জিত মুনাফা সদকা করে দেয়া তার কর্তব্য। কেননা সে এমন উপায়ে ঐ মুনাফা অর্জন করেছে যা কুরআনের সুস্পষ্ট বিধি দ্বারা নিষিদ্ধ।

হস্তগত হওয়ার আগে পণ্য ধ্বংস হয়ে গেলে: ১. বিক্রীত পণ্য যদি ক্রেতার কর্ম দোষে পুরোপুরিভাবে বা আংশিকভাবে হস্তগত করার আগে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে বিক্রয় বাতিল হবে না, বরং বহাল থাকবে, এবং ক্রেতা পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য হবে। কেননা পণ্যটি ধ্বংস হওয়ার জন্য সে-ই দায়ী।

২. আর যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কর্ম দোষে ধ্বংস হয়, তাহলে ক্রেতা হয় ক্রয় বাতিল করবে, নতুবা দায়ী ব্যক্তির কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করবে।

৩. যদি পণ্যটি ক্রেতার দখলে যাওয়ার আগে বিক্রেতার দোষে, বা বিক্রীতের দোষে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আংশিক বা সামগ্রিকভাবে নষ্ট হয়, তবে বিক্রয় বাতিল হবে।

৪. বিক্রেতার দোষে যখন বিক্রীত পণ্যের অংশ বিশেষ নষ্ট হয় তবে ক্রেতা নষ্ট হওয়া অংশের পরিমাণ মূল্য প্রদান থেকে অব্যাহতি পাবে। অবশিষ্ট অংশ মূল্য দিয়ে নেয়া বা না নেয়ার ব্যাপারে সে স্বাধীন।

৫. বিক্রীত পণ্যের অংশ বিশেষ যদি বিক্রীতের নিজের দোষে নষ্ট হয় তাহলে মূল্যের কোনো অংশ থেকেই ক্রেতা অব্যাহতি পাবে না। হয় সে পুরো ক্রয় বাতিল করবে, নচেৎ পুরো মূল্য দিয়ে পণ্যের অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করবে।

৬. যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নষ্ট হয় তাহলে যে পরিমাণ নষ্ট হয়েছে, সে পরিমাণ মূল্য থেকে ক্রেতা অব্যাহতি পাবে। অবশিষ্ট অংশ হয় বাদবাকি মূল্য দিয়ে নিয়ে নেবে, নচেৎ ক্রয় বাতিল করবে।

হস্তগত হওয়ার পর বিক্রীত পণ্য ধ্বংস হয়ে গেলে: বিক্রীত পণ্য যখন ক্রেতার হস্তগত হওয়ার পর ধ্বংস হয়, তখন তা বিক্রেতার অবকাশ প্রার্থনার আওতাভুক্ত না হলে পণ্যটি ক্রেতার দায়ভুক্ত হবে এবং সে তার মূল্য দিতে বাধ্য থাকবে। আর যদি বিক্রেতার অবকাশ প্রার্থনার আওতাভুক্ত হয় তবে সে তার মূল্য বা সমপরিমাণ পণ্য ক্রেতাকে দিতে বাধ্য থাকবে।

দর নিয়ন্ত্রণ: দর নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বুঝায় পণ্যমূল্য এমন সীমার মধ্যে রাখা, যাতে বিক্রেতা যুলুম না করে এবং ক্রেতা না ঠকে।

দর নিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধ: ইমাম আবুদাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি ও ইবনে মাজা বিশুদ্ধ সনদে আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন: লোকেরা বললো, হে রসূলুল্লাহ্, পণ্য মূল্য বেড়ে গেছে। সুতরাং আপনি মূল্য নির্দিষ্ট করে দিন। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: মূল্য নির্দিষ্টকারী তো আল্লাহ। তিনি রিযিকদাতা, রিযিক হ্রাস-বৃদ্ধিকারী। আমি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করতে চাই যে, কারো জান বা মালের ক্ষতি করে যুলুম করেছি– এমন অভিযোগ কেউ যেন আমার বিরুদ্ধে করতে না পারে।'

এ হাদিস থেকে আলেমগণ এ বিধি প্রণয়ন করেন যে, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বা নির্ধারণে হস্তক্ষেপ অবৈধ। কেননা তাতে যুলুমের ধারণা জন্মে। অথচ সাধারণ মানুষ আর্থিক লেনদেনে স্বাধীন। বাজার দর বেঁধে দেয়া এই স্বাধীনতার পরিপন্থী। বিক্রেতার স্বার্থ রক্ষার চেয়ে ক্রেতার স্বার্থ রক্ষা অগ্রগণ্য নয়। উভয়ের স্বার্থ যখন পরস্পর বিরোধী হয় তখন কিভাবে উভয়ের স্বার্থ রক্ষা করা যায় তা ভেবে দেখতে উভয় পক্ষকে সুযোগ ও ক্ষমতা প্রদান করা জরুরী।

ইমাম শওকানী বলেন: সকল মানুষ নিজ নিজ সম্পদের উপর পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া তাদের ক্ষমতা হরণের শামিল। শাসকের দায়িত্ব হলো সকল সাধারণ নাগরিকদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা। মূল্য হ্রাস করে একতরফাভাবে শুধু ক্রেতার স্বার্থ রক্ষা করাকে মূল্য বাড়তে দিয়ে বিক্রেতার স্বার্থ রক্ষার চেয়ে অগ্রগণ্য মনে করা তার কর্তব্য নয়। আর যখন উভয়ের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী হয় তখন উভয় পক্ষকে চিন্তা-গবেষণা করার সুযোগ দেয়া কর্তব্য। যে মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা

ক্রেতার পছন্দ নয়, সে মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য করা কুরআনের সূরা নিসার ২৯ নং আয়াতের এ উক্তির বিরোধী: إِلَّآ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ –

'কিন্তু তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে ব্যবসায় করা বৈধ।' তাছাড়া মূল্য নির্ধারণের ফলে পণ্য বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। ফলে মূল্য বৃদ্ধি পায়। আর পণ্য মূল্য বৃদ্ধি দরিদ্রদের জন্য ক্ষতিকর। তারা পণ্য ক্রয়ে অক্ষম হয়ে পড়ে। অথচ ধনীরা গোপন বাজার থেকে বিপুল বর্ধিত মূল্য দিয়ে পণ্য কিনতে সক্ষম হয়। ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে সংকটে পড়ে যায় এবং তাদের কারো স্বার্থই রক্ষিত হয় না।

প্রয়োজনের সময় মূল্য নিয়ন্ত্রণ বৈধ: তবে ব্যবসায়ীরা যখন যুলুম করতে শুরু করে এবং এত বেশি মুনাফাখোরিতে লিপ্ত হয় যে, বাজারের ক্ষতি সাধন করে, তখন সরকারের পক্ষে হস্তক্ষেপ করা এবং জনগণের অধিকার রক্ষার খাতিরে, মজুতদারী রোধ করার জন্য এবং ব্যবসায়ীর লোভের কারণে জনগণের উপর যে যুলুম হচ্ছে তা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে পণ্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে পণ্য মূল্য যখন বেড়ে যায়, তখন দর বেঁধে দেয়াকে ইমাম মালেক ও শাফেয়ি মযহাবের কেউ কেউ বৈধ মনে করেন। যায়দি মযহাবের একাংশও, যথা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যা, রবীয়া ইবনে আব্দুর রহমান, ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ আনসারী প্রমুখ সমাজের স্বার্থে প্রয়োজনীয় মনে হলে পণ্যমূল্য বেঁধে দেয়া জায়েয মনে করেন।

'হিদায়া' গ্রন্থের লেখক বলেন: 'শাসকের পক্ষে পণ্যমূল্য নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু যদি খাদ্য ব্যবসায়ীরা স্বেচ্ছাচারী আচরণ করে ও অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি করে এবং সরকার দর বেঁধে দেয়া ছাড়া জনগণের অধিকার রক্ষা করার আর কোনো বিকল্প খুঁজে না পায়, তাহলে বিজ্ঞজনদের সাথে পরামর্শক্রমে দর বেঁধে দিতে পারে।

মজুদদারী: সংজ্ঞা: কোনো পণ্য কিনে এমনভাবে আটকে রাখা বা গুদামজাত করা, যাতে বাজারে তার সরবরাহ কমে যায়, এবং গুদামজাতকারীরা তার মূল্য বাড়ানোর সুযোগ পায় আর জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, একে মজুতদারী বলা হয়।

বিধান: শরিয়ত মজুতদারীকে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কারণ এ দ্বারা লোভ, মুনাফাখুরী, অসাধুপনা ও জণগণকে কষ্ট দেয়ার মত খারাপ বৈশিষ্টগুলো লালন করা হয়।

১. ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযি মুয়াম্মার রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি মজুদদারীতে লিপ্ত হয়, সে অন্যায় করে।

২. আহমদ, হাকেম, আবু শায়বা ও বায্যার বর্ণনা করেন, রসূল সা. বলেন: যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন কোনো খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখে, সে আল্লাহ্ থেকে সম্পর্কচ্যুত এবং আল্লাহ্ও তার থেকে দায়মুক্ত।

৩. রযীন তাঁর সংকলিত হাদিসগ্রন্থে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: সেই গুদামজাতকারী বান্দা বড়ই নিকৃষ্ট, জিনিসপত্র সস্তা হয়েছে শুনলে যার মন খারাপ হয়, আর দাম বেড়েছে শুনলে যে খুশি হয়।

৪. ইবনে মাজা ও হাকেম ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: সরবরাহকারী রিযিক প্রাপ্ত, আর মজুদদার অভিশপ্ত।

৫. সরবরাহকারী বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে পণ্য নিয়ে আসে ও কম মূল্যে বিক্রয় করে।

৬. আহমদ ও তাবরানি মা'কিল ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোনো প্রয়োজনীয় মূল্য নিয়ে এমন কারসাজি করে, যাতে তার মূল্য বেড়ে যায়, তাকে দোযখের একটা বৃহৎ অংশে বসিয়ে দেয়া আল্লাহর অধিকার হয়ে দাঁড়ায়।

কখন মজুদদারী হারাম হয়: বহু সংখ্যক ফকিহের মতে নিম্নোক্ত তিনটি শর্তে মজুদদারী হারাম:

১. গুদামজাতকৃত পণ্য যখন তার নিজের ও তার পোষ্যদের পুরো এক বছরের প্রয়োজনীয় পরিমাণের অতিরিক্ত হয়। কেননা এক বছরের জন্যে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস জমা করে রাখা জায়েয, যেমন রসূলুল্লাহ্ সা. করতেন।

২. যে সময় পণ্যের দাম সাধারণত বাড়ে সে সময়টার অপেক্ষায় থাকা, যাতে অতি চড়া মূল্যে বিক্রয় করা যায়। কেননা জনগণের মধ্যে তখন ঐ পণ্যের চাহিদা বাড়ে।

৩. এমন সময় গুদামজাত করা, যখন জনগণের গুদামজাতকৃত পণ্যের প্রয়োজন তীব্রতর হয়, যেমন খাদ্য ও বস্ত্র ইত্যাদি। পণ্য যদি এমন হয় যে, মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যবসায়ীর নিকট আছে, কিন্তু জনগণের মধ্যে তার চাহিদা নেই, তাহলে এ ধরনের পণ্য গুদামজাত করলে তা নিষিদ্ধ হবে না। কেননা এতে জনগণের কোনো ক্ষতি হয় না।

কতক আলেম শুধু খাদ্য জাতীয় পণ্য গুদামজাত করা হারাম মনে করেন। আর কতক আলেম সকল জিনিসের ক্ষেত্রেই মজুদদারী হারাম মনে করেন। কেননা গুদামজাতকৃত পণ্য মূল্য স্তরকে স্বাভাবিক ও ভারসাম্যপূর্ণ থাকতে দেয় না। কতক আলেম মনে করেন, নিজের উৎপাদন করা খেতের ফসল বা নিজের তৈরি জিনিস গুদামজাত করাতে দোষ নেই।

খিয়ার: ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিকে বহাল রাখা বা বাতিল করা এই দুটির কোন্‌টি ভালো হবে তা বিবেচনা করার সুযোগ চাওয়াকে 'খিয়ার' বলা হয়। খিয়ার কয়েক প্রকারের। নিম্নে এর বিবরণ দেয়া যাচ্ছে:

খিয়ারুল মজলিস: ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে যখন চুক্তি সম্পাদন করে, তখন তারা উভয়ে যতক্ষণ ঐ মজলিসে অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদনের মজলিস তথা বৈঠকে আছে, ততক্ষণ ঐ চুক্তি বহাল রাখা বা বাতিল করার অধিকার উভয়ের থাকে। তবে চুক্তির মধ্যে যদি এই অধিকার উভয় পক্ষের সম্মতিতে বাতিল করা হয়ে থাকে, তাহলে এই অধিকার থাকবে না।

কখনো কখনো দু'পক্ষের এক পক্ষ তাড়াহুড়ার মধ্যে প্রস্তাব বা সম্মতি দিয়ে দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই সে উপলব্ধি করে যে, চুক্তিটি কার্যকর না করাতেই তার মংগল। এরূপ ক্ষেত্রে শরিয়ত তাকে এই অধিকার দিয়েছে, যাতে তাড়াহুড়ার কারণে তার যে ক্ষতি হতে যাচ্ছিল তা পূরণ হয়। ইমাম বুখারি ও মুসলিম হাকিম ইবনে হিযাম রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন:

'ক্রেতা ও বিক্রেতার চুক্তি প্রত্যাহারের অধিকার ততক্ষণ থাকবে, যতক্ষণ তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়। তারা উভয়ে যদি সত্য কথা বলে ও স্পষ্ট ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করে, তবে তাদেরকে বরকত দেয়া হবে, আর যদি মিথ্যা বলে ও সত্য গোপন করে তবে তাদের বরকত নষ্ট হয়ে যাবে।'

অর্থাৎ শারীরিকভাবে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত উভয়ের চুক্তি বহাল রাখা বা বাতিল করার অধিকার আছে। প্রত্যেক পরিস্থিতির প্রকৃতি অনুযায়ী বিচ্ছিন্ন হওয়া বিচার্য। একটি ছোট বাড়িতে চুক্তি হয়ে থাকলে দু'জনের একজনের বাড়ি থেকে বের হওয়াকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ধরা হবে। আর বড় বাড়িতে হয়ে থাকলে বৈঠক স্থল থেকে দু'তিন কদম দূরে গেলেই তা বিচ্ছিন্নতা গণ্য হবে। আর যদি উভয়ে এক সাথে বের হয় এবং এক সাথে চলতে থাকে তাহলে তারা বিচ্ছিন্ন হয়নি বিবেচিত হবে ও খিয়ার অর্থাৎ বাতিল করার অধিকার অক্ষুণ্ন থাকবে।

এ ব্যাপারে যে মতটি সর্বাধিক অগ্রগণ্য তা হলো, প্রচলিত রীতিপ্রথা অনুসারেই বিচ্ছিন্ন হওয়া বা না হওয়া নির্ণয় করা হবে। প্রচলিত রীতিতে যা বিচ্ছিন্নতা গণ্য হয় শরিয়তের দৃষ্টিতে সেটাই বিচ্ছিন্নতা, আর যেটা প্রচলিত রীতিতে বিচ্ছিন্নতা নয়, সেটা শরিয়তেরও বিচ্ছিন্নতা নয়।

ইমাম বায়হাকি আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন: তিনি (আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর) বলেন: আমি আমীরুল মু'মিনীন উসমান রা.এর নিকট তাঁর খয়বরের একটি জমির বিনিময়ে ওয়াদির একটি জমি বিক্রয় করলাম। বিক্রয়ের চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর আমি পেছনের দিকে ফিরে চলে এলাম এবং তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম, যাতে তিনি বিক্রয় বাতিল করতে না পারেন। কেননা রীতি ছিলো, ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় চুক্তি বাতিল করার অধিকার রাখে। এটাই অধিকাংশ সাহাবি ও তাবেয়ির অভিমত। ইমামদের মধ্যে শাফেয়ি ও আহমদও এই মত পোষণ করেন। তারা বলেন: 'খিয়ারুল মজলিস' ক্রয়-বিক্রয়, আপোষ মীমাংসা, ভাড়া দেয়া, এবং যাবতীয় আর্থিক লেনদেন জনিত চুক্তিতে প্রযোজ্য। বিয়ে, খুলা, ইত্যাদি, যাতে আর্থিক বিনিময় চাওয়া হয় না, তাতে 'খিয়ারুল মজলিস থাকে না। অনুরূপ মুযারাবা, শিরকা, ওযাকালা ইত্যাদিতেও প্রযোজ্য নয়।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেকের মতে, 'খিয়ারুল মজলিস' অবৈধ। কেবল কথার মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদনই যথেষ্ট এবং তা বাধ্যতামূলক। ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে গেলে এক মজলিসে থাকা অবস্থায়ও তা বাতিল করা যাবে না। তাদের মতে, হাদিসে যে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উল্লেখ আছে, তা কথার বিচ্ছিন্নতা।

কখন বাতিল করার অধিকার রহিত হয়: উভয় পক্ষ চুক্তির পর বাতিল করার অধিকার রহিত করলে তা রহিত হবে। একজন বাতিল করলে অপরজনের অধিকার অক্ষুণ্ন থাকবে। দু'জনের একজন মারা গেলে এ অধিকার রহিত হবে।

খিয়ারুশ শরত বা মেয়াদী অবকাশ: যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার যে কোনো একজন এই শর্তে ক্রয় বা বিক্রয় করে যে, একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সে উক্ত ক্রয় বা বিক্রয় বহাল রাখা বা বাতিল করার স্বাধীনতা বা অবকাশ পাবে, সে মেয়াদ বা অবকাশ যত দীর্ঘ হোকনা কেন তখন তাকে 'খিয়ারুশ শরত' বলা হয়। এ ধরনের শর্ত আরোপ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্যে কিংবা যে কোনো একজনের জন্যে চলতে পারে। এ ধরনের শর্ত আরোপের বৈধতার উৎস হলো নিম্নোক্ত দু'টি হাদিস:

১. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'যে কোনো ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে সম্পাদিত ক্রয় বা বিক্রয় চূড়ান্ত হবে না যতোক্ষণ তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়। তবে শর্ত আরোপের অধিকার সংবলিত ক্রয়-বিক্রয় এর ব্যতিক্রম।' অর্থাৎ তারা উভয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের সম্পাদিত ক্রয় বা বিক্রয় তাদের জন্য অপরিহার্য হবে না। তবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরেও তারা উভয়ে বা একজনে যদি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পুনর্বিবেচনার অবকাশ গ্রহণ করে তাহলে সেই মেয়াদ পর্যন্তও ক্রয় বা বিক্রয় অপরিহার্য হবে না, বরং বাতিল করার সুযোগ থাকবে।

২. ইবনে উমর রা. থেকে আরো বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'যখন দুই ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় করে, তখন উভয়ে যতোক্ষণ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হয় ততোক্ষণ বহাল রাখা বা বাতিল করার স্বাধীনতা তাদের সামনে অনুরূপ যখন উভয়ে বা একজন অপরজনকে অবকাশ দিয়ে ক্রয়-বিক্রয় করবে তখনও ক্রয়-বিক্রয় বহাল রাখা বা বাতিল করার স্বাধীনতা থাকবে।' যখন নির্ধারিত মেয়াদ অতিবাহিত হয়ে যাবে এবং ক্রয়-বিক্রয় নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে বাতিল হবে না, তখন ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। মেয়াদী অবকাশের শর্ত কথা বলেও বাতিল করা যাবে, আবার ক্রেতার কার্য দ্বারাও তা আপনা আপনি রহিত হতে পারে। যেমন সে যদি তার ক্রীত দ্রব্য ওয়াকফ বা দান করে দেয় কিংবা বিক্রয়ের ইচ্ছা ব্যক্ত করে, তা হলে রহিত হবে। কেননা এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সে বিক্রয়টা মেনে নিয়েছে। যতোক্ষণ তার অবকাশ বহাল থাকবে, ততোক্ষণ তার পক্ষ থেকে পণ্যটি হস্তান্তরের উদ্যোগ নিষ্ফল হবে।

ইমাম আহমদের মতে পুনর্বিবেচনার অবকাশের মেয়াদ দুই পক্ষের সম্মতিক্রমে যতখুশি দীর্ঘ করা যেতে পারে। ইমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ির মতে মেয়াদ সর্বোচ্চ তিন দিন এবং ইমাম মালেকের মতে প্রয়োজন অনুযায়ী মেয়াদ নির্ধারণ করা যাবে।

খিয়ারুল আয়ব বা ত্রুটি জনিত অবকাশ: বিক্রয়ের সময় পণ্যের ত্রুটি গোপন করা হারাম: বিক্রয়ের সময় পণ্যের ত্রুটি ক্রেতার নিকট ব্যক্ত না করে বিক্রয় করা হারাম।

১. উক্‌বা ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'মুসলমান মুসলমানের ভাই। কোনো মুসলমান ভাই তার নিকট কোনো পণ্য বিক্রয় করবে, অথচ তাতে যে ত্রুটি রয়েছে তা তাকে জানাবেনা এটা অবৈধ।' (আহমদ, ইবনে মাজা, দারা কুতনি, হাকিম ও তাবরানী)

২. আদ্দা ইবনে খালিদ বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. আমাকে লিখে দিয়েছিলেন: 'এ হচ্ছে আল্লাহ্র রসূল মুহাম্মদ সা.এর নিকট থেকে আদ্দা ইবনে খালিদের ক্রীত পণ্যের দলিল। সে তাঁর কাছ থেকে এমন একজন দাস বা দাসী ক্রয় করেছে, যার কোনো রোগ নেই, কোনো অমঙ্গল নেই, চরিত্রহীনতা নেই। মুসলমানের সাথে মুসলমানের বিক্রয়।'

৩. রসূল সা. বলেন: 'যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোঁকা দেয় সে আমাদের লোক নয়।'

দোষত্রুটি সহকারে বিক্রয়ের বিধি: দোষত্রুটি ক্রেতার জানা থাকা সত্ত্বেও যখন ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পন্ন হয় তখন উক্ত চুক্তি বাধ্যতামূলক হয়ে যায় এবং কোনো পুনর্বিবেচনার অবকাশ থাকে না। কেননা সে ওটা মেনে নিয়েছে। তবে যখন ক্রেতার অজানা থাকে এবং চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর সে দোষত্রুটির কথা জানতে পারে, তখনও চুক্তি শুদ্ধ ও বৈধ হবে, তবে বাধ্যতামূলক হবে না। সে ক্ষেত্রে ক্রেতার স্বাধীনতা থাকবে যে, বিক্রেতার নিকট পণ্যটি ফেরত দিয়ে প্রদত্ত মূল্য ফেরত নেবে, অথবা পণ্যটি নিয়ে নেবে এবং বিদ্যমান ত্রুটির কারণে আনুপাতিক হারে মূল্যের অংশ ফেরত নেবে। তবে সে যদি তাতেই সন্তুষ্ট থাকে কিংবা সম্মতি সূচক কোনো আচরণ করে, যথা ক্রীত পণ্যটি বিক্রয়ের উদ্যোগ নেয়, বা তাকে পুঁজি হিসাবে বিনিয়োগ করে বা হস্তান্তর করে।

ইবনে মুনযির বলেন: হাসান, শুরাইহ্, আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হাসান, ইবনে আবি লায়লা, সাওরী প্রমুখ বলেছেন: 'যখন কেউ কোনো পণ্য ক্রয় করে এবং তাতে কিছু খুঁত আছে জেনেও বিক্রয়ের উদ্যোগ নেয়, তখন সেটা আর ফেরত দেয়ার অধিকার তার থাকে না।' এটা ইমাম শাফেয়িরও অভিমত।

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পণ্যের ত্রুটি নিয়ে বিবাদ: যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় পণ্যে ত্রুটি দেখা দিয়েছে এ বিষয়ে বিরোধ দেখা দেয় এবং যে কোনো একজনের কাছে থাকা অবস্থায় ত্রুটি সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু কারো নিকট কোনো প্রমাণ থাকে না, তখন বিক্রেতা শপথপূর্বক যা বলবে, সেটাই গ্রহণ করা হবে। উসমান রা. এ রকমই ফয়সালা করেছিলেন।

কেউ কেউ বলেন: ক্রেতা শপথপূর্বক যা বলবে সেটাই গ্রহণ করা হবে এবং সে বিক্রেতাকে পণ্যটি ফেরত দেবে।

নষ্ট ডিম ক্রয়: যে কোন ব্যক্তি মুরগীর ডিম ক্রয় করার পর ভেংগে নষ্ট দেখতে পায়, সে যখন ইচ্ছা বিক্রেতার নিকট থেকে পূর্ণ মূল্য ফেরত নিতে পারবে। কেননা এ ক্ষেত্রে ক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ বিক্রীত পণ্যটি একটি মূল্যহীন জিনিস এবং তা সম্পদ হওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছে। নষ্ট ডিমটি বিক্রেতাকে ফেরত দিতে ক্রেতা বাধ্য নয়। কেননা তাতে কোনো লাভ নেই এবং উপকারিতাও নেই।

দায় থেকে আয়: যখন বিক্রয় বাতিল হয়ে যায় এবং ইতিপূর্বে পণ্যটি ক্রেতার নিকট থাকা অবস্থায় তা থেকে কিছু লাভ পাওয়া যায়, তখন ঐ লাভ ক্রেতার প্রাপ্য। আয়শা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'দায় থেকে আয়ের উৎপত্তি।' (ইমাম আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি, ইবনে মাজা। তিরমিযি কর্তৃক বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত।) হাদিসটির ব্যাখ্যা এই যে, বিক্রীত পণ্যটি থেকে যে লাভ বা মুনাফা পাওয়া যায়, তা ক্রেতার প্রাপ্য। কেননা পণ্যটি তার কাছে থাকা কালে নষ্ট হলে সে তার জন্য দায়ী হতো। কেউ যদি একটা জন্তু কেনে এবং তা কয়েকদিন ভোগ করে, অত:পর তাতে বিক্রয়ের আগে থেকে বিদ্যমান ত্রুটি প্রকাশ পায় এবং অভিজ্ঞ লোকদের অভিমত তার সততা প্রমাণ করে, তবে সে ঐ বিক্রয় বাতিল করতে পারবে এবং যে কয়দিন সে ভোগ করেছে সেটা তার প্রাপ্য। বিক্রেতাকে তার কোনো অংশ দিতে সে বাধ্য নয়। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে: এক ব্যক্তি একটি দাস ক্রয় করলো অত:পর তাকে নিজের কাজে খাটালো, তারপর তার মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখতে পেল, অত:পর তা বিক্রেতার নিকট ফেরত দিল। বিক্রেতা বললো: আমার দাসকে যে কাজে খাটিয়েছ তার বিনিময়? রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: 'কাজে খাটানো ওটার দায় বহনের বিনিময়ে হয়েছে।' (আবুদাউদ)

বিক্রয়ে ধোঁকাবাজীর অবকাশ: বিক্রেতা যখন ক্রেতাকে ধোঁকার মাধ্যমে মূল্য বৃদ্ধি করে ঠকায় তখন সেটা তার জন্যে হারাম। ক্রেতা এ ধরনের বিক্রীত পণ্য ফেরত দেয়ার জন্যে তিন দিনের অবকাশ পাবে। কেউ কেউ বলেন: তাৎক্ষণিকভাবে ফেরত দিতে হবে। বিক্রয়টি হারাম হওয়ার কারণ হলো ধোঁকাবাজী বা প্রতারণা। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের কেউ নয়'।

পণ্য ফেরত দেয়ার অধিকারের প্রমাণ হলো আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত এই হাদিস: রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'উট ও ছাগল-ভেড়ার ওলানে কয়েকদিন দুধ আটকে রেখে ওলান বড় দেখিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করো না।

যে ব্যক্তি এ ধরনের জন্তু খরিদ করবে সে দুধ দোহনের পর ইচ্ছা করলে রেখে দেবে, নচেৎ তা ফেরত দেবে ও এক সা খোরমাও দেবে।' (বুখারি, মুসলিম)

অর্থাৎ অতিরিক্ত দুধের বিনিময়ে খোরমা বা প্রধান খাদ্য শস্যের কিছু পরিমাণ ফেরত দিতে হবে। ইবনে আব্দুল বার বলেন: এ হাদিসটি প্রতারণা নিষিদ্ধ হওয়ার মূল প্রমাণ। তাছাড়া প্রতারণা যে মূল বিক্রয়কে বাতিল করে না, এটা তারও প্রমাণ, অবকাশের মেয়াদ যে তিনদিন তারও প্রমাণ, এবং ওলান কৃত্রিমভাবে বড় করে দেখানো ও তা দ্বারা অবকাশ সাব্যস্ত হওয়ারও প্রমাণ।'

প্রতারণা যখন বিক্রেতার পক্ষ থেকে হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়, তখন তা হারাম থাকে না। তবে ক্রেতা যাতে ক্ষতি থেকে রক্ষা পায় সে জন্য তার ফেরত দেয়ার অবকাশ ও অধিকার বহাল থাকবে।

ক্রয়-বিক্রয়ে ঠকা জনিত অবকাশ: ঠকা কখনো বিক্রেতার হয়। যেমন যে জিনিসের দাম পাঁচ মুদ্রা, তা তিন মুদ্রায় বিক্রয় করলো। আবার কখনো ক্রেতারও হয়। যেমন যে জিনিসের মূল্য তিন টাকা তা পাঁচ টাকায় ক্রয় করলো।

যখন কেউ ক্রয় বা বিক্রয় করে ঠকে, তখন তার ক্রীত জিনিস ফেরত দেয়া ও চুক্তি বাতিল করার অধিকার থাকে। তবে এ জন্যে শর্ত হলো, পণ্যের মূল্য সম্পর্কে সে অবহিত থাকবে না এবং দরকষাকষি করতে সক্ষম হবে না। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে তাকে ঠকানো প্রতারণার শামিল, যা থেকে প্রত্যেক মুসলমানেরই মুক্ত থাকা জরুরি। যখন কোনো ক্রেতা বা বিক্রেতা এরূপ ঠকার শিকার হয়, তখন চুক্তি বাতিল করা বা বহাল রাখা তার ইচ্ছাধীন হয়ে যায়। তবে এখানে প্রশ্ন এই যে, শুধুমাত্র ঠকার শিকার হওয়াই কি এ ধরনের অধিকার পাওয়ার জন্যে যথেষ্ট?

কতক আলেমের মতে ঠকা অস্বাভাবিক ও মাত্রাতিরিক্ত ধরনের হওয়া চাই। কেউ কেউ বলেন: মূল্যের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ ঠকা হওয়া চাই। আবার অনেকের মতে, যে কোনো পর্যায়ের ঠকা হলেই এ অধিকার পাওয়া যাবে।

যেহেতু কোনো বিক্রয়ই সাধারণত পুরোপুরি ঠকা মুক্ত হয় না, সেহেতু ঠকা সম্পর্কে অনেকে এরূপ শর্ত আরোপ করেন। তাছাড়া ছোটখাট ঠকা সাধারণত সহনীয় ও ক্ষমার যোগ্য মনে করা হয়ে থাকে। সর্বাধিক উৎকৃষ্ট মত হলো, প্রচলিত রীতি ও প্রথা অনুযায়ীই ঠকার প্রকৃতি বা শর্ত নির্ণীত হবে। প্রচলিত রীতি ও প্রথার আলোকে যেটি ঠকা, সেটির ক্ষেত্রেই পণ্য ফেরত দেয়া বা নেয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যেটি প্রচলিত রীতি ও প্রথায় ঠকা নয়, তার ব্যাপারে ফেরত দেয়া বা নেয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। এটা ইমাম আহমদ ও ইমাম মালিকের অভিমত। তারা এর প্রমাণ হিসাবে বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিস উপস্থাপন করেন:

'হাব্বান ইবনে মুনকিয নামক এক ব্যক্তি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ সা. কে জানানো হলো যে সে ব্যবসায় ঠকার শিকার হয়ে থাকে। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: যখন তুমি কারো সাথে কেনাবেচা করবে তখন বলবে: 'কোনো প্রতারণা নয়।' অর্থাৎ এ কথা যে বলবে, সে ঠকুক বা না ঠকুক, তার পণ্য ফেরত দেয়া বা নেয়ার অধিকার থাকবে।

ইবনে ইসহাক এই হাদিসের সাথে সংযোজন করেন: 'অত:পর প্রত্যেক পণ্যে তিন দিন পর্যন্ত তোমার চুক্তি পুনর্বিবেচনা করার অধিকার থাকবে। যদি তোমার নিকট সন্তোষজনক হয় তবে বহাল রাখ, সন্তোষজনক না হলে ফেরত দাও।' এরপর এই ব্যক্তি উসমান রা. এর আমল পর্যন্ত জীবিত ছিল এবং তখন তার বয়স হয়েছিল একশো ত্রিশ বছর। উসমান রা. এর আমলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তখন কেউ যখন কোনো জিনিস কিনতো এবং তাকে বলা হতো যে, তুমি ঠকবে, তখন সে ফিরে যেত। তখন কোনো সাহাবি তার পক্ষে সাক্ষ্য দিত যে, রসূলুল্লাহ্ সা, তিন দিন পর্যন্ত পুনর্বিবেচনার অধিকার দিয়েছেন। তখন সে তার মুদ্রাগুলো ফিরিয়ে দিত। অধিকাংশ আলিমের অভিমত হলো, ঠকা দ্বারা পুনর্বিবেচনার

অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। কেননা ক্রয়-বিক্রয় কার্যকর হওয়া সংক্রান্ত প্রমাণাদি ঠকা বা না ঠকার শর্তযুক্ত নয়। হাব্বান ইবনে মুনকিয সংক্রান্ত হাদিসের জবাবে তারা বলেন: লোকটি স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলো। আর যদি যে, ভালোমন্দ বাছবিচার করতে এতটা স্বল্পবুদ্ধির না হয় তার লেনদেন সেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের লেনদেনের সাথে তুলনীয় হবে যে, ভালোমন্দ বাছবিচার করতে পারে এবং তাকে ব্যবসায় লিপ্ত হবার অনুমতি দেয়া হয়েছে। ফলে ঠকার ক্ষেত্রে তার পুনর্বিবেচনার অবকাশ প্রমাণিত হবে। আর যেহেতু রসূলুল্লাহ্ সা. তাকে 'কোনো প্রতারণা নয়' একথা বলতে শিখিয়েছেন, তাই তার ক্রয়-বিক্রয় প্রতারণামুক্ত হওয়ার শর্তাধীন, সেহেতু এটা 'খিয়ারুশ্ শরত্' এর আওতাধীন।

পথিমধ্যে পণ্য ক্রয়: পথিমধ্যে অর্থাৎ শহরে পণ্য পৌঁছার পূর্বে এবং পণ্যের মূল্য বিক্রেতার অবগত হওয়ার পূর্বে কেউ গিয়ে তা কিনে নেয়া বিক্রেতার ঠকার কারণ হতে পারে। এমতাবস্থায় ক্রেতা বাজার দরের চেয়ে সস্তায় পণ্য কিনতে পারে। বিক্রেতা যদি পরে বুঝতে পারে যে, তাকে ঠকানো হয়েছে, তবে সে তার ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য পণ্য ফেরত নেয়া ও বিক্রয় বাতিল করার অধিকার পাবে। কেননা ইমাম মুসলিম আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন: রসূলুল্লাহ্ সা. পণ্য বাজারে আনার পথে ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন: পথি মধ্যে পণ্য ক্রয় করো না। কেউ যদি তা করে তবে পণ্য বাজারে আসার পর বিক্রেতার বিক্রয় বাতিল করার অধিকার থাকবে।' অধিকাংশ আলেমের মতে এ হাদিসের নিষেধাজ্ঞা হারামের অর্থবোধক।

মূল্য বৃদ্ধির খাতিরে ক্রয়ের অভিনয়: মালিকের সাথে যোগসাজশপূর্বক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির খাতিরে উচ্চতর মূল্য বলা, অথচ যে ব্যক্তি উচ্চতর মূল্য বলে, তার কেনার ইচ্ছা নেই। উচ্চতর মূল্যে কিনতে সাধারণ ক্রেতাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এ রকম ক্রেতার অভিনয় করা হয়।

বুখারি ও মুসলিমে ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ সা. বিক্রেতাকে উচ্চতর মূল্যে বিক্রয়ের সুযোগ করে দেয়ার জন্যে তৃতীয় ব্যক্তির উচ্চতর মূল্যে ক্রয়ের ভান করা নিষিদ্ধ করেছেন। সকল আলেম একমত হয়ে বলেছেন, এটা হারাম।

হাফেয ইবনে হাজর 'ফাতহুল বারী'গ্রন্থে বলেন: এ ধরনের বিক্রেতার মাধ্যমে বিক্রয় বৈধ হবে কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনুল মুন্যির বলেন: মুহাদ্দিসদের একটি গোষ্ঠির মতে এ ধরনের বিক্রয় অবৈধ। যাহেরি মযহাব ও ইমাম মালেকের একটি মত এর সমর্থক। কাজটি যদি মালিকের সাথে যোগসাজশ ক্রমে বা মালিকের উদ্যোগে হয়ে থাকে, তবে হাম্বলি মাযহাবের যে মতটি অধিকতর প্রসিদ্ধ, তদনুসারে এ ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনা ও ক্রয় বাতিলের অধিকার কার্যকর হবে। শাফেয়িদেরও একটি মত তদ্রূপ। তবে তাদের সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হলো, বিক্রয় কার্যকর হবে তবে গুনাহ হবে। এটা হানাফি মাযহাবেরও অভিমত।

ইকালা বা ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাহার: কোনো ব্যক্তি যদি একটি জিনিস ক্রয় করার পর বুঝতে পারে যে, জিনিসটির তার প্রয়োজন নেই অথবা কেউ একটা জিনিস বিক্রয় করার পর যদি বুঝতে পারে যে, জিনিসটি তার প্রয়োজনীয়, তাহলে সে উক্ত ক্রয় বা বিক্রয় বাতিল করার অনুমতি প্রার্থনা করতে পারবে। ইসলাম এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যাহারের অনুমতি দিতে উদ্বুদ্ধ করছে।

ইমাম আবু দাউদ ও ইবনে মাজা আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: 'যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে চুক্তি প্রত্যাহারের অনুমতি দেবে, আল্লাহ্ তার গুনাহ মাফ করবেন।' এ ধরনের চুক্তি প্রত্যাহার দ্বারা বিক্রয় বাতিল হয়ে যায়। এটা বিক্রীত পণ্য ক্রেতার দখলে যাওয়ার আগে জায়েয। এতে 'খিয়ারুল মজলিস' ও 'খিয়ারুশ শরত্' থাকে না। এতে 'শুফয়া'ও (অর্থাৎ সংলগ্ন ভুমির মালিকের ক্রয়াধিকার) থাকে না। কেননা এটা বিক্রয় গণ্য হয় না। চুক্তি বাতিল হওয়ার পর ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে নিজ নিজ প্রাপ্য নিয়ে নেবে। ক্রেতা মূল্য ও বিক্রেতা পণ্য ফেরত নেবে। বিক্রীত পণ্য যদি নষ্ট

হয়ে গিয়ে থাকে বা চুক্তি স্বাক্ষরকারী মারা যায়, কিংবা মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটায় তাহলে চুক্তি প্রত্যাহার অশুদ্ধ হবে।

বাইয়ে সালাম: সংজ্ঞা: নগদ মূল্য পরিশোধপূর্বক কোনো জিনিস এরূপ চুক্তিতে খরিদ করা যে, পণ্যটি বিক্রেতার দায়িত্বে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত থাকবে। ফকিহ্‌গণ এর অন্য নাম দিয়েছেন 'প্রয়োজনের বিক্রয়'। কারণ এটা একটা অনুপস্থিত পণ্যের বিক্রয় এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে এর তীব্র প্রয়োজন অনুভব করে। পুঁজির মালিকের পণ্যটি ক্রয় করা প্রয়োজন, আর পণ্যের মালিকের তার মূল্যের প্রয়োজন। এ প্রয়োজন এমন সময় দেখা দেয়, যখন পণ্যটি তার মালিকের নিকট প্রস্তুত অবস্থায় থাকে না। সে মূল্য নিয়ে নিজের কাজে ব্যয় করবে এবং পণ্যটি উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে খাটাবে। সুতরাং এটা একটা প্রয়োজনীয় ও স্বার্থক বিক্রয়।

বাইয়ে সালামের বৈধতা: কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা দ্বারা বায়য়ে সালামের বৈধতা প্রমাণিত।

১. ইবনে আব্বাস রা. বলেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অগ্রিম মূল্য প্রদানকে আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে হালাল করেছেন। অত:পর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করলেন:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ط

'হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন তা লিখে রেখ।' (সুরা বাকারা: ২৮২)

২. ইমাম বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ্ সা. যখন মদিনায় এলেন তখন মদিনাবাসী ফলমূলের জন্য এক বছর বা দু'বছরের মেয়াদে অগ্রিম মূল্য দিয়ে রাখতো। এটা দেখে রসূল সা. বললেন: যে ব্যক্তি অগ্রিম পণ্যমূল্য পরিশোধ করবে সে যেন নির্দিষ্ট মাপে ও নির্দিষ্ট ওজনে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে পণ্য প্রাপ্তির জন্য তা পরিশোধ করে।'

ইবনুল মুনযির বলেন: 'যে ক'জন আলিমের অভিমত আমাদের সংগ্রহে রয়েছে, তাদের সবাই একমত যে, বায়য়ে সালাম বৈধ।'

শরিয়তের বিধিমালার সাথে এটি সংগতিপূর্ণ: বাই'য়ে সালামের বৈধতা শরিয়তের দাবি ও চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ, শরিয়তের বিধিমালার অনুকূল এবং কিয়াসের সাথে তার কোনো বিরোধ নেই। কেননা ক্রয়বিক্রয়ে মূল্য বিলম্বে পরিশোধ করা যেমন জায়েয, তেমনি বায়য়ে সালামে পণ্য বিলম্বে প্রদানও জায়েয। এই দুটিতে কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহ্ তো বলেছেন: 'যখন তোমরা একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর, তখন তা লিখে রাখ।' এখানে ঋণ দ্বারা সেই সম্পদ বুঝানো হয়েছে, যা প্রদান করার নিশ্চয়তা দেয়া ও দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে। যখন পণ্য সুনির্দিষ্ট ও সুবিদিত হবে এবং তা প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়া ও দায়িত্ব গ্রহণ করা হবে, আর ক্রেতা নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই বিক্রেতার নিকট থেকে পণ্য বুঝে পাওয়ার ব্যাপারে আস্থাশীল হবে, তখন বিক্রীত পণ্যটিই ঋণ বা ধার বলে গণ্য হবে, যা বিলম্বে প্রদান বা হস্তান্তর করা জায়েয আছে।

এ বিষয়েই ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন: কোনো ব্যক্তি তার নিজের কাছে যে দ্রব্য নেই তা বিক্রয় করতে রসূলুল্লাহ সা. যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন, বায়য়ে সালাম তার আওতাভুক্ত নয়। যেমন তিনি হাকিম ইবনে হিযাম রা.কে বলেছিলেন: 'তোমার কাছে যা নেই তা বিক্রয় করোনা।' (আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি, ইবনে মাজা, তিরমিযি ও ইবনে হাব্বান কর্তৃক সহিহ আখ্যায়িত) কেননা এ নিষেধাজ্ঞার প্রকৃত মর্ম হলো, যে দ্রব্য সরবরাহ করার ক্ষমতাই নেই তা যেন কেউ বিক্রয় না করে। কেননা যে জিনিস সরবরাহ করার ক্ষমতা বিক্রেতার নেই, তা আদৌ তার মালেকানায় নেই। কাজেই এমন জিনিস বিক্রয় ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়। তবে যে জিনিস সুনির্দিষ্টভাবে বিবৃত ও যা দেয়ার নিশ্চয়তা দিয়ে

দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে এবং যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরবরাহ করা সম্ভব হবে মর্মে বিক্রেতার প্রায় সুনিশ্চিত বিশ্বাস রয়েছে, সে জিনিস উক্ত নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়।

বাইয়ে সালামের শর্তাবলী: বায়য়ে সালামের জন্যে কিছু শর্ত রয়েছে, যা বায়য়ে সালাম বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য পূর্ণ হওয়া জরুরি। এ সব শর্তের কয়েকটি এমন রয়েছে যা মূলধনের মধ্যে থাকা চাই, আর কয়েকটি এমন, যা পণ্যের মধ্যে থাকা চাই।

মূলধনের (অর্থাৎ যা মূল্য হিসাবে অগ্রিম দেয়া হয় তার) শর্তাবলী: ১. শ্রেণী নির্দিষ্ট হওয়া, ২. পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়া ৩. একই বৈঠকে হস্তান্তরিত হওয়া।

পণ্যের শর্তাবলী: ১. নিশ্চয়তা সহকারে প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ।

২. এমন স্পষ্টভাবে তার বর্ণনা দেয়া, যাতে তার পরিমাণ ও গুণাবলী জানা যাবে এবং সেই গুণাবলী দ্বারা পণ্যটিকে অন্যান্য পণ্য থেকে পৃথক করা যাবে, যাতে বিবাদ-বিসম্বাদ ও প্রতারণার সম্ভাবনা না থাকে।

৩. সময় নির্দিষ্ট থাকা। ইমাম মালেক বলেন: ফসল কাটা ও হাজীদের আগমন ইত্যাদি দ্বারা সময় নির্দিষ্ট করা বছর ও মাসের সংখ্যা জানা থাকা সাপেক্ষে জায়েয।

নির্দিষ্ট মেয়াদের শর্ত: অধিকাংশ আলিমের মতে বায়য়ে সালামে মেয়াদ বিবেচ্য বিষয়। তারা বলেন: তাৎক্ষণিকভাবে লেনদেন ছাড়া বাইয়ে সালামে জায়েয নেই। শাফেয়ি মযহাব মতে এটা জায়েয। কেননা অনিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও বিলম্বিত বিক্রয় যখন জায়েয, তখন নগদ বিক্রয় আরো ভালোভাবে জায়েয। হাদিসে যে মেয়াদ নির্দিষ্টকরণের কথা বলা হয়েছে, তা শর্তারোপের উদ্দেশ্যে বলা হয়নি, বরং তার অর্থ হলো: এটা যদি তাৎক্ষণিক ও নগদ না হয়, তাহলে মেয়াদ নির্ধারিত হওয়া চাই।

ইমাম শওকানী বলেন: শাফেয়ি মযহাবের মতটাই যথার্থ ও সঠিক। অর্থাৎ মেয়াদ থাকা জরুরি নয়। এর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। বিনা প্রমাণে কোনো বিষয়ের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা জরুরি নয়।

যদি বলা হয় যে, মেয়াদ না থাকলে সেটা একটা অস্তিত্বহীন জিনিসের বিক্রয়ে পর্যবসিত হওয়া অবধারিত, যা বায়য়ে সালাম ব্যতীত অন্য কোথাও অনুমোদিত হয়নি এবং প্রকৃত পক্ষে বায়য়ে সালামেও প্রচলিত ক্রয়-বিক্রয়ে মেয়াদ ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই। তবে এর জবাব এই যে, সাধারণ বিক্রয় ও বায়য়ে সালামের প্রকৃতিতেই পার্থক্য রয়েছে এবং সে পার্থক্যই যথেষ্ট।

বাইয়ে সালামে পণ্য বিক্রেতার নিকট থাকা শর্ত নয়: বাই'য়ে সালামে পণ্যের মালেক হওয়া জরুরি নয়, বরং পণ্যটি মেয়াদান্তে তার কাছে থাকা চাই। মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় যদি পণ্য না পাওয়া যায় তবে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে যদি নাপাওয়া যায় তবে কোনো ক্ষতি নেই।

ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ বলেন: আব্দুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ ও আবু বুরদা আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফার নিকট এই বলে পাঠালেন যে, জিজ্ঞাসা কর, রসূলুল্লাহ্ সা. এর জীবদ্দশায় তাঁর সাহাবিগণ কি গমের জন্য অগ্রিম মূল্য দিতেন? আব্দুল্লাহ্ জবাব দিলেন ; আমরা সিরিয়ার কৃষকদের সাথে (মতান্তরে সিরিয়ার খ্রিষ্টানদের সাথে) গম, যব, ও তেলের জন্য নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অগ্রিম মূল্য দিতাম।' আমি বললাম: যার নিকট পণ্যের উৎস থাকতো তার কাছে? তিনি বলেন: এ বিষয়ে আমরা তাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করতাম না। এরপর তারা আমাকে আব্দুর রহমান ইবনে আব্যার নিকট পাঠালেন। আমি তাকে একই প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন: রসূলুল্লাহ্ সা.-এর আমলে সাহাবীগণ অগ্রিম মূল্য প্রদান করতেন। তাদেরকে আমরা জিজ্ঞাসা করিনি, তাদের ক্ষেত-খামার আছে কিনা।

হস্তান্তরের স্থান উল্লেখ না করলে চুক্তি বাতিল হয় না: পণ্য হস্তান্তরের স্থান সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতা মৌনতা অবলম্বন করলে বায়য়ে সালাম শুদ্ধ হবে এবং স্থান নির্ধারণ হবে। কেননা স্থান উল্লেখের শর্ত হাদিসে উল্লেখিত হয় নি। এটা যদি শর্ত হতো তবে রসূলুল্লাহ্ সা. তা উল্লেখ করতেন, যেমন মাপ, ওজন ও মেয়াদের কথা উল্লেখ করেছেন।

দুধ ও পাকা খেজুরে বাইয়ে সালাম: ইমাম কুরতুবি বলেন: 'দুধ ও পাকা খেজুরে বায়য়ে সালাম এবং তাৎক্ষণিকভাবে তা সংগ্রহ করা একটা সামাজিক রীতি, যা গোটা নগরবাসীর জীবনে প্রচলিত। জনস্বার্থ সম্বন্ধীয় মূলনীতির উপর এর ভিত্তি। কেননা মানুষ প্রতিদিন দুধ ও খেজুর সংগ্রহ করতে অভ্যস্ত ও বাধ্য। প্রতিদিন নতুন করে এটা নগদ অর্থ দিয়ে সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার। কারণ তার কাছে নগদ অর্থ প্রতিদিন হাতে নাও আসতে পারে। তাছাড়া এর দর এক এক দিন এক এক রকম হতে পারে। অথচ খেজুর গাছ ও দুধের মালিকের নগদ অর্থের প্রয়োজন। কারণ যার কাছে নগদ অর্থ ছাড়া অন্যান্য দ্রব্য আছে, সে খেজুর ও দুধের মালিকের কাছে যাবে না। অতএব প্রয়োজন যখন ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সমান, তখন তাদের জন্য এই লেনদেনের অনুমতি দেয়া হয়েছে।'

বাইয়ে সালামে নির্দিষ্ট পণ্যের পরিবর্তে অন্য পণ্য গ্রহণ: বায়য়ে সালামে যে পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি হয়েছে, বায়য়ে সালামের চুক্তি বহাল রেখে সেই পণ্যের পরিবর্তে অন্য পণ্য গ্রহণ অধিকাংশ আলিমের মতে বৈধ নয়। কেননা হয়তো সে পণ্যটি হস্তগত করার পূর্বেই তা ঋণের দায়ে বিক্রয় করে দিয়েছে। তা ছাড়া রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: 'যে ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য অগ্রিম অর্থ প্রদান করেছে, সে যেন প্রদত্ত অগ্রিম অর্থ অন্য জিনিসে স্থানান্তরিত না করে।' (দারা কুতনি, ইবনে উমর থেকে) তবে ইমাম মালেক ও আহমদের মতে এটা বৈধ।

ইবনুল মুনযির বলেন: ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: 'যখন তুমি কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের তরে কোনো পণ্যের জন্য অগ্রিম মূল্য দিয়ে দেবে, তখন তা যদি তুমি মেয়াদের মধ্যে হস্তগত কর তবে তো ভালো কথা। নচেৎ তার পরিবর্তে তার চেয়ে নিকৃষ্ট জিনিস গ্রহণ করবে এবং দুবার মুনাফা অর্জন করবে না।' শু বা এটি বর্ণনা করেছেন এবং এটা সাহাবির উক্তি। বস্তুত সাহাবির উক্তি অন্য কোনো আয়াত বা হাদিসের বিরোধী না হলে অকাট্য প্রমাণ হিসাবে গণ্য।

ইবনুল কাইয়িম উভয় পক্ষের প্রমাণাদি পর্যালোচনা করার পর এই মতটি অগ্রগণ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন কোনো আয়াত বা হাদিস, এবং কোনো ইজমা বা কিয়াস দ্বারা যে এটা অবৈধ প্রমাণিত হয়নি, তা প্রতিষ্ঠিত। বরঞ্চ কুরআন হাদিস ও কিয়াস এর বৈধতার দাবি জানায়। বস্তুত যে কোনো বিতর্কের মীমাংসার জন্য বিষয়টি আল্লাহ ও তার রসূলের সামনে পেশ করাই শরিয়তের মূলনীতি। বাইয়ে সালামের চুক্তি ইকালা বা অন্য কোনো কারণে বাতিল হয়ে গেলে চুক্তিকৃত পণ্যের পরিবর্তে অন্য পণ্য গ্রহণকে কেউ অবৈধ এবং কেউ বৈধ মনে করেন। শেষোক্ত অভিমত ইমাম শাফেয়ি, কাযী আবু ইয়া'লা ও ইমাম ইবনে তাইমিয়ার। ইবনুল কাইয়িম বলেন, শেষোক্ত মতটিই যথার্থ ও সঠিক। কেননা বিকল্প পণ্য গ্রহণ দায়মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায়। ঋণ ও অন্যান্য দায় পরিশোধের মতো এখানেও বিকল্প বৈধ।

চৌত্রিশতম অধ্যায়

রিবা বা সুদ

আরবি রিবার আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি বা অতিরিক্ত। শরিয়তের পরিভাষায় এর অর্থ মূলধনের উপর বৃদ্ধি বা অতিরিক্ত, চাই বেশি হোক বা কম হোক। আল্লাহ্ সূরা বাকারার ২৭৯ নং আয়াতে বলেন:

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ج لَاتَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ○

'কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না, অথবা অত্যাচারিতও হবে না।'

বিধি: সুদ সকল আসমানী ধর্মে হারাম, বিশেষত ইহুদি ধর্মে, খ্রিষ্ট ধর্মে ও ইসলামে নিষিদ্ধ।

পুরাতন নিয়মে বলা হয়েছে: 'আমার জাতির কোনো সন্তানকে যদি তুমি কোনো ঋণ দিয়ে থাক তবে তার সাথে মহাজনের মতো আচরণ করো না। তার কাছ থেকে তোমার দেয়া ঋণের উপর কোনো মুনাফা গ্রহণ করো না।'

'যখন তোমার ভাই অভাবে পড়ে তখন তার ভার বহন করো, তার কাছ থেকে কোনো মুনাফা বা সুবিধা গ্রহণ করো না।'

এতদসত্ত্বেও ইহুদিরাও ইহুদিদের কাছ থেকে সুদ গ্রহণে কোনো বাধা দেখতে পায় না।

কুরআনে সূরা নিসার ১৬১ নং আয়াতে তাদের এই আচরণের নিন্দা করে বলা হয়েছে:

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ○ 'এবং তাদের সুদ গ্রহণের জন্যে, যদিও তা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।'

নতুন নিয়মে বলা হয়েছে: 'যার কাছ থেকে মুনাফা আশা কর, তাকে যখন তোমরা ঋণ দাও তখন তোমাদের কী মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে? তবে বদান্যতা দেখাও এবং মুনাফার আশা না করেই ঋণ দাও। তখন তোমরা বিপুল পুণ্যের অধিকারী হবে।'

বাইবেলের এ সব উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে গির্জার লোকেরা সুদকে সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ বলে রায় দিয়েছে।

সকোবার বলেন: 'যে ব্যক্তি বলে, সুদ খাওয়া গুনাহ নয়, সে নাস্তিক ও ধর্মচ্যুত বিবেচিত।'

ফাদার বুতী বলেন: 'সুদ খোররা দুনিয়ার জীবনে সম্মান থেকে বঞ্চিত এবং মৃত্যুর পর তাদেরকে কাফন পরানোর অযোগ্য।' পবিত্র কুরআন একাধিক জায়গায় পর্যায়ক্রমে সুদ সম্পর্কে মন্তব্য করেছে। মক্কি যুগে নাযিল হওয়া সূরা রুমের ৩৯ নং আয়াতে বলা হয়:

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ج وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ○

'মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দাও, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করেনা। কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তোমরা যে যাকাত দাও তাঁই বৃদ্ধি পায়।'

মাদানি যুগে সূরা আলে ইমরানের ১৩০ নম্বর আয়াতে সুদ নিষিদ্ধ করে বলা হয়:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ○

'হে মুমিনগণ, তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাবে না এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।' সর্বশেষে সূরা বাকারার ২৭৮ ও ২৭৯ নং আয়াতে বলা হয়:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ○ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ج لَاتَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ○

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। যদি তোমরা না ছাড় তবে জেনে রাখ যে, এটা আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধ। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না অথবা অত্যাচারিতও হবে না।'

শেষোক্ত আয়াত থেকে জানা যায়, যারা বলে: চক্রবৃদ্ধি হারে না হলে সুদ হারাম হয় না তাদের কথা ভুল। কেননা আল্লাহ্ মূলধনের অতিরিক্ত কিছুই হালাল করেন ন। সুদ সম্পর্কে এটাই সর্বশেষ আয়াত।

বস্তুত সুদ একটা ভয়ংকর কবীরা গুনাহ। ইমাম বুখারি ও মুসলিম আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'তোমরা সাতটা ধ্বংসাত্মক কাজ পরিহার কর। লোকেরা বললো: হে রসূলুল্লাহ্! কী কী? তিনি বললেন: আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, জাদু, বৈধ কারণ ব্যতীত নিষিদ্ধ প্রাণ হনন, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল খাওয়া, যুদ্ধের সময় পলায়ন, সরলমতী সতী মুমিন নারিদের নামে অপবাদ রটানো।'

সুদের চুক্তিতে শরীক প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন। যে ঋণদাতা সুদ নেয়, যে খাতক সুদ দেয়, যে লেখক সুদের চুক্তি লেখে, এবং যে সাক্ষী এ ব্যাপারে সাক্ষী থাকে, তাদের সবাইকে অভিসম্পাত করেছেন।

বুখারি, মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ, ও তিরমিযি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'আল্লাহ সুদখোরকে, সুদদাতাকে, সুদের সাক্ষীদ্বয়কে ও সুদের লেখককে অভিসম্পাত করেছেন।' দারা কুতনি আব্দুল্লাহ্ ইবনে হানযালা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: সুদের একটি দিরহাম আল্লাহ্র দৃষ্টিতে ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চেয়েও ভয়াবহ।'

রসূলুল্লাহ্ সা. আরো বলেন: 'সুদের নিরানব্বইটি গুনাহ, তন্মধ্যে ক্ষুদ্রতম গুনাহটি হলো নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচার করার সমান।'

সুদ নিষিদ্ধকরণের যৌক্তিকতা: সকল আসমানী ধর্মে সুদ হারাম। হারাম হওয়ার কারণ নিম্নোক্ত মারাত্মক ক্ষতিসমূহ:

১. মানুষে মানুষে শত্রুতার সৃষ্টি করে এবং পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব বিনষ্ট করে। অথচ সকল ধর্ম বিশেষত: ইসলাম পারস্পরিক সহযোগিতা ও অন্যকে অগ্রাধিকার দানের আহ্বান জানায় এবং অহংকার আত্মম্ভরিতা এবং শোষণকে ঘৃণা করে।

২. সুদ এমন একটি বিলাসী শ্রেণী সৃষ্টি করে, যারা কোনো কাজ করে না এবং তাদের হাতে বিপুল সম্পদ পুঞ্জীভূত করে, যা কোনো চেষ্টা ছাড়াই সঞ্চিত হয়। অথচ ইসলাম শ্রমকে মর্যাদা দেয় এবং শ্রমিককে সম্মান করে। ইসলাম শ্রমকে উপার্জনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ারে পরিণত করে। এ দ্বারা দক্ষতা বাড়ে এবং ব্যক্তির মনোবল বৃদ্ধি পায়।

৩. সুদ পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার। এ জন্য বলা হয়: সাম্রাজ্যবাদ হয় একজন ব্যবসায়ীর নচেৎ একজন পাদ্রীর পিছু পিছু চলে। আমরা আমাদের দেশের সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে সুদ ও তার কুফলের সাথে পরিচিত হয়েছি। এ কারণে ইসলাম অভাবী মানুষকে বিনাসুদে ঋণ দেয়ার আহ্বান জানায় এবং এতে বিপুল সওয়াব প্রদান করে। সূরা রুমের ২৯ নং আয়াতে ইতিপূর্বে এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে।

সুদের প্রকারভেদ: সুদ দুই প্রকার: ১. বিলম্ব জনিত সুদ ২. বৃদ্ধি জনিত সুদ।

বিলম্ব জনিত সুদ: ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধে অবকাশ দেয়ার বিনিময়ে তার কাছ থেকে যে অতিরিক্ত আদায় করে, তাকে বিলম্ব জনিত সুদ বলা হয়। কুরআন, সুন্নাহ ও মুসলমানদের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই সুদ হারাম।

বৃদ্ধিজনিত সুদ: বৃদ্ধিজনিত সুদ হলো, মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বা দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য বিক্রয়ের সময় বাড়তি প্রদান। এটা সুন্নাহ্ ও মুসলমানদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত তথা ইজমার আলোকে হারাম। কেননা এটা বিলম্ব জনিত সুদের উৎপত্তির কারণ।

আবু সাঈদ খুদরি রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'তোমরা দুই দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম বিক্রয় করো না। কেননা আমি এ দ্বারা তোমাদের সুদে লিপ্ত হওয়ার আশংকা করি।' হাদিস থেকে ছয়টি দ্রব্যে সুদ হারাম ঘোষিত হয়েছে: স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, যব, খোরমা ও লবণ। আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেন: 'স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, লবণের বিনিময়ে লবণ লেনদেন করতে হলে হাতে হাতে (অর্থাৎ নগদ) এবং সমান সমান লেনদেন করতে হবে। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত দেবে বা চাইবে সে সুদের লেনদেনের দায়ে দোষী হবে। দাতা ও গ্রহীতা সমান।' (আহমদ, বুখারি)

নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ: হাদিসে উল্লিখিত এই ছয়টি জিনিস মানুষের জীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিস, যার প্রতি মানুষ মাত্রই তীব্রভাবে মুখাপেক্ষী এবং যা ছাড়া জীবন অচল। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মৌলিক উপাদান, যা লেনদেন ও বিনিময়ের চাবিকাঠি। এ দুটো জিনিস মূল্য নির্ণয়ের মাপকাঠি এবং দ্রব্যাদির মূল্য নিরূপণের সহায়ক। অবশিষ্ট চারটি দ্রব্য খাদ্যের উপাদান ও উৎস এবং জীবন রক্ষক শক্তি ও পুষ্টির যোগানদাতা। এ সব জিনিসে সুদের প্রচলন ঘটলে তা মানুষের জন্য তীব্র ক্ষতির কারণ হবে এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। এ জন্যই মানুষের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে ও তাদের স্বার্থ ও কল্যাণের খাতিরে আল্লাহ্ এই সুদ নিষিদ্ধ করেছেন।

এ থেকে স্পষ্ট হলো যে, স্বর্ণ ও রৌপ্যে সুদ হারাম করার কারণ হলো ঐ দুটো ক্রয়ের উপকরণ ও মাধ্যম, আর অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে সুদ হারাম হওয়ার কারণ হলো ওগুলো খাদ্য শ্রেণীভুক্ত।

সুতরাং স্বর্ণ ও রৌপ্যের ন্যায় অন্য কোনো জিনিস যদি ক্রয়ের মাধ্যমে পরিণত হয়, তাহলে তাতেও স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিধি প্রযোজ্য হবে এবং তা নগদে ও সমপরিমাণে লেনদেন করতে হবে। অনুরূপ যখন গম, যব, খোরমা ও লবণ ব্যতীত অন্য কোনো পণ্য এই চারটির মতো খাদ্য জাতীয় পণ্য হবে, তখন তাও নগদে ও সমপরিমাণে লেনদেন করতে হবে।

ইমাম মুসলিম মুয়াম্মার ইবনে আব্দুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ্ সা. খাদ্য দ্রব্য সমানে সমানে ব্যতীত লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং যে কোনো জিনিস এই ছয়টির স্থলাভিষিক্ত হবে, তা এই ছয়টির মতোই গণ্য করা হবে এবং এই ছয়টির বিধিই তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কাজেই লেনদেনের বিনিময় দুটি যদি একই শ্রেণীভুক্ত হয় এবং একই কারণের আওতাধীন হয়, তবে অতিরিক্ত দেয়াও হারাম হবে এবং অবকাশ দেয়াও হারাম হবে। উদাহরণ স্বরূপ, স্বর্ণের বিনিময়ে যখন স্বর্ণ এবং গমের বিনিময়ে যখন গম বিক্রয় করা হবে, তখন এ বিক্রয় বা লেনদেনের বিশুদ্ধতার জন্য দুশর্ত প্রযোজ্য হবে।

১. উভয়ের পরিমাণ সমান হওয়া চাই, চাই উভয়ের মান ভালো বা মন্দ হওয়ার দিক দিয়ে একই রকম বা ভিন্ন রকম হোক। উপরোক্ত হাদিস থেকে স্পষ্টত একথাই জানা যায়। তাছাড়া ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন: এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট কিছু খোরমা নিয়ে এলো। রসূলুল্লাহ্ সা. তাকে বললেন: এটা কি আমাদের খোরমা নয়? লোকটি বললো: হে আল্লাহ্র রসূল! আমাদের খোরমা আমাদের নিকট এক সার বিনিময়ে দুই সা' বিক্রয় করুন। রসূলুল্লাহ সা. বললেন: ওটা তো সুদ। ওটা ফিরিয়ে দাও। তারপর আমাদের খোরমা বিক্রয় কর। তারপর ওটা থেকে আমাদের জন্য ক্রয় কর।' ফুযালা সূত্রে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন: রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট একটা হার আনা হলো, যার ভেতরে মুক্তা ও স্বর্ণ ছিলো। এক ব্যক্তি হারটি ৯ বা ৭ দিনার দিয়ে কিনল। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: না, অর্থাৎ ওটা আমি কিনবো না যতোক্ষণ দুটি আলাদা করা না হয়। তিনি ঐ দুটো ফেরত দিলেন। ফলে আলাদা করা হলো। মুসলিমের

বর্ণনায় বলা হয়েছে: হার থেকে স্বর্ণ আলাদা করতে বললেন এবং তা করা হলো। তারপর বললেন: স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান ওজনের বিক্রয় হবে।' ইবনুল কাইয়্যিম বলেন: হালাল দ্রব্য মিশ্রিত জিনিস তার চেয়ে বেশি ওজনের স্বর্ণের জিনিস দিয়ে এবং রৌপ্য মিশ্রিত জিনিস তার চেয়ে বেশি ওজনের রৌপ্যের জিনিস দিয়ে বিক্রয় করা বৈধ।

২. বিনিময়ের দ্রব্য দুটির কোনোটি হস্তান্তরে বিলম্ব না করা, বরং তাৎক্ষণিকভাবে উভয়টি পরস্পরে হস্তান্তর করা চাই। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'এক হাতে দেয়া ও এক হাতে নেয়া চাই।' তিনি আরো বলেন:

'তোমরা স্বর্ণ দিয়ে স্বর্ণ বিক্রয় করলে উভয়টি সমান সমান আদান প্রদান করবে, একটিকে অপরটির উপর অগ্রাধিকার দেবে না। আর রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রয় করলে সমান সমান আদান প্রদান করবে, একটিকে অপটির উপর অগ্রাধিকার দেবে না। আর উপস্থিত জিনিসের বিনিময়ে অনুপস্থিত জিনিস বিক্রয় করবে না। –বুখারি ও মুসলিম।

যখন বিনিময় দুটি ভিন্ন ভিন্ন জাতের এবং একই কারণের আওতাধীন হবে, তখন একটির বিনিময় অপরটির চেয়ে বেশি হওয়া জায়েয, কিন্তু বিলম্বিত লেনদেন জায়েয নেই। যেমন রৌপ্য দিয়ে স্বর্ণ বিক্রয় করা হলে কিংবা যবের বিনিময়ে গম বিক্রয় করা হলে তাৎক্ষণিক হস্তান্তর শর্ত, কিন্তু সমপরিমাণ লেনদেন শর্ত নয়। উভয়টিতে কম-বেশি হতে পারবে।

ইমাম আবুদাউদ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'যবের বিনিময় গম এবং গমের বিনিময়ে যব বেশি দিয়ে বিক্রয় করা যাবে, তবে হাতে হাতে লেনদেন করতে হবে।'

আহমদ ও মুসলিম উবাদা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন: 'এ সব দ্রব্য যখন ভিন্ন ভিন্ন জাতের হবে, তখন যেমন ইচ্ছা বিক্রয় কর। তবে হাতে হাতে লেনদেন কর।' আর যখন বিনিময় দুটির জাতও ভিন্ন এবং কারণও ভিন্ন হবে, তখন কোনো শর্তই জরুরি নয়। কমবেশি লেনদেনও করা যাবে, বিলম্বিত হস্তান্তরও বৈধ হবে। যেমন রৌপ্য দিয়ে খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় করা হলে কমবেশি লেনদেন ও বিলম্বে আদান প্রদান দুটোই জায়েয। অনুরূপ একটা কাপড় দিয়ে দুটো কাপড় এবং একটা পাত্র দিয়ে দুটো পাত্র বিক্রয় করা যাবে।

মোটকথা, স্বর্ণ-রৌপ্য ও খাদ্য-পানীয় ব্যতীত অন্যান্য জিনিসে সুদ বৈধ। ঐ সব দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ে কমবেশি ও বিলম্বে লেনদেন জায়েয এবং হস্তান্তরের পূর্বে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াও জায়েয। উদাহরণ স্বরূপ, দুইটা ছাগলের বদলে একটা ছাগল বিক্রয় করা জায়েয, চাই নগদ হোক বা বাকি। অনুরূপ, একটা ছাগলের পরিবর্তে একটা ছাগল বিক্রয়ও জায়েয। কেননা আমর ইবনুল আ'স রা. বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ্ সা. তাকে যাকাতের উটনীগুলো থেকে দুটির বদলে একটা নিতে আদেশ দিয়েছেন। (আহমদ, আবুদাউদ ও হাকেম) ইবনুল মুনযির বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. দুটো কালো দাসের বিনিময়ে একটা দাস এবং সাতটা ছাগলের বিনিময়ে একটা দাসী কিনেছিলেন। এটা ইমাম শাফেয়িরও অভিমত।

গোশ্‌তের বিনিময়ে জন্তু বিক্রয় করা: অধিকাংশ ইমাম বলেন: কোনো হালাল জন্তুকে একই জাতের জন্তুর গোশতের বিনিময়ে বিক্রয় করা জায়েয নেই। যেমন খাওয়া ইপ্সিত এমন জীবিত গরুর বিনিময়ে জবাইকৃত গরু বিক্রয় করা জায়েয নেই। কেননা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব বর্ণনা করেছেন: রসূলুল্লাহ সা. গোশতের বিনিময়ে জন্তু বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। (মুয়াত্তায় ইমাম মালেক) ইমাম শওকানি বলেছেন: এ হাদিস যতগুলো সনদে বর্ণিত হয়েছে, সে সব সনদের আলোকে সঠিকভাবে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য। বায়হাকি জনৈক মদিনাবাসীর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন: রসূলুল্লাহ্ সা. মৃত জন্তুর বিনিময়ে জীবিত জন্তু বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। হাম্বলীদের মতে এক জন্তুর বিনিময়ে অন্য জন্তুর গোশত বিক্রয় জায়েয। যেমন উটের গোশতের বিনিময়ে ছাগল বিক্রয় জায়েয।

খোরমার বিনিময়ে খেজুর বিক্রয়: খোরমার বিনিময়ে খেজুর বিক্রয় করা জায়েয নেই। তবে যে সব দরিদ্র লোকের খেজুর গাছ নেই, তাদের নিকট বিক্রয় করা জায়েয। তারা খেজুর বাগানের মালিকদের নিকট থেকে খেজুর কিনতে পারে খোরমা ধরে নিয়ে।

ইমাম মালিক ও আবু দাউদ সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন: রসূল সা. কে খোরমার বিনিময়ে খেজুর বিক্রয় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: খেজুর শুকালে কি কমে যায়? লোকেরা বললো: হাঁ, তখন তিনি খোরমার বিনিময়ে খেজুর বিক্রয় করতে নিষেধ করলেন।

ইবনে উমর রা. থেকে বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ্ সা. খোরমার বিনিময়ে বাগানের খেজুর মেপে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আর বাগানের আঙ্গুর কিসমিসের বিনিময়ে মেপে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আর ক্ষেতের খাদ্য-শষ্য রান্না করা খাদ্যের বিনিময়ে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

বুখারি যায়দ ইবনে সাবিত থেকে বর্ণনা করেছেন: রসূলুল্লাহ্ সা. দানকৃত খেজুর গাছের খেজুর আনুমানিক মাপ অনুযায়ী বিক্রয় করতে অনুমতি দিয়েছেন।

প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে বাকিতে বিক্রয়: রসূলুল্লাহ্ সা. কোনো জিনিসকে তার প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে বাকিতে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এটা সুদ, যদিও তা ক্রয় ও বিক্রয়ের আকারে সম্পন্ন হয়ে থাকে। কারণ অর্থের মুখাপেক্ষী হয়ে মানুষ কোনো পণ্য নির্দিষ্ট মূল্যে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত ক্রয় করে, তারপর আরেক ক্রেতার কাছে স্বল্প মেয়াদে কম মূল্যে বিক্রয় করে। এ ক্ষেত্রে সে তাৎক্ষণিকভাবে যে পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করে, তার দ্বারা উপকৃত হওয়াই তার অতিরিক্ত প্রাপ্তি। এ ধরনের বিক্রয় হারাম ও বাতিল। এটা ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের অভিমত। ইমাম শাফেয়ি প্রমুখের মতে এটা জায়েয। কেননা বিক্রয়ের সকল উপাদান এখানে যথাযথ ভাবে বিদ্যমান। এখানে নিয়ত কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। নিয়ত বাস্তবায়নের কোনো নিশ্চয়তা নেই।

১. ইবনে উমর বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: মানুষ যখন নগদ মুদ্রা ব্যয়ে কৃপণতা করে, গরুর লেজের পিছু পিছু চলে এবং আল্লাহ্র পথে জেহাদ বর্জন করে, তখন আল্লাহ্ তাদের উপর এমন বিপদ নাযিল করেন, যা তারা দীনের দিকে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তুলে নেননা।' (আহমদ, আবুদাউদ, তাবারানি, ইবনুল কাতান)

২. আলিয়া (ইনি হলেন আবু ইসহাক হামদানী কুফী সাবিঈ'র স্ত্রী) বিনতে আইফা ইবনে শুরাহবিল বলেন: 'আমি যায়দ ইবনে আরকামের দাসী ও তার স্ত্রী আয়েশা রা. এর নিকট গেলাম। যায়দ ইবনে আরকামের দাসী বললো: আমি আটশো দিরহামের বিনিময়ে বাকিতে যায়দ ইবনে আরকামের নিকট একটা দাস বিক্রয় করেছি। অত:পর সেটি নগদ ছয়শো দিরহামে খরিদ করলাম। আয়েশা রা. বললেন: তোমার ক্রয় ও বিক্রয় দুটোই অন্যায় হয়েছে। যায়দ ইবনে আরকামকে জানাবে, সে তওবা না করলে রসূল সা. এর সাথে কৃত তার জিহাদ বাতিল হয়ে যাবে।' (মালিক, দারু কুতনি)

পঁয়ত্রিশতম অধ্যায়

কর্জ বা ঋণ

সংজ্ঞা: কর্জ বা ঋণ হলো সে সম্পদ, যা ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে দেয় এ শর্তে যে, সে যখন সমর্থ হবে সমপরিমাণ সম্পদ ফেরত দেবে।

শরিয়তে এর বৈধতা: এটা একটা ইবাদত, যা দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা যায়।এর মাধ্যমে মানুষের প্রতি দয়া ও মহানুভবতার আচরণ করা হয়, তাদের অভাব মোচন ও সমস্যার সমাধান করা হয়।

ইসলাম ঋণদাতার ঋণদানকে মুস্তাহাব ও ঋণগ্রহীতার জন্য ঋণ গ্রহণকে বৈধ করেছে এবং এটা তার দৃষ্টিতে ঘৃণীত ভিক্ষাবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা সে এটা গ্রহণ করে তার প্রয়োজন পূরণ করে উপকৃত হওয়ার জন্য এবং যথাসময়ে সমপরিমাণ ফেরত দেয়ার জন্য।

১. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের পার্থিব জীবনের কোনো সংকট মোচন করে, আল্লাহ্ তার কেয়ামতের দিনের সংকট মোচন করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করে আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখেরাতের অভাব দূর করবেন। বান্দা যতোক্ষণ তার ভাইয়ের (মুসলমান ভাইয়ের) সাহায্যে নিয়োজিত থাকে ততোক্ষণ আল্লাহ তার সাহায্যে নিয়োজিত থাকেন।' (মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিযি)

২. ইবনে মাস্উদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'কোনো মুসলমান যদি অপর মুসলমানকে দু'বার ঋণ দেয়, তবে তা একবার সদকা করার সমান।' (ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান)

৩. আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'মেরাজের রাতে আমি বেহেশতের দরজার উপর লেখা দেখেছি: সদকার প্রতিদান দশগুণ, আর ঋণ দানের প্রতিদান আঠারো গুণ। আমি বললাম: হে জিবরীল, ব্যাপার কি, ঋণ দান সদকার চেয়ে ভালো? তিনি বললেন: কেননা সাহায্যপ্রার্থী যখন সাহায্য চায় তখন তার কাছে কিছু থাকে। কিন্তু ঋণপ্রার্থী একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত ঋণ চায় না।'

ঋণের চুক্তি: ঋণের চুক্তি গ্রহীতাকে মালিক বানিয়ে দেয়ার চুক্তি। সুতরাং এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকেই ঋণের চুক্তি করা জায়িয, যার তা দেয়ার আইনগত ক্ষমতা ও যোগ্যতা আছে এবং বিক্রয় ও দানের চুক্তির মত ইজাব ও কবুলের (প্রস্তাব ও প্রস্তাব গ্রহণ) মাধ্যমে তা সম্পাদিত হয়। যে শব্দ দ্বারা ঋণ দান বুঝায়, সেই শব্দ দ্বারাই এ চুক্তি সম্পন্ন হবে।

মালেকি মযহাব অনুসারে চুক্তি সম্পন্ন হলেই গ্রহীতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়, চাই প্রদত্ত ঋণ গ্রহীতার হস্তগত হোক বা না হোক। গ্রহীতা যে জিনিসের ঋণ নিয়েছে, অদ্রূপ বা হুবহু সেই জিনিস ফেরত দিতে পারে, চাই অদ্রূপ জিনিস পাওয়া যাক বা না যাক। তবে হুবহু সেই জিনিস ফেরত দিতে হলে ততোক্ষণই দিতে পারবে যতক্ষণ তাতে হ্রাস বা বৃদ্ধির মাধ্যমে কোনো পরিবর্তন না ঘটে। পরিবর্তন ঘটলে অদ্রূপ জিনিস ফেরত দিতে হবে।

মেয়াদ নির্ধারণের শর্ত: অধিকাংশ ফকীহের মতে, ঋণের ব্যাপারে মেয়াদ নির্ধারণের শর্ত আরোপ করা জায়েয নেই। কেননা এটা নিছক ইচ্ছাকৃত পরোপকার। ঋণদাতার তাৎক্ষণিকভাবে এর বিনিময় চাওয়ার অধিকার রয়েছে। তাই যখন ঋণকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা হবে, তখন তা বিলম্বিত হবে না, বরং তাৎক্ষণিক গণ্য হবে। ইমাম মালেক বলেন: মেয়াদ নির্ধারণের শর্ত আরোপ করা জায়েয, এবং আরোপিত শর্ত অবশ্য পালনীয়। সুতরাং যখন ঋণ কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিলম্বিত করা হয়, তখন তা সেই মেয়াদ পর্যন্ত বিলম্বিতই থাকবে এবং সেই মেয়াদ আগমনের পূর্বে তা চাওয়ার অধিকার কারো নেই। কেননা আল্লাহ্ সূরা বাকারার ২৮২ নং আয়াতে বলেন:

'যখন তোমরা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কোনো ঋণ লেনদেন কর।' তা ছাড়া আমর ইবনে আওফ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'মুসলমানরা তাদের শর্তের অধীন থাকবে।' (আবুদাউদ, আহমদ, তিরমিযি, দারুকুতনি)

কী কী জিনিসে ঋণ জায়েয: কাপড় ও জীবজন্তুতে ঋণ জায়েয। কেননা প্রমাণ রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ সা. দুবছর বয়সী একটি উট ঋণ হিসাবে নিয়েছিলেন। অনুরূপ, যে সব জিনিস মাপে বা ওজনে লেনদেন করা হয় এবং যাবতীয় বাণিজ্যিক পণ্যে ঋণ লেনদেন করা যায়। রুটি ও আটার খামিরেও ঋণ লেনদেন করা যায়।

আয়েশা রা. বলেছেন: 'আমি বললাম: হে আল্লাহ্র রসূল, প্রতিবেশীরা রুটি ও খামির ঋণ দেয় এবং কখনো কম, কখনো বেশি ফেরত দেয়। তিনি বললেন: কোনো অসুবিধা নেই। এগুলো তো মানুষের সুযোগ-সুবিধার বিষয়। এতে কোনো লাভ আশা করা হয় না।

মুয়ায রা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো: রুটি ও আটা ধার নেয়া দেয়া কেমন? তিনি বললেন: সুবহানাল্লাহ্, এটা তো মহৎ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তুমি বেশি দাও কম নাও, অথবা বেশি নাও ও কম দাও। তবে যে সুস্পষ্টভাবে পরিশোধ করে সেই সর্বোত্তম মানুষ। এ কথা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সা. কে বলতে শুনেছি।'

যে ঋণে মুনাফা আসে তা সুদ: যে কোনো ঋণ চুক্তির উদ্দেশ্য হলো মানুষের উপকার করা ও তাদের জীবন যাপনের উপকরণ লাভকে সহজতর করতে সাহায্য করা। ঋণ উপার্জনের মাধ্যম নয় এবং জনগণের শোষণেরও হাতিয়ার নয়। তাই ঋণগ্রহীতার জন্য ঋণদাতার নিকট থেকে গৃহীত মূল ঋণ বা তার সমপরিমাণের চেয়ে বেশি ফেরত দেয়া বৈধ নয়। কেননা ফিক্হের মূলনীতি হলো, যে ঋণ দ্বারা মুনাফা অর্জিত হয়, সেটাই সুদ।

তবে এটা সুদ ও অবৈধ হওয়ার একটা শর্ত রয়েছে। সেটি হলো ঋণের এই মুনাফা বা লাভ শর্ত হিসাবে আরোপিত হওয়া চাই অথবা প্রথাগতভাবে চালু থাকা চাই। এর কোনোটিই যদি না হয়, অর্থাৎ শর্তও আরোপিত হয়নি কিংবা প্রথাগত ভাবেও চালু নেই, তাহলে ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধের সময় গ্রহীত ঋণের চেয়ে উত্তম মানের জিনিস দিতে, পরিমাণে তার চেয়ে কিছু বেশি দিতে কিংবা পূর্বাহ্নে তার নিকট বাড়ি বিক্রয়ের শর্ত আরোপিত হয়ে থাকলে তার নিকট বাড়ি বিক্রয় করতে পারে। ঋণদাতা এটা গ্রহণ করলে মাকরূহ হবে না। কেননা আহমদ, মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি ও ইবনে মাজা আবু রাফে থেকে বর্ণনা করেন:

'রসূলুল্লাহ্ সা. এক ব্যক্তির নিকট থেকে দুবছর বয়সী একটা উট ধার নেন। এরপর তাঁর কাছে যাকাতের উট এলো। তখন তিনি আমাকে আদেশ দিলেন যাকাতের উটের বহর থেকে দু'বছর বয়সী একটা উট দিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করতে। আমি বললাম: ছয় বছর পেরিয়ে সাত বছরে পা দিয়েছে এমন সুন্দর উট ছাড়া ঐ বহরে আর কোনো উট নেই। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: 'ওটাই ওকে দিয়ে দাও। কারণ যে উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ করে সে-ই উত্তম মানুষ।'

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. এর কাছে আমার কিছু প্রাপ্য ছিলো। তিনি আমার সেই প্রাপ্য পরিশোধ করলেন এবং কিছু বেশিও দিলেন। (আহমদ, বুখারি, মুসলিম)

মৃত্যুর পূর্বে ঋণ পরিশোধ করার জন্যে তাড়া দেয়া: ১. ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন: এক ব্যক্তি তার ভাই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। সে ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায়। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: সে তার ঋণের দায়ে আটক রয়েছে। তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দাও।' সে বললো: হে রসূলুল্লাহ্, তার সব ঋণ আমি পরিশোধ করেছি। কেবল দুই দিনার বাকি। জনৈকা মহিলা এই দুই দিনারের দাবিদার। কিন্তু তার কোনো সাক্ষী নেই। তিনি বললেন: মহিলাটি যা দাবি করছে তা তাকে দিয়ে দাও। কারণ তার দাবি সঠিক।'

২. বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি বললো: হে রসূলুল্লাহ্, আমি যদি আমার জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করি, অত:পর এমন অবস্থায় নিহত হই যে, আমি ধৈর্যশীল ছিলাম, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিহাদরত ছিলাম এবং পিছু না হটে কেবল সামনের দিকেই অগ্রসর হচ্ছিলাম, তাহলে কি আমি বেহেশতে যেতে পারবো? তিনি বললেন: হাঁ। লোকটি তার কথাটা আবারো দু'বার বা তিনবার পুনরাবৃত্তি করলো। রসূলুল্লাহ সা. বললেন: কিন্তু তুমি যদি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যাও এবং পরিশোধ করার ব্যবস্থাও তোমার নেই, তাহলে পারবে না। এরপর তিনি একটি বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে অত্যন্ত কঠোর সতর্কবাণী নাযিল হয়েছে বলে জানালেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো: কোন্ বিষয়ে? তিনি বললেন:

'ঋণ সম্পর্কে, মহান আল্লাহ্‌র শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় ও পুনরায় জীবিত হয়। অত:পর পুনরায় আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় ও পুনরায় জীবিত হয়, অত:পর পুনরায় আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়, তবুও ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।'

৩. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ্ সা. এমন কোনো ব্যক্তির জানাযা পড়তেন না, যে ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেছে। একদিন তার নিকট একটি মৃতদেহ এলো। তিনি বললেন: তার কি কোনো ঋণ আছে? লোকেরা বললো: হাঁ, তিনি বললেন: তোমরা তোমাদের বন্ধুর জানাযা পড়। আবু কাতাদা আনসারী বললেন: 'ওর ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমি নিলাম।' তখন রসূলুল্লাহ্ সা. তার জানাযা পড়ালেন।

পরে যখন আল্লাহ্ তাঁর রসূল সা. কে বিজয় দান করলেন, তখন তিনি বললেন: আমি যে কোনো মুমিনের জন্য তার নিজের চেয়ে উত্তম অভিভাবক। যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যাবে, তার ঋণের দায় আমার। আর যে ব্যক্তি কোনো সম্পদ রেখে মারা যাবে, তার ঋণের দায় তার উত্তরাধিকারীদের।' (বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি, নাসায়ি, ইবনে মাজা, আবু হুরায়রা রা, সূত্রে)

৪. আবু হুরায়রা রা. থেকে বুখারি বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'যে ব্যক্তি লোকদের কাছ থেকে কোনো সম্পদ নিয়েছে, এবং তা পরিশোধ করতে ইচ্ছুক ছিলো, তার ঋণ আল্লাহ্ পরিশোধ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি তা নষ্ট করার জন্যে নিয়েছে, আল্লাহ্ তা নষ্ট করবেন।'

ধনীর গড়িমসি যুলুম: আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: পাওনা পরিশোধে ধনীর গড়িমসি ও টালবাহানা যুলুমের শামিল। আর যখন তোমার কারো পাওনা কোনো ধনী ব্যক্তির নিকট সোপর্দ করা হয়, তখন তা তার মেনে নেয়া উচিত।' (আবু দাউদ)

দরিদ্র খাতককে সময় বাড়িয়ে দেয়া মুস্তাহাব: আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন:

وَاِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۚ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ○

'যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয় তবে স্বচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা ছেড়ে দাও তবে সেটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা জানতে। (আল বাকারা, ২৮০)

১. আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত: তিনি তার জনৈক খাতককে খুঁজছিলেন। কিন্তু সে গা ঢাকা দিলো। অত:পর তাকে পেলেন। তখন খাতক বললো: আমি অভাবগ্রস্ত। তিনি বললেন: আল্লাহ্‌র কসম করে বলতে পার? সে বললো: আল্লাহ্‌র কসম! কাতাদা বললেন: আমি রসূলুল্লাহ্ সা. কে বলতে শুনেছি: কেয়ামতের দিনের দু:খকষ্ট থেকে আল্লাহ মুক্তি দিলে যে ব্যক্তি আনন্দিত হয়, তার উচিত অভাবগ্রস্ত খাতককে অবকাশ দেয়া অথবা ঋণ থেকে অব্যাহতি দেয়া।

২. কাব ইবনে উমর রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সা. কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্ত খাতককে অবকাশ দেবে বা ঋণ থেকে অব্যাহতি দেবে, আল্লাহ তাকে নিজের ছায়ায় স্থান দেবেন।'

মেয়াদ সমাপ্তির পূর্বে ঋণের একাংশ থেকে অব্যাহতি দান: অধিকাংশ ফকিহের মতে, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে স্থিরকৃত মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ত্বরিত ঋণ আদায়ের নিমিত্ত ঋণের একাংশ থেকে খাতককে অব্যাহতি দেয়া অবৈধ। কেউ যদি কাউকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দেয় তারপর খাতককে বলে: তোমাকে ঋণের একাংশ থেকে অব্যাহতি দেবো এই শর্তে যে, তুমি বাকি অংশ মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পরিশোধ করে দেবে, তবে এটা হারাম হবে।

কিন্তু ইবনে আব্বাস ও যুফার র. এর মতে এটা জায়েয। কারণ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ্ সা. যখন বনুনযীর (ইহুদি গোত্র) কে মদিনা থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেন, তখন তাদের একটা প্রতিনিধি দল এসে বললো: হে আল্লাহ্‌র নবী, আপনি তো আমাদেরকে বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছেন। অথচ এখনো জনগণের নিকট আমাদের অনেক ঋণ পাওনা রয়েছে যা তারা পরিশোধ করেনি। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: 'ঋণের কিছুটা ছেড়ে দাও এবং বাকিটা আদায়ে তাড়া দাও।'

ছত্রিশতম অধ্যায়

রাহ্ন বা বন্ধক

সংজ্ঞা: শরিয়তের পরিভাষায় রাহ্ন বা বন্ধক হচ্ছে শরিয়তের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক মূল্য সম্বলিত কোনো দ্রব্যকে কোনো ঋণের প্রমাণে পরিণত করা, যাতে ঐ ঋণ বা তার অংশ বিশেষ ঐ দ্রব্য থেকে আদায় বা উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

যখন অপর কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে এবং সে ঋণের পরিবর্তে ঋণদাতার হাতে কোনো জমি বা জন্তু আটক তথা বন্ধক রাখে যা ঋণ পরিশোধ করা পর্যন্ত আটক অবস্থায় থাকবে, তখন শরিয়তের দৃষ্টিতে ঐ আটক বস্তুটি রাহ্ন বা বন্ধক গণ্য হবে। (এভাবে ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত হয়। নচেৎ বন্ধক দেয়া বস্তুটি পুরো বা আংশিক ঋণের অনুপাতে নষ্ট হবে।) বন্ধক দেয়া বস্তুটির মালিক ঋণ গ্রহীতাকে বন্ধকদাতা এবং যে ঋণদাতা বস্তুটির ঋণের পরিবর্তে নিজের হাতে আটক রাখে তাকে বন্ধক গ্রহীতা বলা হয়। আর যে বস্তুটিকে বন্ধক রাখা হয় তাকে রাহ্ন বা বন্ধক বলা হয়।

রাহ্নের বৈধতা: কুরআন সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা রাহন বা বন্ধক বৈধ প্রমাণিত। কুরআনে আল্লাহ্ বলেন:

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ؕ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۝

'যদি তোমরা সফরে থাকে এবং কোনো লেখক না পাও, তবে বন্ধক রাখা বৈধ। তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করলে, যাকে বিশ্বাস করা হয়, সে যেন আমানত প্রত্যর্পণ করে এবং তার প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করে।' (আল বাকারা: আয়াত ২৮৩)

সুন্নাহ থেকে এর বৈধতা প্রমাণিত এভাবে যে, রসূলুল্লাহ্ সা. জনৈক ইহুদির নিকট তার বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। তিনি তার কাছে কিছু যব ধার চাইলে সে বলেছিল মুহাম্মদ আমার পণ্য আত্মসাৎ করতে চায়।' তখন তিনি বললেন: সে মিথ্যা বলছে। আমি পৃথিবীতেও বিশ্বস্ত আকাশেও বিশ্বস্ত। সে যদি আমাকে বিশ্বাস করতো তবে আমি অবশ্যই ধার পরিশোধ করতাম। তোমরা আমার বর্মটি তার কাছে রেখে এসো।'

বুখারি প্রমুখ আয়েশা রা থেকে বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ্ সা. জনৈক ইহুদির নিকট থেকে কিছু খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করেন এবং তার নিকট তাঁর বর্ম বন্ধক রাখেন।

আলেমগণ বন্ধকের বৈধতার ব্যাপারে একমত। এর বৈধতায় কেউ দ্বিমত পোষণ করেনি। অবশ্য সফর অবস্থা ব্যতীত এটা বৈধ কিনা তা নিয়ে কেউ দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে, কেউ সফরে থাকুক বা নিজ বাসস্থলে থাকুক, উভয় অবস্থায় বন্ধক রাখা বৈধ। কেননা রসূলুল্লাহ সা. মদিনায় অবস্থান কালেই এটা করেছেন। আয়াতে এটিকে সফরের অবস্থার সাথে যুক্ত করার কারণ এই যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটা সফরেই হয়ে থাকে।

মুজাহিদ যাহ্হাক ও যাহেরি মযহাবের আলেমগণ বলেন: শুধু সফরে অবস্থান কালেই বন্ধক বৈধ। কেননা আয়াতে একথাই বলা হয়েছে। তবে হাদিসটি তাদের মোক্ষম জবাব।

বন্ধক বিশুদ্ধতার শর্তাবলী: ১. সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া, ২. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া,

৩. চুক্তির সময়ে বন্ধকী দ্রব্যটির উপস্থিতি, চাই তা শরিকী হোক না কেন।

৪. বন্ধক গ্রহীতা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক বন্ধকী দ্রব্যটি দখলে নেয়া।

ইমাম শাফেয়ি বলেছেন: আল্লাহ তায়ালা বন্ধকের বিধান দিয়েছেনই হস্তগত করার শর্ত সহকারে। তাই হস্তগত না হলে বন্ধকও বৈধ হবে না। মালেকি আলেমগণ বলেন: চুক্তির বলেই বন্ধক বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকর হয়ে যাবে। তবে বন্ধকদাতাকে বাধ্য করা হবে বন্ধকী দ্রব্য হস্তান্তর করতে, যাতে বন্ধক গ্রহীতা তা দখলে নিতে পারে। যখন বন্ধক গ্রহীতা তা হস্তগত করবে, তার পরও বন্ধকদাতা তা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ি এ মতের বিরোধী। তার মতে, যতোক্ষণ বন্ধকগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ততক্ষণই বন্ধকদাতা তা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে।

বন্ধকী সম্পত্তি দ্বারা বন্ধক গ্রহীতার লাভবান হওয়া: বন্ধকের চুক্তিটি মূলত ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা ও বিশ্বস্ততা অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়ে থাকে। এ দ্বারা লাভজনক হওয়া বাঞ্ছিত নয়। তাই বন্ধকগ্রহীতার জন্যে বন্ধকী সম্পত্তি দ্বারা লাভবান হওয়া বৈধ নয়। এমনকি বন্ধকদাতা অনুমতি দিলেও নয়। কেননা এতে করে বন্ধক একটি লাভবান ঋণে পরিণত হবে। অথচ প্রত্যেক লাভজনক ঋণই সুদ। অবশ্য এ কথা কেবল তখনই প্রযোজ্য, যখন বন্ধকী সম্পত্তি আরোহণযোগ্য বা দোহনযোগ্য জন্তু হবে না। সে ধরনের কোনো জন্তু হলে বন্ধকগ্রহীতা তার লালনপালনের খরচ বহন করার বিনিময়ে তা দ্বারা উপকৃত ও লাভবান হতে পারবে।

যেমন ঘোড়া, খচ্চর বা উট ইত্যাকার জন্তু হলে তার লালন পালনের ব্যয় বহনের বিনিময়ে তাতে আরোহণ এবং গরু ছাগল ইত্যাকার জন্তু হলে তার লালনপালনের ব্যয় বহনের বিনিময়ে তার দুধ দোহন ও ব্যবহার করতে পারবে। (এটা ইমাম আহমদ ও ইসহাকের অভিমত। কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে, বন্ধকগ্রহীতা কোনোভাবেই উপকৃত হতে পারবে না। তবে হাদিসের প্রমাণ তাদের বিপক্ষে।)

উপকৃত হওয়ার বৈধতার স্বপক্ষে প্রমাণাদি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'দুধেল জন্তু যখন বন্ধক থাকে তখন তার দুধ বন্ধক গ্রহীতার ব্যয়ে দোয়ানো যাবে আর জন্তু বন্ধক থাকা অবস্থায় গ্রহীতার ব্যয়ে তার পিঠে আরোহণ করা যাবে। যে আরোহণ করে ও দোহন করে, জন্তুর লালনপালনের ব্যয় তাকেই বহন করতে হবে।' ইমাম আবু দাউদ বলেছেন: হাদিসটি আমাদের জানামতে সহীহ। অন্যেরাও এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে বুখারি, তিরমিযি ও ইবনে মাজা অন্যতম।

খ. আবু হুরায়রা রা. থেকে আরো বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: জন্তু যদি বন্ধককৃত হয়, তবে নিজ খরচে বন্ধকগ্রহীতা তার উপর আরোহণ করতে পারবে এবং দুধেল জন্তু যদি বন্ধককৃত হয়, তবে নিজ খরচে বন্ধকগ্রহীতা তার দুধ পান করতে পারবে। আরোহণকারী ও দুধ পানকারীকে খরচ বহন করতে হবে। (মুসলিম ও নাসায়ি ব্যতীত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থ কর্তৃক বর্ণিত)

ইমাম আহমদের বর্ণনার ভাষা এ রকম: জন্তু যদি বন্ধকী হয় তবে বন্ধক গ্রহীতার উপর তাকে ঘাস খাওয়ানো বাধ্যতামূলক। দুধেল জন্তুর দুধ পান করা যাবে। পানকারীকে জন্তুর খরচ বহন করতে হবে।'

গ. আবু হুরায়রা রা. থেকে আরো বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'বন্ধকী জন্তুর দুধ দোহন ও পিঠে আরোহণ বৈধ।'

বন্ধকী সম্পত্তির ব্যয়ভার ও উপকারিতা: বন্ধকী সম্পত্তির ব্যয়ভার তার রক্ষণাবেক্ষণের পারিশ্রমিক ও তা ফেরত দেয়ার খরচ তার মালিক বহন করবে। আর বন্ধকী সম্পত্তির উপকারিতা বন্ধকদাতা ভোগ করবে। এর প্রবৃদ্ধি বন্ধকী সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত এবং তাও মূল বন্ধকী সম্পত্তির সাথে যুক্ত হবে। সন্তান, পশম, দুধ ও ফসল বন্ধকী সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'বন্ধকী সম্পত্তির সকল উপকারিতা বন্ধকদাতার প্রাপ্য এবং তার সকল দায়ও তার উপর আরোপিত।

ইমাম শাফেয়ি বলেছেন: এর কোনোটাই বন্ধকী সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। ইমাম মালেক বলেছেন: সন্তান ও খেজুর গাছের চারা ব্যতীত আর কিছুই বন্ধকী সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না।

শাসকের অনুমতি নিয়ে যদি বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকদাতার অনুপস্থিতিতে বা তার অস্বীকৃতির কারণে বন্ধকী সম্পত্তির খরচ বহন করে তবে তা বন্ধকদাতার নিকট খরচ বহনকারীর ঋণ হিসাবে পাওনা থাকবে।

বন্ধকী সম্পত্তি আমানত: বন্ধকী সম্পত্তি বন্ধক গ্রহীতার নিকট আমানত। বাড়াবাড়ি না করলে তার জন্যে তাকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। এটা ইমাম আহমদ ও শাফেয়ির অভিমত।

ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত বন্ধক বহাল থাকবে: ইবনুল মুনযির বলেছেন: আমি যতো জন আলেমের অভিমত সংরক্ষণ করেছি তারা সবাই একমত যে, যে ব্যক্তি কোনো বিনিময়ে কোনো জিনিস বন্ধক রাখে অত:পর প্রদত্ত বিনিময়ের একাংশ দিয়ে বন্ধককৃত জিনিসের একাংশ মুক্ত করতে চায়, তার জন্য এটা বৈধ নয়। তাকে পূর্ণ প্রাপ্য প্ররিশোধ না করা অথবা দায়মুক্ত না করা পর্যন্ত সে বন্ধককৃত জিনিস ফেরত নিতে পারবে না।

বন্ধক হাতছাড়া হওয়া: আরবদের মধ্যে রেওয়াজ ছিলো, বন্ধকদাতা যখন তার কাছে প্রাপ্য ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হতো, তখন তা তার মালিকানা থেকে বেরিয়ে যেত এবং বন্ধক গ্রহীতা তার মালিক হয়ে যেত। ইসলাম এটা নিষিদ্ধ করেছে ও এই রেওয়াজ বাতিল করেছে।

মেয়াদ শেষ হওয়া মাত্রই বন্ধকদাতার উপর ঋণ পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু সে যদি ঋণ পরিশোধ না করে এবং বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করার অনুমতিও না দেয় তবে শাসক ঋণ পরিশোধ করতে অথবা বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করতে তাকে বাধ্য করবে। বিক্রয় করলে ও তার মূল্যের কিছু অংশ উদ্বৃত্ত থাকলে তা বন্ধকী সম্পত্তির মালিকের। আর যদি কিছু কম পড়ে তবে তা বন্ধকদাতার নিকট পাওনা থাকবে।

মুয়াবিয়া ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাফর বর্ণনা করেন: এক ব্যক্তি মদিনায় একটা বাড়ি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বন্ধক রাখলো। মেয়াদ শেষ হওয়া মাত্রই বন্ধকগ্রহীতা বললো: এটা আমার বাড়ি। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: বন্ধকী সম্পত্তি বন্ধকদাতার হাতছাড়া হতে পারে না। সে তার উপকারিতা লাভ করবে ও দায় বহন করবে। (শাফেয়ি, আহরাম ও দারু কুতনি কর্তৃক বর্ণিত)

মেয়াদ ফুরালে বন্ধক বিক্রয়ের শর্ত আরোপ: মেয়াদ ফুরালে বন্ধক বিক্রয় করা হবে এরূপ শর্ত আরোপ করা হলে তা জায়েয। সে ক্ষেত্রে বন্ধক গ্রহীতার বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের অধিকার থাকবে। তবে ইমাম শাফেয়ি এর বিরোধী। তাঁর মতে এ ধরনের শর্ত বাতিল।

বন্ধক বাতিল হয় কখন

বন্ধক গ্রহীতার ইচ্ছাক্রমে বন্ধকী সম্পত্তি বন্ধকদাতার নিকট যখনই ফেরত যাবে, তখনই বন্ধক বাতিল হয়ে যাবে।

সাঁইত্রিশতম অধ্যায়

কৃষি কাজ

কৃষির ফযিলত: ইমাম কুরতুবি বলেন: কৃষি কাজ একটা ফরযে কেফায়া। সুতরাং সরকারের কর্তব্য জনগণকে এ কাজে নিয়োজিত হতে বাধ্য ও উদ্বুদ্ধ করা। গাছের চারা রোপণও কৃষি কাজের আওতাভুক্ত।

১. বুখারি ও মুসলিম আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'কোনো মুসলমান যদি গাছের চারা রোপণ করে কিংবা ফসল ফলায়, তবে তা থেকে মানুষ, জীবজন্তু বা পাখি কিছু খেয়ে ফেললে তা তার জন্য সদকায় পরিণত হবে।'

২. ইমাম তিরমিযি আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'তোমরা ক্ষেতের ফসল থেকে জীবিকা অন্বেষণ করো।'

যৌথ কৃষি বা বর্গাচাষ: যৌথ কৃষি বলতে বুঝায়, কৃষককে এই শর্তে ভূমি অর্পণ করা যে, যে ফসল উৎপন্ন হবে তার একটা অংশ যেমন: অর্ধেক, এক তৃতীয়াংশ, বা তার বেশি বা কম, উভয়ের সম্মতিক্রমে যা স্থির হয় তা সে পাবে।

যৌথ কৃষির বৈধতা: যৌথ কৃষিকাজ ভূমি মালিক ও কৃষকের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার একটি প্রক্রিয়া। কৃষক কৃষি কাজে দক্ষ হতে পারে। কিন্তু তার ভূমি নেই। অপরদিকে ভূমিমালিক কৃষি কাজে অসমর্থ হতে পারে। এজন্য উভয় পক্ষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে ইসলাম এ ব্যবস্থা অনুমোদন করেছে।

যৌথ কৃষি কাজ রসূলুল্লাহ্ সা. ও তাঁর সাহাবীগণ করেছেন। বুখারি ও মুসলিম ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ্ সা. খয়বরবাসীর সাথে সেখানে যা কিছু ফল বা ফসল উৎপন্ন হবে তার একাংশের বিনিময়ে কৃষির বন্দোবস্ত করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ বাকের বলেন: মদিনায় এমন কোনো মুহাজির পরিবার নেই, যারা এক তৃতীয়াংশ ও এক চতুর্থাংশ ফসলের বিনিময়ে চাষবাস করেনা। আলি রা. সাদ ইবনে মালেক, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উমার ইবনে আব্দুল আযীয, কাসেম, উরওয়া এবং আবু বকর, উমর, আলি ও ইবনে সিরীনের বংশধরেরা যৌথ কৃষি কাজ করেছেন। (বুখারি)

আল-মুগনীতে বলা হয়েছে: 'এটা একটা প্রসিদ্ধ ব্যাপার। রসূলুল্লাহ্ সা. মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ কাজ করেছেন, তারপর তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীন মৃত্যু পর্যন্ত এ কাজ করেছেন, অত:পর তাদের বংশধররাও করেছেন।' মদিনায় আহলে বাইতের এমন কেউ ছিলনা, যিনি এ কাজ করেননি। রসূলুল্লাহ্ সা. এর পরে তার স্ত্রীগণও এ কাজ করেছেন। এ ধরনের কাজ রহিত হওয়াও বৈধ নয়। কেননা শরিয়তের কোনো বিধি একমাত্র রসূলুল্লাহ্ সা. এর জীবদ্দশায়ই রহিত হতে পারে। যে কাজ রসূলুল্লাহ সা. আমৃত্যু করেছেন, তারপর তার খলিফারাও করেছেন এবং যার পক্ষে সাহাবীগণ একমত ছিলেন এবং তাদের কেউ এর বিরোধিতা করেননি, তা রহিত করা কিভাবে বৈধ হতে পারে? যদি রসূলুল্লাহ্ সা. এর জীবদ্দশায় রহিত হয়ে থাকে, তাহলে রহিত হওয়ার পর তিনি এ কাজ কিভাবে করলেন? আর কিভাবেই এই রহিত হওয়াটা এতোই গোপন থেকে গেল যে, তাঁর খলিফারাও তা জানতে পারলো না? অথচ খয়বরের ঘটনা ও সেখানে তাদের কাজ সর্বজন বিদিত। রহিত হওয়ার তথ্য বর্ণনাকারী কোথায় ছিলেন যে, তার উল্লেখ করলেন এবং তাদেরকে ব্যাপারটা জানালেন না?

যৌথ কৃষি নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত হাদিসের জবাব : রাফে ইবনে খাদীজ যে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ সা. যৌথ কৃষি নিষিদ্ধ করেছেন, যায়েদ ইবনে সাবিত তার জবাব দিয়েছেন এই বলে যে, ঐ নিষেধাজ্ঞা কেবল বিবাদ মীমাংসার উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছিল। তিনি বলেছেন:

'আল্লাহ্ রাফে ইবনে খাদীজকে ক্ষমা করুন। আল্লাহর কসম, আমি এ হাদিস সম্পর্কে তার চেয়ে বেশি জানি। দুজন আনসারী মারামারি করে রসূল সা. এর কাছে এসেছিল। তিনি বললেন: তোমাদের অবস্থা যখন এই, তখন তোমরা ক্ষেত বর্গা দেবে না।' রাফে শুধু শেষের কথাটা 'ক্ষেত বর্গা দেবে না' শুনতে পেয়েছেন। (আবু দাউদ, নাসায়ি)

ইবনে আব্বাসও রাফে' ইবনে খাদীজের বক্তব্য খন্ডন করেছেন এবং এই বলে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, রসূল সা. এই নিষেধাজ্ঞাটি শুধু যা মঙ্গলজনক হয় সেটা করতে বলার উদ্দেশ্যেই দিয়েছিলেন।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. যৌথ কৃষি বা বর্গা চাষকে নিষিদ্ধ করেননি। তিনি কেবল পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করার আদেশ দিয়ে বলেছেন:

'যার ভূমি আছে, সে যেন সেই ভূমি নিজে চাষ করে, অথবা তার ভাইকে চাষ করতে দেয়। সে যদি অস্বীকার করে, তবে সে যেন নিজের জমিকে নিজেই ধরে রাখে।'

আমর ইবনে দিনার রা. বলেন: আমি ইবনে উমরকে বলতে শুনেছি: 'আমরা বর্গা চাষে কোনো আপত্তি দেখতামনা, যতোক্ষণ না রাফে ইবনে খাদীজ বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ সা. এটা করতে নিষেধ করেছেন। পরে রাফের এই বর্ণনা আমি তাউসের কাছে উল্লেখ করলাম। তাউস বললেন: তাদের মধ্যে যিনি সর্বাধিক বিজ্ঞ (অর্থাৎ ইবনে আব্বাস) তিনি বলেছেন: 'কাউকে নিজের জমি দেয়া জমির উপর নির্দিষ্ট কর বা খাজনা গ্রহণের চেয়ে ভালো।' (পাঁচটি সহীহ্ হাদিস গ্রন্থ)

মুদ্রার বিনিময়ে জমি ভাড়া নেয়া: মুদ্রা, খাদ্যশস্য বা অন্য কোনো সম্পদের বিনিময়ে যৌথ কৃষিকাজ বা বর্গা চাষ জায়িয।

হানযালা ইবনে কায়েস রা. বলেন: আমি জমি ভাড়া নেয়ার ব্যাপারে রাফে ইবনে খাদীজকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: রসূলুল্লাহ সা. এটা নিষেধ করেছেন। (সম্ভবত ফসলের অংশের বিনিময়ে ভাড়া নেয়া বুঝিয়েছেন) আমি বললাম: স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময়ে? তিনি বললেন: স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময়ে হলে আপত্তি নেই। (তিরমিযি ব্যতীত অবশিষ্ট পাঁচটি সহীহ হাদিস গ্রন্থ)

এটা ইমাম আহমদ এবং মালিক ও শাফেয়ি মযহারের কারো কারো অভিমত। ইমাম নববী বলেন: এটাই সবচেয়ে অগ্রগণ্য মত।

অবৈধ বর্গা চাষ: আমরা আগেই বলেছি, বৈধ বর্গা চাষ হলো কাউকে এই শর্তে জমি চাষ করতে দেয়া যে, মালিক উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ পাবে। অর্থাৎ তার প্রাপ্যের পরিমাণ অনির্দিষ্ট থাকবে। কিন্তু যদি তার প্রাপ্যের পরিমাণ নির্ধারিত হয়, যেমন উৎপন্ন ফসলের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থির করা হয়, অথবা ভূমির আয়তনের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থির করা হবে যে, ভূমির ঐ অংশের ফসল মালিকের প্রাপ্য হবে, আর বাকি অংশ থাকবে চাষী বা উভয়ে তাতে অংশীদার, তাহলে এ ধরনের বর্গা চাষ অবৈধ হবে। এতে অস্পষ্টতা ও ধোকার অবকাশ রয়েছে এবং বিবাদ-বিসংবাদের ঝুঁকি রয়েছে।

ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন, রাফে ইবনে খাদীজ বলেন: 'আমরা মদিনার সবচেয়ে বেশি কৃষি ক্ষেতের অধিকারী ছিলাম। আমরা জমি আমাদের পাশ থেকে ভাড়া দিতাম এবং তা জমির মালিকের জন্য নির্দিষ্ট থাকতো। কখনো ঐ অংশে ফসল হতো, আর অবশিষ্ট জমি ফাঁকা যেতো। আবার কখনো ঐ অংশ ফাঁকা যেতো ও অবশিষ্ট জমিতে ফসল হতো। অবশেষে এ ধরনের বর্গা চাষ করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হলো।' রাফে' ইবনে খাদীজ থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: তোমাদের ক্ষেত কিভাবে চাষ কর? আমরা বললাম: সিকি ফসল এবং কয়েক ওয়াসাক খোরমা ও যবের বিনিময়ে ক্ষেত ভাড়া দেই।' তিনি বললেন: এটা করোনা।'

রাফে ইবনে খাদীজ রা. থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন: 'রসূলুল্লাহ্ সা. এর যুগে খাল ও জলাশয়ের কিনারে যা ফলতো তার বিনিময়ে লোকেরা জমি ভাড়া দিতো। তখন কতক ফসল নষ্ট হতো, কতক অক্ষত থাকতো। অথচ এই ভাড়ার জমি ছাড়া লোকদের হাতে আর কিছু ছিলনা। এজন্য রসূলুল্লাহ্ সা. এ কাজ করতে নিষেধ করলেন।

পতিত জমি আবাদ করা: ব্যাখ্যা: পতিত জমি আবাদ করার অর্থ হলো, যে জমি ইতিপূর্বে আবাদ ও ব্যবহার করা হয়নি, তাকে ব্যবহারযোগ্য করা এবং আবাসন বা চাষের কাজে লাগানোর উপযুক্ত করা।

এ কাজে উদ্বুদ্ধকরণ: ইসলাম চায়, মানুষ আবাদযোগ্য জমি সম্প্রসারিত করুক, পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ুক এবং অনাবাদী জমি আবাদ করুক। এতে তাদের সম্পদ বাড়বে ও স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে। আর

এভাবে তারা সম্পদশালী ও শক্তিশালী হবে। এজন্য ইসলাম মানুষকে পতিত জমি আবাদ করতে ও তার সম্ভাবনা দ্বারা উপকৃত হতে উদ্বুদ্ধ করে। রসূলুল্লাহ সা. বলেন:

১. 'যে ব্যক্তি কোনো পতিত জমি আবাদ করবে, সে জমি তার।' (আবু দাউদ, নাসায়ি, তিরমিযি)।

২. উরওয়া রা. বলেন: 'পৃথিবী আল্লাহ্র, বান্দারাও আল্লাহ্র, যে ব্যক্তি কোনো মৃত জমিকে জীবিত করবে, সে জমির উপর তার অধিকারই অগ্রগণ্য। রসূলুল্লাহ্ সা. এর কাছ থেকে এ কথা আমাদের নিকট তারাই পৌছিয়েছেন, যারা নামাযের কথা পৌছিয়েছেন।'

৩. 'যে ব্যক্তি কোনো মৃত জমিকে জীবিত করবে, তার জন্যে ঐ কাজে প্রতিদান রয়েছে। তা থেকে পশুপাখি ও কীটপতংগ যা খেয়ে ফেলে, তা তার জন্য সদকায় পরিণত হবে।' (নাসায়ি)।

৪. হাসান ইবনে সামুরা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'যে ব্যক্তি জমিতে কোনো প্রাচীর দেবে, সে জমি তার হবে।' (অর্থাৎ পতিত জমি।) আবু দাউদ।

৫. আস্মার ইবনে মুযাররাস বলেন: আমি রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে এসে বাইয়াত হলাম। তিনি বললেন: কোনো মুসলমান যার প্রতি ইতিপূর্বে অগ্রণী হয়নি, তার প্রতি যে ব্যক্তি অগ্রণী হবে, সেটি তার হবে।' এ কথা শোনার পর লোকেরা নিজ নিজ ভূমিকে ঘিরে ফেললো।

পতিত জমি আবাদ করার শর্তাবলী: জমিকে পতিত গণ্য করার শর্ত হলো, তা লোকালয় থেকে দূরে অবস্থিত হওয়া চাই, যাতে তা ঐ লোকালয়ের অংশ গণ্য না হয়। লোকালয় থেকে দূরত্বের পরিমাণ প্রচলিত রীতি রেওয়াজ অনুসারে স্থির হবে।

শাসকের অনুমতি : ফকিহ্গণ এই মর্মে একমত যে, পতিত জমিকে আবাদ করা তার মালিক হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এ ব্যাপারে শাসকের অনুমতি শর্ত কিনা সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ আলেম বলেন: শাসকের অনুমতি শর্ত নয়। যখনই কেউ কোনো পতিত জমি আবাদ করবে, তখনই সে তার মালিক হয়ে যাবে, শাসকের অনুমতি ছাড়াই। যখন বিবাদ দেখা দেবে এবং শাসক এর মীমাংসার দায়িত্ব করবে তখন আবাদকারীকে তার অধিকার বুঝিয়ে দেয়া শাসকের কর্তব্য।

ইমাম আবু দাউদ সাইদ ইবনে যায়েদ সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'যে ব্যক্তি কোনো পতিত জমি আবাদ করবে, সে জমি তার।'

ইমাম আবু হানিফা বলেন: 'আবাদ করলে মালিক হওয়া যায়। তবে শাসকের অনুমতি ও স্বীকৃতি শর্ত।'

মালেকের মতে লোকালয় থেকে দূরের জমি ও লোকালয়ের সন্নিহিত জমিতে পার্থক্য রয়েছে। সন্নিহিত হলে শাসকের অনুমতি লাগবে। দূরের হলে অনুমতি লাগবে না। আবাদকারী তার মালিক হয়ে যাবে।

কখন মালিকানা রহিত হবে?: যে ব্যক্তি কোনো জমি আবাদ করবে বলে স্থির করলো, পতাকা গেড়ে তাকে চিহ্নিত অথবা প্রাচীর দিয়ে ঘেরাও করলো, তারপর কোনো কাজ দ্বারা তাকে আবাদ বা ব্যবহারযোগ্য করলো না, তিন বছর পর তা থেকে তার মালিকানা রহিত হবে।

সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ্ বলেন: উমর ইবনুল খাত্তাব রা. একদিন মিসরের উপর ভাষণ দিলেন: যে ব্যক্তি পতিত জমি আবাদ করবে, সে জমি তার হবে। তবে জমি আটকে রেখে আবাদ না করলে তিন বছর পর তার মালিকানা থাকবে না। কারণ অনেকেই জমি আটকে রাখতো, কিন্তু আবাদ করতো না।'

তাউস বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: আদি ভূমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের, এরপর তোমাদের। যে ব্যক্তি পতিত জমি আবাদ করবে সে জমি তার। যে ব্যক্তি জমি শুধুই আটকে রাখে, তিন বছর পর তার মালিকানা থাকবে না।'

যে ব্যক্তি অন্যের মালিকানাভুক্ত জমি তার অজান্তে আবাদ করে : উমর ইবনুল খাত্তাব রা.ও উমর ইবনে আব্দুল আযিয রা. এর আমলে যে রেওয়াজ চালু ছিলো তা হলো, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো জমিকে মালিকবিহীন মনে করে আবাদ করতো, অত:পর অন্য একজন এসে জমিটি তার মালিকানাভুক্ত প্রমাণ করতো, তখন মালিকানা দাবিদারকে দুটি কাজের যে কোনো একটি করার ইখতিয়ার দেয়া হতো: হয় আবাদকারীকে তার কাজের পারিশ্রমিক দিয়ে তার কাছ থেকে জমি উদ্ধার করবে, নতুবা জমির মূল্য

গ্রহণ করে তাকে জমি বুঝিয়ে দেবে। এ ব্যাপারেই রসূল সা. বলেছেন: 'যে ব্যক্তি পতিত জমি আবাদ করবে সেটা তার। যুলুমকারীর ঘামের কোনো প্রাপ্য নেই।'

জমি জলাশয় ও খনি বরাদ্দ দেয়া: ন্যায়বিচারক শাসক যদি কল্যাণকর বিবেচনা করেন, তবে কিছু লোককে কিছু জমি, খনি বা জলাশয় বরাদ্দ দিতে পারেন। (কল্যাণকর না হলে নিছক স্বজনপ্রীতির খাতিরে দেয়া জায়েয নেই।)

রসূল সা. ও পরবর্তী খলিফাগণ এটা করেছেন। নিম্নোক্ত হাদিস থেকে তার প্রমাণ মেলে:

১. আব্দুর রহমান ইবনে আওফ বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. ও উমর ইবনুল খাত্তাব আমাকে কিছু জমি বরাদ্দ দেন। পরে যুবাইর রা. উমর রা. এর পরিজনদের নিকট গিয়ে তাদের কাছ থেকে তার অংশ কিনে নেন। অত:পর উসমান রা. এর নিকট বললেন:

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ দাবি করেন যে, রসূলুল্লাহ্ সা. ও উমর ইবনুল খাত্তাব তাকে অমুক জমি বরাদ্দ দিয়েছেন। কিন্তু আমি উমরের বংশধরদের অংশ কিনে নিয়েছি। উসমান রা. বললেন: আব্দুর রহমানের বক্তব্য সঠিক। (আহমদ)

২. আলকামা ইবনে ওয়ায়েল বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. তাঁর জন্য হাযরা মাউতের এক খণ্ড জমি বরাদ্দ করেছিলেন।

৩. উমর ইবনে দিনার বলেন: রসূলুল্লাহ সা. যখন মদিনায় এলেন, তখন আবু বকর ও উমর রা. কে জমি বরাদ্দ দেন।

৪. ইবনে আব্বাস রা. বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. বিলাল ইবনে হারিসের জন্য সমুদ্রতীরবর্তী নীচু ও উঁচু জমি বরাদ্দ দিয়েছিলেন। -আহমদ, আবু দাউদ।

ইমাম আবু ইউসুফ বলেন: এ সমস্ত হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, রসূলুল্লাহ্ সা. অনেকের জন্যে জমি বরাদ্দ করেছেন এবং তাঁর পরবর্তী খলিফাগণও বরাদ্দ করেছেন। এতে যদি ইসলামের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ পায় এবং দেশ গঠনে সহায়তা হয়, তবে রসূলুল্লাহ্ সা. একে কল্যাণকর মনে করতেন। খলিফাগণও সেই ব্যক্তিকেই বরাদ্দ দিতেন, যার সম্পর্কে তারা জানতেন যে, তার দ্বারা ইসলামের উন্নতি ও সমৃদ্ধি হবে এবং ইসলামের শত্রুর ক্ষতি হবে। খলিফাগণ তাদের কাজ ভালো মনে করেই করতেন, নচেৎ করতেন না।

যে ব্যক্তি জমি পতিত রেখে দেয় তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া: শাসক শুধু কল্যাণের উদ্দেশ্যেই জমি বরাদ্দ দিতে পারেন। যখন প্রমাণিত হবে যে, যার নামে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, সে জমি আবাদ না করে পতিত রেখে দিয়েছে, তখন তা তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে।

১. আমর ইবনে শুয়াইব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ্ সা. মুযায়না বা জুহায়না গোত্রের কিছু লোকের নামে কিছু জমি বরাদ্দ নিয়েছিলেন। কিন্তু তারা সে জমি আবাদ করেনি। পরে অন্য একটি গোত্র ঐ জমি আবাদ করলো। ফলে যুহানী বা মুযানীরা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর নিকট তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। উমার রা. বললেন: জমিটা যদি আমি দিতাম বা আবু বকর দিতেন, তবে আমি তোমাদেরকে ফেরত দিতাম। কিন্তু ওটা রসূলুল্লাহ্ সা. এর প্রদত্ত জমি। তারপর বললেন: কেউ যদি তার জমিকে তিন বছর অনাবাদী রেখে দেয় অত:পর অন্য কেউ তা আবাদ করে, তবে পরবর্তী আবাদকারী ঐ জমির অধিক হকদার।

২. হারিস ইবনে বিলাল মুযানির পিতা বিলাল বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. তাকে সমগ্র আকীক এলাকা বরাদ্দ দেন। পরে উমর রা. এর যুগ এলে তিনি বিলালকে বললেন: রসূলুল্লাহ্ সা. তোমাকে এ জমি এ জন্য বরাদ্দ দেননি যে, তুমি ওটা জনগণের কাছ থেকে নিজের কাছে অনর্থক আগলে রাখবে। বরাদ্দ দিয়েছেন এ জন্য যে, তুমি তা কাজে লাগাবে। সুতরাং ঐ জমি থেকে তুমি যেটুকু আবাদ করতে পার তা গ্রহণ কর বাকিটা ফেরত দাও।'

◆◆◆

আটত্রিশতম অধ্যায়

ইজারা বা ভাড়াদান

সংজ্ঞা: শরিয়তের পরিভাষায় ইজারা বা ভাড়াদান এমন চুক্তিকে বলা হয়, যা কোনো জিনিসের উপকারিতা বা সেবা নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে পাওয়ার নিশ্চয়তা দেয়। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী ফল আহরণ দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য গাছ ভাড়া নেয়া বৈধ নয়। কারণ গাছ কোনো সেবা বা উপকারিতা নয়, বরং সেবার উৎস। অনুরূপ স্বর্ণ, রৌপ্য, খাদ্য দ্রব্য, কিংবা মেপে বা ওজন করে দেয়া বা নেয়া হয় এমন কোনো জিনিসের ইজারাও বৈধ নয়। কেননা এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বস্তুটির সেবা নিতে হলে বস্তুটিই নি:শেষ হয়ে যাবে। একই কারণে দুধ খাওয়ার জন্য গরু, ছাগল ও উটনী ভাড়া দেয়া-নেয়াও বৈধ নয়। কেননা ইজারার উদ্দেশ্য সেবা বা উপকারিতার মালিক হওয়া। অথচ এ ক্ষেত্রে দুধের মালিকানা অর্জিত হয়, যা সে নয়। সেবা কখনো কখনো কোনো বস্তু থেকে পাওয়া যায়। যেমন বাড়ি থেকে বসবাসের সেবা পাওয়া এবং গাড়ি থেকে পরিবহণের সেবা পাওয়া যায়। আবার কখনো কখনো কাজ থেকে সেবা পাওয়া যায়। যেমন প্রকৌশলী, রাজমিস্ত্রী, রংমিস্ত্রী ইত্যাদির কাজ। আবার কখনো ব্যক্তির কাজ থেকে পাওয়া যায়, যেমন চাকর বাকর।

যিনি সেবার মালিক ও তা ভাড়া দেন তাকে বলা হয় ইজারাদাতা বা ভাড়াদাতা আর যিনি সেবা গ্রহণ করেন, তাকে ইজারাগ্রহীতা বা ভাড়াগ্রহীতা বলা হয়। যে বস্তুটির সেবা ভাড়া নেয়া হয় তাকে বলা হয় ভাড়ায় প্রদত্ত এবং সেবার বিনিময়কে বলা হয় ভাড়া।

ইজারার ব্যক্তি সঠিক হলে ভাড়া গ্রহীতার জন্য সেবা গ্রহণের অধিকার বা সেবার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। আর ভাড়াদাতার জন্য ভাড়ার মালিকানা বা ভাড়া গ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। কেননা এটা একটা বিনিময় চুক্তি।

ইজারা বা ভাড়া দানের বৈধতা : কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা দ্বারা ভাড়া দানের বৈধতা প্রমাণিত।

১. পবিত্র কুরআনের সূরা যুখরুফের ৩২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ط نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ط وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ○

'তারা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বণ্টন করে? আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপর জনের উপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে। তারা যা জমা করে তার চেয়ে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।'

২. সূরা বাকারার ২৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন:

وَإِنْ أَرَدْتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَادَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآاٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ○

'তোমরা যা বিধিমত দিতে চেয়েছিলে তা যদি অর্পণ করো তবে ধাত্রী দ্বারা তোমাদের সন্তানদের স্তন্য পান করাতে চাইলে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আল্লাহ্কে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।'

৩. আল্লাহ সূরা কাসাসের ২৬ ও ২৭ নং আয়াতে বলেন:

قَالَتْ إِحْدٰىهُمَا يٰٓأَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ز إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْأَمِينُ○ قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَىَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى أَنْ تَاْجُرَنِى ثَمٰنِىَ حِجَجٍ ج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ج وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ط سَتَجِدُنِىٓ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِينَ○

'কন্যাদ্বয়ের একজন বললো: হে পিতা, তুমি এ ব্যক্তিকে মজুর নিযুক্ত করো, কারণ শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিই তোমার মজুর হিসেবে উত্তম হবে। সে মূসাকে বললো: আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে। যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ করো, সে তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনা। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে তোমার প্রতি সদাচারী পাবে।'

আর নিম্নোক্ত হাদিসগুলিও লক্ষ্যণীয়: ১. ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ্ সা. বনুদ দাইলের আব্দুল্লাহ্ ইবনুল আরিকিত নামক এক ব্যক্তিকে মজুর নিযুক্ত করেন। সে দক্ষ পথ প্রদর্শক ছিলো।

২. ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক তার ঘাম শুকানোর আগেই দিয়ে দাও।'

৩. ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও নাসায়ি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. সূত্রে বর্ণনা করেন: 'আমার খালের কিনারে যে ফসল উৎপন্ন হতো তার বিনিময়ে জমি ভাড়া নিতাম। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ সা. এটা করতে নিষেধ করলেন এবং স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময়ে ভাড়া নিতে আদেশ দিলেন।'

৪. ইমাম বুখারি ও মুসলিম ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: খেরি করাও এবং নাপিতকে তার পারিশ্রমিক দাও।

এ ছাড়া সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ ইজারার বৈধতার ব্যাপারে একমত। যে কজন আলেম এই ঐক্যমতের বিরোধিতা করেছেন তাদের বিরোধিতা ধর্তব্য নয়।

ইজারা বৈধতার যুক্তি: শরিয়ত ইজারা বা ভাড়া দানকে বৈধ করেছে এ জন্যে যে, এটা মানুষের জন্যে খুবই প্রয়োজনীয়। বসবাসের জন্যে মানুষের ঘরবাড়ি দরকার। কাজের জন্যে চাকর বা কর্মচারী দরকার। পরিবহণের জন্যে বাহক জন্তু (বা গাড়ি), চাষবাসের জন্যে ভূমি এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্যে যন্ত্রপাতির দরকার। এ সব প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করার চেয়ে ভাড়ায় সংগ্রহ করাই সুলভ।

ইজারা বা ভাড়া চুক্তির মূল উপাদান: ইজারা বা ভাড়ার চুক্তি 'ভাড়া দিলাম' ও 'ভাড়া গ্রহণ করলাম' বা এ ধরনের অর্থবোধক দুটো বাক্য দ্বারা সম্পাদিত হয়, যার একটি ইজাব বা প্রস্তাব এবং অপরটি কবুল বা গ্রহণ বুঝায়।

ভাড়াদাতা ও গ্রহীতার শর্ত: ভাড়াদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে অপরিহার্য শর্ত হলো, উভয়ের ন্যায় অন্যায় ও লাভ ক্ষতি বুঝার মতো সুস্থ মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিমান হওয়া চাই। একজন যদি পাগল বা নির্বোধ শিশু হয়, তাহলে চুক্তি বৈধ হবে না।

ইজারা বা ভাড়ার বিশুদ্ধতার শর্তাবলী: ইজারা/ভাড়ার বিশুদ্ধতার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী জরুরি:

১. ভাড়াদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্মতি। দু'জনের একজনকে যদি বলপ্রয়োগে ভাড়া দিতে বা নিতে বাধ্য করা হয় তাহলে ভাড়া শুদ্ধ হবে না। কেননা আল্লাহ্ বলেন:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قف وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا○

'হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজি হয়ে ব্যবসায় করা বৈধ।' (সূরা ৪ নিসা: আয়াত ২৯)

২. যে সেবা লাভের জন্য চুক্তি করা হচ্ছে, সে সেবা সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা, যাতে কোনো ধরনের বিতর্ক সৃষ্টি না হয়। বিতর্ক রোধক জ্ঞান অর্জনের উপায় হলো, ভাড়া দেয়া বস্তু চাক্ষুস দর্শন, বিবরণ দ্বারা পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন সম্ভব হলে বস্তুটির বিবরণ দান, ভাড়ার মেয়াদ বর্ণনা, যথা মাস, বছর বা তার চেয়ে কম বা বেশি, এবং ইঙ্গিত সেবার বিবরণ দান।

৩. যে বস্তুর সেবা নিয়ে চুক্তি হবে, তা যেন আইনগতভাবে ও বাস্তব সম্মতভাবে হস্তান্তর যোগ্য হয়। কিছু কিছু আলেম এই শর্তটি জুড়ে দিয়েছেন। তারা মনে করেন, এই শর্ত অনুসারে শরিক ব্যতীত যৌথ

মালিকানাধীন বস্তুর ভাড়া জায়েয নয়। কারণ সেটা হস্তান্তর করা সম্ভব নয়। এটা ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম যুফারের অভিমত।

কিন্তু অধিকাংশ ফকিহের মতে যৌথ মালিকানাধীন জিনিস শরীক ব্যতীতই ভাড়া দেয়া ও নেয়া জায়েয। কেননা যৌথ মালিকানাধীন জিনিসেরও সেবা ও উপকারিতা রয়েছে। আর বস্তুটিকে শরিকমুক্ত করে অথবা তার অংশ অনুপাতে আংশিক সেবা প্রদানের চুক্তির মাধ্যমে হস্তান্তর করা সম্ভব, যেমন ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। বস্তুত: ইজারাও এক ধরনের বিক্রয়। সেবা সুপরিচিত ও সুনির্দিষ্ট না হলে ভাড়ার চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

৪. ভাড়া দেয়া বস্তু হস্তান্তর করা ও তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকা চাই। কাজেই পালানো জন্তু ভাড়া দেয়া বৈধ হবে না। কেননা তা হস্তান্তর করা সম্ভব নয়। অনুরূপ নিষ্ফলা জমি ও বিকলাংগ জন্তু ভাড়া দেয়া বৈধ নয়। কেননা এ দুটি দ্বারা সেই সেবা পাওয়া সম্ভব নয়, যা পাওয়ার জন্য ভাড়া নেয়ার চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

৫. কাম্য সেবা শরিয়তের আলোকে মুবাহ হওয়া চাই, হারামও নয়, ওয়াজিবও নয়। সুতরাং গুনাহ্র কাজে ভাড়া লেনদেন জায়েয নয়। কারণ গুনাহ্র কাজ পরিহার করা ওয়াজিব।

কেউ যদি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করার জন্যে কোনো লোক ভাড়া করে অথবা তাকে মদ এনে দেয়ার জন্যে কাউকে মজুর নিযুক্ত করে অথবা মদ বিক্রয়ের জন্যে ঘর ভাড়া দেয় কিংবা জুয়া খেলা বা গির্জা বা মন্দির বানানোর জন্যে ঘর ভাড়া দেয়, তবে এই ভাড়া অবৈধ হবে। অনুরূপ জ্যোতিষী ও গণককে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্যে পারিশ্রমিক বা বখশিস দেয়া জায়েয নেই। কেননা এটা একটা হারাম কাজের বিনিময় ও মানুষের সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করার শামিল। নামায ও রোযার জন্যে কাউকে ভাড়া নেয়াও জায়েয নেই। কেননা এটা ফরয কাজ, যা প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের উপর ফরয।

ইবাদতের জন্যে পারিশ্রমিক দেয়া: ইবাদাতের কাজে পারিশ্রমিক দেয়া নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। হানাফি মযহাবের মত: ইবাদাতের কাজে ভাড়া বা পারিশ্রমিক দেয়া, যেমন পারিশ্রমিকদাতার পক্ষ থেকে নামায পড়া, রোযা রাখা, হজ্জ করা বা কুরআন পড়া এবং তার সওয়াব তার জন্য হাদিয়া করে পাঠানো, ইবাদাত বাবত পারিশ্রমিক দেয়া নাজায়েয। এ ধরনের কাজ করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হারাম। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: তোমরা কুরআন পড়, কিন্তু তার বিনিময়ে কিছু খাবে না।' তিনি আমর ইবনুল আসকে বলেন: 'তোমাকে যদি মুয়ায্যিন নিয়োগ করা হয়, তবে আযানের জন্য পারিশ্রমিক নেবে না। তাছাড়া যেহেতু কোনো ইবাদাত যখন সম্পন্ন হয় তখন তা সম্পাদনকারীর পক্ষ থেকেই সম্পাদিত হয়। তাই সে বাবতে অন্য কারো পারিশ্রমিক নেয়া বৈধ নয়। এ জাতীয় যে সব কাজ মিসরে প্রচলিত আছে, যেমন খতম, তাসবীহ্ ইত্যাদি নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পড়া, যাতে পাঠক তা মৃত ব্যক্তির আত্মার নিকট পাঠিয়ে দেয়, এ সব শরিয়তে অবৈধ কোন বিষয়েই নয়, বাংলাদেশসহ অন্যান্য মুসলিম দেশেও এ ধরনের কাজ চালু আছে। আলেম ও ইমাম সাহেবদের উচিৎ এসব বর্জন করা। কেননা পাঠক যখন অর্থের জন্যে পড়ে তখন তাতে কোনো সওয়াবই হয় না। অতএব মৃত ব্যক্তির নিকট সে কী পাঠাবে?

ফকিহগণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন: এবাদতমূলক কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হারাম। তবে সাম্প্রতিকতম আলেমগণ কুরআন শিক্ষা ও শরিয়তের জ্ঞান বিস্তারের কাজে পারিশ্রমিক গ্রহণকে জায়েয বলেছেন। কেননা প্রাথমিক যুগে এ সব কাজ যারা করতো, তাদের জন্যে বাইতুল মাল ও ধনীদের পক্ষ থেকে ভাতাদি দেয়া হতো, এবং সেই ভাতা এখন আর চালু নেই। তাদের ও তাদের উপর নির্ভরশীলদের বিকল্প কোনো জীবিকার ব্যবস্থা না থাকায় তারা যাতে সংকটে না পড়ে সে জন্য তাদের এই কাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ বৈধ। কেননা তাদেরকে পারিশ্রমিক দেয়া না হলে তারা কৃষি, ব্যবসায়, শিল্প বা অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত হতে বাধ্য হবে এবং তার ফলে কুরআন ও ইসলামের প্রচারক সংখ্যা হ্রাস পেতে পেতে নি:শেষ হয়ে যাবে। তখন কুরআন ও শরিয়তের জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার হুমকির সম্মুখীন হবে। তাই তাদেরকে এ কাজে পারিশ্রমিক দেয়া যাবে।

হাম্বলীদের অভিমত: আযান, একামত, কুরআন, হাদিস ও ফিক্‌হ শিক্ষাদান, হজ্জে প্রতিনিধিত্ব করা, ও শরয়ী আদালতের বিচার কার্যে পারিশ্রমিক দেয়া জায়েয নেই। এ কাজ যে করবে, সে-ই এর প্রতিদান পাবে। এর জন্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাও হারাম। তারা বলেন: 'তবে বাইতুল মাল থেকে বিচার, কুরআন, হাদিস, ও ফিক্‌হের শিক্ষা বিস্তার, হজ্জে প্রতিনিধিত্ব করা, সাক্ষ্য প্রদান, আযান দেয়া ইত্যাদি সামাজিক সেবামূলক কাজের জন্যে ওয়াকফকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে জীবিকা গ্রহণ করা জায়েয। কেননা এ হচ্ছে জনস্বার্থমূলক কাজ। আর এ জীবিকা পারিশ্রমিক নয়, বরং ইবাদাতের কাজে সহায়তা বাবত রাষ্ট্রীয় জীবিকা। এতে ইবাদাতের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তা যদি হতো তবে গনিমত নেয়া জায়েয হতো না।

মালেকি, শাফেয়ি ও ইমাম ইবনে হায্‌মের মত: কুরআন শিখানো ও শরিয়তের জ্ঞান প্রচারের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয। এটা সুনির্দিষ্ট শ্রমের জন্যে সুনির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কর্মী নিয়োগের পর্যায়ভুক্ত।

ইবনে হায্‌ম বলেন: 'কুরআন শিখানো, শরিয়তের জ্ঞান বিস্তার, তাবিজ লেখা, কুরআন লেখা, ইসলামী জ্ঞান সংবলিত পুস্তক লেখা ইত্যাদি কাজে মাসিক বা এককালীন পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয। কেননা কুরআন বা হাদিসে সুস্পষ্টভাবে এর বিরুদ্ধে কোনো নিষেধাজ্ঞা আসেনি, বরং অনুমোদন এসেছে।'

ইমাম বুখারি কর্তৃক ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিসটি ইবনে হায্‌মের অভিমতকে শক্তিশালী করে: 'রসূলুল্লাহ্ সা. এর সাহাবিদের একটি দল একটি জলাশয়ের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঐ জলাশয়ের তীরে অবস্থানকারীদের মধ্যে কাউকে সাপে কাটে। জলাশয়বাসীদের মধ্য হতে একজন বললো: আপনাদের মধ্যে কি কোনো ঝাড় ফুঁককারী আছে? কেননা জলাশয় এলাকায় একজন সর্পদংশিত লোক রয়েছে। তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি চলে গেল এবং একটা ছাগলের বিনিময়ে সূরা ফাতেহা পড়লো, পরে সে ছাগলটি নিয়ে তার সাথীদের কাছে এল। সাথীরা এতে বিরক্ত হলো এবং বললো: তুমি কুরআন পড়ার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিলে? পরে তারা মদিনায় এসে বললো: হে রসূলুল্লাহ্, এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠের জন্য পারিশ্রমিক নিয়েছে। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: তোমরা যতো কিছুর জন্য পারিশ্রমিক নিয়ে থাক, তন্মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাবই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারী।'

ফকিহগণ কুরআন পাঠ ও তা শিখানোর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ সম্পর্কে যেমন নানা মত পোষণ করেন, তেমনি তারা হজ্জ, আযান ও ইমামতির বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ নিয়েও নানা মত পোষণ করেন।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ বলেন: ইবাদাতের কাজে পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয নেই, এই মূলনীতির আওতায় এটা নাজায়েয। ইমাম মালেক বলেন: কুরআন শিক্ষাদানে যেমন পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয, তেমনি হজ্জ ও আযানেও জায়েয। তবে শুধু ইমামতির জন্যে পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয নেই। যদি কেউ ইমামতি ও মুয়াযযেনি দুটোই করে তবে পারিশ্রমিক নেয়া বৈধ। সেই পারিশ্রমিক গণ্য হবে আযান ও মসজিদের দেখাশুনা বা তদারকীর পারিশ্রমিক হিসাবে, নামাযের পারিশ্রমিক হিসাবে নয়।

ইমাম শাফেয়ি বলেন: হজ্জের জন্য পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয, কিন্তু ফরয নামাযের ইমামতির জন্য পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয নেই। তবে অংক, হাতের লেখা, ভাষা, সাহিত্য, ফিক্‌হ ও হাদিস শেখানো এবং মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণের পারিশ্রমিক নেয়া সর্বসম্মতভাবে জায়েয।

ইমাম শাফেয়ির মতে মৃত ব্যক্তির গোসল, দাফন ও দাফনের পর কবরের কাছে দাঁড়িয়ে কলেমায়ে শাহাদাত শেখানোর জন্য পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয। ইমাম আবু হানিফা বলেন: মৃত ব্যক্তির গোসল করানোর জন্য পারিশ্রমিক দেয়া জায়েয নেই। কিন্তু কবর খনন ও লাশ বহনের জন্য জায়েয আছে।

নাপিতের আয়: নাপিতের আয় হারাম নয়। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. নাপিতের দ্বারা খেউরি করিয়েছেন এবং তাকে তার পারিশ্রমিক দিয়েছেন। ইমাম বুখারি ও মুসলিম ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে এটা বর্ণনা করেন। যদি এটা হারামই হতো তবে তিনি দিতেন না।

ইমাম নববি বলেন: যে সকল হাদিসে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে, তা দ্বারা এটা মাকরূহ তান্‌যিহী বুঝায় এবং নিম্ন মানের কাজ দ্বারা আয় রোজগার না করতে ও মহৎ কার্যাদি করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

৬. সর্বশেষ শর্ত হলো, পারিশ্রমিকটা এমন সম্পদ হওয়া চাই, বাজারে যার মূল্য আছে এবং যা দেখে বা বর্ণনা দ্বারা নির্ধারিত করা যায়। কেননা এটা সেবার মূল্য। আর যে কোনো মূল্যই নির্ধারিত হওয়া শর্ত। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'যে ব্যক্তি কাউকে মজুর নিযুক্ত করবে সে যেন তার কাছে তার মজুরি নির্ধারণ করে জানিয়ে দেয়। মজুরি প্রচলিত রেওয়াজ দ্বারা নির্ধারণ করা বৈধ। ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেন এবং তিরমিযি সহিহ বলে প্রত্যয়ন করেন, সুয়াইদ ইবনে কায়েস বলেছেন: 'আমি ও মহরামা আবদি বাজার থেকে এক বস্তা কাপড় নিয়ে মক্কায় এলাম। তখন আমাদের নিকট রসূলুল্লাহ্ সা. এলেন এবং একটা পাজামার দর করলেন। পাজামাটা আমরা তাঁর কাছে বিক্রয় করলাম। পাশেই এক ব্যক্তি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পণ্য ওজন করছিল। তিনি তাকে বললেন: 'ওজন কর এবং পাল্লা ঝুঁকিয়ে দাও।' এখানে তিনি তার জন্যে কোনো পারিশ্রমিক নির্ধারণ করলেন না, বরং প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তাকে পারিশ্রমিক দিলেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: 'যখন কেউ পেশাদার বাহক জন্তু চালকের পিঠে আরোহণ করে, পেশাদার শৌচাগারধারী শৌচাগারে প্রবেশ করে, পেশাদার ধোপাকে কাপড় ধৌত করতে ও পেশাদার বাবুর্চিকে খাবার রান্না করতে দেয়, তখন পারিশ্রমিক জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। কেননা তার পারিশ্রমিক নির্ধারিতই আছে।'

ভাড়া দেয়া-নেয়া বা নিয়োগের ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক নির্ধারণে প্রচলিত রীতি অনুসরণ করতে হবে। এটা সূরা তালাকের ৬নং আয়াতে প্রমাণিত: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ○

'মহিলারা যদি তোমাদের সন্তানকে দুধ পান করায় তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দেবে।'

আয়াতে দুধ পান করালেই পারিশ্রমিক দেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। আর পারিশ্রমিক যে প্রচলিত রেওয়াজ দ্বারাই নির্ধারিত হবে তা সুবিদিত।

পারিশ্রমিক দ্রুত বা বিলম্বে প্রদানের শর্ত আরোপ: শুধুমাত্র চুক্তি সম্পন্ন হলেই পারিশ্রমিক পাওনা হয় না, এটা হানাফি মযহাবের মত। আর উভয় পক্ষ একমত হলে পুরো পারিশ্রমিক বা ভাড়া বা তার একাংশ তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান বা বিলম্বে প্রদান উভয়ই বৈধ। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন:

'মুসলমানরা তাদের পারস্পরিক শর্তের ভিত্তিতে লেনদেন করবে।' ত্বরিত বা বিলম্বিত পরিশোধের ব্যাপারে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত না হয়ে থাকলে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার অব্যবহিত পরই তা পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক। উদাহরণ স্বরূপ, কেউ যদি এক মাসের জন্য বাড়ি ভাড়া দেয় তবে এক মাস অতিক্রম করার পরই ভাড়া পরিশোধ করতে হবে। আর যদি কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা বাবদ ভাড়া বা মজুরি নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে কাজটি সমাপ্ত হওয়া মাত্রই তা পরিশোধ করতে হবে। আর যদি কোনো শর্ত আরোপ ছাড়াই চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকে তবে ইমাম আবু হানিফার মতে সেবা গ্রহণের অনুপাতে কিস্তিতে কিস্তিতে মজুরি বা ভাড়া দেয়া হবে। ইমাম শাফেয়ি ও আহমদ বলেন: চুক্তি সম্পাদিত হওয়া মাত্রই ভাড়া প্রাপ্য হয়ে যায়। ভাড়া দানকারী যখনই তার ভাড়ায় দেয়া জিনিসটি ভাড়া গ্রহীতার নিকট সমর্পণ করে, তখনই সে পুরো ভাড়া পাওয়ার অধিকারী হয়ে যায়। কেননা সে ভাড়ার চুক্তির বলেই সমস্ত সেবার মালিক হয়ে গেছে এবং তার নিকট ভাড়ার বস্তুটি সমর্পণের জন্য ভাড়া পরিশোধ করা জরুরি।

পারিশ্রমিক বা ভাড়া পাওনা হয় কখন?: ভাড়া বা পারিশ্রমিক পাওনা হয় নিম্নোক্ত সময়ে:

১. যখনই কাজ সমাপ্ত হয়। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'শ্রমিককে তার ঘাম শুকাবার আগেই পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।' -ইবনে মাজা।

২. ভাড়া চুক্তিটি যদি কোনো বস্তু সম্পর্কে সম্পাদিত হয় তবে ঐ বস্তুটির সেবা প্রাপ্তির পরই ভাড়া পাওনা হয়। নির্দিষ্ট মেয়াদের একটুও অতিবাহিত নাহতেই যদি বস্তুটি ধ্বংস হয়ে যায় তবে ভাড়ার চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

৩. ভাড়ায় নেয়া বস্তুটি থেকে পুরোপুরি সেবা নেয়া সম্ভব এতটা সময় যদি মেয়াদ থেকে অতিবাহিত হয়, তবে নির্ধারিত ভাড়া পাওনা হবে, চাই কার্যত: পুরো সেবা নিয়ে থাকুক বা না থাকুক।

৪. কার্যত: তাৎক্ষণিক পরিশোধ করা হলে বা উভয় পক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করতে একমত হলে।

মজুর নিয়োগের চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট বস্তু ধ্বংস হয়ে গেলে: যখন ভাড়া গ্রহীতার মালিকানাধীনে বা তার উপস্থিতিতে মজুর কাজ করে তখন কাজ শেষেই সে মজুরি পাওয়ার অধিকারী হয়। কেননা সে তার অধীনেই রয়েছে। সে যখনই কোনো কাজ সম্পন্ন করে, তখনই তা মালিকের নিকট হস্তান্তরিত হয়। আর যদি কাজটা মজুরের হাতে থাকে এবং সংশ্লিষ্ট বস্তুটি তার হাতেই ধ্বংস হয় তবে সে পারিশ্রমিক পাবে না। কেননা সে তার সেবা হস্তান্তর করেনি। এটা শাফেয়ি ও হাম্বলিদের মত।

ধাত্রী ভাড়া করা: স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তারই গর্ভজাত সন্তানকে দুধ পান করানোর জন্য ভাড়া করা জায়েয নেই। কেননা ঐ স্ত্রীর মাঝে ও আল্লাহ্‌র মাঝে এটা স্ত্রীর উপর অর্পিত দায়িত্ব। (এটা তিন ইমামের অভিমত। ইমাম মালেক এর উপর আরো সংযোজন করেছেন: স্ত্রীকে এ কাজে বাধ্য করা যাবে। অবশ্য সে যদি এমন অভিজাত শ্রেণীর মহিলা হয়, যার সমপর্যায়ের মহিলারা এটা করে না, তা হলে ভিন্ন কথা। ইমাম আহমদের মতে অভিজাত শ্রেণীর হলেও তাকে বাধ্য করা বৈধ।) মা ব্যতীত অন্য ধাত্রীকে নির্ধারিত পারিশ্রমিকে নিযুক্ত করা বৈধ। ধাত্রীকে খাদ্য ও বস্ত্রের বিনিময়ে নিযুক্ত করাও বৈধ। এক্ষেত্রে পারিশ্রমিকের পরিমাণ অজ্ঞাত থাকলে বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি হয়। প্রচলিত রেওয়াজ অনুযায়ী ধাত্রীদের প্রতি উদার আচরণ করা হয় সন্তানের মংগলের স্বার্থে।

তবে দুধ পান করানোর মেয়াদ জ্ঞাত হওয়া, সংশ্লিষ্ট শিশুকে দেখে চিনে নেয়া ও দুধ পান করানোর স্থান নির্ধারণ করা শর্ত। আল্লাহ্‌ বলেন:

وَإِنْ أَرَدْتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

'তোমরা যা বিধিমত দিতে চেয়েছিলে তা যদি অর্পণ কর তবে ধাত্রী দ্বারা তোমাদের সন্তানকে স্তন্য পান করাতে চাইলে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, তোমরা যা কর, আল্লাহ্‌ তার সম্যক দ্রষ্টা।' (সূরা বাকারা, আয়াত ২৩৩)

ধাত্রী ব্যক্তিগত ভৃত্যের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং তার পক্ষে অন্য কোনো শিশুকে দুধ পান করানো জায়েয নয়।

শিশুকে স্তন্যদুধ পান করানো ও সেই সাথে শিশুকে স্নান করানো, তার কাপড় ধোয়া, তার খাবার রান্না করাসহ শিশুর যা যা প্রয়োজন তা করা ধাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক। তবে শিশুর পিতার দায়িত্ব হলো খাদ্য, সুগন্ধী দ্রব্য, তেল ও শিশুর প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস সরবরাহের যাবতীয় ব্যয় বহন করা। শিশু বা ধাত্রী মারা গেলে ইজারা বা নিয়োগ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা ধাত্রীর মৃত্যু হলে কাংখিত সেবা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে যায়। আর শিশু মারা গেলেও কাংখিত সেবা আদায় করা সম্ভব নয়।

খাদ্য ও বস্ত্রের বিনিময়ে নিয়োগের বৈধতা: শুধু খাদ্য ও বস্ত্রের বিনিময়ে চাকর নিয়োগ করা জায়েয কিনা সে বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যারা বৈধ মনে করেন তাদের প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদিস: ইমাম আহমদ ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেন, উতবা ইবনে নুদুর বলেন: 'আমরা রসূলুল্লাহ্‌ সা. এর নিকট বসা ছিলাম। এ সময় তিনি সূরা কাসাস পড়লেন। যখন মূসা আ. এর ঘটনা পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন বললেন: 'মূসা আ. নিজের পেটের খাদ্য জোটাতে ও চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করতে আট বছর বা দশ বছর যাবত মজুর খেটেছেন।' এ হাদিসটি আবু বকর রা. উমর রা. ও আবু মূসা রা. থেকেও বর্ণিত হয়েছে। মালেকি ও হাম্বলি মযহাবের মতও অনুরূপ। আবু হানিফার মতে, খাদ্য ও বস্ত্রের বিনিময়ে শুধু ধাত্রী নিযুক্ত করা যাবে ভৃত্য নয়।

ইমাম শাফেয়ি, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ বলেন, অস্বচ্ছতা ও সততার কারণে এটা জায়েয নয়। মালেকি মযহাবে রেওয়াজ চালু থাকলে খাদ্য ও বস্ত্রের বিনিময়ে ভৃত্যও নিয়োগ করা যাবে। তারা বলেন:

'নিয়োগকর্তা যদি বলে: আমার ফসল কেটে দাও তোমাকে তার অর্ধেক দেব, অথবা রুটি বানাও বা তেল বানাও, তবে সে যদি তাকে তাৎক্ষণিকভাবে অর্ধেক দিয়ে দেয় তবে জায়েয। আর যদি যে ফসল পাওয়া যাবে তার অর্ধেক দেয়া হবে বুঝায়, তবে পরিমাণ অজানা থাকার কারণে জায়েয হবে না।

জমির ভাড়া নেয়া: জমি ভাড়া নেয়াও বৈধ। তবে ফসল ফলানো, গাছ লাগানো, ঘর বানানো বা অন্য কী উদ্দেশ্যে ভাড়া নেয়া হচ্ছে তা স্পষ্ট করে জানানো শর্ত। যদি কৃষি কাজের উদ্দেশ্যে হয় তবে কী ফসল ফলানো হবে, তা জানাতে হবে। অবশ্য ভাড়াদাতা যদি যা ইচ্ছা ফসল ফলানোর অনুমতি দেয় তবে যে কোনো ফসল ফলানো যাবে।

এ সব শর্ত পূরণ না হলে ইজারা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা জমির সেবা জমিতে যা নির্মাণ করা বা ফলানো হবে সে অনুপাতে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন জমিতে ফলানো ফসল ভিন্ন ভিন্ন রকমের হতে পারে। উভয় পক্ষ যে ফসল ফলাতে সম্মত ছিলো, ভাড়া গ্রহীতা তা ছাড়া অন্য ফসলও ফলাতে পারে। তবে শর্ত এই যে, যে ফসলের উপর উভয়ে একমত ছিলো, তার ক্ষতির চেয়ে যেন নতুন ফসলের ক্ষতি বেশি না হয় বরং সমান বা কম হয়। ইমাম দাউদ বলেন: উভয়ে যে ফসলে একমত, তা ছাড়া অন্য কিছু ফলানোর অধিকার তার নেই।

পশু ভাড়া নেয়া: পশু ভাড়া নেয়াও জায়েয। তবে এ জন্য শর্ত হলো, সময় স্থান, ভাড়া নেয়ার উদ্দেশ্য যথা পরিবহণ, আরোহণ, কে আরোহণ করবে ও কী পরিবহণ করবে, তা জানাতে হবে।

আরোহণ ও পরিবহণের উদ্দেশ্যে ভাড়া নেয়া পশু যদি মারা যায়, তবে যদি ভাড়া নেয়ার সময়ই পশুটিতে খুঁত থেকে থাকে এবং তারপর সে মারা গিয়ে থাকে তবে ভাড়ার চুক্তি শেষ হয়েছে ধরা হবে। আর যদি খুঁত না থেকে থাকে এবং মারা গিয়ে থাকে তবে ভাড়ার চুক্তি বাতিল হবে না।

মারা গেলে ভাড়াদাতাকে নতুন একটা পশু দিতে হবে এবং চুক্তি বাতিল করতে পারবে না। কেননা কিছু নির্দিষ্ট সেবা দানের দায়িত্ব নিয়েই সে ভাড়া দিয়েছিল এবং চুক্তি অনুযায়ী প্রদেয় সেবা দিতে সে এখনো অক্ষম হয়নি। এ বিষয়ে চার মযহাবের ফকিহগণ একমত।

বসবাসের উদ্দেশ্যে বাড়ি ভাড়া নেয়া: বসবাসের উদ্দেশ্যে বাড়ি ভাড়া নিলে ভাড়া গ্রহীতার জন্য ঐ বাড়িতে বসবাস করা বৈধ হয়ে যায়, চাই সে নিজে তাতে বাস করুক বা অন্য কাউকে ধারে বা ভাড়ায় বাস করতে দিক। তবে শর্ত এই যে, যে ব্যক্তি বাস করবে সে যেন বাড়ির ভিত্তিকে দুর্বল বা ক্ষতিগ্রস্ত না করে, যেমন কামার ইত্যাদি। ভাড়া গ্রহীতাকে রেওয়াজ অনুযায়ী বাড়ি দ্বারা পুরোপুরি উপকৃত হতে দেয়া ভাড়াদাতার কর্তব্য।

ভাড়া নেয়া বস্তু পুন ভাড়া দেয়া: ভাড়া গ্রহীতার জন্য ভাড়া নেয়া বস্তুকে পুন: ভাড়া দেয়া বৈধ। ভাড়া দেয়া জিনিসটি যদি পশু হয়, তবে পুন ভাড়া দেয়ার শর্ত এই যে, যে কাজের উদ্দেশ্যে তাকে প্রথম ভাড়া নেয়া হয়েছিল, পরবর্তী ভাড়ার কাজ যেন তার সমান বা তার কাছাকাছি হয়, যাতে পশুর ক্ষতি না হয়, সে ভাড়া দেয়া বস্তুটিকে হস্তগত করার পর একই ভাড়ায় বা তার চেয়ে কম বা বেশি ভাড়ায় পুনরায় ভাড়া দিতে পারবে।

ভাড়া নেয়া বস্তু খোয়া গেলে: ভাড়া নেয়া বস্তুটি ভাড়া গ্রহীতার হাতে আমানত। কেননা সে তার প্রাপ্য সেবা গ্রহণের জন্যে ভাড়া নিয়েছে। সেটি যদি ধ্বংস হয়ে যায় তবে রক্ষণাবেক্ষণে তার ত্রুটি বা বাড়াবাড়ি দায়ী না থাকলে সে বস্তুটি খোয়া যাওয়ার জন্য দায়ী হবে না। কেউ যদি একটা পশুকে আরোহণের উদ্দেশ্যে ভাড়া নেয়, অত:পর সে রেওয়াজ অনুযায়ী লাগাম দিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তবে সে জন্যে দায়ী হবে না।

ঊনচল্লিশতম অধ্যায়

মজুর বা চাকর

ব্যক্তিগত চাকর: যে ব্যক্তিকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ করার জন্যে চাকর নিযুক্ত করা হয় তাকে ব্যক্তিগত চাকর বলা হয়। সময় নির্দিষ্ট না করা হলে নিযুক্তি বাতিল হবে। এরূপ ক্ষেত্রে নিযুক্ত ও নিয়োগকর্তা উভয়ের অধিকার থাকবে যখন ইচ্ছা চুক্তি বাতিল করা। আর যদি কোনো চাকর যে কোনো মেয়াদে কাজ করার জন্যে নিজেকে নিয়োগকর্তার নিকট সমর্পণ করে তবে সে যে মেয়াদে কাজ করবে তার জন্যে তার সমকক্ষ অন্যান্য চাকর যে মজুরি পায়, সেও সেই মজুরি পাবে।

ব্যক্তিগত চাকর তার নিয়োগকর্তার সাথে যে মেয়াদ পর্যন্ত কাজ করার চুক্তি করবে, সেই মেয়াদে অন্য কারো জন্যে কোনো কাজ করতে পারবে না। যদি করে তবে তার কৃত কাজের অনুপাতে কর্তিত হবে।

যখন সে নিজেকে চাকুরিতে নিয়োজিত করবে এবং যে কাজের জন্যে তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে তা থেকে বিরত হবে না, তখন সে পূর্ণ মজুরি পাবে। অনুরূপ, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে স্থিরকৃত চুক্তিতে যে মেয়াদ ধার্য করা হয়েছে, সেই মেয়াদের আগে যদি নিয়োগকর্তা চাকরকে বরখাস্ত করে এবং বরখাস্ত করার মত কোনো কারণ না থাকে, তাহলেও চাকর তার পূর্ণ মজুরি পাবে। উদাহরণত: বলা যায়, চাকর যদি কাজে অক্ষম হয়ে পরে কিংবা এমন রোগে আক্রান্ত হয় যে, কাজ করতে সক্ষম হয়না, তাহলে এটাকে বরখাস্ত করার উপযুক্ত কারণ গণ্য করা যাবে না, তবে যদি চাকরের মধ্যে বিদ্যমান কোনো খুঁত জনিত কারণ পাওয়া যায় বা অক্ষম পাওয়া যায় এবং সে কারণে নিয়োগকর্তা তাকে বরখাস্ত করে, তাহলে চাকর যে টুকু সময় কাজ করেছে সেটুকু সময়ের মজুরি ব্যতীত আর কিছু পাবে না। পূর্ণ মজুরি দেয়া নিয়োগকর্তার উপর বাধ্যতামূলক থাকবে না। ব্যক্তিগত চাকর প্রতিনিধির মতো। তার হাতে যে কাজ ন্যস্ত থাকে তা তার কাছে আমানত। নিজের বাড়াবাড়ি বা অবহেলাক্রমে তার কোনো ক্ষয়ক্ষতি হলে তার জন্য সে দায়ী ও ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। বাড়াবাড়ি বা অবহেলা না করে থাকলে দায়ী থাকবে না।

যৌথ বা সামষ্টিক চাকর: যৌথ বা সামষ্টিক চাকর হলো সেই ব্যক্তি যে সঠিক ব্যক্তির জন্যে কাজ করে। ফলে সকলে তার সেবা দ্বারা উপকৃত হয়, যেমন রংকার, দর্জি, কামার, কাঠমিস্ত্রি, ইত্যাদি। এ ধরনের কাউকে যদি কোনো ব্যক্তি নিয়োগ করে, তবে তাকে অন্যের কাজ করে দিতে বাধা দেয়ার অধিকার তার নেই। এ ধরনের চাকর কাজ করা ছাড়া মজুরি পাওয়ার অধিকারী হয় না। এ ধরনের চাকরের হাতে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হলে সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে।

আলি রা. উমর রা. বিচারপতি শুরাইহ্, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ও মালেকি ফকিহগণ বলেন, বাড়াবাড়ি বা অবহেলা না করা সত্ত্বেও যদি তার দ্বারা কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় তবে সে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য, যাতে মানুষের সহায়-সম্পদ ও স্বার্থ সুরক্ষিত ও নিরাপদ থাকে। ইমাম বায়হাকি বর্ণনা করেন: আলি রা. নির্মাতা ও রংকারকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করতেন এবং বলতেন: এটা ছাড়া মানুষকে সংশোধন করা সম্ভব নয়। ইমাম শাফেয়ি রহ. বর্ণনা করেন: শুরাইহ রংকারকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করতেন এবং তিনি এমন একজন রংকারকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করেছিলেন যার বাড়ি পুড়ে গিয়েছিল। সে বললো, আমার বাড়ি পুড়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করলেন? শুরাইহ্ বললেন, তোমার প্রতিপক্ষের যদি বাড়ি পুড়ে যেত তবে কি তুমি তার কাছ থেকে প্রাপ্য তোমার মজুরি ছেড়ে দিতে?

ইমাম আবু হানিফা ও ইবনে হায্ম বলেন, সে বাড়াবাড়ি বা অবহেলার দায়ে দোষী না হলে ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়ী হবে না। এটাই হাম্বলি ও শাফেয়ি মযহাবের সঠিক মত।

ইমাম হায্ম বলেন: অবহেলা বা বাড়াবাড়ির কারণে ক্ষয়ক্ষতি না করে থাকলে ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক কোনো ধরনের চাকরই দায়ী হবে না।

ভাড়া বা নিয়োগ বাতিল হওয়া বা শেষ হওয়া: ভাড়া বা নিয়োগ চুক্তি বাতিল করার অধিকার দু'পক্ষের কারো নেই। কেননা এটা একটা বিনিময় চুক্তি। তবে বাতিল করা অপরিহার্য করে তোলে এমন কিছু ঘটলে বাতিল করা যাবে, যেমন কোনো খুঁত যদি পাওয়া যায়। যে জিনিস ভাড়া দেয়া হয়েছে তা যদি

অক্ষত থাকে তবে দু'পক্ষের এক পক্ষ মারা গেলে ভাড়া বাতিল হবেনা। সে ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীই মৃতের স্থলাভিষিক্ত হবে, চাই সে ভাড়াদাতা হোক বা ভাড়া গ্রহীতা হোক। তবে হানাফি, যাহেরি, শাবি, সাওরি ও লাইস ইবনে সা'দ এ মতের বিরোধী।

ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের মতানুসারে ভাড়া দেয়া বস্তু ভাড়াগ্রহীতার কাছে বা অন্য কারো কাছে বিক্রয় করলে ভাড়া চুক্তি বাতিল হবে না। ক্রেতা যদি ভাড়া গ্রহীতা ছাড়া অন্য কেউ হয় তবে সে ভাড়ার চুক্তির মেয়াদ শেষে ক্রীত বস্তু নিজের দখলে নিতে পারবে। (ইমাম আবু হানিফা বলেন, ভাড়া গ্রহীতার সম্মতি ব্যতিরেকে বিক্রয় করা যাবে না। তবে যদি সে কারো কাছে ঋণগ্রস্ত থাকে, তা আদায় করার জন্যে শাসক তাকে গ্রেফতার করে থাকে তবে সে ঋণ পরিশোধ করার জন্যে সে বিক্রয় করতে পারবে।)

নিম্নলিখিত কারণে ভাড়া চুক্তি বাতিল করা যাবে:

১. ভাড়া দেয়া বস্তু ভাড়াটের হাতে থাকা কালে যদি তাতে নতুন করে কোনো খুঁত সৃষ্টি হয় অথবা আগে থেকে বিদ্যমান কোনো খুঁত প্রকাশ পায়।

২. ভাড়া দেয়া বস্তু যথা বাড়ি বা পশু ধ্বংস হওয়া।

৩. যার নিকট ভাড়া দেয়া হয়েছে সে মারা গেলে, যেমন দর্জির নিকট কাপড় সেলাই করার জন্যে দেয়ার পর দর্জি মারা গেলে। কেননা তার মৃত্যুর পর কাপড় আদায় করা সম্ভব নয়।

৪. যে সেবা পাওয়ার জন্যে ভাড়া দেয়া হয়েছিল তা অর্জিত হলে, বা যে কাজের জন্যে মজুর নিযুক্ত হয়েছিল তা শেষ হলে বা মেয়াদ শেষ হলে। তবে চুক্তি বাতিল করার পথে অন্তরায় হয় এমন কোনো ওযর থাকলে বাতিল হবে না। যেমন কৃষি কাজের জন্য নেয়া জমির ভাড়ার চুক্তির মেয়াদ যদি ফসল কাটার আগেই শেষ হয় তবে ফসল কাটা পর্যন্ত ভাড়াটের দখলে থাকবে এবং বর্ধিত সময়ের মজুরি সে অনুরূপ কাজের জন্যে প্রদেয় মজুরি অনুসারে পাবে। এই বর্ধিত সময় ভাড়াটের হাতে রাখার জন্যে প্রয়োজনে ভাড়াদাতার উপর বল প্রয়োগ করা যাবে, যাতে ফসল কাটার সময় সমাগত হওয়ার আগে ফসল কাটলে ভাড়াটের যে ক্ষতি হতো তা থেকে তাকে রক্ষা করা যায়।

৫. হানাফিগণ বলেন: ওযর যদি ভাড়াটের পক্ষ থেকেও উদ্ভুত হয়, তবে তার জন্যে ভাড়ার চুক্তি বতিল করা যাবে, যেমন সে ব্যবসায়ের জন্যে একটা দোকান ভাড়া করলো, অত:পর তার পণ্য পুড়ে গেল এবং চুরি হলো বা লুণ্ঠিত হলো বা সে দেউলে হয়ে গেল, এমতাবস্থায় ভাড়া চুক্তি বাতিল করা যাবে।

ভাড়া নেয়া বস্তু ফেরত দেয়া: ভাড়ার মেয়াদ শেষে ভাড়া নেয়া বস্তু ফেরত দেয়া ভাড়াটের কর্তব্য। বস্তুটি যদি স্থানান্তর যোগ্য হয় তবে তা তার মালিকের নিকট হস্তান্তর করবে। আর যদি ভূমি হয়, তবে তা থেকে নিজের আসবাবপত্র সরিয়ে শূন্য অবস্থায় ফেরত দেবে। আর ফসলী জমি হলে তবে ফসলমুক্ত অবস্থায় ফেরত দিতে হবে। অবশ্য ওযর থাকলে ভিন্ন ব্যবস্থা, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে জমি ভাড়াটের দখলে থাকবে ফসল কাটা পর্যন্ত।

হাম্বলিদের মতে, ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়া মাত্রই ভাড়াটে তা ব্যবহার করা থেকে বিরত হবে। মালিকের নিকট ফেরত দিতে এবং ফেরত দেয়ার ব্যয় বহন করতে সে বাধ্য নয়। কেননা এটা এমন একটা চুক্তি, যা কোনো দায় ও ক্ষতিপূরণ দাবি করেনা। তারা বলেন:

মেয়াদ শেষে বস্তুটি ভাড়াটের হাতে আমানত হিসাবে থাকবে, তার অবহেলা ছাড়াই যদি নষ্ট হয় তবে সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে না।

চল্লিশতম অধ্যায়

মুদারাবা

সংজ্ঞা ও বিধি: দুই পক্ষের মধ্যে এমন চুক্তি হওয়া যে, একজন অপর জনের নিকট ব্যবসা করার জন্য অর্থ দেবে এবং উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে স্থিরকৃত হারে মুনাফা বণ্টিত হবে।

সর্বসম্মতভাবে এটা বৈধ। রসূলুল্লাহ্ সা. খাদিজা রা. এর সাথে খাদিজার অর্থ নিয়ে মুদারাবা ব্যবসা করেছিলেন এবং সেই অর্থ নিয়ে নবুয়তের পূর্বে সিরিয়ায় সফরে গিয়েছিলেন। জাহিলি যুগে এর প্রচলন ছিলো। ইসলাম এই ব্যবসাকে বহাল রেখেছে। হাফেয ইবনে হাজর বলেন: আমরা নিশ্চিত যে, ব্যবসায়ের এই পদ্ধতি রসূলুল্লাহ সা. এর আমলে চালু ছিলো, তিনি তা জানতেন এবং জেনে বহাল রেখেছিলেন। তা না হলে এটা কিছুতেই বৈধ হতো না।

বর্ণিত আছে, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর দুই ছেলে আব্দুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহ ইরাক অভিযাত্রী বাহিনীতে যুক্ত হয়ে রওনা হয়ে যান। তারা ফিরে এসে, তখন উমর রা. কর্তৃক নিযুক্ত জনৈক শাসনকর্তার সাথে মিলিত হলেন। তিনি হলেন বসরার শাসক আবু মূসা আশয়ারী। তিনি আব্দুল্লাহ্ ও উবায়দুল্লাহ্কে স্বাগত জানিয়ে বললেন: তোমাদের জন্যে লাভজনক কিছু যদি করতে পারতাম তবে তা করতাম। পরক্ষণেই পুনরায় বললেন: হ্যাঁ, এখানে আল্লাহ্র সম্পদের মধ্য থেকে কিছু সম্পদ আছে। আমি সেটা আমীরুল মুমিনীনের নিকট পাঠাতে চাই। তবে আমি সেটি তোমাদেরকে ধার দেবো। তোমরা তা দিয়ে ইরাকের কোনো পণ্য কিনে মদিনায় এনে বিক্রয় করবে। তা থেকে মূলধনটা বাঁচিয়ে আমীরুল মুমিনীনকে দেবে এবং মুনাফা তোমাদের থাকবে। তারা উভয়ে বললো: ঠিক আছে, আমরা এটা পছন্দ করলাম। অত:পর আবু মূসা রা. যা বললেন তাই করলেন। উমর রা. কে চিঠি লিখলেন যেন তিনি তাদের উভয়ের কাছ থেকে প্রেরিত সম্পদ গ্রহণ করেন। অত:পর তারা উভয়ে মদিনায় উপস্থিত হয়ে পণ্য বিক্রয় করা মুনাফা অর্জন করলে উমর রা. বললেন: আবু মূসা রা. কি তোমাদের মতো বাহিনীর বাদবাকি সবাইকে ধার দিয়েছে? তারা বললো: না। উমর রা. বললেন: তোমরা আমীরুল মুমিনীনের ছেলে। তাই তোমাদেরকে ধার দিয়েছে। দাও, মূলধন ও মুনাফা দুটোই দাও।'

আব্দুল্লাহ্ চুপ করে থাকলেন। কিন্তু উবায়দুল্লাহ্ বললেন: হে আমীরুল মুমিনীন, এই সম্পদ যদি নষ্ট হয়ে যেতো তবে তো আমাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হতো। ' আমীরুল মুমিনীন বললেন: দাও। এবারও আব্দুল্লাহ চুপ থাকলেন এবং উবায়দুল্লাহ্ তার কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। এ সময় উমর রা. এর নিকট উপবিষ্ট এক ব্যক্তি বললেন: হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি এটাকে মুদারাবায় পরিণত করতে পারেন। উমর রা. তাতে সম্মত হলেন। তিনি মূলধন ও মুনাফার অর্ধেক নিলেন এবং বাকি অর্ধেক আব্দুল্লাহ্ ও উবায়দুল্লাহ্কে দিলেন।

মুদারাবার যৌক্তিকতা: মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ ও স্বচ্ছলতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইসলাম এটিকে চালু করেছে। কেননা কতক মানুষের কাছে ধন-সম্পদ থাকতে পারে, কিন্তু তারা হয়তো তা বিনিয়োগে ও লাভজনক কাজে খাটাতে সমর্থ হয় না। আবার কেউ এমনও থাকতে পারে, যার ধন-সম্পদ নেই, কিন্তু সম্পদকে বিনিয়োগ করে কিভাবে বাড়াতে হয়, তা হয়তো সে জানে ও করার ক্ষমতা রাখে। তাই শরিয়ত ব্যবসায়ের এই পদ্ধতি অনুমোদন করেছে, যাতে উভয়ে লাভবান হতে পরে। সম্পদশালী ব্যক্তি ব্যবসায়ীর অভিজ্ঞতা দ্বারা এবং ব্যবসায়ী ধনশালীর ধন দ্বারা লাভবান হতে পারে। এভাবে সম্পদ ও কাজের মধ্যে সহযোগিতা কার্যকর হয়। বস্তুত আল্লাহ্ সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা ও অকল্যাণ রোধ করার উদ্দেশ্যেই বিবিধ চুক্তি অনুমোদন করেছেন।

মুদারাবার মৌলিক উপাদান: : চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য এমন দুই ব্যক্তির একজনের প্রস্তাব ও অপরজনের প্রস্তাব গ্রহণই এর মূল উপাদান। এ জন্যে কোনো নির্দিষ্ট শব্দ প্রয়োগ করা শর্ত নয়, বরং মুদারাবার অর্থ বুঝা যায় এমন যে কোনো শব্দ দ্বারা মুদারাবার চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে। কেননা যে কোনো চুক্তির ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যই বিবেচ্য বিষয়, শব্দ বা কথা নয়।

মুদারাবার শর্তাবলী: মুদারাবায় নিম্নোক্ত শর্তাবলী পুরণ জরুরি:

১. মূলধন নগদ মুদ্রা হওয়া চাই, স্বর্ণ, রৌপ্য, অলংকার বা পণ্যদ্রব্য হলে মুদারাবা শুদ্ধ হবে না। ইবনুল মুনযির বলেন: আমার পরিচিত সকল আলিম একমত যে, কোনো লোক মুদারাবা করতে গিয়ে কারো উপর ঋণ চাপিয়ে দেবে এটা জায়েয নেই।

২. মূলধন কত তা সুস্পষ্ট হওয়া জরুরি, যাতে যে মূলধন নিয়ে ব্যবসায় করা হবে তা মুনাফা থেকে পৃথক করা যায়। কেননা মুনাফা তো উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বন্টিত হতে হবে।

৩. মূলধনের মালিক ও ব্যবসাকারীর মধ্যে মুনাফার আনুপাতিক হার নির্ধারিত হওয়া চাই, যেমন অর্ধেক, এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. খয়বরবাসীর সাথে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের বিনিময়ে চুক্তি করেছিলেন।

ইবনুল মুন্যির বলেন: আমরা যে সব ফকিহের কাছ থেকে শরিয়তের তথ্য সংগ্রহ করেছি, তারা সবাই এ বিষয়ে একমত যে, উভয় পক্ষ বা কোনো এক পক্ষ নিজের জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার মুনাফা নির্ধারিত করে রাখলে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে।'

এর কারণ হলো, এক পক্ষের জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফার শর্ত আরোপ করা হয়, তবে এমনও হতে পারে যে, সর্বমোট মুনাফা ঐ পরিমাণই অর্জিত হবে। তখন যে পক্ষের জন্যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, সে-ই সমগ্র মুনাফা নিয়ে যাবে, অপর পক্ষ কিছুই পাবে না। এরূপ হলে মুদারাবার উদ্দেশ্য অর্থাৎ উভয় পক্ষের লাভবান হওয়া সফল হবে না।

৪. মুদারাবাকারীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া চাই। মূলধনের মালিক তাকে কোনো নির্দিষ্ট শহরে, নির্দিষ্ট পণ্যে, নির্দিষ্ট সময়ে কিংবা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে ব্যবসায় করতে বাধ্য করতে বা অনুরূপ অন্য কোনো শর্ত আরোপ করতে পারবে না। কেননা শর্ত আরোপ দ্বারা প্রায়শ: মুদারাবার উদ্দেশ্য অর্থাৎ মুনাফা অর্জন ব্যাহত হয়ে থাকে। কাজেই মুদারাবা শর্তমুক্ত, বাধামুক্ত ও চাপমুক্ত হওয়া চাই। নচেৎ মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। এটা ইমাম মালেক ও শাফেয়ির মত।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ পূর্ণ স্বাধীনতার শর্তারোপের বিরোধী। তাঁরা বলেন: মুযারাবা শর্তমুক্ত ও শর্তযুক্ত দু'রকমেরই হতে পারে। শর্ত আরোপ করা হলে ব্যবসায়কারীর জন্য শর্ত লংঘন করা জায়েয হবেনা। করলে ক্ষতিপুরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

হাকিম ইবনে হিযাম রা. থেকে বর্ণিত: কাউকে বাণিজ্য করতে পণ্য দেয়া হলে তার উপর এরূপ শর্ত আরোপ করা হতো যে, আমার পণ্য কোনো স্যাঁতসেতে বস্তুর মধ্যে রাখবে না, সমুদ্রের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাবে না, কোনো পানিবাহী নীচু জায়গায় অবস্থান করবে না। এর কোনোটি করলে তুমি আমার পণ্যের জন্যে দায়ী থাকবে।'

মুদারাবার মেয়াদ জানানো মুদারাবার জন্যে শর্ত নয়। কেননা ওটা একটা বৈধ চুক্তি এবং যে কোনো সময় বাতিলযোগ্য। মুদারাবা শুধু দু'জন মুসলমানের মধ্যে হওয়াও শর্ত নয়। এটা একজন মুসলমান ও একজন অমুসলমানের মধ্যে হওয়াও বৈধ।

ব্যবসাকারী আমানত রক্ষক: মুদারাবা চুক্তি সম্পাদন ও ব্যবসায়কারীর নিকট মূলধন বা পণ্য হস্তান্তর হওয়ার পর থেকেই ব্যবসায়কারী ঐ পুঁজি বা পণ্যের ব্যাপারে আমানত রক্ষক হিসাবে গণ্য হবে। তার বাড়াবাড়ি ব্যতীত সে কোনো ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়ী হবে না। আর এ ব্যাপারে সে কসম খেয়ে যে জবানবন্দী দেবে, সম্পদ ধ্বংস বা নষ্ট হওয়ার কারণ সম্পর্কে সেই জবানবন্দীই চূড়ান্ত বলে ধরা হবে। কারণ মূলত: সে খেয়ানত করেনি বলেই স্বীকার করা হয়।

ব্যবসাকারী যদি অন্যের নিকট পুঁজি হস্তান্তর করে: ব্যবসায়কারী মুদারাবার মূলধন নিয়ে আরেক জনের সাথে মুদারাবা করার অধিকার রাখে না। করলে তা তার বাড়াবাড়ি বা অনধিকার তৎপরতা গণ্য হবে। 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: 'খ্যাতনামা ফকিহগণ এ বিষয়ে একমত যে, ব্যবসাকারী যদি মুদারাবার মূলধন আরেকজন ব্যবসাকারীর নিকট অর্পণ করে, তবে ক্ষতি হলে সে তার জন্যে দায়ী হবে, আর মুনাফা হলে তা তার আরোপিত শর্ত অনুযায়ী বন্টিত হবে।

(আবু কুলাবা, নাফে, আহমদ ও ইসহাক বলেন: ব্যবসায়কারী যখন চুক্তি লংঘন করবে, তখন সে দায়ী হবে, এবং মুনাফা মূলধনের মালিকের প্রাপ্য হবে। অন্যান্য ফকিহ্গণ বলেন: মুনাফা ব্যবসায়কারীর এবং সে তা সদকা করে দেবে। আর ক্ষতি হলে সেটা তার ঘাড়ে বর্তাবে। লাভ-ক্ষতি উভয় অবস্থায় সে মূলধনের জন্য দায়ী থাকবে।)

ব্যবসাকারীর ব্যয় : ব্যবসায়কারীর মুদারাবার পণ্যে যা কিছু ব্যয় হবে, তা তার নিজের সম্পদ থেকেই নিষ্পন্ন হবে, চাই সে স্বদেশে থাকুক বা মুদারাবার জন্য সফরে যাক। কেননা এই ব্যয় মুনাফার সমপরিমাণও হতে পারে। তেমন হলে মূলধনের মালিক মুনাফা থেকে বঞ্চিত হবে এবং সে একাই তা খেয়ে ফেলবে। তাছাড়া ব্যবসায়কারীর জন্যে মুনাফার অংশ তো নির্ধারিতই রয়েছে। কাজেই সে এর পাশাপাশি অতিরিক্ত কিছু পাওয়ার অধিকারী নয়।

তবে মূলধনের মালিক যদি ব্যবসায়কারীকে অনুমতি দেয় যে, সে মুদারাবার অর্থ থেকে তার সফরকালে নিজের ব্যয় নির্বাহ করতে পারে অথবা প্রচলিত রেওয়াজে এরূপ ব্যবস্থা থেকে থাকে, তাহলে তার জন্যে মুদারাবার অর্থ থেকে নির্বাহ করতে পারবে।

ইমাম মালেকের মতে: মুদারাবার অর্থের পরিমাণ যখন এতো বেশি হয় যে, তা থেকে ব্যয় নির্বাহ করার অবকাশ থাকে, তখন ব্যবসায়কারী তা থেকে নিজের ব্যয় নির্বাহ করতে পারবে।

মুদারাবা বাতিল করা: নিম্নোক্ত কারণে মুদারাবা বাতিল, যেমন: ১. বিশুদ্ধতার শর্তাবলীর মধ্য থেকে কোনো একটি অপূর্ণ থাকা। বিশুদ্ধতার শর্তাবলী থেকে কোনো শর্ত যখন অপূর্ণ থাকে এবং ব্যবসায়কারী ইতিমধ্যে মূলধন হস্তগত করেছে ও তা নিয়ে ব্যবসায় করেছে, তখন সে অনুরূপ কাজে যেরূপ মজুরি দেয়ার রেওয়াজ আছে, সেরূপ মজুরি পাবে। কেননা সে মূলধনে যেটুকু হস্তক্ষেপ করেছে, তা মালিকের অনুমতি নিয়েই করেছে এবং যে কাজ করেছে, তার জন্যে সে মজুরি পাওয়ার অধিকারী। আর যেটুকু মুনাফা অর্জিত হবে তা মালিকের এবং লোকসানও তার। কেননা ব্যবসায়কারী একজন মজুর ব্যতীত আর কিছু নয় এবং মজুর নিজের বাড়াবাড়ি ব্যতীত ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়ী হয়না।

২. ব্যবসায়কারী যদি বাড়াবাড়ি করে, অথবা মুদারাবার মাল রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতি করে অথবা চুক্তির উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কোনো কাজ করে, তবে এ ক্ষেত্রে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে এবং মাল নষ্ট হলে তার জন্যে সে দায়ী হবে। যেহেতু নষ্ট হওয়ার কারণ তার দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে।

৩. ব্যবসায়ী কিংবা মূলধনের মালিক মারা গেলে মুদারাবা বাতিল হবে।

মূলধনের মালিক মারা গেলে ব্যবসাকারীর করণীয়: মূলধনের মালিক মারা গেলে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে এবং মুদারাবার মালে হস্তক্ষেপ করার অধিকার ব্যবসায়কারীর থাকবে না। মৃত্যুর খবর জেনেও যদি উত্তরাধিকারীদের অনুমতি ছাড়া সে হস্তক্ষেপ অব্যাহত রাখে, তবে সে অনধিকার হস্তক্ষেপকারী বা জবর দখলকারী গণ্য হবে এবং সে ক্ষয়ক্ষতির জন্যে দায়ী হবে। এরপর যদি মুনাফা অর্জিত হয় তবে মুনাফা উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: 'আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাবের পুত্র হয়ে বাইতুল মালের মূলধন নিয়ে অনধিকার ব্যবসায় করে যে মুনাফা অর্জন করেছিলেন, সে ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীন এ ফায়সালাই দিয়েছিলেন।' মুদারাবা যখন বাতিল হয়ে যায় এবং মূলধন যখন নগদ মুদ্রার পরিবর্তে পণ্য হয়, তখন মূলধনের মালিক ও ব্যবসায়কারী তা বিক্রয় করেও দিতে পারে অথবা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করেও নিতে পারে। কেননা এটা তাদের অধিকার। কিন্তু ব্যবসায়কারী যদি বিক্রয়ে রাজি ও মূলধনের মালিক নারাজ থাকে, তবে মূলধনের মালিককে বিক্রয়ে বাধ্য করা হবে। কেননা ব্যবসায়কারীর মুনাফায় অংশ রয়েছে এবং বিক্রয় ব্যতীত সে তা হস্তগত করতে পারবে না। এটা শাফেয়ি ও হাম্বলি মযহাবের মত।

বণ্টনের সময় মূলধনের মালিকের উপস্থিতি শর্ত: আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মূলধনের মালিকের উপস্থিতি ব্যতীত মুনাফার অংশ গ্রহণ করা ব্যবসায়কারীর জন্যে বৈধ নয়। মুনাফা বণ্টনের ও তা থেকে ব্যবসায়কারীর অংশ গ্রহণ করার জন্যে মূলধনের মালিকের উপস্থিতি শর্ত। কেবল সাক্ষী বা অন্য কারো উপস্থিতি যথেষ্ট নয়।

একচল্লিশতম অধ্যায়

হাওয়ালা

খাতক কর্তৃক ঋণের ভার অন্যের নিকট হস্তান্তর: সংজ্ঞা: শরিয়তের পরিভাষায় 'হাওয়ালা' হলো, খাতক কর্তৃক তার ঋণের ভার এমন একজনের নিকট হস্তান্তর করা, যে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ ধরনের চুক্তিতে হাওয়ালাকারী (খাতক), হাওয়ালাকৃত (ঋণদাতা) হাওয়ালা গ্রহণকারী অর্থাৎ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণকারী এই তিনজন জড়িত থাকে।

হাওয়ালা এমন একটা লেনদেন, যাতে কোনো প্রস্তাবদান (ইজাব) ও প্রস্তাব গ্রহণ (কবুল) প্রয়োজন হয়না। শুধু 'আপনাকে অমুকের হাওয়ালা করলাম' বা 'আপনার ঋণ পরিশোধের ভার অমুকের উপর অর্পণ করলাম' অথবা এরূপ অর্থবোধক কথা বলাই যথেষ্ট।

হাওয়ালার বৈধতা: প্রয়োজনের আলোকেই ইসলাম এ ধরনের কাজকে অনুমোদন করেছে। ইমাম বুখারি ও মুসলিম আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'পাওনা পরিশোধে সমর্থ ব্যক্তির গড়িমসি যুলুমের শামিল, আর তোমাদেরকে যখন কোনো ক্ষমতাবান ধনীর হাওয়ালা করা হয়, তখন তার হাওয়ালা গ্রহণ করা উচিত।'

এ হাদিসে রসূল সা. ঋণদাতাকে আদেশ দিয়েছেন যখন তার খাতক তাকে এমন কোনো সামর্থবান ধনীর নিকট সমর্পণ করে, যে ঋণ পরিশোধ করে দিতে রাজি হয়, তখন সে যেন এই সমর্পণ করা তথা হাওয়ালা করা মেনে নেয় এবং তার কাছ থেকে ঋণ ফেরত নেয়।

আদেশটি বাধ্যতামূলক অর্থবোধক না মুস্তাহাব সূচক?: হাম্বলি মযহাবের বহু সংখ্যক ফকিহ, ইবনে জারীর, আবু সাওর ও যাহেরি মযহাবের মতে, এ আদেশ অনুযায়ী ঋণদাতার উপর ঋণ পরিশোধে সম্মত সামর্থ্যবান ধনী ব্যক্তির নিকট ঋণদাতাকে হাওয়ালা বা সমর্পণ করার প্রস্তাব মেনে নেয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে এ আদেশ মুস্তাহাব বোধক।

হাওয়ালা বিশুদ্ধতার শর্তাবলী: হাওয়ালার বিশুদ্ধতার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী পূরণ জরুরি:

১. হাওয়ালাকারী (খাতক) ও হাওয়ালাকৃত (ঋণদাতা) এই দুজনের সম্মতি জরুরি। যার নিকট হাওয়ালা করা হয় তার সম্মতি জরুরি নয়। কেননা উপরোক্ত হাদিসে রসূলুল্লাহ্ সা. এই দুজনের কথাই উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া যেহেতু যেখান থেকেই সম্ভব ঋণ পরিশোধ করা হাওয়ালাকারীর অপরিহার্য কর্তব্য। এবং হাওয়ালাকৃত (ঋণদাতা) ব্যক্তির হাওয়ালাকারীর নিকট ঋণ পাওনা রয়েছে, তাই তার সম্মতি ব্যতিরেকে হাওয়ালা শুদ্ধ হতে পারে না।

কেউ কেউ বলেন: তার সম্মতি শর্ত নয়। কেননা হাওয়ালার প্রস্তাব গ্রহণ করা হাদিস অনুযায়ী তার জন্য বাধ্যতামূলক। তাছাড়া হাওয়ালাকারীর নিকট থেকেই হোক, বা তার স্থলাভিষিক্ত অন্য কারো নিকট থেকে হোক, সে তার পাওনা আদায় করতে পারে। যে ব্যক্তির নিকট ঋণদাতাকে সমর্পণ করা হয়েছে, তার সম্মতি জরুরি নয় এজন্য যে, হাদিসে রসূলুল্লাহ্ সা. তার কথা উল্লেখ করেননি। তবে হানাফি মযহাব ও শাফেয়ি মযহাবের আসতাখালির মতানুযায়ী তার সম্মতিও জরুরি।

২. উভয় প্রাপ্যের শ্রেণী, পরিমাণ, তাৎক্ষণিক বা বিলম্বিত হওয়া, ভালো বা খারাপ মানের হওয়ার দিক দিয়ে সমান হওয়া জরুরি। ঋণ যদি স্বর্ণ হয় আর তা রৌপ্য দ্বারা পরিশোধ করার জন্য যদি হাওয়ালা করা হয় তবে হাওয়ালা শুদ্ধ হবে না। অনুরূপ, ঋণ যদি ত্বরিত পরিশোধ করার কথা থাকে এবং তা বিলম্বে পরিশোধ করার জন্যে অথবা যদি ঋণ বিলম্বে পরিশোধ করার কথা থাকে এবং ত্বরিত পরিশোধ করার জন্য হাওয়ালা করা হয়, তবে হাওয়ালা শুদ্ধ হবে না।

৩. ঋণের স্থিতিশীলতা। সুতরাং এমন কোনো চাকুরিজীবীর নিকট যদি হাওয়ালা করা হয়, যে এখনো বেতন পায়নি, তবে হাওয়ালা শুদ্ধ হবেনা।

৪. উভয় প্রাপ্য উভয়ের নিকট জানা থাকা জরুরি।

হাওয়ালা দ্বারা হাওয়ালাকারীর দায় মোচন হবে কি?: হাওয়ালা যদি শুদ্ধ হয় তবে হাওয়ালাকারী দায়মুক্ত হবে। কিন্তু যার নিকট হাওয়ালা করা হলো সে যদি দেউলে হয়ে যায় কিংবা হাওয়ালা অস্বীকার করে, বা মারা যায়, তাহলে ঋণদাতা খাতকের নিকট কিছুই দাবি করতে পারবে না। এটা অধিকাংশ আলেমের মত।

তবে মালেকি ফকিহগণ বলেন: যে ক্ষেত্রে খাতক ঋণদাতাকে ধোঁকা দিয়ে একজন নি:স্ব ব্যক্তির নিকট হাওয়ালা করবে, সে ক্ষেত্রে সে খাতকের নিকট থেকে প্রাপ্য আদায় করার হকদার।

ইমাম আবু হানিফা ও বিচারপতি শুরাইহ প্রমূখ বলেন: যার নিকট হাওয়ালা করা হয়েছে সে দেউলে অবস্থায় মারা গেলে বা হাওয়ালার কথা অস্বীকার করলে ঋণদাতা খাতকের কাছে নিজের প্রাপ্য দাবি করতে পারবে। উসমান আলবাত্তিও একই মত পোষণ করেন।

বিয়াল্লিশতম অধ্যায়

শুফ্য়াহ্

সংজ্ঞা: জাহিলি যুগে আরবে কেউ তার বাড়ি বা বাগান বিক্রয় করতে চাইলে তার কাছে তার প্রতিবেশী, অংশীদার ও পার্শ্ববর্তী জমি বাড়ি বা বাগানের মালিক এসে অনুরোধ করতো, যে জিনিস সে একজন দূরবর্তী লোকের নিকট বিক্রয় করতে যাচ্ছে বা করছে, তা যেন দূরবর্তী লোকটির পরিবর্তে তার নিকট বিক্রয় করে এবং তাকে তার উপর অগ্রাধিকার দেয়। এই অনুরোধ ও সুপারিশ করাকে আরবিতে শুফ্য়াহ্ বলা হয় এবং অনুরোধকারীকে বলা হয় শাফি। শরিয়তে এর উদ্দেশ্য হলো, শাফি' কর্তৃক বিক্রীত বস্তুকে ক্রেতার নিকট থেকে জোরপূর্বক একই মূল্য ও আনুষংগিক ব্যয়ভার বহন করে নিজ মালিকানায় নেয়া।

বৈধতা: শুফ্য়াহ্ হাদিস দ্বারা বৈধ প্রমাণিত। তদুপরি মুসলমানরা এর বৈধতার ব্যাপারে একমত।

ইমাম বুখারি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ সা. যে জিনিস ভাগ-বাটোয়ারা করা হয়নি, তাতে শুফ্য়ার পক্ষে ফায়সালা করেছেন। কিন্তু যখন সীমানা সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং রাস্তার পরিবর্তন হবে, তখন আর শুফ্য়া দেয়া হবেনা।'

যৌক্তিকতা: ইসলাম ক্ষতি নিবারণ ও শত্রুতা রোধ করার উদ্দেশ্য শুফ্য়াহ্কে বিধিবদ্ধ করেছে। কেননা যে বিক্রীত বস্তুটি একজন অচেনা ব্যক্তি খরিদ করেছে, অপেক্ষাকৃত নিকটতর ব্যক্তি যদি তার মালিক হয়, তবে সে এই অচেনা ব্যক্তির কাছ থেকে যে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারতো, তা থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে।

অমুসলিম নাগরিকের জন্য শুফ্য়াহ্: শুফ্য়াহ্ যেমন মুসলমানের প্রাপ্য হয়ে থাকে, তেমনি তা অমুসলিম নাগরিকেরও প্রাপ্য। এটা অধিকাংশ ফকিহের অভিমত। ইমাম আহমদ, হাসান, ও শাবির মতে এটা অমুসলিমের জন্য নয়। কেননা দারু কুতনিতে আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'কোনো খ্রিষ্টান শুফ্য়ার সুবিধা পাবে না।'

বিক্রয়ের পূর্বে অংশীদারের অনুমতি চাওয়া: একজন অংশীদার তার সম্পত্তি বিক্রয়ের পূর্বে তার অপর অংশীদারের অনুমতি গ্রহণ করতে বাধ্য। তার অনুমতি ছাড়া যদি বিক্রয় করে তবে সে-ই উক্ত সম্পত্তি ক্রয়ের অধিকতর হকদার। আর যদি সে বিক্রয়ের অনুমতি দেয় এবং বলে: ঐ সম্পত্তিতে আমার কোনো আগ্রহ নেই, তবে বিক্রয়ের পর সে আর তার দাবি করতে পারবে না। এটা রসূলুল্লাহ্ সা. এর হুকুমের দাবি এবং কোনোভাবেই এর বিরোধিতার অবকাশ নেই।

১. ইমাম মুসলিম জাবির রা. থেকে বর্ণনা করেন: 'একাধিক ব্যক্তির মালিকানা সম্পত্তি যতোক্ষণ বণ্টিত না হয়, ততক্ষণ রসূলুল্লাহ সা. তাতে শুফ্য়ার বিধান দিয়েছেন, চাই তা বাড়ি হোক বা বাগান। অংশীদারের অনুমতি না নেয়া পর্যন্ত তা বিক্রয় করা বৈধ নয়। ইচ্ছা হলে সে কিনবে, নচেৎ বর্জন করবে। তার অনুমতি ছাড়া বিক্রয় করলে সে-ই উক্ত সম্পত্তি ক্রয়ে অধিকতর হকদার।'

২. ইয়াহিয়া ইবনে আদম বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেন: যার কোনো বাড়িতে বা বাগানের মালিকানায় অংশ আছে, সে অংশীদারের অনুমতি ব্যতীত তার অংশ বিক্রয় করতে পারবে না। সে ইচ্ছা করলে কিনবে, না হয় বর্জন করবে।'

ইমাম ইবনে হায্‌ম বলেন: 'যার কোনো সম্পত্তির মালিকানায় অংশ আছে, তার পক্ষে তার অন্যান্য শরীকদেরকে না জানিয়ে বিক্রয় করা বৈধ নয়। শরীক যদি অন্যের দেয়া মূল্যে কিনতে ইচ্ছুক হয় তবে শরীকের অধিকারই সর্বাধিক। আর যদি কিনতে না চায় তবে তার অধিকার রহিত হবে এবং অত:পর সে যার কাছেই বিক্রয় করুক, শরীকের তাতে কোনো দাবি জানানোর অধিকার থাকবে না। শরীকদেরকে না জানিয়ে যদি বিক্রয় করে তবে শরীক ইচ্ছা করলে সেই বিক্রয় বহাল রাখতে পারবে অথবা বিক্রয় বাতিল করে যে মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে সেই মূল্যে নিজের জন্যে রেখে দিতে পারবে।'

ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলেন: এটা রসূলুল্লাহ্ সা. এর ফায়সালা, এর বিরোধিতা করার অধিকার কারো নেই। এটাই অকাট্য, চূড়ান্ত ও সঠিক।' কতিপয় শাফেয়ি ফকিহ্‌সহ কিছু সংখ্যক আলিমের বক্তব্য এই যে, শরীকদেরকে জানিয়ে বিক্রয় করা মুস্তাহাব। নববী বলেন: জানিয়ে বিক্রয় করা মুস্তাহাব এবং না জানিয়ে বিক্রয় করা মাকরূহ, হারাম নয়।

শুফয়ার অধিকার রহিত করার জন্য ছল চাতুরির আশ্রয় নেয়া: শুফ্য়ার অধিকার রহিত করার জন্য ছল-চাতুরির আশ্রয় নেয়া জায়েয নেই। কেননা এতে মুসলমানের অধিকার নষ্ট করা হয়। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত: 'ইহুদিরা যে অন্যায় করতো তোমরা তা করো না, ছল-চাতুরির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র হারাম বস্তুকে হালাল করে নেবে না।' এটা ইমাম মালেক ও আহমদের মত। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ি মনে করেন, ছল-চাতুরির আশ্রয় নেয়া বৈধ। শুফ্য়ার অধিকার হরণে ছল-চাতুরির উদাহরণ হলো: যার কাছে সম্পত্তি বিক্রয় করবে তাকে সম্পত্তির কিছু অংশের মালিক বলে স্বীকার করে নেবে, এই স্বীকৃতি দ্বারা সে শরীকে পরিণত হবে, তারপর অবশিষ্ট অংশ তার কাছে বিক্রয় অথবা দান করবে।

শুফ্য়ার শর্তাবলী: শুফ্য়ার অধিকার বলে সম্পত্তি হস্তগত করার জন্যে নিম্নোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য:

প্রথম শর্ত: শুফ্য়ার দাবিযুক্ত সম্পত্তি অবশ্যই জমি, বাড়ি বা তার সাথে সংযুক্ত কোনো স্থাবর সম্পত্তি হওয়া চাই। কেননা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, জাবির রা. বলেন: বণ্টিত হয়নি এমন প্রত্যেক যৌথ সম্পত্তি যথা বাড়ি বা বাগানে রসূলুল্লাহ্ সা. শুফ্য়ার পক্ষে ফায়সালা করেছেন, এটা অধিকাংশ ফকিহের মত। মক্কাবাসী ও যাহেরি ফকিহ্‌গণ এর বিরোধী। ইমাম আহমদের কথিত একটি মতও এর বিরোধী। তাঁরা বলেন: সব ধরনের সম্পত্তিতেই শুফ্য়ার অধিকার রয়েছে। কেননা জমিতে শরীকের যে ক্ষতির আশংকা রয়েছে, তা অস্থাবর সম্পত্তিতে হওয়ার আশংকা আছে। এক বর্ণনায় জাবির রা. বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. প্রত্যেক সম্পত্তিতে শুফয়ার ফায়সালা করেছেন। ইবনুল কাইয়েম বলেছেন: শেষোক্ত এই হাদিসের বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসেও আছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেন: 'সকল জিনিসেই শুফ্য়াহ্ চালু আছে।' ইবনে হায্‌ম এই মতের সমর্থনে বলেন: অবণ্টিত যৌথ মালিকানাধীন সম্পত্তির প্রত্যেক বিক্রীত অংশে শুফ্য়া ওয়াজিব, চাই তা দু'জন বা ততোধিক ব্যক্তির মালিকানাধীন হোক এবং বিভাজ্য বা অবিভাজ্য যেমনই হোক, যেমন জমি, এক বা একাধিক গাছ, দাস বা দাসী, তরবারী, খাদ্য, জন্তু, বা অন্য যে কোনো বিক্রীত জিনিস।

দ্বিতীয় শর্ত: শাফী বা শুফ্য়ার দাবিদারকে অবশ্যই শুফ্য়ার দাবিভুক্ত সম্পত্তিতে সম্পত্তি বিক্রয়ের আগে থেকেই শরীক থাকতে হবে এবং উভয় শরীকের শরীকানাভুক্ত অংশ অচিহ্নিত অবস্থায় থাকতে হবে। কেননা জাবির রা. বলেন: ভাগ-বাটোয়ারা হয়নি এমন প্রত্যেক সম্পত্তিতে রসূলুল্লাহ সা. শুফ্য়ার পক্ষে ফায়সালা করেছেন। যখন সীমা নির্ধারিত ও রাস্তা পরিবর্তিত হয়ে যাবে তখন আর শুফ্য়ার অধিকার থাকবেনা। (পাঁচটি সহিহ হাদিস গ্রন্থ কর্তৃক বর্ণিত)

অর্থাৎ প্রত্যেক যৌথ মালিকানাধীন অবিভক্ত সম্পত্তিতে শুফ্য়াহ্ আছে। যখন ভাগবাটোয়ারা হয়ে যাবে, সীমানা নির্ধারিত হবে ও রাস্তা চিহ্নিত হবে, তখন আর শুফ্য়ার অধিকার থাকবে না।

শুফ্য়া যেহেতু শরীকের জন্যে প্রতিষ্ঠিত, তাই তা প্রত্যেক বন্টনযোগ্য সম্পত্তিতে শূফয়া থাকবে এবং শরীককে বন্টনে বাধ্য করা হবে। তবে সে জন্যে এই শর্ত প্রযোজ্য যে, বন্টনের আগে তা দ্বারা যেভাবে উপকৃত হওয়া সম্ভব ছিলো, বন্টনের পরও যেন তা দ্বারা তদ্রূপ উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়। সুতরাং ভাগবাটোয়ারা হলে উপকারিতা নষ্ট হয় এমন সম্পত্তিতে শুফ্য়া দেয়া হবেনা। 'মিনহাজ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: 'বাটোয়ারার পর কাংখিত উপকারিতা পাওয়া যাবে না এমন সম্পত্তিতে শুফ্য়া নেই, যেমন গোসলখানা, যাঁতাকল ইত্যাদি।' ইমাম মালেক ইবনে শিহাব ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব থেকে বর্ণনা করেন: যে সম্পত্তি শরীকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়নি, সেই সম্পত্তিতে রসূলুল্লাহ্ সা. শূফয়ার অধিকার দিয়েছেন। শরীকদের মধ্যে সীমানা নির্ধারিত হয়ে গেলে তখন আর কোনো শুফ্য়া থাকবে না।' এটা আলি, উসমান, উমার, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, সুলায়মান ইবনুল ইয়াসার, উমর ইবনে আব্দুল আযিয, রবিয়া, মালেক, শাফেয়ি, আহমদ, ইসহাক, উবাইদুল্লাহ্ ইবনুল হাসান ও ইমামিয়া মযহাবের ফকিহদের অভিমত।

'শারহুস সুন্নাহ'গ্রন্থে বলা হয়েছে: 'আলেমগণ একমত যে, বণ্টনযোগ্য সম্পত্তিতে যখন কোনো শরীক বণ্টনের আগে তার অংশ বিক্রয় করবে, তখন শুফ্য়া দেয়া হবে, যে মূল্যে তা বিক্রয় হয়েছে, সেই মূল্যে অন্য শরীকগণ তা কিনতে পারবে। কাপড় বা অনুরূপ অন্য কোনো অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করলে সেই মূল্যে তা কিনতে হবে।' প্রতিবেশীর জন্যে তাদের মতে শুফ্য়ার অধিকার প্রাপ্য নয়।

হানাফি ফকিহগণ এ মতের বিরোধী। তারা বলেন: শুফ্য়াহ্ ধারাক্রম অনুসারে প্রাপ্য। প্রথমে যে শরীক তার অংশ ভাগ করে নেয়নি সে পাবে, তারপর যে শরীক ভাগ করে নিয়েছে এবং রাস্তায় বা উঠানে তার কিছু অংশ বাকি রয়েছে, সে পাবে, তারপর পাবে সন্নিহিত প্রতিবেশী।

কিছু সংখ্যক আলেম মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেন। তারা মালিকানাভুক্ত সম্পত্তির কোনো সুযোগ-সুবিধা যথা রাস্তা বা পানিতে অংশীদার থাকা অবস্থায় শুফ্য়ার অধিকার দেয়ার পক্ষে প্রমাণ দর্শান। পক্ষান্তরে প্রত্যেকের অংশ চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার পর শুফ্য়ার অধিকার থাকবে না বলে মত প্রকাশ করেন। তারা আবুদাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি ও ইবনে মাজা কর্তৃক জাবির রা. সূত্রে বর্ণিত হাদিস থেকে এর প্রমাণ দর্শান, যাতে রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: দুই প্রতিবেশীর রাস্তা যখন এক থাকে, তখন একে অপরের শুফ্য়ার অধিকতর হকদার। একজন অনুপস্থিত থাকলেও অপর জন তার অপেক্ষায় থাকবে।'

ইবনুল কাইয়েম বলেন: জাবির রা. বর্ণিত হাদিসসমূহ এই বক্তব্য সমর্থন করে। আর উক্ত তিনটি মতই ইমাম আহ্মদের মযহাবে বিদ্যমান। তন্মধ্যে শেষোক্ত তৃতীয় মতই সর্বাধিক ভারসাম্যপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট।'

তৃতীয় শর্ত: যে সম্পত্তিতে শুফ্য়ার দাবি পেশ করা হয়েছে, তা বিক্রয় অপরাধের জরিমানা বা অন্য কোনো উপায়ে বিনিময় গ্রহণের মাধ্যমে মালিকের মালিকানা থেকে বের হয়ে যাওয়া জরুরি। দান, উত্তরাধিকার বা অন্য কোনো পন্থায় বিনিময় ব্যতিরেকে মালিকানা থেকে বেরিয়ে গেলে তাতে শুফ্য়াহ্ জায়েয কিনা সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক থেকে এ ব্যাপারে তিনটি মত বর্ণিত হয়েছে: একটি মত অনুসারে জায়েয, অপর মত অনুসারে নাজায়েয, এবং তৃতীয় মত অনুসারে শরীকদের মধ্যে জমি বদল হলে শুফ্য়াহ্ নেই, আর অ-শরীকদের মধ্যে হলে শুফ্য়াহ্ আছে।

চতুর্থ শর্ত: শাফী বা শুফ্য়ার দাবিদারকে সম্ভব হলে বিক্রয়ের খবর জানা মাত্রই শুফ্য়ার দাবি জানাতে হবে। জানার পরও যদি বিনা ওযরে বিলম্ব করে তবে তার শুফ্য়া রহিত হবে। কারণ শাফী যদি তাৎক্ষণিকভাবে শুফ্য়ার দাবি পেশ না করে এবং তার দাবি বিলম্বিত হয়, তাহলে তাতে ক্রেতার ক্ষতি হবে। কেননা ক্রীত সম্পত্তিতে তার মালিকানা টেকসই হবে না এবং উক্ত সম্পত্তিকে আবাদ করার মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ তার চেষ্টা বিফলে যাবে ও শুফ্য়ার দাবি বলে কেউ নিয়ে যাবে এই ভয়ে ভীত থাকবে।

এটা ইমাম আবু হানিফার মত, ইমাম শাফেয়ির অগ্রগণ্য মত, এবং ইমাম আহমদের একাধিক বর্ণিত মতের একটি। অবশ্য শুফয়ার দাবিদার যখন অনুপস্থিত থাকবে না, কিংবা বিক্রয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে না অথবা এই বিধি তার অজানা থাকবে না, কেবল তখনই এই বিধি প্রযোজ্য হবে। সে যদি অনুপস্থিত থাকে কিংবা বিক্রয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে অথবা বিলম্ব করলে শুফয়ার দাবি রহিত হয় এটা না জানে, তবে তার অধিকার অক্ষুণ্ন থাকবে। (ইমাম আবু হানিফার দুটি বর্ণিত মতের মধ্যে অধিকতর বিশুদ্ধ মত হলো, বিক্রয়ের খবর জানা মাত্রই দাবি পেশ করা শর্ত নয়। কেননা শুফয়ার দাবিদারকে বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা লাগতে পারে। তাই সে সুযোগ তাকে দেয়া জরুরি। আর এ সুযোগ এভাবেই দেয়া সম্ভব যে, যে বৈঠকে সে এ খবর জানবে সেই বৈঠকে সে যতোক্ষণ থাকে, ততোক্ষণ তাকে দাবি পেশ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় দিতে হবে। বৈঠক থেকে না ওঠা ও অন্য কাজে আত্মনিয়োগ না করা পর্যন্ত তার শুফয়ার অধিকার রহিত হবেনা।)

ইবনে হায্ম প্রমুখ মনে করেন, শুফয়ার অধিকার আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অধিকার। কাজেই সে যদি আশি বছর বা তার চেয়ে বেশি সময় পর্যন্ত দাবি পেশ না করে তবুও তার অধিকার রহিত হবে না। কেবল সে নিজে দাবি বর্জন করলেই তা রহিত হবে। তিনি মনে করেন, 'শুফয়া শুধু সে ব্যক্তিই পায়, যে এ দাবিতে তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে' –এমন কথা যারা বলেন, তারা খুবই অশোভন কথা বলেন এবং এ ধরনের উক্তিকে রসূলুল্লাহ্ সা. এর উক্তি বলে আখ্যায়িত করা জায়েয নয়। ইমাম মালেক বলেন: এটা তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াজিব নয়, বরং এর সময় যথেষ্ট প্রশস্ত।

ইবনে রুশ্দ বলেন: এর সময় সীমাহীন না সীমাবদ্ধ, সে সম্পর্কে ইমাম মালেকের মতে বিভিন্নতা রয়েছে। কখনো বলেন: এর সময় সীমাহীন এবং কখনো তা শেষ হয় না। তবে ক্রেতা যদি জমিতে কোনো নির্মাণ কাজ বা ব্যাপক সংস্কার শুরু করে এবং সে তা জেনেও চুপ ও নির্বিকার থাকে তাহলে তার শুফয়া দাবি করার সময় থাকবে না।

আবার কখনো তিনি এই সময়কে এক বছর, মতান্তরে এক বছরের চেয়ে বেশি নির্ধারণ করেন। তাঁর সম্পর্কে এ কথাও বলা হয় যে, তিনি বলেছেন: পাঁচ বছর পর্যন্ত শুফয়ার অধিকার অক্ষুণ্ন থাকে।

পঞ্চম শর্ত: শাফী বা শুফয়ার দাবিদারকে অবিকল সেই মূল্য ক্রেতাকে পরিশোধ করতে হবে, যার জন্য সে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। জাবির রা. বর্ণিত হাদিসে রয়েছে: 'ক্রেতা মূল্য পাওয়ার সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখে।' (জাওযজানি)

পুরো মূল্য পরিশোধে অক্ষম হলে শুফয়ার অধিকার রহিত হবে।

ইমাম মালেক ও হাম্বলি মযহাবের ফকিহগণ মনে করেন, সমগ্র মূল্য বা তার অংশ বিশেষ যদি বাকি থেকে থাকে তবে শুফয়ার দাবিদার তা বাকি রাখতে বা কিস্তিতে দিতে পারবে যেমনটি চুক্তিতে উল্লেখ করা আছে। তবে শর্ত এই যে, তাকে স্বচ্ছল হতে হবে অথবা কোনো স্বচ্ছল ব্যক্তিকে জামিন করে আনতে হবে। নচেৎ ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী মূল্য নগদ পরিশোধ করতে হবে। শাফেয়ি ও হানাফিদের মতে, শুফয়ার দাবিদার স্বাধীন। সে যদি তাৎক্ষণিকভাবে সম্পত্তি নিতে চায় তবে তাৎক্ষণিকভাবে নেবে, নচেৎ নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত বিলম্বিত করবে।

ষষ্ঠ শর্ত: শুফয়ার দাবিদারকে পুরো সম্পত্তি নিতে হবে। সে যদি তার একাংশ নিতে চায় তবে সমগ্র সম্পত্তিতেই তার অধিকার রহিত হবে। শুফয়ার দাবিদার যদি একাধিক হয় এবং তাদের একজন যদি নিজের হিসসা বর্জন করে তবে অবশিষ্ট দাবিদারকে পুরোটা নিতেই হবে, যাতে ক্রেতার প্রাপ্য বিভক্ত হয়ে না যায়।

শুফয়ার দাবিদার যখন একাধিক: শুফয়ার দাবিদার যখন একাধিক হয় এবং তাদের সবার অংশ সমান না হয়, তখন তাদের প্রত্যেকে বিক্রীত সম্পত্তি থেকে নিজ নিজ অংশ নেবে। এটা ইমাম

মালেকের অভিমত। ইমাম শাফেয়ি ও আহমদের দুটি মতের মধ্যে বিশুদ্ধতর মতটিও এটি। কেননা এটা এমন একটা অধিকার, যা মালিকানার কারণে ভোগ করা হয়। তাই প্রত্যেকের মালিকানা যতোটুকু, শুফ্য়াও ততোটুকু হবে।

হানাফি ফকিহ্গণ ও ইবনে হায্‌ম বলেন: এটা দাবিদারদের সংখ্যা অনুপাতে সবাইকে সমান অংশ দেয়া হবে। কারণ অধিকারের দিক দিয়ে তারা সবাই সমান।

শুফ্য়ার উত্তরাধিকার: ইমাম মালেক ও শাফেয়ি মনে করেন, শুফ্য়া উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তরিত হয় এবং মৃত্যুর কারণে তা বাতিল হয় না। কেউ যদি শুফ্য়ার অধিকার পায় এবং এটা না জেনেই মারা যায় অথবা জেনেছে কিন্তু দখলে নেয়ার আগেই মারা গেছে এমন হয়, তবে অন্যান্য সম্পত্তির মতোই এটাও উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তরিত হবে। ইমাম আহ্মদ বলেন: মৃত ব্যক্তি দাবি না জানিয়ে থাকলে উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তরিত হবে না। হানাফি ফকিহ্গণ বলেন: মৃত ব্যক্তি দাবি জানিয়ে থাকলেও এ অধিকার উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তরিত হয় না, অনুরূপ এটা বিক্রয়ও করা যাবে না। তবে শাসক যদি তার শুফ্য়ার অধিকার প্রদানের পক্ষে রায় দিয়ে থাকে এবং তারপর মারা গিয়ে থাকে, তাহলে উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তরিত হবে।

ক্রেতার হস্তক্ষেপ: শুফ্য়ার দাবিদার শুফ্য়ার সম্পত্তি হস্তগত করার আগে ক্রেতা ক্রীত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করে থাকলে তা বৈধ। কেননা সে তার মালিকানাধীন সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করেছে। এমনকি সে যদি তা বিক্রয় করে দেয় তবে তাও বৈধ। তবে সে ক্ষেত্রে শুফ্য়ার দাবিদার দুই বিক্রয়ের যে কোনোটি থেকে তার অধিকার গ্রহণ করতে পারবে।

আর যদি সে উক্ত সম্পত্তি দান, সদ্কা, ওয়াক্ফ, দেনমোহর ইত্যাদি বাবত দিয়ে দেয়, তাহলে শুফ্য়ার অধিকার রহিত হবে। কেননা এভাবে যার কাছ থেকে নেয়া হয়েছে, তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। কারণ তার মালিকানাভুক্ত সম্পত্তি কোনো বিনিময় ছাড়াই তার হাতছাড়া হবে। শুফ্য়ার দাবিদার শুফয়া গ্রহণের পর ক্রেতা ঐ সম্পত্তিতে কোনো হস্তক্ষেপ করলে সেই হস্তক্ষেপ বাতিল গণ্য হবে। কেননা মালিকানা শুফয়ার দাবিদারের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে।

ক্রেতা যদি ক্রীত সম্পত্তিতে শুফ্য়ার দাবির পূর্বে কিছু নির্মাণ করে: ক্রেতা যখন শুফ্য়ার দাবিকৃত সম্পত্তিতে শুফ্য়ার দাবি বাস্তবায়িত হওয়ার আগে কিছু নির্মাণ বা চারা রোপণ করে, অত:পর শুফ্য়ার দাবিদার শুফ্য়ার অধিকার পায়, তখন ইমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ির মতে, শুফ্য়ার দাবিদার ভাঙ্গা অবস্থায় নির্মিত বস্তুর মূল্য, অথবা উপড়ানো অবস্থায় রোপিত চারার মূল্য পরিশোধ করতে পারবে অথবা ক্রেতাকে ভাঙ্গা ও উপড়ানোর দায়িত্ব অর্পণ করতে পারবে। ইমাম মালেক বলেন: শুফ্য়ার দাবিদার ক্রেতাকে নির্মাণ কার্যের বা রোপিত চারার মূল্য না দেয়া পর্যন্ত শুফয়া পাবে না।

শুফ্য়া রহিত করার জন্য আপোষ মীমাংসা: শুফ্য়ার দাবিদার যদি তার শুফয়ার অধিকার ছেড়ে দিতে আপোষে সম্মত হয় অথবা ক্রেতার নিকট তা বিক্রয় করে দেয়, তবে তার এ কাজ তার শুফ্য়ার অধিকার রহিত করবে এবং তার বিনিময়ে ক্রেতার নিকট থেকে কিছু নিয়ে থাকলে তা ফেরত দিতে সে বাধ্য। এটা ইমাম শাফেয়ির মত। কিন্তু অবশিষ্ট তিন প্রধান ইমামের নিকট এটা জায়েয এবং ক্রেতা তার জন্য যা ব্যয় করেছে, সে তার মালিক হতে পারবে।

তেতাল্লিশতম অধ্যায়

ওকালাহ্ বা প্রতিনিধিত্ব

সংজ্ঞা: আরবিতে ওকালাহ্ শব্দের অর্থ কারো নিকট কোনো দায়িত্ব সমর্পণ করা। আর শরিয়তের পরিভাষায় এর অর্থ হলো, যে ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নিয়োগ বৈধ, সে ক্ষেত্রে এক ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তিকে নিজের প্রতিনিধি নিয়োগ করা।

ওকালাহ্র বৈধতা : ইসলাম প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ওকালাহ্ বা প্রতিনিধি নিয়োগ বৈধ করেছে। কেননা সকল মানুষ নিজের কাজ নিজেই করতে সমর্থ হয় না। তাই সে অন্যকে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে বাধ্য হয়, যাতে সে তার প্রতিনিধি হয়ে তার কাজ সমাধা করে দেয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ আস্‌হাবুল কাহ্‌ফের ঘটনা প্রসংগে বলেন:

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَاءَلُوْا بَيْنَهُمْ ط قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ط قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوْا ط اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ○

'এ ভাবে আমি তাদেরকে জাগরিত করলাম যাতে তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বললো: তোমরা কত কাল অবস্থান করেছো? কেউ কেউ বললো: একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ। কেউ কেউ বললো: তোমরা কত কাল অবস্থান করেছ, তা তোমাদের প্রতিপালকই ভালো জানেন। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর, সে যেন দেখে কোন্ খাদ্য উত্তম এবং তা থেকে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য; সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে এবং কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকে কিছু জানতে না দেয়।' (সূরা কাহফ, আয়াত ১৯)

অনুরূপ আল্লাহ্ ইউসুফ আ. সম্পর্কে জানিয়েছেন যে, তিনি বাদশাকে বললেন:

اِجْعَلْنِيْ عَلٰي خَزَائِنِ الْاَرْضِ ج اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ○ (سورة يوسف : ٥٥)

'আমাকে দেশের ধনসম্পদের উপর কর্তৃত্ব দেন আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও সুবিজ্ঞ।'

এছাড়া বহু সংখ্যক হাদিসেও ওকালাহ্ বা প্রতিনিধি নিয়োগকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো: রসূলুল্লাহ্ সা. আবু রাফে' ও জনৈক আনসারীকে প্রতিনিধি নিয়োগ করেছিলেন, ফলে তারা উভয়ে রসূলুল্লাহ্ সা. এর সাথে মাইমুনা রা. কে বিয়ে দেন। তা ছাড়া তিনি ঋণ পরিশোধে, 'হুদুদ' প্রমাণিত করায় ও তার বাস্তবায়ন ইত্যাদিতে প্রতিনিধি নিয়োগ করতেন এটা প্রমাণিত হয়েছে। মুসলমানদের ইজমা বা সর্বসম্মত মত থেকেও এটা শুধু বৈধ নয় বরং মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়। কেননা এটা সৎকাজে ও তাকওয়ায় এক ধরনের সহযোগিতা, যার জন্য কুরআনে আহ্বান জানানো হয়েছে ও সুন্নাহ্য় উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন: وَتَعَاوَنُوْا عَلَي الْبِرِّ وَالتَّقْوٰي وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَي الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ○ 'সৎকর্ম ও তাক্‌ওয়ায় তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবেনা।'

রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'বান্দা যতোক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে লিপ্ত থাকে, ততোক্ষণ আল্লাহ্ বান্দার সাহায্যে লিপ্ত থাকেন।'

'আল-বাহর' গ্রন্থে বলা হয়েছে: ওকালাহ্র বৈধতার পক্ষে ইজমা রয়েছে। ওকালাহ্ প্রতিনিধিত্ব না অভিবাবকত্ব সে সম্পর্কে দুটো মত রয়েছে। কেউ বলেন: এটা প্রতিনিধিত্ব এই হিসাবে যে, যে ব্যক্তি প্রতিনিধি নিয়োগ করে তার নির্দেশের বিরুদ্ধে কাজ করা নিষিদ্ধ। আবার কেউ বলেন: এটা এ হিসাবে অভিভাবকত্ব যে, প্রতিনিধি নিয়োগকারীর আদেশের বিরোধিতা করে অপেক্ষাকৃত মংগলজনক কাজ করা বৈধ। যেমন বাকিতে বিক্রয় করার আদেশ দেয়া সত্ত্বেও প্রতিনিধির নগদ বিক্রয় করা।

ওকালাহ্র মূল উপাদান: ওকালাহ্ অন্যান্য চুক্তির মতোই একটা চুক্তি। সুতরাং এর মূল উপাদান

ইজাব ও কবুল (প্রস্তাব ও প্রস্তাব গ্রহণ) ব্যতীত এটা শুদ্ধ হবে না। এতে কোনো নির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহার করার বাধ্যবাধকতা নেই, বরং যে কোনো কথা বা কাজ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব বুঝা গেলেই ওকালত শুদ্ধ হবে। চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষ যে কোনো অবস্থায় ওকালাহ্র চুক্তি বাতিল করারও অধিকারী। কেননা এটা বাধ্যতামূলক চুক্তি নয়, বরং বৈধ চুক্তি।

শর্তযুক্ত ও শর্তহীন ওকালাহ্: ওকালাহ্র চুক্তি শর্তহীনভাবে, শর্তযুক্তভাবে, ভবিষ্যতের কোনো কাজের উপর নির্ভরশীল রেখে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমিত রেখে বা নির্দিষ্ট কাজের উপর নির্ভরশীল রেখেও করা যায়। শর্তহীন ওকালাহ্র উদাহরণ হলো: 'তোমাকে অমুক জিনিস কিনতে উকিল তথা প্রতিনিধি নিযুক্ত করলাম।' আর শর্তযুক্ত ওকালাহ্র উদাহরণ, যথা: 'এরূপ যদি ঘটে, তবে তুমি আমার প্রতিনিধি।' ভবিষ্যতের উপর নির্ভরশীল ওকালাহ্র উদাহরণ হলো, যথা: 'রমযান মাস সমাগত হলেই তোমাকে আমি প্রতিনিধি নিয়োগ করবো।' নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমিত ওকালাহ্র উদাহরণ হলো: 'তোমাকে অমুক কাজে এক বছরের জন্যে প্রতিনিধি নিযুক্ত করলাম।' এ হচ্ছে হানাফি ও হাম্বলি মযহাবের মত। শাফেয়ি মযহাব মতে ওকালাহ্ কোনো শর্তের অধীনে জায়েয নেই।

ওকালাহ্ বিনা মজুরিতেও হতে পারে, আবার মজুরির ভিত্তিতেও হতে পারে। মজুরি ভিত্তিক হলে নিয়োগকর্তা এরূপ শর্ত আরোপ করতে পারবে যে, নির্দিষ্ট মেয়াদের পরে ব্যতীত প্রতিনিধি নিজেকে প্রতিনিধিত্ব থেকে মুক্ত করতে পারবে না। করলে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। চুক্তিতে যদি প্রতিনিধির জন্য মজুরি নির্ধারিত হয়, তাহলে সে একজন চাকর বা মজুর গণ্য হবে এবং চাকর সংক্রান্ত যাবতীয় বিধি তার উপর প্রযোজ্য হবে। (কেউ যদি কাউকে বলে: 'এটা দশ মুদ্রায় বিক্রয় কর, বেশি দামে বিক্রয় করতে পারলে বেশিটুকু তোমার' তবে তা বৈধ হবে এবং বেশিটুকু সে পাবে। এটা ইস্হাক প্রমুখের মত, ইবনে আব্বাস এতে কোনো দোষ দেখেন না।

ওকালাহ্র শর্তাবলী: ওকালাহ্র শর্তাবলী পূরণ করা না হলে ওকালাহ্ শুদ্ধ হবে না। এ সব শর্তের মধ্যে কতক রয়েছে প্রতিনিধির সাথে সংশ্লিষ্ট, কতক রয়েছে নিয়োগকর্তার সাথে সংশ্লিষ্ট, আবার কতক রয়েছে যে বিষয়ে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়েছে সে বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

মুয়াক্কেল তথা প্রতিনিধি নিয়োগকর্তা সংক্রান্ত শর্তাবলী: যে বিষয়ে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে, নিয়োগকারীকে সে বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। সে যদি পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী না হয় তাহলে তার প্রতিনিধি নিয়োগ বৈধ হবে না, যেমন পাগল ও ন্যায়-অন্যায় বাছবিচারে অক্ষম শিশু। এ দু'জনের একজনের পক্ষেও কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা বৈধ নয়। কেননা তারা উভয়ে এ ব্যাপারে অযোগ্য। তাই তারা প্রথম থেকেই অক্ষম ছিলো বলে গণ্য হবে। তবে যে বালক ভালো-মন্দের বাছবিচার করতে পারে, তাকে এমন কাজে প্রতিনিধি নিয়োগ করা জায়েয, যা নিরেট লাভজনক, যেমন দান, সদ্কা ও ওসিয়ত গ্রহণে প্রতিনিধি নিয়োগ। পক্ষান্তরে যে কাজ নিরেট ক্ষতির যেমন তালাক, দান ও সদ্কা করা, সে কাজে এমন বালককে প্রতিনিধি নিয়োগ করা বৈধ নয়।

প্রতিনিধি হওয়ার শর্তাবলী : প্রতিনিধি হওয়ার শর্ত হলো সুস্থ মস্তিষ্ক বুদ্ধিমান হওয়া। পাগল বা ভালোমন্দ বুঝে না এমন বালক হলে তাকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা বৈধ নয়। ভালোমন্দ বুঝতে পারে এমন বালককে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হানাফি মযহাব মতে বৈধ। কেননা সে জাগতিক বিষয়গুলো প্রাপ্তবয়স্কের মতোই আয়ত্ত করেছে। রসূলুল্লাহ্ সা. এর স্ত্রী উম্মে সালমাকে তার ছেলে আমর অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকা অবস্থায়ই রসূলুল্লাহ্ সা. এর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন।

যে কাজে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে তার শর্তাবলী : যে কাজে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে তার শর্ত হলো, কাজটি সম্পর্কে প্রতিনিধির জ্ঞাত থাকা চাই আর অজ্ঞ থাকলেও যেন পুরোপুরি অজ্ঞ না থাকে। তবে নিয়োগকর্তা যদি শর্তহীনভাবে নিয়োগ করে তাহলে পুরোপুরি অজ্ঞ থাকলেও দোষ নেই। যেমন সে যদি বলে: 'তুমি যা ইচ্ছা তা-ই আমার জন্য কিনে নিয়ে এসো।' সেই সাথে এটিও একটি শর্ত

যে, কাজটি প্রতিনিধি নিয়োগের উপযুক্ত হওয়া চাই। প্রতিনিধি নিয়োগ এমন যাবতীয় কাজের চুক্তিতে প্রয়োজ্য, যে কাজের চুক্তি মানুষ নিজের জন্য করে থাকে, যেমন ক্রয়, বিক্রয়, ইজারা বা ভাড়া দেয়া, ঋণ প্রমাণ করা, মামলা করা, পাওনা দাবি করা, আপোষ মীমাংসা করা, শুফ্য়া দাবি করা, দান করা, সদ্কা করা, বন্ধক দেয়া, বন্ধক রাখা, ধার দেয়া, ধার নেয়া, বিয়ে, তালাক, আর্থিক লেনদেন ইত্যাদি, চাই প্রতিনিধি নিয়োগকারী উপস্থিত হোক বা অনুপস্থিত হোক এবং পুরুষ হোক বা স্ত্রী হোক।

ইমাম বুখারি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. এর কাছে এক ব্যক্তির একটা নির্দিষ্ট বয়সের উট পাওনা ছিলো। সে তার পাওনার দাবি নিয়ে এল। রসূলুল্লাহ্ সা. তাকে তার প্রাপ্য উটটি দিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট বয়সের উট পাওয়া গেলনা। বরং তার চেয়ে বেশি বয়সের উট পাওয়া গেল। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: ওটাই ওকে দিয়ে দাও। লোকটি বললো: আপনি আমার পাওনা পরিশোধ করেছেন, আল্লাহ্ আপনার পাওনা পরিশোধ করুন। রসূলুল্লাহ সা. বললেন: তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে উত্তমভাবে পাওনা পরিশোধ করে।

ইমাম কুরতুবি বলেন: এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, একজন সুস্থ ও উপস্থিত ব্যক্তিও প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারে। কেননা রসূল সা. তাঁর সাহাবিদেরকে তার পক্ষ থেকে যে বয়সের উট পাওয়া যাচ্ছে তা প্রদানের আদেশ দিলেন। এটা তার পক্ষ থেকে তাদেরকে প্রতিনিধি নিয়োগের পর্যায়ভুক্ত। অথচ রসূলুল্লাহ্ সা. রোগীও ছিলেন না, মুসাফিরও ছিলেন না। এ দ্বারা ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম সাহ্নুনের এ মত ভুল প্রমাণিত হয় যে, সুস্থ ও উপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে প্রতিপক্ষের সম্মতি ব্যতীত প্রতিনিধি নিয়োগ করা অবৈধ। আলোচ্য হাদিস তাদের মত খণ্ডন করে।

কিসে কিসে প্রতিনিধিত্ব বৈধ: কিসে কিসে প্রতিনিধিত্ব বৈধ, সে ব্যাপারে ফকিহগণ একটা মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন। মূলনীতিটি হলো: 'মানুষের নিজের জন্য যে চুক্তি সম্পাদন করা বৈধ, সে চুক্তি সম্পাদনের জন্য তার প্রতিনিধি নিয়োগ বৈধ। কিন্তু যে কাজ অন্যকে দিয়ে করানোর সুযোগ নেই, সে কাজে প্রতিনিধিত্ব বৈধ নয়। যেমন নামায, শপথ, পবিত্রতা। এসব কাজে অন্যকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা জায়েয নেই। কেননা এ সব কাজের উদ্দেশ্যই হলো, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের পরীক্ষা করা। অন্যকে দিয়ে করালে এ উদ্দেশ্য সফল হয় না।

প্রতিনিধি দায়িত্বশীল : যখন প্রতিনিধি নিয়োগ সম্পন্ন হবে তখন যে কাজের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছে, সে কাজে সে দায়িত্বশীল হবে। তবে নিজের অবহেলা বা বাড়াবাড়ি ব্যতীত কোনো ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়ী হবে না এবং ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেলে সে সম্পর্কে তার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে। (অবহেলার উদাহরণ হলো: পণ্য বিক্রয় করা ও মূল্য গ্রহণ না করেই পণ্য ক্রেতাকে অর্পণ করা, অথবা পণ্যকে নিজে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা বা অরক্ষিত স্থানে রাখা।)

দাবি আদায়ের জন্য প্রতিনিধি বা উকিল নিয়োগ: ঋণ, সম্পত্তির দাবি ও যাবতীয় পাওনা সংক্রান্ত দাবিদাওয়া আদায় করার জন্য প্রতিনিধি তথা উকিল নিয়োগ করা বৈধ, চাই মুয়াক্কেল (প্রতিনিধি নিয়োগকর্তা) অভিযোগকারী বা অভিযুক্ত হোক, চাই সে পুরুষ বা স্ত্রী হোক, এবং চাই প্রতিপক্ষ তাতে সম্মত হোক বা না হোক। কেননা পাওনা আদায়ের চেষ্টা মুয়াক্কেলের ঐকান্তিক অধিকার। ইচ্ছা করলে সে নিজেই এ চেষ্টা করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে নিজের পক্ষ হতে অন্য কাউকে এ কাজে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারে। এখন প্রশ্ন হলো, দাবি আদায়ের জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধি বা উকিল তার মুয়াক্কেলের পক্ষে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিতে পারে কি? আর আদালতের রায়ে মুয়াক্কেলের জন্য ঘোষিত সম্পত্তি কি উকিল দখলে নিতে পারে? এর জবাব নিম্নে উল্লেখ করা যাচ্ছে:

মুয়াক্কেলের পক্ষে উকিলের স্বীকারোক্তি: মুয়াক্কেলের পক্ষে উকিলের স্বীকারোক্তি যদি 'হুদুদ' (শরিয়ত নির্ধারিত দণ্ডবিধি) ও 'কিসাস' (মৃত্যুদণ্ড) সংক্রান্ত হয় তবে তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়; চাই তা বিচার অধিবেশন চলাকালেই দেয়া হোক বা তার বাইরে। হুদুদ ও কিসাস ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে দেয়া

হলে ইমামগণ সর্বসম্মতভাবে বলেছেন যে, বিচার অধিবেশনে ব্যতীত তা গ্রহণযোগ্য নয়। বিচার অধিবেশনে দেয়া স্বীকারোক্তি সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা বলেন: স্বীকারোক্তি বৈধ হবে। তবে মুয়াক্কেল যদি শর্ত দিয়ে থাকে যে, তার বিরুদ্ধে কোনো স্বীকারোক্তি দেয়া চলবে না তাহলে বৈধ হবে না। অন্য তিনজন ইমাম (শাফেয়ি, মালেক ও আহমদ) বলেন: কোনো অবস্থায়ই বৈধ নয়। কেননা স্বীকারোক্তি দেয়া তার ক্ষমতা বহির্ভূত কাজ তথা অনধিকার চর্চা।

দাবি আদায়ে নিযুক্ত উকিল সম্পত্তি দখলের প্রতিনিধি নয়: দাবি আদায়ে নিযুক্ত উকিল সম্পত্তি দখলের কাজে নিযুক্ত ও ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধি নয়। কেননা সে শুধু দাবি আদায়ে ও যুক্তিতর্ক উপস্থাপনে অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত হতে পারে, অথচ সম্পত্তি দখলের ব্যাপারে বিশ্বস্ত নাও হতে পারে। এটা ইমাম আবু হানিফা ব্যতীত অন্য তিন ইমামের অভিমত। হানাফি ফকিহগণের মত হলো, মুয়াক্কেলের পক্ষে যে সম্পত্তির রায় দেয়া হবে সে সম্পত্তি তার উকিল দখলে নিতে পারবে। এটা তার দাবি আদায়ের চেষ্টার পূর্ণতা এবং এ ছাড়া তার চেষ্টার সমাপ্তি হয়না। সুতরাং তাকে এ কাজেও প্রতিনিধি বিবেচনা করা যায়।

কিসাস আদায়ে প্রতিনিধি নিয়োগ: কিসাস আদায়ে প্রতিনিধি নিয়োগের বিষয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা বলেন: শুধু মুয়াক্কেলের উপস্থিতিতেই এটা বৈধ, তার অনুপস্থিতিতে বৈধ নয়। কেননা মুয়াক্কেলই তার প্রাপ্য অধিকারের মালিক। সে উপস্থিত থাকলে ক্ষমা করেও দিতে পারতো। তাই এই বিষয়ে সংশয় থাকার পরিপ্রেক্ষিতে কিসাস আদায় উকিলের জন্য বৈধ নয়। ইমাম মালেক বলেন: মুয়াক্কেল অনুপস্থিত থাকলেও কিসাস আদায় করা জায়েয। ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত দুটি মতের মধ্যে সঠিক মত এটাই।

বিক্রয়ের প্রতিনিধি: যে ব্যক্তি তার পক্ষে কোনো জিনিস বিক্রয় করার জন্য কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে, সে যদি মূল্য নির্ধারণ ছাড়াই শর্তহীনভাবে নিযুক্ত করে এবং বাকি বা নগদ বিক্রয় করবে কিনা তা উল্লেখ না করেই করে। তবে সে শুধু প্রচলিত মূল্যে ও নগদে বিক্রয় করতে পারবে। সে যদি এমন মূল্যে বিক্রয় করে, যা সচরাচর ঠকা বিবেচিত হয়না, অথবা বাকিতে বিক্রয় করে তবে মুয়াক্কেলের সম্মতি ছাড়া সেই বিক্রয় বৈধ হবেনা। কেননা এটা তার স্বার্থের পরিপন্থী। কাজেই সে এটা ফেরত চাইতে পারবে। শর্ত আরোপ না করার অর্থ প্রতিনিধিকে যা ইচ্ছে তাই করার স্বাধীনতা দেয়া নয়, বরং তার অর্থ হলো, ব্যবসায়ীদের নিকট পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য এবং মুয়াক্কেলের জন্য অধিকতর উপকারী ধরনের বিক্রয়। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, নগদ বা বাকি, প্রচলিত মূল্যে বা ঠকা মূল্যে এবং দেশে প্রচলিত মুদ্রায় বা অন্য মুদ্রায় যেভাবেই বিক্রয় করুক বৈধ হবে। কেননা এটাই শর্ত আরোপ না করার অর্থ। কারণ মানুষ অনেক সময় তার মালিকানাধীন কোনো কোনো জিনিস অত্যধিক সস্তা দামে বিক্রয় করে হলেও তা থেকে নিস্তার পেতে আগ্রহী হয়ে থাকে। অবশ্য প্রতিনিধি নিয়োগ যখন শর্তহীনভাবে সম্পন্ন হয়, এটা তখনকার জন্যই প্রযোজ্য। কিন্তু যখন শর্ত আরোপ করে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়, তখন মুয়াক্কেলের আরোপিত শর্ত পূরণ করেই প্রতিনিধির কাজ করা বাধ্যতামূলক। তার অন্যথা করা তার জন্য বৈধ নয়। তবে মুয়াক্কেলের জন্য অধিকতর লাভজনক হয় এমন কিছু করলে বৈধ। যথা, মুয়াক্কেল যদি একটা নির্দিষ্ট মূল্য বেঁধে দেয়, আর সে তার চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রয় করে, অথবা তাকে যদি বলে, এটা বাকিতে বিক্রয় কর, কিন্তু সে নগদে বিক্রয় করে, তবে বিক্রয় শুদ্ধ হবে।

শর্ত লংঘনপূর্বক মুয়াক্কেলের জন্য অধিকতর লাভজনকভাবে বিক্রয় করতে নাপারলে সে বিক্রয় ইমাম শাফেয়ির মতে বাতিল হবে। হানাফিগণ মনে করেন, মুয়াক্কেল সম্মতি দিলে শুদ্ধ হবে, নচেৎ বাতিল হবে। (হাম্বলি আলেমদের মতে প্রতিনিধি যদি নির্ধারিত মূল্য বা প্রচলিত মূল্যের চেয়ে এত বেশি মূল্যে ক্রয় করে, যা জনগণের জন্য সাধারণত ঠকা বলে বিবেচিত হয় না, তাহলে মুয়াক্কেলের জন্য সেই ক্রয় শুদ্ধ হবে, তবে বাড়তি মূল্য দেয়ার জন্য প্রতিনিধি দায়ী হবে। ক্রয় ও বিক্রয় শুদ্ধতায় একই রকম। বিক্রয় কম মূল্যে করলে তার জন্যও প্রতিনিধি দায়ী হবে, যেমন বেশি মূল্যে আয়ের জন্য প্রতিনিধি দায়ী হয়।

তবে যে সব জিনিসে মানুষ সচরাচর ঠকে থাকে তার জন্য প্রতিনিধি দায়ী হবে না, এটা মার্জনীয় বিবেচিত হবে এজন্য তাকে দণ্ডও দিতে হবে না।)

প্রতিনিধি কর্তৃক নিজের জন্য ক্রয় করা: প্রতিনিধিকে যখন কোনো জিনিস বিক্রয়ের কাজে নিযুক্ত করা হয় তখন তার পক্ষে ঐ জিনিস নিজের জন্য ক্রয় করা কি বৈধ? ইমাম মালেক বলেন: মূল্য একটু বাড়িয়ে সে নিজের জন্য ক্রয় করতে পারে। ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ি ও আহমদ বলেন: এটা জায়েয নয়। কেননা মানুষ স্বভাবতই নিজের জন্য সস্তায় কিনতে উদগ্রীব হয়ে থাকে। অথচ মুয়াক্কেলের উদ্দেশ্য হলো বর্ধিত মূল্যে বিক্রয় করা। অথচ এ দুই উদ্দেশ্যের মধ্যে মিল নেই।

ক্রয়ের কাজে প্রতিনিধি নিয়োগ: ক্রয়ের কাজে নিযুক্ত প্রতিনিধির উপর যদি মুয়াক্কেল শর্ত আরোপ করে থাকে, তবে সেই শর্ত অবশ্য পালনীয়, চাই সে শর্ত ক্রীত পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক বা মূল্যের সাথে। সে যদি শর্ত লংঘন করে তাকে যা কিনতে বলা হয়েছে, তার পরিবর্তে অন্য কিছু কেনে, অথবা মুয়াক্কেলের নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে কেনে, তবে সেটা তার নিজের ক্রয় হবে, মুয়াক্কেলের নয়। শর্ত লংঘন করে যদি উৎকৃষ্টতর কিছু কেনা হয় বা অধিকতর সস্তা মূল্যে কেনা হয় তাহলে তা জায়েয। উরওয়া আল বারেকি রা. থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ সা. তাকে একটা ছাগল বা অন্য কোনো কুরবানীর জন্তু ক্রয়ের জন্য এক দিনার দিলেন। উরওয়া এক দিনার দিয়ে দুটো ছাগল কিনলেন। ঐ দুটো ছাগলের একটা তিনি এক দিনারে বিক্রয় করে রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট একটা ছাগল ও এক দিনার নিয়ে এলেন। রসূলুল্লাহ সা. তার বিক্রয়ে বরকতের জন্য দোয়া করলেন। এর ফল হলো এই যে, তিনি মাটি কিনলেও তাতে মুনাফা হতো। (বুখারি, আবুদাউদ, তিরিমিযি)।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুয়াক্কেল যদি প্রতিনিধিকে এক দিনার দিয়ে নির্দিষ্ট ধরনের একটা ছাগল কিনতে বলে এবং সে সেই ধরনের দু'টা ছাগল এক দিনার দিয়ে কেনে, তবে তা জায়িয হবে। কেননা মুয়াক্কেলের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে এবং প্রতিনিধি তার জন্য অতিরিক্ত কিছু মংগলজনক কাজ করেছে। অনুরূপ, তাকে যদি একটা ছাগল এক দিরহামে বিক্রয় করার আদেশ দেয় এবং সে সেটি দুই দিরহামে বিক্রয় করে অথবা এক দিরহামে কিনতে বলে এবং সে অধিক দিরহামে কিনে আনে, তবে তাও জায়েয। ইমাম নবাবি বলেছেন, শাফেয়ি মযহাব মোতাবেক এই মতই শুদ্ধ। আর যদি শর্তহীনভাবে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়ে থাকে, তবে প্রচলিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বা অতিরিক্ত ঠকা মূল্যে আয় করা প্রতিনিধির জন্য বৈধ নয়। প্রতিনিধি যখন শর্ত লংঘন করবে, তখন তার ক্রয় কার্যকর হবে না, বরং ঐ ক্রয় তার নিজের জন্য হবে।

প্রতিনিধিত্ব চুক্তির পরিসমাপ্তি: প্রতিনিধিত্বের চুক্তি নিম্নোক্ত কারণে শেষ হয়:

১. চুক্তির দুই পক্ষের যে কোনো এক পক্ষের মৃত্যু বা পাগল হওয়া। কেননা প্রতিনিধিত্বের অন্যতম শর্ত হলো জীবিত থাকা ও সুস্থমস্তিষ্ক থাকা। মৃত্যু ঘটলে বা পাগল হলে চুক্তির বৈধতার ভিত্তি ধ্বসে যায়।

২. প্রতিনিধিত্ব দ্বারা যে কাজ সমাধা করা কাম্য, তার সমাপ্তি। কেননা যে কাজের জন্য প্রতিনিধিত্বের সৃষ্টি, সে কাজ যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন আর প্রতিনিধিত্বের কোনো অর্থ থাকবে না।

৩. মুয়াক্কেল কর্তৃক প্রতিনিধিকে বরখাস্ত করা, এমনকি এটা যদি তার অজান্তেও হয়। (এটা শাফেয়ি ও হাম্বলি মযহাবের অভিমত। বরখাস্ত হওয়ার পর তার কাছে মুয়াক্কেলের যা থাকবে তা আমানত গণ্য হবে।) হানাফি মযহাব অনুসারে বরখাস্ত হওয়ার বিষয়টি প্রতিনিধির অবগত হওয়া জরুরি। অবগত হওয়ার পূর্বে তার করা সকল কাজ বরখাস্ত হওয়ার পূর্বের কাজের মতো।

৪. প্রতিনিধির পদত্যাগ: এ ক্ষেত্রে প্রতিনিধির পদত্যাগের কথা মুয়াক্কেলের জানা শর্ত নয়। কিন্তু হানাফিদের মতানুসারে এটা তার জানা শর্ত, যাতে সে কোনো ক্ষতির শিকার না হয়।

৫. যে জিনিসের ব্যাপারে তাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়েছে, তা মুয়াক্কেলের মালিকানা থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

চুয়াল্লিশতম অধ্যায়

ধার প্রদান

সংজ্ঞা: ধার দেয়া একটা পরোপকারমূলক কাজ, যার প্রতি ইসলাম আহ্বান জানিয়েছে ও উৎসাহ দিয়েছে। আল্লাহ্ বলেন: وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
'সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে, পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না।' (সূরা ৫ আল মায়িদা: আয়াত ২)।

আনাস রা. বলেন: একবার মদিনায় আতংক ছড়িয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ্ সা. আবু তাল্হার কাছ থেকে একটা ঘোড়া ধার নিয়ে তাতে আরোহণ করেন। ঘোড়াটিকে 'মানদুব' বলা হতো। তিনি ফিরে এসে, বললেন: 'আমরা কিছুই দেখতে পেলামনা, যদিও একটা সমুদ্র মনে করেছিলাম।'

ফিক্হের পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হলো: 'মালিক কর্তৃক তার মালিকানাধীন বস্তুর উপকারিতা বা সেবা অন্য কাউকে কোনো বিনিময় ব্যতিরেকে ব্যবহার করতে দেয়া।'

কিভাবে ধার দেয়া হয়: যে কোনো কথা ও কাজ দ্বারা ধার দেয়া বুঝা গেলেই তা দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন হয়।

ধার দেয়ার শর্তাবলী: এর বৈধতার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী পূরণ জরুরি:

১. ধারদাতাকে সেচ্ছায় দান করার যোগ্য হতে হবে।
২. যে জিনিসটি ধার দেয়া হবে, তা যেন স্থিতিশীল হওয়ার সাথে সেবা দানের যোগ্য হয়।
৩. সেবা বা উপকারিতা বৈধ হওয়া চাই।

ধার নেয়া জিনিস পুন ধার দেয়া ও ভাড়া দেয়া: ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেন: ধার দেয়া জিনিসটি যদি এমন হয় যে, ব্যবহারকারীর ব্যবহারে তাতে কোনো পরিবর্তন সূচিত হয় না, তাহলে তা ধার নেয়ার পর ধারদাতার অনুমতি ব্যতিরেকে অন্যকে ধার দেয়া বৈধ।

হাম্বলি মযহাব অনুসারে ধার নেয়া জিনিস দ্বারা শুধু ধারগ্রহীতা নিজে বা তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি উপকৃত হতে পারবে। মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে তা অন্য কাউকে ধার বা ভাড়া দিতে পারবে না। মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে যদি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ধার দেয় এবং জিনিসটি দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট নষ্ট হয়, তাহলে মালিক দুজনের যাকে ইচ্ছা দায়ী করতে পারবে। তবে দ্বিতীয় জনের উপরই দায় স্থির হবে। কেননা সে দায় মেনে নিয়েই তা নিজের দখলে নিয়েছে এবং তার হাতেই ধ্বংস হয়েছে। তাই দায় তার উপরই বর্তাবে। একজন লুটেরার নিকট থেকে যখন আরেক লুটেরা লুট করে তখন দ্বিতীয় লুটেরাই দায়ী হয়।

ধারদাতা কখন তার জিনিস তলব করতে পারবে: ধারদাতা ধার গ্রহীতার ক্ষতি না হয় এমন উপায়ে যখন ইচ্ছা তার জিনিস ফেরত চাইতে পারে। ফেরত চাওয়ায় যদি ধার গ্রহীতার ক্ষতির আশংকা থাকে, তবে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে তাকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ফেরত নেয়া বিলম্বিত করবে।

কখন ফেরত দেয়া জরুরি: ধার নেয়া জিনিসের সেবা গ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পর তা ফেরত দেয়া ধারগ্রহীতার অবশ্য কর্তব্য। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন: إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا ۝
'আল্লাহ্ হকদারের নিকট আমানত প্রত্যর্পণ করতে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন।' (সূরা নিসা: ৫৮)

আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'যে ব্যক্তি তোমার কাছে আমানত রেখেছে তার কাছে আমানত ফেরত দাও, আর যে ব্যক্তি তোমার আমানতের খেয়ানত করেছে, তুমি তার খেয়ানত করো না।' (আবুদাউদ, তিরমিযি)।

আবুদাউদ ও তিরমিযি আবু উমামা থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'ধার অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।'

যে জিনিস ধার দিলে ধারদাতার ক্ষতি হয় না, কিন্তু ধারগ্রহীতার উপকার হয় তা ধার দেয়া: কোনো মানুষ যদি তার প্রতিবেশীর প্রাচীরে একটা কাঠ গাড়লে প্রাচীরের ক্ষতি না হয়, তবে প্রতিবেশীকে কাঠ গাড়তে বাধা দিতে রসূলুল্লাহ্ সা. নিষেধ করেছেন। আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীকে তোমাদের প্রাচীরে একখানা কাঠ ঢুকাতে নিষেধ করো না।'

ফকিহ্গণ এ হাদিসের ব্যাখ্যায় নানা মত প্রকাশ করেছেন। প্রাচীরে কাঠ ঢুকানোর অনুমতি দেয়া এ হাদিস দ্বারা মুস্তাহাব না ওয়াজিব প্রমাণিত হয়, সে ব্যাপারে ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ির বিশুদ্ধতম মত হলো, এটা মুস্তাহাব। ইমাম আবু হানিফা ও কুফার ফকিহ্গণও একই মত পোষণ করেন। দ্বিতীয় মতটি হলো, এটা ওয়াজিব। এটা ইমাম আহমদ, আবু সাওর ও মুহাদ্দিসগণের অভিমত। হাদিসের প্রকাশ্য অর্থও তাই। এমন সকল জিনিস এর আওতায় আসবে, যা দ্বারা ধারগ্রহীতা উপকৃত হয়, অথচ ধারদাতার কোনো ক্ষতি হয় না। এ ধরনের জিনিস ধার দিতে অস্বীকার করা জায়েয নেই। অস্বীকার করলে শাসক এ ব্যাপারে ফায়সালা করবে।

কেননা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে ইমাম মালেক বর্ণনা করেছেন: যাহ্হাক ইবনে কায়েস একটা প্রশস্ত খাল খনন করে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। অত:পর তার ইচ্ছা হলো, খালটাকে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার জমির উপর দিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু তিনি তাতে রাজি হলেন না। তখন যাহ্হাক তাকে বললেন: তুমি আমাকে বাধা দিচ্ছ, অথচ এটা তোমার জন্য লাভজনক। তুমি এই খাল দ্বারা তোমার জমিতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেচ দিতে পারবে, অথচ তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। এরপরও মুহাম্মদ রাজি হলো না। তখন যাহহাক তার ব্যাপারে উমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে কথা বললেন। উমর রা. মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে ডেকে আদেশ দিলেন যাহ্হাককে তার জমির ভেতর দিয়ে খাল কেটে নেয়ার সুযোগ দিতে। মুহাম্মদ তবুও বললেন: না। উমর রা. বললেন: যে কাজে তোমার শুধু উপকারই হবে এবং কোনো ক্ষতি হবে না, সে কাজ তোমার ভাইকে করতে দাও। মুহাম্মদ তবুও বললো ; না। তখন উমর রা. বললেন: আল্লাহ্র কসম, সে অবশ্যই খাল নিয়ে যাবে তোমার পেটের উপর দিয়ে হলেও। অত:পর উমর রা. যাহহাককে খাল নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন এবং যাহ্হাক তাই করলেন। এ ছাড়া আমর ইবনে ইয়াইহ্য়া আলমাযনি তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন: আমার দাদার বাগানে আব্দুর রহ্মান ইবনে আওফের একটা ঝরণা ছিলো। আব্দুর রহ্মান সেটি বাগানের এক কিনারে সরিয়ে নিতে চাইল। বাগানের মালিক এ বিষয়ে কথা বললো। উমর রা. সরাতে বললেন। এটাই ইমাম শাফেয়ি, আহ্মদ, আবু সাওর, দাউদ ও মুহাদ্দিসগণের একটি গোষ্ঠীর মত। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিকের মতে, এ ধরনের ফায়সালা করা যাবে না। কেননা ধারের ব্যাপারে কোনো ফায়সালা দেয়া চলে না। কিন্তু ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদিসগুলো প্রথম মতটি সমর্থন করে।

ধারগ্রহীতার দায়বদ্ধতা: ধারগ্রহীতা যখন ধার চাওয়া জিনিসটি নিজের দখলে নেবে, তখন তা নষ্ট হলে সে তার জন্য দায়ী হবে, চাই সে অবহেলা করুক বা না করুক। এটা ইবনে আব্বাস, আয়েশা, আবু হুরায়রা, ইমাম শাফেয়ি ও ইসহাকের মত। সামুরা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'যে ব্যক্তি কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেছে, সে যতোক্ষণ তা তাকে ফেরত না দেবে ততোক্ষণ তার জন্য দায়ী থাকবে।' কিন্তু হানাফি ও মালিকি মযহাব অনুসারে ধারগ্রহীতা অবহেলা না করে থাকলে দায়ী হবেনা। তাদের প্রমাণ রসূলুল্লাহ্ সা. এর এই হাদিস: যে ধারগ্রহীতা খিয়ানতকারী নয় সে দায়ী নয়। যে আমানত রক্ষক খিয়ানতকারী নয় সে দায়ী নয়।' (দারু কুতনি)

পঁয়তাল্লিশতম অধ্যায়

গচ্ছিত সম্পদ

সংজ্ঞা ও বিধান: গচ্ছিত সম্পদ সে সম্পদ বুঝায়, যা মানুষ অন্যের কাছে সংরক্ষণের জন্য জমা রাখে।

গচ্ছিত সম্পদ জমা রাখা ও জমা দেয়া দুটোই জায়েয। যে ব্যক্তি এর সংরক্ষণে নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে নিশ্চিত, তার পক্ষে গচ্ছিত রাখা মুস্তাহাব। গচ্ছিত সম্পদ নিরাপদ ও সুরক্ষিত স্থানে সংরক্ষণ করা রক্ষকের উপর ওয়াজিব। এর মালিক যখনই চাইবে তখনই তা ফেরত দেয়া কর্তব্য। আল্লাহ্ বলেন: 'তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করলে, যাকে বিশ্বাস করা হয়, সে যেন আমানত প্রত্যর্পণ করে এবং তার প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করে।' (সূরা বাকারা-২: আয়াত ২৮৩)।

ইতিপূর্বে এ হাদিসটিও উল্লেখ করা হয়েছে: 'যে ব্যক্তি তোমাকে বিশ্বাস করেছে, তার নিকট আমানত ফিরিয়ে দাও।'

ক্ষতিপূরণ: গচ্ছিত সম্পদের রক্ষক তার রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা না করে থাকলে কিংবা গচ্ছিত ধনের বিরুদ্ধে অপরাধ না করে থাকলে তার ক্ষয়ক্ষতি পূরণে দায়ী হবে না। ইতিপূর্বে দারু কুতনি বর্ণিত হাদিস এর প্রমাণ।

আর আমর ইবনে শূয়াইব বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'যে ব্যক্তি কোনো গচ্ছিত সম্পদ সংরক্ষণ করে, তার উপর কোনো ক্ষয়ক্ষতির দায় নেই।' (ইবনে মাজা)। বায়হাকি বর্ণিত অপর হাদিসে রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'আমানত রক্ষকের উপর কোনো ক্ষয়ক্ষতির দায় নেই।'

একটি থলি বা ব্যাগে রক্ষিত গচ্ছিত ধন থলি বা ব্যাগ ছিঁড়ে হারিয়ে যাওয়ার ঘটনায় আবু বকর রা. রায় দিয়েছিলেন যে, এর কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

উরওয়া ইবনে যুবায়ের আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমানের নিকট বনুমুসয়াবের কিছু সম্পদ গচ্ছিত রেখেছিলেন। আবু বকরের নিকট উক্ত সম্পদ পুরোপুরি বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হলো। তখন উরওয়া তাকে বার্তা পাঠালেন: 'তোমাকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তুমি তো কেবল আমানত রক্ষক।' আবু বকর বললেন: আমি জানতাম, আমার উপর ক্ষতিপূরণের দায় নেই, তবে তুমি কুরাইশকে জানতে দেবে না যে, আমার আমানত নষ্ট হয়েছে।' অত:পর তিনি কিছু জিনিস কিনে ফেরত দিলেন।

আমানত রক্ষকের বক্তব্য তার শপথ সহকারে গৃহীত হবে: আমানত রক্ষক যখন দাবি করবে, তার কাছে রাখা গচ্ছিত সম্পদ তার কোনো বাড়াবাড়ি ছাড়াই ধ্বংস হয়েছে তখন সে এই দাবি শপথ সহকারে করলে তা গৃহীত হবে। ইবনুল মুনযির এ মতের স্বপক্ষে তার পরিচিত ফকিহদের ইজমা দাবি করেছেন।

গচ্ছিত সম্পদ চুরি হওয়া দাবি করলে: ইবনে তাইমিয়ার 'ফাত্ওয়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে: 'যে ব্যক্তি দাবি করবে, সে তার নিজের সম্পদের সাথে একত্রে গচ্ছিত সম্পদ সংরক্ষণ করেছে এবং তার নিজের মাল ছাড়া শুধু গচ্ছিত সম্পদ চুরি হয়েছে তাকে চুরি হওয়া গচ্ছিত সম্পদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।'

উমর রা. আনাস রা. কে এমন একটি গচ্ছিত সম্পদের ক্ষতিপূরণ দিতে দায়ী করেছিলেন, যার সম্পর্কে আনাস রা. দাবি ছিলো যে, চুরি হয়েছে কিন্তু তার নিজের মাল চুরি হয়নি।

গচ্ছিত সম্পদ রক্ষকের মৃত্যু হলে: যে ব্যক্তি মারা যায় এবং প্রমাণিত হয় যে, তার কাছে অন্য একজনের সম্পদ গচ্ছিত ছিলো, কিন্তু তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছেনা, সে ঐ সম্পদের ঋণ হিসাবে দায়বদ্ধ থাকবে এবং তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে তা পরিশোধ করা হবে। আর যখন মৃত ব্যক্তির হস্তলিখিত স্বীকারোক্তি পাওয়া যাবে যে, তার নিকট কারো সম্পদ আমানত ছিলো, তখন তাকে দায়ী করা হবে। কেননা পরিচিত হস্তাক্ষরে লিখিত স্বীকারোক্তি মৌখিক স্বীকারোক্তির মতোই।

ছেচল্লিশতম অধ্যায়

জবর দখল

সংজ্ঞা: জবর দখল হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অন্যের সম্পদ বা অধিকার জোর পূর্বক ও শক্তি প্রয়োগে হস্তগত করা ও দখল করা। (কারো মাল তার রক্ষণাবেক্ষণের স্থান থেকে গোপনে নেয়া হলে তাকে বলা হয় চুরি। ঔদ্ধত্য সহকারে নিলে তা হয় লুণ্ঠন, প্রভাব বিস্তার করে নিলে তা হয় আত্মসাৎ, আর নিজের কাছে আমানত হিসাবে রক্ষিত জিনিস এরূপ করলে তাকে বলা হয় খেয়ানত।)

আল্লাহ্ সূরা কাহ্ফের ৭৯ নং আয়াতে বলেন:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝

'নৌকাটির ব্যাপার হলো, ওটা ছিলো কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করতো। আমি ইচ্ছা করলাম, নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে। কারণ তাদের সম্মুখে ছিলো এক রাজা, যে বলপ্রয়োগে সকল নৌকা ছিনিয়ে নিতো।' (অর্থাৎ ভালো নৌকা ছিনিয়ে নিতো।)

জবর দখল সম্পর্কে শরিয়তের বিধি: এটা হারাম এবং এ ধরনের কাজ যে করে সে গুনাহ্গার। আল্লাহ্ বলেন:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۝ 'তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা।' (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৮)।

১. বুখারি ও মুসলিম বর্ণিত বিদায় হজ্জের ভাষণে রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'তোমাদের পরস্পরের রক্ত, সহায়-সম্পদ, ও মান-সম্মান তোমাদের উপর হারাম আজকের এই দিনে আজকের এই মাসেও তোমাদের এই নগরীতে যেমন হারাম।'

২. বুখারি ও মুসলিম আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করেনা। মদখোর যখন মদ পান করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় মদ পান করেনা। চোর যখন চুরি করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় চুরি করেনা। কোনো লুটেরা যখন লুণ্ঠন করে এবং লোকেরা তার দিকে চোখ মেলে তাকায়, তখন সে মুমিন অবস্থায় লুণ্ঠন করেনা।'

৩. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ সুত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'তোমাদের কেউ যেন কোনোক্রমেই তার ভাইয়ের সম্পদ খেলাচ্ছলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে অপহরণ না করে। তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের লাঠি নিয়ে থাকলে সে যেন তা তাকে ফেরত দিয়ে দেয়।' (আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিযি)।

৪. দারুকুতনিতে আনাস রা. সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'কোনো মুসলমানের সম্পদ সে খুশী মনে না দিলে হালাল হয়না।'

৫. রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্পদ অপহরণ করবে, আল্লাহ তার উপর দোযখ অবধারিত ও বেহেশত হারাম করবেন। এক ব্যক্তি বললো: হে রসূলাল্লাহ্! নগণ্য জিনিস হলেও? তিনি বললেন: এমনকি আরাক গাছের একটা ডালও যদি হয়।'

৬. বুখারি ও মুসলিম আয়েশা রা. সুত্রে বর্ণনা করেন, রসূল সা. বলেন ; যে ব্যক্তি কারো এক বিঘত জমি জবর দখল করবে, আল্লাহ সাতটি পৃথিবী তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন।'

জবর দখলকৃত ভূমিতে নির্মাণ কিংবা চাষাবাদ: জবর দখলকৃত ভূমিতে চাষাবাদ করলে ফসল ভূমির মালিকের প্রাপ্য, আর জবর দখলকারী পাবে শুধু চাষাবাদের খরচ। এ ব্যবস্থা কেবল তখন প্রযোজ্য, যখন ফসল কাটা হয়নি। ফসল কাটা হয়ে গেলে ভূমির মালিক শুধু ভূমির ভাড়া পাবে। আর যদি গাছের চারা রোপণ করা হয় তবে চারা উপড়ে ফেলতে হবে এবং নির্মাণের কাজ করা হয়ে থাকলে তা ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

রাফে ইবনে খাদীজ রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'যে ব্যক্তি অন্য কারো জমিতে তার বিনা অনুমতিতে চাষাবাদ করে, তার ঐ জমির ফসল কিছু প্রাপ্য নেই। তবে তার যা খরচ হয়েছে, তা তার পাওয়ার অধিকার রয়েছে।' –আবু দাউদ, ইবনে মাজা, তিরমিযি ও আহমদ। (ইমাম আহ্মদ বলেন: যুক্তির বিরুদ্ধে হলেও আমি শুধু হাদিসের অনুসরণে এই মত অবলম্বন করি।) আবু দাউদ ও দারু কুতনি উরওয়া ইবনে যুবায়ের রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: যে ব্যক্তি কোনো পতিত জমি আবাদ করবে, সে জমি তার হবে। তবে কোনো জবরদখলকারী তার ঘাম ঝরানোর জন্য কোনো অধিকার পাবে না।'

বর্ণনাকারী বলেন: যে ব্যক্তি আমাকে এ হাদিস শুনিয়েছে, সে জানিয়েছে যে, দুই ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা. এর কাছে তাদের বিবাদ মীমাংসার জন্য উপস্থিত হয়। তাদের একজন অপর জনের জমিতে খেজুরের গাছ লাগিয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ সা. জমির মালিককে তার জমি বুঝিয়ে দিলেন এবং খেজুর গাছওয়ালাকে তার গাছ উপড়ে ফেলার আদেশ দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন: 'আমি দেখলাম, গাছটির শেকড়ে কুড়াল দিয়ে আঘাত করা হচ্ছে এবং তা ছিলো লম্বা খেজুর গাছ।'

জবর দখলকৃত বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া নিষিদ্ধ: যেহেতু জবর দখল হারাম, তাই জবর দখলকৃত বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাম, চাই যেভাবেই ব্যবহার করা হোক না কেন। বস্তুটি থেকে আরো কিছু যদি উৎপন্ন হয়ে থাকে, তবে উৎপন্ন বস্তু তার সাথে যুক্ত থাক বা বিচ্ছিন্ন থাক, তা ফেরত দেয়া বাধ্যতামূলক। সামুরা বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'যে হাত কারো জিনিস অপহরণ করেছে, তা ফেরত না দেয়া পর্যন্ত দায়বদ্ধ থাকবে।' –আহমদ, আবু দাউদ, হাকেম ও ইবনে মাজা। নতুন উৎপন্ন বস্তুটি যদি জবরদখলকারীর চেষ্টার ফল হয়ে থাকে তবে কোনো কোনো আলিম সেটিকে জবরদখলকারী ও মালিকের মধ্যে মুদারাবার নিয়মে বন্টন করার পক্ষে। জবরদখলকৃত জিনিস যদি ধ্বংস হয়ে যায় তবে তার সমমূল্যের জিনিস বা মূল্য মালিককে ফেরত দেয়া জবরদখলকারীর উপর ওয়াজিব, চাই তার কাজ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ধ্বংস হোক। মালেকি মযহাব মতে, অস্থাবর সম্পত্তি ও জীবজন্তু প্রভৃতি, যা ওজন বা মাপ করা হয় না, তা জবরদখল করার পর ধ্বংস হয়ে গেলে তার মূল্য ফেরত দেয়া ওয়াজিব। হানাফি ও শাফেয়ি মযহাব অনুসারে যে ব্যক্তি তা নষ্ট করবে বা ভোগ করবে, তার উপর সমমূল্যের জিনিস ফেরত দেয়া বাধ্যতামূলক। যখন সমমূল্যের জিনিস পাওয়া যাবে না কেবল তখনই এর ব্যতিক্রম করা যাবে। ফকিহ্গণ একমত যে, ওজন করা হয় বা মাপা হয় এমন জিনিস জবরদখল করা হলে এবং তারপর তা নষ্ট হলে তার সমমূল্যের জিনিস প্রাপ্তি সাপেক্ষে সমমূল্যের জিনিস ফেরত দিতে হবে। কেননা আল্লাহ্ সূরা বাকারার ১৯৪ নং আয়াতে বলেন: فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ○

'সুতরাং যে কেউ তোমাদের উপর আক্রমণ করলে, তোমরাও তার উপর অনুরূপ আক্রমণ করবে।'

জবরদখলকৃত জিনিস ফেরত দেয়ার ব্যয়ভার ও শ্রম যতই হোক, তা জবরদখল কারীকেই বহন করতে হবে। আর জবরদখলকৃত বস্তু যদি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় তবে যতো টুকু হ্রাস পেয়েছে ততোটুকু মূল্যে ফেরত দিতে হবে, চাই বস্তুটি আকৃতিতে হ্রাস পাক বা গুণবৈশিষ্টে।

সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ: যখন কারো সম্পদ অন্য কেউ লুণ্ঠন করতে সচেষ্ট হয়, তখন তার সেই চেষ্টা প্রতিহত করা ওয়াজিব। অপেক্ষাকৃত মৃদু পন্থায় প্রতিহত করতে হবে। কিন্তু তাতে কাজ নাহলে কঠোরতর পন্থায় প্রতিহত করতে হবে, তাতে যদি মারামারি ও খুনাখুনি পর্যন্ত গড়ায় তবুও। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহিদ। যে ব্যক্তি নিজের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজের ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।' (বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি)।

যে ব্যক্তি তার সম্পদ অন্যের কাছে পাবে, সে তার অধিকতর হকদার: যার সম্পদ

জবরদখল হয়েছে, সে যদি তার সম্পদ অন্য কারো কাছে পায় তবে সে-ই ঐ সম্পদের সর্বাপেক্ষা হকদার, যদিও জবরদখলকারী তার কাছে বিক্রয় করে থাকে। কেননা জবরদখলকারী যখন বিক্রয় করেছে, তখন সে ঐ সম্পদের মালিক ছিল না। কাজেই এই বিক্রয় শুদ্ধ ছিলনা। এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতা জবরদখলকারীর কাছ থেকে তার দেয়া মূল্য ফেরত আনতে পারবে। আবু দাউদ ও নাসায়ি সামুরা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'যে ব্যক্তি তার হুবহু সম্পদ অন্যের কাছে পাবে, সে ঐ সম্পদের সবচেয়ে বেশি হকদার। আর ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত আনবে।'

পাখির খাঁচার দরজা খুলে দেয়া: যে ব্যক্তি এমন কোনো খাঁচার দরজা খুলে দেয় যার ভেতরে পাখি রয়েছে এবং তাকে তাড়িয়ে দেয়, সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। তবে দরজা খোলার পর পাখি নিজ থেকে উড়ে গেলে কী হবে সে সম্পর্কে ফকিহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অনুরূপ পশুর বাঁধন খুলে দেয়ায় সে পালালে সে ক্ষেত্রেও এই মতভেদ প্রযোজ্য। ইমাম আবু হানিফা বলেন, কোনো অবস্থায়ই ক্ষতিপূরণ দেয়া লাগবে না। ইমাম মালেক ও আহমদের মতে দেয়া লাগবে, চাই ভেতরকার পশু বা পাখি তৎক্ষণাৎ বের হোক বা পরে। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ির দুটি মত বর্ণিত। প্রথমটি পুরানো মত। সেটি হলো ক্ষতিপূরণ দেয়া লাগবে না। দ্বিতীয় মতটি নতুন। সেটি হলো সংগে সংগে পালালে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, বিলম্বে পালালে দিতে হবে না।

সাতচল্লিশতম অধ্যায়

লাওয়ারিশ শিশু

সংজ্ঞা ও বিধান: অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু, যাকে রাস্তায় পাওয়া যায়, অথবা যে পথ হারিয়ে ফেলেছে এবং যার বংশ পরিচয় অজ্ঞাত, তাকে লাওয়ারিশ শিশু বলা হয়।

অরক্ষিত অন্য যে কোনো জিনিসের ন্যায় এই শিশুকেও কুড়িয়ে নেয়া ফরযে কেফায়া। কেননা কুড়িয়ে না নিলে সে বিপথগামী বা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। মুসলিম দেশে পাওয়া গেলে এ ধরনের শিশুকে মুসলমান গণ্য করতে হবে।

লাওয়ারিশ শিশুর জন্য কে বেশি যোগ্য?: যে ব্যক্তি তাকে কুড়িয়ে পায়, তার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সে-ই অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি। তবে শর্ত হলো, তাকে স্বাধীন, ভারসাম্যপূর্ণ, বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি হতে হবে এবং তাকে এই শিশুর লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। সাঈদ ইবনে মানসুর তাঁর সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেন, সানীন ইবনে জামিলা বলেন: আমি একটা শিশুকে কুড়িয়ে পেলাম এবং তাকে নিয়ে উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর নিকট গেলাম। তখন শিশুটি বললো: হে আমীরুল মুমিনীন, এই ব্যক্তি যিনি আমাকে আপনার সাথে পরিচিত করতে এনেছেন, তিনি একজন সৎ লোক। উমর রা. বললেন: 'সত্যই তাই?' সে বললো: হ্যাঁ। তখন উমর রা. আমাকে বললেন: 'তুমি ওকে নিয়ে যাও। সে স্বাধীন এবং এর অভিভাবকত্ব ও লালন-পালনের ভার তোমার উপর। আর আমরা ওর খরচ বহন করবো।' এ ধরনের শিশু যদি কোনো অসৎ লোকের কবলে পড়ে তবে তাকে তার কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হবে এবং শাসক তার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

ভরণপোষণ: লাওয়ারিশ শিশুর সাথে যদি কোনো অর্থ-সম্পদ থাকে তবে তা তার পেছনে ব্যয় করা হবে। অন্যথায় তার ব্যয়ভার বাইতুল মাল থেকে বহন করা হবে। কেননা বাইতুলমাল মুসলমানদের প্রয়োজন পূরণার্থেই তৈরি হয়েছে। বাইতুলমাল থেকে যদি সংকুলান না হয় তবে শিশুটির অবস্থা জানে এমন যে কোনো ব্যক্তি তার ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করা কর্তব্য। কেননা এভাবেই তাকে ধ্বংসের হাত

থেকে রক্ষা করা সম্ভব। এ ধরনের দায়িত্ব গ্রহণকারীকে যদি বিচারক ভরণ-পোষণের দায় গ্রহণের অনুমতি দেয়, তাহলেই শুধু সে বাইতুলমালের নিকট তার ব্যয় নির্বাহের জন্য আবেদন জানাতে পারে। বিচারক যদি অনুমতি না দেয় তবে শিশুর পেছনে তার ব্যয় দান হিসেবে গণ্য হবে।

লাওয়ারিশ শিশুর উত্তরাধিকার: লাওয়ারিশ শিশু যদি মারা যায় এবং কিছু সম্পত্তি রেখে যায়, অথচ কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে, তবে বাইতুল মালই হবে তার উত্তরাধিকারী। অনুরূপ সে যদি হত্যা করে তবে তার দায়ও বাইতুলমালের উপর বর্তাবে। যে ব্যক্তি তাকে কুড়িয়ে পেয়েছে, সে শিশুটির উত্তরাধিকারী হবে না।

লাওয়ারিশ শিশুর বংশ পরিচয় দাবি: কোনো পুরুষ বা মহিলা যদি লাওয়ারিশ শিশুর বংশ পরিচয় দাবি করে তবে সেই পরিচয় যদি তার সাথে সম্ভব বিবেচিত হয় তবে তার সাথে তার বংশ পরিচয় যুক্ত করা হবে। কেননা এতে কারো ক্ষতি সাধন ছাড়াই শিশুর স্বার্থ রক্ষিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বংশ পরিচয়ের দাবিদারের সাথে তার বংশ পরিচয় নির্ধারিত হবে এবং সে তার উত্তরাধিকারীও হবে। এ ধরনের দাবিদার যদি একাধিক হয় তবে সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা যে ব্যক্তি তার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে তার সাথেই তার বংশ পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হবে। তাদের কারোই যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে অথবা প্রত্যেকে সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে আসে, তবে কোনো ন্যায়নিষ্ঠ, অভিজ্ঞ, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের অভিমতে তার বংশ পরিচয় নির্ণয় করা হবে।

আয়েশা রা. সূত্রে বর্ণিত: আলি রা. অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে রসূলুল্লাহ্ সা. -এর নিকট এসে বললেন: মুজাযযাজ আল-মুদলিজী এই মাত্র যায়দ ও উসামার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছে। তারা উভয়ে নিজেদের মাথা ঢেকে ও পা খুলে রেখেছিল। মুজাযযাজ বললো: এই দু'জনের পা আপন জনের পা।' (বুখারি ও মুসলিম) বিশেষজ্ঞ দ্বারাও যদি এ সমস্যার সমাধান না হয় তবে লটারি করা হবে। লটারিতে যার নাম উঠবে, শিশুটি তার হবে।

হানাফি মযহাব মতে বিশেষজ্ঞ দ্বারাও পরিচয় নির্ধারণ করা হবে না, লটারি দ্বারাও নয়। বরং যখন একাধিক ব্যক্তি কোনো শিশুকে সন্তান দাবি করে এবং তারা সবাই সর্বদিক দিয়ে সমান সাব্যস্ত হয়, তখন তারা সবাই তার উত্তরাধিকারী হবে এবং সেও তাদের সকলের উত্তরাধিকারী হবে।

আটচল্লিশতম অধ্যায়

লা-ওয়ারিশ সম্পদ বা পতিত সম্পদ

সংজ্ঞা: এমন যে কোনো সম্পদকে লাওয়ারিশ সম্পদ বলা হয়, যা সম্পূর্ণ নির্দোষ, কিন্তু যার ধ্বংস হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে এবং যার মালিক কে তা অজ্ঞাত। প্রধানত: অপ্রাণী বস্তু জাতীয় সম্পদকেই এ নামে আখ্যায়িত করা হয়। প্রাণী জাতীয় হলে তাকে বলা হয় হারানো।

বিধান: লাওয়ারিশ সম্পদ কুড়িয়ে নেয়া মুস্তাহাব। কেউ কেউ বলেন, ওয়াজিব। আবার অন্যেরা বলেন: জিনিসটা যদি এমন জায়গায় থাকে, যেখানে রেখে দিলেও নিরাপদ থাকবে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়, তবে তা কুড়িয়ে নেয়া মুস্তাহাব, আর যদি নিরাপদ থাকবে বলে নিশ্চিত হওয়া না যায় তবে কুড়িয়ে নেয়া ওয়াজিব। আর যে ব্যক্তি লাওয়ারিশ জিনিসটি দেখে সে যদি বুঝতে পারে যে, বাড়ি নিয়ে গেলে সে নিজেই তার লোভে পড়ে যাবে, তবে তার জন্য কুড়িয়ে নেয়া হারাম। এই মতভেদ সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্ক, চাই মুসলমান হোক বা অমুসলিম। সে যদি স্বাধীন, প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্ক না হয়, তবে সে লাওয়ারিশ সম্পদ কুড়িয়ে নিতে বাধ্য নয়। যায়দ ইবনে খালিদ রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিস এ সংক্রান্ত মূলনীতি নির্দেশক। তিনি বলেন: এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট এসে লাওয়ারিশ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন: 'যে পাত্রে জিনিসটি ছিলো এবং যে রশি দিয়ে তা বাঁধা ছিলো, সেই দুটোই সংরক্ষণ কর। তারপর এক বছর ধরে ওটির প্রাপ্তি সংবাদ প্রচার করতে থাক। জিনিসটির মালিক যদি এসে পড়ে তবে দিয়ে দেবে। নচেৎ ওটা তুমি ব্যবহার করবে। (পাত্র ও রশি সংরক্ষণের উদ্দেশ্য হলো, ওটা যেন কুড়িয়ে নেয়া লোকটির মালামালের সাথে মিশে না যায় এবং আলাদা থাকে। তা ছাড়া মালিক এলে তার কাছে জিনিসটির আলামতসমূহ জিজ্ঞাসা করে তার দাবি সত্য না মিথ্যা তা যেন যাচাই করা যায়।) লোকটি বললো: হারিয়ে যাওয়া ছাগল বা ভেড়া হলে? রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: ওটা তোমার, নতুবা তোমার ভাই এর (অর্থাৎ তার মালিকের বা অন্য কোনো কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তির) অথবা হিংস্র প্রাণীর। লোকটি বললো: যদি হারিয়ে যাওয়া বস্তুটি উট হয়? রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: তাকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও। তার সাথে পানির ভান্ডার রয়েছে, তার পায়ে মোজা রয়েছে, সে পানি পান করবে, গাছ খাবে, অত:পর এক সময় তার মালিকের সাক্ষাৎ পাবে।' (বুখারি)।

হারাম শরীফের লাওয়ারিশ সম্পদ: এতক্ষণ যা কিছু বলা হলো, তা হারাম শরীফ ব্যতীত অন্যান্য স্থানে পাওয়া লাওয়ারিশ জিনিস সংক্রান্ত। হারাম শরীফের লাওয়ারিশ সম্পদ শুধু মাত্র প্রচারের জন্য কুড়ানো জায়েয আছে। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন ; 'মক্কার লাওয়ারিশ সম্পদ শুধু সেই ব্যক্তি কুড়াতে পারবে, যে তার কথা প্রচার করবে।' (লাওয়ারিশ সম্পদ যেখানে পাওয়া যায় সেখানে যদি এমন বিশ্বস্ত সরকার থাকে, যার ভেতরে তার রক্ষণাবেক্ষণের সুপ্রসিদ্ধ স্থান ও ব্যবস্থা রয়েছে, তবে সেই সরকারের নিকট ওটা সমর্পণ করা জায়েয। কেননা ওটাই জনগণের পক্ষে সহজতর ও নিরাপদতর ব্যবস্থা।)

লাওয়ারিশ সম্পদের প্রচার: যে ব্যক্তি লাওয়ারিশ সম্পদ কুড়িয়ে নেবে, তার জন্য উক্ত সম্পদের সেই সব আলামত অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে অবহিত হওয়া কর্তব্য, যা দ্বারা তাকে অন্যান্য জিনিস থেকে বেছে পৃথক করা যায়। যেমন তা কী পাত্রে রক্ষিত ছিলো এবং কী দিয়ে বাঁধা ছিলো। অনুরূপ তার শ্রেণী, জাতীয়তা ও পরিমাণও সুনির্দিষ্টভাবে জেনে নেয়া কর্তব্য। অত:পর তাকে তার নিজের মালামালের মতই সংরক্ষণ করতে হবে, চাই তা যতই মূল্যবান বা নগণ্য জিনিস হোক। জিনিসটি যে ব্যক্তি কুড়িয়েছে তার কাছে আমানত স্বরূপ থাকবে। নিজের বাড়াবাড়ির কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে তা ধ্বংস হলে সে তার জন্য দায়ী হবে না। তাকে সমগ্র ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায়, বাজারে ও যেখানে যেখানে তার মালিকের থাকার সম্ভাবনা আছে, সর্বত্র জিনিসটি সম্পর্কে প্রচার চালাতে হবে। মালিক যদি আসে এবং তার সঠিক আলামতগুলো বলে, যা দ্বারা তাকে অন্যান্য জিনিস থেকে পৃথক করা যায়, তবে সাক্ষ্য প্রমাণ না দেখালেও তাকে জিনিসটি দেয়া যাবে। আর যদি মালিক না আসে তবে এক বছর পর্যন্ত প্রচারণা চালাতে হবে। এক বছরেও যদি মালিকের খোঁজ না পাওয়া যায় তবে তা সদকা করে দেয়া বা নিজে ব্যবহার করা জায়েয হবে, চাই সে ধনী হোক বা দরিদ্র হোক। সে জিনিসটির জন্য দায়ী হবে না। কেননা ইমাম বুখারি

ও তিরমিযি সুয়াইদ ইবনে গাফলা থেকে বর্ণনা করেন, সুয়াইদ বলেন: আমি আওস ইবনে কাবেরের সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি বললেন: আমি একশো দিনার ভর্তি একটা থলি পেয়ে রসূলুল্লাহ্ সা. এর কাছে গেলাম। তিনি বলেন: থলিটি সম্পর্কে এক বছর ঘোষণা দিতে থাক। আমি এক বছর ব্যাপী প্রচার চালাতে লাগলাম, কিন্তু মালিককে পেলাম না। অত:পর তৃতীয়বার রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট গেলাম। তখন তিনি বললেন: জিনিসটির পাত্র ও রশি সংরক্ষণ কর। অত:পর মালিক এলে তাকে দিও, নচেৎ নিজেই ব্যবহার কর।'

ঘনবসতিতে পাওয়া লাওয়ারিশ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: এক বছর ধরে জিনিসটির প্রচার চালাও। তারপর যদি তার অন্বেষণকারী পাও তবে তাকে দিয়ে দেবে। নচেৎ ওটা তোমার। জিজ্ঞাসাকারী বললো: বিরান স্থানে যা পাওয়া যায়? তিনি বললেন: বিরান স্থানে পাওয়া জিনিসে ও মাটির নীচে প্রোথিত মূল্যবান জিনিসে এক পঞ্চমাংশ।'

খাবার জিনিস ও নগণ্য জিনিসের ব্যতিক্রম: উপরে যা কিছু বলা হলো, তা শুদ্ধ খাবার ও নগণ্য জিনিস বাদে অন্যান্য জিনিস সংক্রান্ত। খাবার জিনিস নিয়ে প্রচারের প্রয়োজন নেই। তা খাওয়া জায়েয। আনাস রা. থেকে বর্ণিত: রসূল সা. রাস্তায় কিছু ফলমূলের মধ্য দিয়ে যাত্রাকালে বললেন: এই ফলগুলো সদকার হতে পারে এই আশংকা যদি না থাকতো, তবে আমি এই ফল খেতাম।' (বুখারি, মুসলিম)।

অনুরূপ কোনো নগণ্য জিনিস হলে তা নিয়েও এক বছর প্রচার চালানোর প্রয়োজন নেই, বরং এতটা সময় প্রচার চালানো যথেষ্ট, যার পরে মালিক আর দাবি করবে না বলে ধারণা জন্মে। মালিকের খোঁজ না পাওয়া গেলে যে ব্যক্তি কুড়িয়ে নিয়েছে, তার জন্য জিনিসটি ব্যবহার করা জায়েয। জাবির রা. বলেন: 'লাঠি, চাবুক, রশি ও এ জাতীয় জিনিস কুড়িয়ে পেলে তা ব্যবহার করতে রসূলুল্লাহ্ সা. আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন।' (আহমদ, আবুদাউদ)।

আলি রা. বলেন: তিনি রাস্তায় পাওয়া এক দিনার নিয়ে রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট গেলে তিনি বললেন: এটি সম্পর্কে তিন দিন প্রচার চালাও। তিনি তিন দিন প্রচার চালালেন, কিন্তু কেউ এলোনা। তখন রসূল সা. বললেন: 'এখন তুমি ওটা খাও।' (আব্দুর রাজ্জাক)।

হারানো ছাগল-ভেড়া: হারানো ছাগল-ভেড়া নেয়া জায়েয। কেননা এটা দুর্বল প্রাণী, ধ্বংসের ঝুঁকি প্রবণ এবং হিংস্র প্রাণীর আক্রমণের শিকার হতে পারে। তবে এ সম্পর্কে প্রচার চালাতে হবে। মালিক যদি দাবি নিয়ে না আসে, তবে কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তি তা নিতে পারে। অবশ্য মালিককে এজন্য জরিমানা দিতে হবে। মালেকি মযহাব মতে, যে কুড়িয়ে পাবে, সে দখলে নেয়া মাত্রই তার মালিক হবে, মালিক এলেও কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। অবশ্য এটা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে মালিক প্রাণীটি খাওয়ার পরে দাবি নিয়ে আসে। খাওয়ার আগে এলে সর্বসম্মত ভাবে ফেরত দিতে হবে।

হারানো উট, গরু, ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর: আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, হারানো উট কুড়িয়ে নেয়া জায়েয নেই। ইতিপূর্বে যায়েদ ইবনে খালিদ বর্ণিত হাদিস এর প্রমাণ। কেননা হারানো উট তার কুড়িয়ে পাওয়া লোকের তদারকির মুখাপেক্ষী নয়। পিপাসা সহ্য করা তার স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার। আর তার ঘাড় লম্বা হওয়ার কারণে সহজেই গাছ থেকে পাতা খেতে সক্ষম। কাজেই তার কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া তার মালিকের পক্ষে তাকে খুঁজে পাওয়া সহজ। উসমান রা. এর আমল পর্যন্ত এই নিয়মই চালু ছিলো। উসমান রা. যখন দেখলেন, হারানো উট কুড়ানো ও বিক্রয় চলছে, তখন মালিক এলে উটের মূল্য নিয়ে নিত।

ইবনে শিহাব যুহরি বলেন: উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর আমলে হারানো উট ব্যাপক সংখ্যায় থাকতো এবং তা দিয়ে ক্রীড়া-কৌতুক করা হতো। উসমান রা. এর আমলে এগুলো নিয়ে প্রচার করার আদেশ দেয়া হতো। প্রচারের পর বিক্রয় করা হতো। মালিক এলে তাকে তার মূল্য দেয়া হতো। (মুয়াত্তা-ই ইমাম মালিক)।

উসমান রা. এরপর আলি রা. এগুলোর জন্য একটা ঘর নির্মাণের নির্দেশ দিন এবং সেখানে তাকে

সংরক্ষণ করা ও এমনভাবে ঘাস খাওয়ানোর আদেশ দিন যেন বেশি মোটা না হয়, কৃশও না হয়। তারপর কেউ সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে নিজের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তাকে দেয়া হতো। নচেৎ যেমন ছিলো তেমন থাকতো। বিক্রয় করা হতো না। ইবনুল মুসাইয়াব এই পন্থাই পছন্দ করতেন। গরু, ঘোড়া, গাধা ও খচ্চরের বিধান ইমাম শাফেয়ি ও আহ্মদের নিকট উটের মতো। (তবে ইমাম শাফেয়ি অল্পবয়স্ক গুলো কুড়িয়ে নেয়া জায়েয মনে করতেন।) ইমাম আবু হানিফা বলেন: এগুলো কুড়ানো জায়েয। ইমাম মালেক বলেন: এগুলোর উপর হিংস্র প্রাণীর হামলার ভয় থাকলে কুড়ানো জায়েয, নতুবা জায়েয নেই।

হারানো প্রাণীর ব্যয়: হারানো প্রাণী কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তি তার জন্য যা কিছু ব্যয় করবে, তা তার মালিকের কাছ থেকে আদায় করতে পারবে। তবে সে যদি তার দুধ দোহন ও পিঠে আরোহণ করার বিনিময়ে ব্যয় করে তবে তা আদায় করতে পারবে না।

উনপঞ্চাশতম অধ্যায়

খাদ্য দ্রব্যে হালাল ও হারাম

খাদ্যের সংজ্ঞা:

মানুষ যা খায় এবং যা দ্বারা জীবন ধারণ ও পুষ্টি অর্জন করে, তাকেই খাদ্য বলা হয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন: قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ .....

'বলুন, আমার কাছে যে ওহি প্রেরণ করা হয়েছে, তাতে আমি কোনো হারাম খাদ্য পাইনা কোনো ভক্ষণকারীর জন্য যা সে ভক্ষণ করে......।' (সূরা আনয়াম, ১৪৫)।

একমাত্র সে খাদ্যই হালাল, যা পবিত্র এবং যার প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। আল্লাহ্ বলেন:

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ؕ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ .....

'লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কী কী জিনিস তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে? আপনি বলুন, তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে পবিত্র জিনিসসমূহ.....।' (সূরা মায়েদা, আয়াত ৪)।

এখানে পবিত্র বস্তু দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে জিনিসের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। যেমন সূরা আরাফের ১৫৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ

'যিনি হালাল করেন তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু এবং হারাম করেন অপবিত্র বস্তু..।'

এক ধরনের খাদ্য আছে যা জড় জাতীয় আর এক ধরনের খাদ্য আছে প্রাণী জাতীয়। জড় জাতীয় খাদ্যের মধ্যে যা অপবিত্র, অপবিত্র জিনিস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অপবিত্র, ক্ষতিকারক, মাদক ও অন্যের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট, তা ছাড়া আর সবই হালাল। অপবিত্র জিনিসের উদাহরণ হলো রক্ত। আর অপবিত্র জিনিস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। অপবিত্র হওয়া জিনিসের উদাহরণ হলো, যে ঘিতে ইঁদুর পড়েছে। কেননা ইমাম বুখারি মাইমুনা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে ঘিতে ইঁদুর পড়েছে, তার বিধান কী? তিনি বললেন: ইঁদুরটি ফেলে দাও এবং তার চার পাশের ঘিও ফেলে দাও, তারপর তোমাদের ঘি খাও।'

এ হাদিস থেকে জানা গেল যে, জড় জাতীয় খাদ্যে যদি মৃত প্রাণী পড়ে তবে তা ফেলে দিতে হবে এবং তার পার্শ্ববর্তী জিনিসও ফেলে দিতে হবে। আর যেটুকু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, উক্ত মৃত প্রাণীর কোনো অংশ তাতে পৌঁছেনি, সেটুকু পবিত্র। আর তরল পদার্থ অপবিত্র পদার্থের সংস্পর্শে আসা মাত্রই অপবিত্র হয়ে যায়।

ক্ষতিকর খাদ্যের উদাহরণ বিষ প্রভৃতি। বিচ্ছু, মৌমাছি ও বিষধর সাপ থেকে নির্গত বিষ এবং বিষাক্ত তরুলতা ও আর্সেনিক। কেননা আল্লাহ্ বলেন: وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ○
'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করোনা। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণাময়।' –নিসা, ২৯।

তিনি আরো বলেন: – وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ 'তোমরা নিজের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।' (সূরা বাকারা, ১৯৫)।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: যে ব্যক্তি কোনো পাহাড়ের উপর থেকে পড়ে নিজেকে হত্যা করে, সে অনন্তকাল ধরে উপর থেকে জাহান্নামের আগুনে পড়তে থাকবে।'

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'যে ব্যক্তি বিষ পান দ্বারা নিজেকে হত্যা করে, সে জাহান্নামে অনন্তকাল ধরে সেই বিষ হাতে নিয়ে পান করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কোনো লোহার অস্ত্র দিয়ে নিজেকে কুপিয়ে হত্যা করে সে সেই অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে অনন্তকাল ধরে নিজেকে হত্যা করতে থাকবে।'

তবে বিষের যে পরিমাণ ক্ষতি করে, সেই পরিমাণই হারাম। বিষ ছাড়া অন্য যে সব জিনিস যাদের জন্য ক্ষতিকর, যেমন মাটি, কাঁদা, পাথর, কয়লা, সে সব জিনিস যাদের জন্য ক্ষতিকর তাদের জন্য হারাম। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেন: 'ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াও নিষিদ্ধ, ক্ষতিগ্রস্ত করাও নিষিদ্ধ।' –আহমদ, ইবনে মাজা। ধূমপান এবং মাদক দ্রব্য সেবনও এই হাদিসের আলোকে নিষিদ্ধ। আর অন্যের হকের সাথে যা কিছু সংশ্লিষ্ট, যেমন চোরাই মাল ও জবরদখলকৃত মাল, তার সবই হারাম। আর জলজ প্রাণী, অর্থাৎ যে সকল প্রাণী পানিতে বাস করে, তার সবই হালাল। আর স্থলজ প্রাণী, চাই তা পশু হোক বা পাখি তন্মধ্যে কতক হালাল ও কতক হারাম। ইসলাম এর বিশদ বিবরণ দিয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ 'আল্লাহ্ তোমাদের উপর যা কিছু হারাম করেছেন, তা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে তোমরা নিরুপায় হলে তা স্বতন্ত্র'। (সূরা আনয়াম: ১১৯)

এ বিশদ বর্ণনায় তিন ধরনের জিনিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: প্রথমত হারাম জিনিসের বর্ণনা।

দ্বিতীয়ত মুবাহ জিনিসের বর্ণনা। তৃতীয়ত যে সকল জিনিস সম্পর্কে ইসলাম মৌনতা অবলম্বন করেছে, তার বর্ণনা।

মুবাহ্: যে সকল জিনিসকে মুবাহ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

জলজ প্রাণী: একমাত্র ক্ষতিকর বিষ বহনকারী ব্যতীত সমস্ত জলজ প্রাণী হালাল, চাই তা মাছ হোক বা অন্য কিছু শিকার করা হোক বা মৃত অবস্থায় পাওয়া যাক, কোনো মুসলমান, ইহুদি খ্রিষ্টান বা পৌত্তলিকের হাতে শিকার করা প্রাণী এবং স্থলচর প্রাণীসমূহের মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ কোনো প্রাণী থাক বা না থাক।

জলজ প্রাণী জবাই করার প্রয়োজন নেই। এর প্রমাণ সূরা মায়িদার ৯৬ নং আয়াত:

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ –

'তোমাদের ও মুসাফিরদের ভোগের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য হালাল করা হয়েছে।'

ইবনে আব্বাস রা. বলেন: সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য বলতে বুঝায় সমুদ্র যা কিছু তীরে নিক্ষেপ করে। –দারু কুতনি।

ইব্নে আব্বাস রা. থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে: সমুদ্রের খাদ্যের অর্থ মৃত সামুদ্রিক প্রাণী। কারণ আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলো: হে আল্লাহ্র রসূল, আমরা সমুদ্রে চলাফেরা করি, আমরা সামান্য কিছু পানি সাথে রাখি। তা দিয়ে যদি ওযু করি তবে আমাদের পিপাসায় কষ্ট পেতে হয়। তবে কি আমরা সমুদ্রের পানি দিয়ে ওযু করবো? রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণী হালাল। পাঁচটি সহিহ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত। তিরমিযি এটিকে হাসান ও সহিহ এবং বুখারি সহিহ বলেছেন।

নোনা মাছ: মাছ যাতে দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকে, সে জন্য মাছকে প্রায়ই লবণ যুক্ত করে রাখা হয়। একে নোনা মাছ বলা হয়। সব রকমের নোনা মাছই হালাল, যতক্ষণ তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না হয়। স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হলে হারাম। বিশিষ্ট মালিকি ফকিহ্‌ দারদেরি রাহ. বলেন: 'আমি আল্লাহ্‌র যে বিধির আনুগত্য করি তা হলো, নোনা মাছ হালাল। কেননা মৃত্যুর পূর্বে তাকে নোনা করা হয় না। আর প্রবাহমান রক্ত কেবল প্রবাহিত হওয়ার পরই অপবিত্র, তার আগে নয়। মাছের মৃত্যুর পর যদি তাতে রক্ত পাওয়া যায় তবে তা শরিয়তসম্মত পন্থায় জবাই করার পর ধমনীতে অবশিষ্ট থাকা রক্তের মত। জবাইর পর তা থেকে যে আর্দ্র পদার্থ বের হয়, তা নি:সন্দেহে পবিত্র। এটাই হানাফি, হাম্বলি ও কিছু সংখ্যক মালিকি আলিমের অভিমত।

জলচর ও স্থলচর প্রাণী: ইমাম ইবনুল আরাবী বলেন: জলচর ও স্থলচর প্রাণীর ব্যাপারে সঠিক মত হলো, তা নিষিদ্ধ। কেননা এগুলোর হালাল হওয়া ও হারাম হওয়া উভয়ের পক্ষেই প্রমাণ রয়েছে। তথাপি সতর্কতা বশত: আমরা হারাম হওয়ার পক্ষের প্রমাণকেই অগ্রাধিকার দেই। ইবনুল আরাবী ব্যতীত অন্যান্য আলেমগণ মনে করেন, সকল জলচর মৃত প্রাণী হালাল, যদিও তা স্থলে বসবাস করতে সক্ষম হয়। একমাত্র ব্যাঙ হারাম। কেননা এটাকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আব্দুর রহমান ইবনে উসমান রা. থেকে বর্ণিত: জনৈক চিকিৎসক রসূল সা. কে ব্যাঙ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো, যা সে ওষুধে ব্যবহার করে। তখন রসূল সা. তাকে ব্যাঙ হত্যা করতে নিষেধ করলেন। (আবুদাউদ, নাসায়ি, আহমদ)।

স্থলচর হালাল প্রাণী: যে সকল হালাল স্থলচর প্রাণীর বিবরণ কুরআন ও সুন্নাহ্‌ থেকে পাওয়া যায় তা আমরা নিম্নে উল্লেখ করছি:

চতুষ্পদ জন্তু: সূরা নাহ্‌লের ৫ নং আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন:

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ○

'তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তু, এতে রয়েছে তোমাদের জন্য শীতের সম্বল আরো রয়েছে অনেক উপকার। তা থেকে তোমরা কিছু সংখ্যক খেয়েও থাক।'

সূরা মায়িদার ১নং আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ○ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ ○

'হে মুমিনগণ! তোমরা অংগীকার পূর্ণ কর। তোমাদের নিকট যা বর্ণিত হচ্ছে তা ব্যতীত চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হলো।'

চতুষ্পদ হালাল জন্তু হচ্ছে: উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, বন্য গরু, বন্য উট ও হরিণ। এ সব প্রাণী সর্বসম্মতভাবে হালাল। হাদিস থেকে আরো জানা যায়, মুরগি, হাঁস, ঘোড়া, বুনো গাধা, খরগোশ, গুই সাপ, হায়েনা, পঙ্গপাল ও চড়ুই পাখিও হালাল। (ইমাম মালিক ও ইমাম আবু হানিফার মতে ঘোড়া খাওয়া মাকরূহ। কেননা আল্লাহ্‌ এটাকে আরোহণের জন্তু হিসাবে উল্লেখ করেছেন, খাওয়ার জন্তু হিসাবে নয়।)

উমার ইবনুল খাত্তাব রা. সূত্রে সহিহ মুসলিমে বর্ণিত, আবুয যুবায়ের বলেন: জাবিরকে গুই সাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন: এটা খাবেনা। তিনি এটিকে নোংরা বলেও আখ্যায়িত করলেন। অন্য দিকে উমার ইবনুল খাত্তাব রা. বলেছেন: 'রসূলুল্লাহ্‌ সা. গুই সাপকে হারাম করেন নি, আল্লাহ্‌ এ দ্বারা অনেককে উপকৃত করেন। এটা থেকে কেবল সাধারণ রাখালদের খাদ্যই সংগৃহীত হয়। আমার কাছে থাকলে আমি ওটা খেতাম।'

ইবনে আব্বাস রা. খালিদ ইবনুল ওলীদ সূত্রে বর্ণনা করেন: তিনি রসূলুল্লাহ্‌ সা. কে সাথে নিয়ে তার খালা মাইমুনা বিনতে হারেসের নিকট গেলেন। মাইমুনা রসূলুল্লাহ্‌ সা. কে গুই সাপের গোশত খেতে দিলেন, যা তার জনৈকা আত্মীয়া নাজদ থেকে পাঠিয়েছিল। রসূলুল্লাহ্‌ সা. এর নিয়ম ছিল, তাকে কিছু খেতে দিলে সেটি কি জিনিস না জানা পর্যন্ত খেতেন না। মহিলারা স্থির করেছিল, ওটা কিসের গোশ্‌ত তা তাকে জানাবে না। তারা দেখবে, তিনি ওটা কেমন আস্বাদন করেন এবং আস্বাদন করে চিনতে পারেন কিনা।

কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করত: জানতে পেরে, তখন গোশতটি বর্জন করলেন ও অপছন্দ করলেন। তখন খালিদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: ওটা কি হারাম? রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন না, তবে এটা এমন এক খাবার, যা আমার গোত্রে চালু নেই। তাই আমার অপছন্দ হলো। খালিদ বলেন: এরপর আমি গোশ্তের পাত্রটি কাছে টেনে নিলাম, খেলাম এবং রসূলুল্লাহ্ সা. আমার খাওয়া দেখছিলেন।

আব্দুর রহমান ইবনে আম্মার রা. বর্ণনা করেন: জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্কে জিজ্ঞাসা করলাম: হায়েনা কি খেতে পারবো? তিনি বললেন: হ্যাঁ, আমি বললাম: ওটা শিকার করা যাবে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, আমি বললাম: আপনি কি এটা রসূলুল্লাহ্ সা. এর কাছ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। (তিরমিযি)।

ইমাম শাফেয়ি, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও ইবনে হায্মও হায়েনা খাওয়া জায়েয মনে করেন। এ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ি বলেন: আরবরা এটা খুবই পছন্দ করে ও প্রশংসা করে এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে অবাধে এর কেনাবেচা হয়। তবে হিংস্র বিধায় কিছু সংখ্যক আলেম এটি খাওয়া হারাম মনে করেন। কিন্তু উপরোক্ত হাদিস তাদের বিপক্ষে।

ইমাম আবু দাউদ ও আহমদ উল্লেখ করেছেন: ইবনে উমর রা. কে সজারু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সূরা আনয়ামের এ আয়াত পাঠ করলেন: 'বলুন, আমার কাছে যে ওহি এসেছে তাতে মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত, ও শূকরের গোশত ছাড়া আর কিছু নিষিদ্ধ পাইনা..। এ সময়ে ইবনে উমরের কাছে বসা জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি বললেন, আমি আবু হুরায়রাকে বলতে শুনেছি: রসূলুল্লাহ্ সা. এর কাছে সজারু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: 'এটা নোংরা প্রাণী।' তখন ইবনে উমর রা. বললেন: রসূলুল্লাহ্ সা. যদি এ কথা বলে থাকেন, তবে তার কথাই শিরোধার্য।' তবে এই হাদিসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে ঈসা ইবনে নামিলা দুর্বল। এ জন্য শওকানি বলেন: হালালের সাধারণ মূলনীতি থেকে সজারুকে ব্যতিক্রমি করার জন্য এ হাদিস উপযুক্ত নয়। আর শওকানির বক্তব্যের আলোকে সজারু খাওয়া হালাল। ইমাম মালেক, আবু সাওর, শাফেয়ি ও লাইসের মতে সজারু খাওয়া বৈধ। কারণ আরবরা এটা পছন্দ করে এবং উল্লিখিত হাদিসটি দুর্বল। তবে হানাফিগণ এটাকে মাকরূহ মনে করেন। আয়েশা রা. ইঁদুর সম্পর্কে বলেছেন: এটা হারাম নয়। অত:পর তিনি সূরা আন'আমের উপরোক্ত আয়াত পাঠ করেন।

ইমাম মালেকের মতে, কীটপতংগ, বিচ্ছু, পোকামাকড়, মৌমাছির বাচ্চা, খোরমার পোকা ইত্যাদি খাওয়া বৈধ। কুরতুবি বলেন: ইমাম মালেকের প্রমাণ হলো ইবনে আব্বাস ও আবু দারদার উক্তি: 'আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা হারাম, আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হালাল এবং যে সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছেন তা নির্দোষ।'

কীটযুক্ত তরিতরকারী সম্পর্কে ইমাম আহ্মদ বলেন: আমার মতে ওটা বর্জন করাই ভালো। তবে কেউ যদি তা নোংরা মনে না করে তাহলে খাওয়া যেতে পারে। তিনি কীটযুক্ত খোরমা বেছে খাওয়া ভালো বলে মত প্রকাশ করেন। বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট কিছু পুরানো খোরমা আনা হলে তিনি তা বাছতে লাগলেন, ও তা থেকে পোকা বের করতে লাগলেন। ইবনে কুদামা বলেন: এটাই উত্তম।

ইবনে শিহাব, উরওয়া, শাফেয়ি, হানাফি ফকিহগণ ও মদিনার কিছু আলেম বলেন: কীটপতঙ্গ, সাপ, ইঁদুর এবং যে সব জীব হত্যা করা জায়েয, তা খাওয়া জায়েয নেই। এগুলোকে জবাই করে কোনো লাভ নেই। চড়ুই খাওয়া সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: কেউ কোনো চড়ুই বা তার চেয়ে বড় কোনো প্রাণীকে তার অধিকার না দিয়ে হত্যা করলে আল্লাহ্ তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। জিজ্ঞাসা করা হলো: হে রসূলুল্লাহ, চড়ুই এর অধিকার কী? তিনি বললেন: তাকে জবাই করে খেতে হবে এবং তার মাথা কেটে ফেলে দেয়া চলবে না। (নাসায়ি) আবুদাউদ ও তিরমিযি বর্ণনা করেন, কোনো কোনো সাহাবি রসূলুল্লাহ্ সা. এর সাথে বন্য পাখির গোশত খেয়েছেন।

স্পষ্টভাবে বর্ণিত হারাম খাদ্য: কুরআনে যে সব খাদ্য হারাম ঘোষিত হয়েছে তার সংখ্যা দশটিতে সীমিত। আল্লাহ্ বলেন: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ .....

'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মরা জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের নামে

যবাইকৃত পশু, শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু, তবে যা তোমরা জবাই করতে পেরেছ তা ব্যতীত। আর যা মূর্তিপূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ করা। এ সব পাপ কাজ।' (সূরা মায়িদা-৫: ৩)

মরা অর্থ স্বাভাবিকভাবে মৃত জন্তু। যেহেতু স্বাভাবিকভাবে মৃত জন্তু কোনো না কোনো রোগেই মারা গেছে, তাই তার গোশত খেলে ক্ষতি অবধারিত। আর রক্ত দ্বারা প্রবাহিত রক্ত বুঝানো হয়েছে। যেহেতু প্রবাহিত রক্ত রোগ-জীবাণুর বিকাশে অধিকতর সহায়ক, তাই এটা খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর শূকরের গোশ্‌ত নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, এটা একটা নোংরা প্রাণী এবং যাবতীয় নোংরা ও অপবিত্র জিনিসই তার প্রিয়তম খাদ্য। অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, এর মাংস বিশ্বের সকল মহাদেশে, বিশেষত: গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে ক্ষতিকর। এর গোশত প্রাণঘাতী কৃমি উৎপাদন করে। আরো জানা যায়, যৌন সততা বিনাশে এর প্রভাব রয়েছে। আর আল্লাহ্ ব্যতীত অপর নামে ও মূর্তিপূজার বেদীতে জবাইকৃত জন্তু খাওয়া নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্য হলো তাওহিদের হেফাযত। হিংস্র পশুর আক্রমণে আহত হালাল জন্তুকে জীবিত অবস্থায় পেয়ে যবাই করলে তা খাওয়া হালাল হবে।

সূরা মায়িদার এ আয়াতে যে বিবরণ দেয়া হয়েছে, তা আসলে সূরা আনআমের ১৪৫ নং আয়াতেরই বিস্তারিত বিবরণ, যাতে বলা হয়েছে: 'বলুন, আমার কাছে যে ওহি প্রেরণ করা হয়েছে তাতে আমি মৃত, বহমান রক্ত, শূকরের গোশ্‌ত, অথবা যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করার কারণে অবৈধ, তা ছাড়া কোনো ভক্ষণকারীর জন্য কোনো হারাম খাদ্য পাই না। সূরা আনআমের আয়াতে চারটা জিনিস সংক্ষেপে আর এ আয়াতে বিস্তারিতভাবে সবকটা হারাম জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে।

জীবিত প্রাণীর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অংশ: জীবিত প্রাণীর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা অংশও মৃত প্রাণীর মতো হারাম। আবু ওয়াকেদ লাইছি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: জীবিত থাকা অবস্থায় কোনো প্রাণীর দেহ থেকে যে অংশ কেটে নেয়া হয়, তা একটা মৃত দেহ।' (আবুদাউদ ও তিরমিযি। তিরমিযি) এটিকে হাসান আখ্যা দিয়ে বলেন: আলেমগণ এ হাদিস অনুসারেই কাজ করেন। তবে নিম্নোক্ত জিনিসগুলো হারাম নয়:

ক. মাছ ও পঙ্গপালের মৃতদেহ। এ দুটো পবিত্র ও হালাল। ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: দুটো মৃতদেহ ও দুটো রক্ত আমাদের জন্য হালাল: মৃতদেহ দুটো হলো মাছ ও পঙ্গপালের। আর রক্ত দুটো হলো, কলিজা ও প্লীহা। –আহমদ, শাফেয়ি, ইবনে মাজা, বায়হাকি ও দারু কুতনি কর্তৃক বর্ণিত। প্রাণীর মৃতদেহকে যখন হারাম ঘোষণা করা হয় তখন তার উদ্দেশ্য হলো, তার গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ করা। গোশত ছাড়া তার অন্যান্য অংশ পবিত্র এবং তা ব্যবহার করা হালাল।

খ. মৃত প্রাণীর হাড়, শিং, নখ, চুল, পালক ও চামড়া ও জাতীয় জিনিস পবিত্র। এগুলো অপবিত্র হওয়া সম্পর্কে কোনো প্রমাণ নেই। তাই এগুলো পবিত্র। কারণ যে কোনো জিনিসের মূল অবস্থা পবিত্রতা, যতোক্ষণ তার অপবিত্র হওয়ার প্রমাণ পাওয়া না যায়।

ইমাম যুহ্‌রি মৃত হাতি ও অন্যান্য প্রাণীর হাড় সম্পর্কে বলেন: 'অতীতের বহু সংখ্যক আলেমকে মৃত প্রাণীর হাড়ের তৈরি চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াতে ও তার তেল ব্যবহার করতে দেখেছি। এতে তারা দোষের কিছু দেখতেন না। (বুখারি)।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন: 'মাইমুনার জনৈকা মুক্ত দাসীকে একটা ছাগল সদকা দেয়া হলো। পরে ছাগলটি মারা গেল। রসূলুল্লাহ্ সা. তা দেখে বললেন: 'তোমরা এর চামড়া নিয়ে পাকিয়ে তা দ্বারা উপকৃত হতে পারনা? লোকেরা বললো: ওটা তো মৃত প্রাণী। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: আল্লাহ্ তো শুধু ওর গোশ্‌ত খাওয়া হারাম করেছেন।' (ইবনে মাজা ব্যতীত অপর সবকটা সহিহ হাদিস গ্রন্থ কর্তৃক বর্ণিত)।

বর্ণিত আছে, ইবনে আব্বাস রা. সূরা আনআমের আয়াত: 'বলুন, আমার কাছে যে ওহি এসেছে তাতে আমি কোনো হারাম খাদ্য পাইনা ......' পাঠ করলেন এবং বললেন: আল্লাহ্ শুধু এগুলোর গোশত খাওয়া হারাম করেছেন। কিন্তু এর চামড়া, চামড়ার তৈরি জিনিস, দাঁত, হাড়, চুল ও পশম হালাল। –ইবনুল মুনযির ও ইবনে হাতিম। অনুরূপ মৃত প্রাণীর পেট থেকে বের করা জমাট দুধ হালাল। কেননা সাহাবিগণ

যখন ইরাক জয় করলেন, তখন সেখানকার অগ্নি উপাসকদের তৈরি পনির খেয়েছিলেন, যা তাদের জবাই করা প্রাণীর পেট থেকে বের করা জমাট দুধ দিয়ে বানানো হতো। অথচ অগ্নি উপাসকরা মোশরেক এবং তাদের জবাই করা প্রাণী মৃত প্রাণীর পর্যায়ভুক্ত। সালমান ফারসি রা. থেকে বর্ণিত: তাকে পনির ও ঘি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি জবাব দেন: আল্লাহ্ তার কিতাবে যা যা হারাম করেছেন, তা হারাম। আর যা সম্পর্কে কিছুই বলেননি, তা বৈধ।' এটা সুবিদিত যে, সালমান যখন উমার ইবনুল খাত্তাবের পক্ষ থেকে মাদায়েনের প্রতিনিধি ছিলেন, তখন তাকে এ প্রশ্ন করা হয় এবং আসলে প্রশ্নটি ছিলো অগ্নি উপাসকদের পনির সম্পর্কে।

গ. রক্ত: স্বল্প পরিমাণ রক্ত হালাল। ইবনুল মুনযির বর্ণনা করেন, ইবনে জুরাইজ কুরআনের আয়াতে বর্ণিত 'বহমান রক্তের' ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন: জবাইকৃত জন্তুর রগের মধ্যে যে রক্ত থাকে, তাতে আপত্তি নেই। আর আবু মিজাল্লায ছাগল জবাইর স্থানে বা ডেগচির উপরি ভাগে যে রক্ত থাকে সে সম্পর্কে বলেন: ওতে কোনো অসুবিধা নেই, যা নিষিদ্ধ তা হচ্ছে বহমান রক্ত। –ইবনে হামিদ ও আবুশ শাইখ কর্তৃক বর্ণিত। আয়েশা রা. বলেন: ডেগচির উপর রক্তের রেখা থাকা অবস্থায় আমরা গোশত খেতাম।

গাধা ও খচ্চরের নিষেধাজ্ঞা: নিষিদ্ধ খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত গৃহপালিত গাধা ও খচ্চর। আল্লাহ বলেন: وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ৮ 'তোমাদের আরোহণের জন্য ও সৌন্দর্যের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা।' (সূরা নাহ্ল: আয়াত ৮)।

এ ধারণা ঠিক নয় যে, হারাম খাদ্যের বিবরণ সংবলিত আয়াতের অর্থ আয়াতে বর্ণিত তালিকার মধ্যেই নিষেধাজ্ঞা সীমাবদ্ধ এবং এগুলো ছাড়া আর কিছুই হারাম নয়। কুরতুবি এ ধারণা খন্ডন করে বলেন: এ আয়াত মক্কায় নাযিল হয়। এরপর রসূলুল্লাহ্ সা. যদি কোনো জিনিস হারাম করে থাকেন বা কুরআনে অন্য কিছু হারাম করা হয়ে থাকে, তবে তাও এর সাথে যুক্ত হবে। রসূলুল্লাহ্ যা হারাম করেন, তা রসূলের মুখ দিয়ে আল্লাহ্রই একটি বর্ধিত হুকুম। এটাই অধিকাংশ ফকিহ ও হাদিস বিশারদর অভিমত।

১. ইমাম আবুদাউদ ও ইমাম তিরমিযি মিকদাদ ইবনে মাদীকারাব রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'জেনে রেখ, আমাকে কিতাব দেয়া হয়েছে, সেই সাথে অনুরূপ আরো কিছু দেয়া হয়েছে। জেনে রেখ, অচিরেই কোনো ব্যক্তি পরিতৃপ্ত অবস্থায় তার সুসজ্জিত খাটে বসে হয়তো বলবে: 'তোমরা এই কুরআনকে আঁকড়ে ধর, এতে যা হালাল পাও, তা হালাল বলে মেনে নাও, আর এতে যা হারাম পাও, তা হারাম বলে মেনে নাও। (অর্থাৎ হাদিসকে অগ্রাহ্য করে কেবল কুরআনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে) জেনে রেখ, গৃহপালিত গাধা তোমাদের জন্য হালাল নয়, কর্তন দাঁতধারী হিংস্র জন্তুও হালাল নয় এবং চুক্তিবদ্ধ নাগরিকের হারানো বস্তুও তার মালিক তার দাবি ছেড়ে না দিলে হালাল নয়। কোনো ব্যক্তি কোনো জনগোষ্ঠীর অতিথি হলে তার আপ্যায়ন করা তাদের কর্তব্য। যদি না করে তবে তার অধিকার রয়েছে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিস তাদের কাছ থেকে জোরপূর্বক হলেও আদায় করার।'

২. আনাস রা. সূত্রে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ্ সা. যখন খয়বর দখল করলেন, তখন আমরা কিছু গাধা পেলাম। তা থেকে কিছু জবাই করে রান্না করলাম। এ সময় রসূলুল্লাহ্ সা. ঘোষণা করলেন: সাবধান, আল্লাহ্ ও তার রসূল সা. তোমাদেরকে এটা খেতে নিষেধ করেছেন। কেননা এটা অপবিত্র ও শয়তানের কাজ। তৎক্ষণাৎ ডেগচিগুলো উল্টে ফেলে দেয়া হলো। অথচ তখনো রান্না করা জিনিস তাতে টগবগ করছিল পাঁচটি সহিহ হাদিস গ্রন্থ।

৩. জাবির রা. বলেন: খয়বরের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ্ সা. আমাদেরকে গাধা ও খচ্চর খেতে নিষেধ করেছেন, তবে ঘোড়া খেতে নিষেধ করেননি।

ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ্ সা. গৃহপালিত গাধার অনুমতি দিয়েছেন। তবে বিশুদ্ধ বর্ণনা এই যে, ইবনে আব্বাস এ ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করে বলেন: আমি জানিনা, গৃহপালিত গাধা মানুষের পরিবহনের উপকরণ বিধায় এটি নষ্ট হবে ভেবে রসূলুল্লাহ্ সা নিষেধ করেছেন, না খয়বরে যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধা হারাম ঘোষণা করেছেন। (বুখারি)।

হিংস্র পশু ও পাখি হারাম: ইসলাম যে সব প্রাণী হারাম করেছে, তন্মধ্যে হিংস্র পশু ও পাখি অন্যতম। ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন: প্রত্যেক কর্তন দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র পশু ও প্রত্যেক নখরধারী পাখি রসূলুল্লাহ্ সা. নিষিদ্ধ করেছেন। কর্তন দন্তধারী জন্তু দ্বারা সেই সব জন্তু বুঝায়, যারা মানুষের জান ও মালের উপর দাঁত বের করে আক্রমণ চালায়, যেমন: বাঘ, সিংহ, কুকুর, নেকড়ে বাঘ, চিতা বাঘ, বন্য বিড়াল। এ সব অধিকাংশ ফকিহের মতে হারাম। ইমাম আবু হানিফার মতে গোশত খায় এমন প্রত্যেক জন্তুই হিংস্র জন্তু। হাতি, হায়েনা, বিড়াল, ইঁদুর এ সবই তাঁর নিকট হারাম। ইমাম শাফেয়ির মতে মানুষের উপর আক্রমণ করে এমন জন্তুই নিষিদ্ধ হিংস্র জন্তু, যথা সিংহ ও বাঘ।

ইমাম মালিক মুয়াত্তা গ্রন্থে আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'প্রত্যেক কর্তন দাঁতধারী হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম।' ইমাম মালিক হাদিসটি উদ্ধৃত করার পর বলেন: আমাদের নিকট এটাই কার্যকর মত। ইবনুল কাসেম বর্ণনা করেন, এগুলো খাওয়া মাকরূহ এবং এটাই অধিকাংশ সাহাবির মত। ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আবু হানিফার শিষ্যরা শিয়াল খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। আর ইবনে হাযম হাতি ও বেজী খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। বানর খাওয়া হারাম। আবু উমর বলেন: মুসলমানদের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, বানর খাওয়া জায়েয নেই। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. ওটা খেতে নিষেধ করেছেন। নখধারী পাখি বলতে সেই সব পাখিকে বুঝানো হয়েছে, যারা তাদের নখর দ্বারা আক্রমণ করে, যেমন চিল, শকুন, ঈগল ইত্যাদি। অধিকাংশ আলিমের নিকট এগুলো হারাম, যদিও তা ময়লা ভক্ষণকারী না হয়।

ময়লা ভক্ষণকারী প্রাণী হারাম: যে সকল উট, গরু, ছাগল, ভেড়া, মোরগ, মুরগি বা হাঁস ইত্যাদি মল খায়, তার উপর আরোহণ করা, তার গোশত খাওয়া ও তার দুধ পান করা হারাম।

১. ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত: মল ভক্ষণকারী প্রাণীর দুধ পান করতে রসূলুল্লাহ সা. নিষেধ করেছেন। –ইবনে মাজা ব্যতীত পাঁচটি সহিহ হাদিসগ্রন্থ। তিরমিযির মতে হাদিসটি সহিহ। আবু দাউদের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সা. মল ভক্ষণকারী প্রাণীর উপর আরোহণ করতে নিষেধ করেছেন।

২. আম্‌র ইবনে শুয়াইব রা. বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ্ সা. মল ভক্ষণকারী জন্তু ও গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে, ও তার উপর আরোহণ করতে নিষেধ করেছেন। (আহমদ, নাসায়ি, আবুদাউদ)।

তবে এ ধরনের প্রাণীকে কিছুকাল মল থেকে দূরে আটক রাখা হয়, পবিত্র খাবার খাওয়ানো হয়, আর তার ফলে তার গোশত পবিত্র হয়ে যায় এবং তার মলভক্ষণকারী নাম মুছে যায়, তবে হালাল হয়ে যাবে, কেননা হারাম হওয়ার কারণটি দূর হয়ে গেছে।

অপবিত্র জিনিস হারাম: এই বিবরণের পাশাপাশি পবিত্র কুরআন একটা সর্বব্যাপী মূলনীতি দিয়ে হারাম নির্ণয়ের উপায় জানিয়ে দিয়েছে। সেটি সূরা আরাফের ১৫৭ নং আয়াতে রয়েছে:

.... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَٰٓئِثَ 'তিনি তাদের জন্য পবিত্র জিনিসগুলো হালাল ও অপবিত্র জিনিসগুলো হারাম করে দেবেন। পবিত্র জিনিস বলে সেই সব জিনিস বুঝানো হয়েছে, যা কোনো নিষিদ্ধকারী ওহির বাণী ছাড়াই মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে পবিত্র মনে করে ও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। মানুষ যদি স্বতস্ফূর্তভাবে অপবিত্র মনে করে তবে তা হারাম।

ইমাম শাফেয়ি ও হাম্বলি মযহাবের মতানুসারে পবিত্র জিনিস হচ্ছে, যা শুধু আরবরা অর্থাৎ জনপদ ও নগরবাসীরা পবিত্র মনে করে ও যার প্রতি আকৃষ্ট হয়, গ্রামবাসী ও বেদুইনরা নয়। তবে 'আদ্দরারিল মুযিয়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে, সাধারণ জনগণ যাকে পবিত্র মনে করে, সেটাই পবিত্র, শুধু আরবরা বা অভিজাত এলাকার অধিবাসীরা নয়। উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে:

'কোনো কারণ বশত: নয় এবং অনভ্যস্ততা বশত:ও নয়, বরং কেবলমাত্র স্বতস্ফূর্তভাবে নোংরা ও অপবিত্র মনে করার কারণে যে প্রাণীকে সাধারণ মানুষ অপবিত্র মনে করে, সেটাই অপবিত্র। আর যদি কিছু লোক অপবিত্র মনে করে এবং কিছু লোক অপবিত্র মনে না করে, তবে অধিকাংশ মানুষের মনোভাবই গ্রহণযোগ্য হবে, যেমন পোকা মাকড় ও বহু জীবজন্তু কোনো নির্দিষ্ট দলিল-প্রমাণ ছাড়াই জনসাধারণ

খাওয়া বর্জন করেছে। বস্তুত: এ সব প্রাণী প্রধানত: নোংরা ও অপবিত্র মনে হওয়ার কারণে বর্জিত হয়েছে। এ সব নোংরা ও অপবিত্র জিনিসের মধ্যে থু থু, কফ, বীর্য, গোবর, উকুন ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত।

শরিয়ত যে সব প্রাণীকে হত্যার আদেশ দিয়েছে, তা হারাম: যে সকল প্রাণীকে রসূলুল্লাহ্ সা. হত্যা করতে আদেশ দিয়েছেন এবং যে সকল প্রাণীকে রসূলুল্লাহ্ সা. হত্যার করতে নিষেধ করেছেন, বহু সংখ্যক আলেমের মতে তা হারাম। যে ক'টা প্রাণীকে হত্যা করতে রসূলুল্লাহ্ সা. আদেশ দিয়েছেন তা হচ্ছে পাঁচটি: চিল, বিচ্ছু, কাক, ইঁদুর ও খেকি কুকুর। বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি ও নাসায়ি আয়েশা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: পাঁচটি প্রাণী পাপিষ্ঠ। হারাম শরীফে তাদেরকে হত্যা করা হবে: কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর, ও খেকি কুকুর।

আর যে ক'টা প্রাণী হত্যা করতে রসূলুল্লাহ সা. নিষেধ করেছেন তা হচ্ছে: পিপঁড়ে, মৌমাছি, হুদহুদ পাখি ও সারাদ পাখি। আবু দাউদ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ সা. পিপঁড়ে, মৌমাছি, হুদহুদ ও সারাদ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম শওকানি এ মতটির পর্যালোচনা করে বলেন: 'বলা হয়েছে যে, কয়েকটি প্রাণীকে হত্যা করতে আদেশ দেয়া, যেমন পাঁচটি পাপিষ্ঠ প্রাণীকে এবং কয়েকটি প্রাণীকে হত্যা করতে নিষেধ করা, যেমন পিঁপড়ে, মৌমাছি, হুদহুদ, সারাদ, ব্যাঙ, এগুলোই নিষিদ্ধ হওয়াার অন্যতম কারণ। অথচ যে সকল প্রাণীকে রসূল সা. হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন, বা হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, সেগুলি খাওয়া নিষিদ্ধ এ কথা শরিয়তের কোনো বাণীতে জানা যায় না। তাই কেবল আদেশ ও নিষেধকে হারাম হওয়ার প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। এ দুটির মধ্যে কোনো যৌক্তিক বা প্রথাগত বাধ্যবাধকতা নেই। সুতরাং হত্যা করার আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাকে হারাম করার মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করার কোনো কারণ নেই। বরং যাকে হত্যা করার আদেশ দেয়া হয়েছে বা হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে, তা যদি অপবিত্র প্রাণী হয়ে থাকে তবে তাতো সংশ্লিষ্ট আয়াতের আওতায়ই নিষিদ্ধ হবে। অন্যথায় তা হালাল হবে। কেননা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, সকল জিনিস মূলত: হালাল, যতোক্ষণ তা হারাম হওয়ার প্রমাণ না পাওয়া যায়।' (মালিকি মযহাবে কাকসহ যাবতীয় পাখি হালাল।)

যে সব জিনিস সম্পর্কে মৌনতা অবলম্বন করা হয়েছে: শরিয়ত যে সব জিনিস সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছে এবং তা হারাম হওয়া সম্পর্কে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তা সর্বসম্মত মূলনীতি 'সকল জিনিস মূলত হালাল'এর আওতায় হালাল। বস্তুত এটা ইসলামের অন্যতম মূলনীতি।

কুরআন ও সুন্নাহ্র একাধিক বাণী উক্ত মূলনীতির প্রতি সমর্থন জানায়। যেমন আল্লাহ বলেন:
هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا 'তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।' (আল বাকারা-২: আয়াত ২৯)।

২. দারু কুতনি আবু সা'লাবা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'আল্লাহ তোমাদের উপর কিছু কাজ ফরয করেছেন, সেগুলো অবহেলা করোনা। কিছু সীমা নির্ধারণ করেছেন, সেগুলো লংঘন করোনা এবং কিছু জিনিস সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছেন তোমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে, ভুলে গিয়ে নয়, কাজেই সেগুলো নিয়ে মাথা ঘামাবেনা।'

৩. সালমান ফারসি রা. সূত্রে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ্ সা. কে পনির ও ঘি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: আল্লাহ্ তার কিতাবে যা যা হালাল করেছেন তা হালাল, আর আল্লাহ্ তার কিতাবে যা যা হারাম করেছেন তা হারাম, আর যা সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, তা হচ্ছে সেই সব বিষয়, যার ব্যাপারে তিনি তোমাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছেন।' (ইবনে মাজা ও তিরমিযি)।

৪. বুখারি ও মুসলিম সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে ইতিপূর্বে হারাম করা হয়নি এমন জিনিস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে আর তার জিজ্ঞাসা করার কারণে ঐ জিনিসটি হারাম হয়ে যায়।'

৫. আবুদ দারদা রা. সূত্রে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তা

হালাল, আর যা হারাম করেছেন তা হারাম, আর যা সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, তার ব্যাপারে অব্যাহতি দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র দেয়া অব্যাহতি গ্রহণ কর। কেননা আল্লাহ্ কোনো কিছু ভুলে যাওয়ার পাত্র নন। অত:পর তিনি সূরা মরিয়ামের ৬৪ নং আয়াতের এ অংশটি পাঠ করলেন:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ‘তোমার প্রভু ভুলে যাওয়ার পাত্র নন।’ (বাযযার)।

আমদানীকৃত গোশ্‌ত: অমুসলিম দেশ থেকে আমদানীকৃত গোশ্‌ত দুই শর্তে খাওয়া হালাল:

১. আল্লাহ্ যে সকল জন্তুকে হালাল করেছেন, সেগুলোর গোশ্‌ত হওয়া চাই।

২. শরিয়ত নির্দেশিত উপায়ে জবাই হওয়া চাই।

এই দুটো শর্ত যদি পূরণ না হয়, যদি তা শূকর বা অনুরূপ হারাম জন্তুর গোশত হয় অথবা শরিয়ত বহির্ভূত নিয়মে জবাই হয়ে থাকে, তাহলে তা নিষিদ্ধ এবং তা খাওয়া হালাল হবে না। আধুনিক বিজ্ঞানের সুবাদে যে সব সংবাদ মাধ্যমের প্রচলন হয়েছে, তার ফলে এখন ঐ শর্ত দুটি পূরণ হয়েছে কিনা জানা সহজ হয়ে গেছে। প্রায়ই এ সব গোশতের প্যাকেটের গায়ে এ বিষয়ে তথ্য লেখা থাকে এবং এই তথ্যের উপর নির্ভর করা যেতে পারে। কেননা প্রায়ই এগুলো সত্য হয়ে থাকে।

ইতিপূর্বেও ফকিহগণ এরূপ ক্ষেত্রের করণীয় সম্পর্কে ফতোয়া দিয়েছেন। শাফেয়ি মায্‌হাবের গ্রন্থাবলীর মধ্যে নীয়া ‘আল-ইকনায়’ বলা হয়েছে:

‘কোনো ফাসেক অথবা কোনো ইহুদি বা খ্রিষ্টান যদি জানায় যে, সে এই ছাগলটি জবাই করেছে, তবে তা খাওয়া যাবে। কেননা সে জবাই করার যোগ্য। পক্ষান্তরে কোনো দেশে যদি মোশরেক ও মুসলমান উভয় সম্পদায়ের লোক বাস করে, এবং জন্তুকে জবাই করেছে মোশরেক না মুসলমান, তা জানা যায়না, তাহলে খাওয়া হালাল হবেনা। কেননা জবাই হালাল পন্থায় হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। তবে ঐ দেশে যদি মুসলমানদের সংখ্যা অধিক হয়, তাহলে খাওয়া যাবে।

অনন্যোপায় অবস্থায় হারাম খাওয়া জায়েয

যে ব্যক্তির হালাল খাদ্য সংগ্রহ করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়েছে, তার জন্য মৃত প্রাণী, শূকর, অন্যান্য হারাম প্রাণীর গোশ্‌ত অথবা অন্য কোনো হারাম খাদ্য বাঁচানো ও মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে খাওয়া শুধু জায়েয নয়, বরং ওয়াজিব। কারণ সূরা নিসার ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন:

وَلَا تَقْتُلُوٓا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ‘তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করোনা। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়াময়।’

অনন্যোপায় অবস্থার সীমারেখা

মানুষ তখনই অনন্যোপায় বলে বিবেচিত হবে, যখন ক্ষুধা তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় অথবা এমন রোগে আক্রান্ত করার উপক্রম হয়, যা তাকে মৃত্যুরমুখে নিক্ষেপ করতে পারে। যে ব্যক্তি এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার হয়, সে আল্লাহ্‌র অনুগত না অবাধ্য, তাতে কিছু যায় আসে না। আল্লাহ বলেন:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

‘কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালংঘনকারী নয়, তার কোনো পাপ হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ (হারাম খাদ্য খাওয়ার সময় একই পর্যায়ের অনন্যোপায় অপর ব্যক্তির হক গ্রাস করা, তাকে খেতে না দিয়ে একাকী খাওয়া ও তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া নাফরমানীর আওতাভুক্ত। আর যতটুকু খেলে তৃপ্তি হয়, মতান্তরে, যতোটুকু খেলে জীবন বাঁচে ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি দূরীভূত হয়, তার চেয়ে বেশি খাওয়া সীমালংঘনের পর্যায়ে পড়ে।)

ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন: ফুজাই আমেরি রা. রসূলুল্লাহ্ সা. এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন: কী অবস্থায় আমাদের জন্য মৃত প্রাণী হালাল হয়? রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: তোমাদের খাদ্য কী? ফুজাই বললেন: সকাল বিকাল শুধু তরল পানীয়। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: ‘এটাই সেই ক্ষুধা, যা মৃত প্রাণী হালাল করে।’ অত:পর তিনি তাদেরকে মৃত প্রাণী খাওয়ার অনুমতি দিলেন। ইবনে হায্‌ম বলেন:

'অনন্যোপায় অবস্থার সীমারেখা হলো, পুরো একদিন ও এক রাত এমন অবস্থায় থাকতে হবে যে, কোনো খাদ্য ও পানীয় পাওয়া যাচ্ছেনা। এমতাবস্থায় সে যদি এমন কষ্টকর দুর্বলতার আশংকা করে যা দীর্ঘস্থায়ী হলে তাকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করতে পারে অথবা তার জীবিকা উপার্জন বন্ধ করে দেবে, তবে তার জন্য এমন যে কোনো জিনিস খাওয়া ও পান করা বৈধ, যা ক্ষুধা ও পিপাসা জনিত মৃত্যু থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে। একদিন ও একরাত অনাহারে থাকার সীমারেখা উল্লেখ করেছি এ জন্য যে, রসূলুল্লাহ্ সা. রোযার জন্য পুরো একদিন ও একরাত একটানা পানাহার না করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন।

মালেকি মযহাব অনুসারে কেউ যদি একটানা তিনদিন অনাহারে কাটায়, তবে তার পক্ষে যে কোনো হারাম জিনিস খাওয়া জায়েয, চাই তা অন্যের সম্পদ হোক না কেন।

উল্লেখ্য, শাফেয়ি ও যায়দি মতানুসারে অন্য কিছু না পাওয়া গেলে মানুষের গোশ্ত খাওয়াও জায়েয। তবে এ জন্য তারা কিছু শর্ত আরোপ করেন। কিন্তু হানাফি ও যাহেরি মযহাব অনুসারে মানুষের গোশ্ত খাওয়া কোনো অবস্থায়ই জায়েয নেই।

যে পরিমাণ হারাম খাদ্য খাওয়া জায়েয: অনন্যোপায় ব্যক্তি মৃত প্রাণী বা অন্য কোনো হারাম খাদ্য থেকে সর্বোচ্চ ততটুকুই খেতে পারবে, যতটুকু তার জীবন বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট। সে তার প্রয়োজন অনুযায়ী সফরের সম্বল হিসেবেও নিতে পারবে।

এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম মালিক ও আহ্মদ বলেন, অনন্যোপায় ব্যক্তি যখন হারাম খাদ্য খাবে, তখন তা তৃপ্তি সহকারে খেতে পারে। কেননা ইমাম আবুদাউদ জাবির ইবনে সামুরা রা. সুত্রে বর্ণনা করেন: এক ব্যক্তি 'হাররাতে' এসে যাত্রা বিরতি করলো। এর কিছুক্ষণ পর তার উটনীটা মারা গেল। তখন তার স্ত্রী বললো: ওর চামড়া খুলে ফেল, আমরা ওর চর্বি ও গোশত জ্বাল দেব ও খাব। সে বললো: আগে রসূল সা. এর কাছে জিজ্ঞাসা করে নেই। অত:পর রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো। রসূল সা. বললেন: তোমার নিকট কি আর কোনো সম্পদ নেই? সে বললো: না। তিনি বললেন: তা হলে খাও।'

ইমাম আবু হানিফার শিষ্যগণ বলেন: এ রকম অবস্থায় তৃপ্তি সহকারে খাওয়া চলবে না। ইমাম শাফেয়ি থেকে দু'রকমের মত বর্ণিত আছে।

অন্যের খাদ্য পাওয়া গেলেও তাকে অনন্যোপায় বলা যাবেনা: মানুষ তখনই অনন্যোপায় বলে গণ্য হবে যখন খাওয়ার মত কোনো খাদ্যই পায় না, এমনকি যদি তা অন্যের খাদ্যও হয়। যখন অন্য কারো মালিকানাধীন খাদ্য তার নাগালে থাকে, তখন সে তা তার মালিকের অনুমতি ছাড়াও খেতে পারবে। এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। মতভেদ আছে শুধু ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কিনা সেই ব্যাপারে। অধিকাংশ আলেমের মত এই যে, কেউ যদি ক্ষুধার কারণে অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং অন্যের মালিকানাধীন খাবার ব্যতীত আর কিছু তার নাগালে না থাকে, অথচ সে খাবারের মালিক অনুপস্থিত, তা হলে সে তা থেকে কিছু নিতে পারে এবং সে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। কেননা নিরুপায় অবস্থা অন্যের হক বাতিল করে না।

ইমাম শাফেয়ি বলেন: ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হবে না। কেননা তার নিরুপায় অবস্থাই তার দায়বদ্ধতা রহিত করে। কারণ আল্লাহ্ নিজেই তাকে এর অনুমতি দিয়েছেন। আর আল্লাহ যেখানে অনুমতি দিয়েছেন, সেখানে ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

যে ক্ষেত্রে খাদ্য বিদ্যমান, কিন্তু তার মালিক তা দিতে নারাজ, সে ক্ষেত্রে অনন্যোপায় ব্যক্তি ক্ষমতা থাকলে বল প্রয়োগে কেড়ে নিতে পারবে। আর মালেকি মযহাব অনুসারে, এরূপ ক্ষেত্রে অনন্যোপায় ব্যক্তি মালিককে নিজের অনন্যোপায় অবস্থার কথা জানিয়ে তাকে হুশিয়ারি দেবে যে, সে তাকে খাবার না দিলে সে তার সাথে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করবে। এরপরও না দিলে সে তার সাথে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারবে। যুদ্ধে খাবারের মালিক নিহত হলে এই হত্যার জন্য হত্যাকারী দায়ী হবে না। আর অনন্যোপায় ব্যক্তিকে খাবার দেয়া তার উপর ওয়াজিব ছিলো।

ইমাম ইবনে হাযম বলেন: যে ব্যক্তি হারাম খাদ্য ব্যতীত আর কিছু যোগাড় করতে অক্ষম এবং কোনো

মুসলমানের বা চুক্তিবদ্ধ (যিম্মি) অমুসলিমের সম্পদও তার নাগালে নেই, সে উক্ত হারাম খাদ্য তৃপ্তি সহকারে খেতে পারবে এবং পরবর্তী প্রয়োজন পূরণের জন্য সম্বল হিসেবেও নিতে পারবে। পরে যখনই সে হালাল খাদ্য পাবে, তখনই ঐ হারাম খাদ্য পুনরায় তার জন্য আগের মতো হারাম হয়ে যাবে। আর যদি সে কোনো মুসলমান বা যিম্মীর খাদ্য পেয়ে যায়, তাহলে সেই খাদ্যে তার হক প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: 'ক্ষুধার্তকে খাবার দাও।' রসূলুল্লাহ্ সা. এর এই আদেশ বলে সে উক্ত খাদ্যের হকদার। এমতাবস্থায় সে মৃত প্রাণী বা অন্য কোনো হারাম খাদ্য খাওয়ার জন্য নিরুপায় নয়। কিন্তু খাদ্যের মালিক অন্যায়ভাবে তাকে খাদ্য থেকে বঞ্চিত করলে সে নিরুপায় হিসাবে গণ্য হবে।

চিকিৎসার জন্য মদ কি হালাল?: ক্ষুধায় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হারাম খাদ্য খাওয়ার অনুমতি আছে এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত। কেবল চিকিৎসার জন্য মদের অনুমতি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন: অনুমতি আছে, কেউ বলেন: নেই। এ ক্ষেত্রে অনুমতি না থাকার মতটাই অগ্রগণ্য। কারণ ইসলামের আগমনের পূর্বে জাহিলি যুগে লোকেরা মদ দিয়ে রোগের চিকিৎসা করতো। ইসলাম এসে এটা নিষিদ্ধ করে দেয়। তারেক ইবনে সুয়াইদ জাফি থেকে ইমাম আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, ও তিরমিযি বর্ণনা করেন: সুয়াইদ রসূলুল্লাহ্ সা. কে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে মদ স্পর্শ করতে নিষেধ করেন। সুয়াইদ বললেন: আমি মদকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করতে চাই। রসূলুল্লাহ সা. বললেন: মদ ওষুধ নয়, বরং রোগ।

আবু দারদা রা. থেকে আবুদাউদ বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'আল্লাহ্ তায়ালা রোগ ও ওষুধ দুটোই নাযিল করেছেন। প্রত্যেক রোগের জন্য ওষুধ সৃষ্টি করেছেন। কাজেই তোমরা রোগের চিকিৎসা করাও। তবে কোনো হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করাবো না।' ইসলামের পূর্বে লোকেরা ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পেতে মদ পান করতো। ইসলাম তাদের উদ্দেশ্যেও মদ পান করতে নিষেধ করেছে।

আবু দাউদ বর্ণনা করেন, দাইলাম আলহিমাইয়ারি রসূলুল্লাহ্ সা. কে জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহ্র রসূল! আমরা একটা শীত প্রধান এলাকায় বাস করি এবং আমাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। আমরা গম দিয়ে এক ধরনের পানীয় তৈরি করি, যা দ্বারা আমরা আমাদের শ্রমের জন্য শক্তি সঞ্চয় করি এবং এলাকার শীতের মোকাবিলা করি। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: তোমাদের সেই পানীয় কি মাতাল করে? দাইলাম বললেন: হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ সা. বললেন: তাহলে এটা বর্জন করো। দাইলাম বললেন: লোকেরা এটা বর্জন করবে না। রসূলুল্লাহ সা. বললেন: তারা এটা বর্জন না করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।' অবশ্য কোনো কোনো ফকিহ্ মদ দ্বারা চিকিৎসা করার অনুমতি দিয়েছেন। তবে তারা এ জন্য হারামের মত কার্যকর হালাল ওষুধ খুঁজে না পাওয়া রোগীর এ দ্বারা নেশা ও মজা উপভোগ করার ইচ্ছা না থাকা এবং চিকিৎসকের নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি ব্যবহার না করার শর্ত আরোপ করেছেন। অনুরূপ অনন্যোপায় অবস্থায় মদ পানেরও অনুমতি দিয়েছেন ফকিহগণ। উদাহরণ স্বরূপ, কেউ এক গ্লাস খাদ্য গিলেছে, কিন্তু তা গলায় আটকে গেছে। এ সময় ঐ খাবার গলা থেকে নামানোর জন্য মদ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাচ্ছেনা, এমতাবস্থায় তার জন্য মদ খাওয়া জায়েয। অথবা কেউ ঠান্ডার আতিশয্যে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, অথচ এক ঢোক বা এক গ্লাস মদ পান করা ছাড়া মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার আর কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছেনা। অথবা কেউ হৃদরোগে মৃত্যুর ঝুঁকির সম্মুখীন এবং চিকিৎসকরা তাকে জানিয়েছে যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ মদ পান না করলে এই ঝুঁকি থেকে মুক্ত হওয়া যাবেনা। এ সব অবস্থায় নিষিদ্ধ জিনিসও বৈধ হয়ে যায়।

পঞ্চাশতম অধ্যায়

শরিয়ত অনুমোদিত জবাই

সংজ্ঞা: শরিয়ত সম্মত জবাই হলো, যে জন্তু খাওয়া হালাল, তার শ্বাসনালী অথবা খাদ্যনালী কেটে তাকে হত্যা করা। মাছ ও পঙ্গপাল ব্যতীত আর কোনো হালাল প্রাণী এভাবে জবাই করা ছাড়া হালাল হয় না।

জবাই বিশুদ্ধতার জন্য যা করণীয়: শরিয়ত সম্মত জবাইর জন্য নিম্নোক্তগুলো জরুরি:

১. জবাইকারীকে সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন হতে হবে, চাই সে পুরুষ কিংবা মহিলা হোক, মুসলমান কিংবা ইহুদি কিংবা খ্রিষ্টান হোক। সে যদি মাতাল পাগল বা অপ্রাপ্তবয়স্ক হয়, তবে সে জবাইর অযোগ্য এবং তার জবাই করা জন্তু খাওয়া হালাল হবে না। অনুরূপ, মুশরেক, মূর্তিপূজারী, নাস্তিক ও ইসলাম ত্যাগীর জবাই করা জন্তুও হালাল নয়।

আহ্‌লে কিতাবের জবাই করা জন্তু: ইমাম কুরতুবি বলেন, ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ۝

'আর এমন প্রাণী খাবেনা যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি, অবশ্যই তা পাপের কাজ।' (আল-আনআম: আযাত ১২১)।

এরপর বলেছেন: وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ص وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ۝

'যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য হালাল।' (সূরা মায়িদা: আয়াত ৫)।

অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের জবাই করা জন্তু হালাল, যদিও জবাই করার সময় 'খ্রিষ্টানরা ঈসা মসিহের নামে' এবং ইহুদিরা 'উযায়েরের নামে' উৎসর্গ করে। আতা বলেন: 'খ্রিষ্টান যদিও মসিহের নামে জবাই করে, তবু তুমি তা খেতে পার। কারণ আল্লাহ্ স্বয়ং তাদের জবাইকে হালাল করেছেন। অথচ তারা কী বলে তা তিনি জানেন।'

যুহ্‌রি, রবিয়া, শাবি ও মাকহুল এবং দু'জন সাহাবি আবুদ দারদা ও উবাদা ইবনুস সামিতও একই মত পোষণ করেন।

আরেক দল ফকিহ্ বলেন: কোনো ইহুদি বা খ্রিষ্টান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবাই করেছে শুনলে তা খেয়োনা। তাউস ও হাসান এবং সাহাবিদের মধ্য থেকে আলি রা. ও আয়েশা রা. এই মতের সমর্থক। তাদের প্রমাণ সূরা আনআমের ১২১ নং আয়াত: 'এমন প্রাণী খাবে না যার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়নি। অবশ্যই তা পাপের কাজ।' ইমাম মালেকের মতে এটা মাকরূহ, হারাম নয়।

অগ্নি উপাসক ও সাবেয়িদের জবাই করা জন্তু: অগ্নিউপাসকদের জবাই করা জন্তু সম্পর্কে ফকিহ্‌দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এর কারণ অগ্নি উপাসকদের ধর্মের উৎস নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিছু ফকিহ মনে করেন তারা 'ফারফা' নামক আসমানী গ্রন্থের অনুসারী। আলি রা. এর মতও অনুরূপ। আবার কেউ কেউ বলেন: তারা মুশরিক। যারা তাদেরকে আসমানী গ্রন্থের অনুসারী মনে করেন তারা তাদের জবাই করা জন্তু হালাল মনে করেন, যেমন সূরা মায়িদার ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে। রসূল সা. বলেন; 'তাদের সাথে আহলে কিতাবের মতো আচরণ কর।'

অগ্নি উপাসকদের সম্পর্কে ইবনে হায্‌ম বলেন: 'ওরা আহলে কিতাব। কাজেই সব ব্যাপারে তাদের বিধান আহলে কিতাবের বিধানের অনুরূপ।' আবু সাওর ও যাহেরি মাযহাবের অভিমতও তদ্রূপ। কিন্তু অধিকাংশ ফকিহের মতে তাদের জবাই করা জন্তু হারাম। কেননা তাদের মতে তারা মুশরিক। আর সাবেয়িদের জবাই করা জন্তু কারো মতো জায়েয, কারো মতে নাজায়েয। (সাবেয়িদের ধর্ম অগ্নি উপাসক ও খ্রিষ্টানদের মধ্যবর্তী। তারা নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাসী।)

২. জবাই করা অস্ত্রটি এমন ধারালো হওয়া দরকার, যাতে সবেগে রক্ত প্রবাহিত হয় ও শ্বাসনালী কেটে, যেমন ছুরি, পাথর, কাঠ, তরবারি, কাঁচ, বাঁশ যার পাশ এমন ধারালো যে, ছুরির মত কাটে। হাড় দিয়েও জবাই করা যায়, কিন্তু দাঁত ও নখর দিয়ে নয়।

ক. ইমাম মালিক বর্ণনা করেন: জনৈকা মহিলা ছাগল চরাতো। তার একটি ছাগল আহত হলো। মহিলা তৎক্ষণাৎ একটা পাথর দিয়ে থাকে জবাই করলো। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ সা. কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: জবাই শুদ্ধ হয়েছে।

খ. বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো: শক্ত পাথর ও লাঠির ভাঙ্গা টুকরো দিয়ে যবাই করতে পারি? রসূল সা. বললেন: ক্ষীপ্রতার সাথে কর ও কাট। রক্ত সবেগে প্রবাহিত হলে ও আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হলে খাও। তবে দাঁত ও নখর দিয়ে কেটনা।' –মুসলিম।

গ. রসূলুল্লাহ্ সা. শয়তানের মত জবাই করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ শুধু চামড়া কাটা ও ঘাড়ের রগ না কাটা, তারপর দীর্ঘ সময় ধরে মরার জন্য রেখে দেয়া। –আবু দাউদ।

৩. শ্বাসনালী ও খাদ্যনালী কাটা জরুরি। তবে এ দুটোকে বিচ্ছিন্ন করা জরুরি নয়। ঘাড়ের দু'পাশে মোটা রগ দুটো কাটাও জরুরি নয়। কেননা ঐ দুটো দিয়ে খাদ্য ও পানীয় চলাচল করে এবং ঐ দুটো জীবনের জন্য জরুরি নয়। অথচ জীবনের অবসান ঘটানোই জবাই এর উদ্দেশ্য। মাথা বিচ্ছিন্ন করলে জবাই করা জন্তু হারাম হবে না। অনুরূপ, পেছন থেকে জবাই করলেও জবাই শুদ্ধ হবে, যদি অস্ত্র জবাই এর জায়গায় আঘাত করে।

৪. আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ: ইমাম মালেক বলেন: যে জন্তুই আল্লাহ্ নাম উচ্চারণ ব্যতিরেকে জবাই করা হোক তা হারাম, চাই ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা ভুলক্রমে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ বাদ পড়ুক। ইবনে সিরীন ও একদল আলিমের অভিমতও তদ্রূপ। ইমাম আবু হানিফা বলেন: ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ পরিত্যক্ত হলে হারাম, আর ভুলক্রমে পরিত্যক্ত হলে হালাল। ইমাম শাফেয়ি বলেন: জবাইকারী যদি জবাই এর যোগ্য হয়, তাহলে ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ পরিত্যক্ত হোক বা ভুলক্রমে হোক, হালাল হবে। আয়েশা রা. বলেন: একদল লোক বললো: হে রসূলুল্লাহ্, অনেকে আমাদেরকে গোশ্ত দিতে আসে। অথচ আমরা জানিনা ঐ গোশ্তে আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয়েছে কি হয়নি। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: তোমরা তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর ও খাও।' আয়েশা রা. বললেন: তারা অল্প কিছুদিন আগেও কাফির ছিলো। (বুখারি)।

জবাইতে যা যা মাকরূহ: ১. ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে জবাই করা: কেননা শাদ্দাদ ইবনে আউস রা. থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: আল্লাহ্ সব কাজ ভালোভাবে করার আদেশ দিয়েছেন। কাজেই তোমরা যখন কোনো জন্তু জবাই করবে তখন ভালোভাবে জবাই কর। ছুরিকে ভালোভাবে ধার দিতে হবে ও জবাই করা জন্তুকে শান্তি দিতে হবে।

২. ইবনে উমর রা. বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. জবাই এর অস্ত্র ধার দিতে ও জন্তুর দৃষ্টির আড়ালে ধার দিতে আদেশ দিয়েছেন। (আহমদ)।

৩. জবাই করা জন্তুর প্রাণ নির্গত হওয়ার আগে তার ঘাড় ভাঙ্গা বা চামড়া ছাড়ানো মাকরূহ, দারু কুতনি আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার আগে তাড়াহুড়া করো না। তবে জবাই এর পূর্বে কেবলামুখী হওয়া মুস্তাহাব এমন কোনো কথা কুরআন বা হাদিসে নেই।

মৃত্যুর মুখোমুখি বা রুগ্নাবস্থায় জবাই করা: কোনো প্রাণীকে জবাই করার মুহূর্তে যদি সে জীবিত থাকে তবে তা খাওয়া হালাল হবে, যদিও নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তার ঐ জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী হতো এবং কোনো প্রাণী ঐ অবস্থায় বেঁচে থাকেনা। অনুরূপ যে রুগ্ন প্রাণীর বাঁচার আশা নেই, তাকে জীবিত থাকতে থাকতে জবাই করা হলে তা খাওয়া হালাল। জবাই করাকালে তার প্রাণ ছিলো এটা বুঝা যাবে তার হাত

পা ও লেজের নড়াচড়া, শ্বাসপ্রশ্বাস চলা ইত্যাদি দ্বারা। কিন্তু সে যদি প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার অবস্থায় পৌঁছে যায় এবং হাত পা না নাড়ায়, তবে সে অবস্থায় তাকে মৃত প্রাণী বিবেচনা করা হবে এবং জবাই দ্বারা তাকে হালাল করা যাবে না। কারণ সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ .....

'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মরা, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের নামে যবাই করা পশু, শ্বাসরোধ মৃত জন্তু, প্রহারের মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু, তবে যা তোমরা জবাই করতে পেরেছ তা ব্যতীত।'

অর্থাৎ এ সব জন্তু তোমাদের জন্য হারাম, কেবল এগুলোর মধ্য থেকে যা তোমরা জীবিতাবস্থায় পাও ও জবাই কর। এই জবাই এগুলোকে হালাল করে।

ইমাম আব্বাস রা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো: একটা বাঘ একটা ছাগলের উপর হামলা করে তার পেট ছিঁড়ে ফেলেছে, অত:পর তার নাড়িভুড়ি বেরিয়ে পড়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে তাকে যবাই করা হয়েছে, তার কী হবে? তিনি বললেন: খাও। কিন্তু তার নাড়িভুড়ির যেটুকু বেরিয়ে গেছে তা খাবে না।

জবাইর কাজ সম্পূর্ণ না করে হাত সরানো: জবাইকারী জবাইর কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগে যদি হাত সরায়, অত:পর তৎক্ষণাৎ আবার হাত ফিরিয়ে আনে ও জবাই সম্পূর্ণ করে, তবে এটা বৈধ। কেননা সে জন্তুটিকে আহত করেছে অত:পর জীবিত থাকতেই তাকে জবাই করেছে। এমতাবস্থায় জন্তুটি আল্লাহ্র এই উক্তির আওতায় পড়ে: 'তবে যা তোমরা জবাই করতে পেরেছ তা ব্যতীত।'

জবাই করা অসম্ভব হয়ে পড়লে জন্তুকে আহত করা: যে জন্তু জবাই করলে হালাল হয়, তাকে জবাই করা সম্ভব হলে জবাইর জায়গাতেই জবাই করতে হবে। আর তা সম্ভব না হলে জন্তুর শরীরের যে কোনো স্থানে আঘাত করলেই তাতে জবাই সম্পন্ন হয়ে যাবে। তবে শর্ত এই যে, আঘাতটা যেন এমন রক্ত প্রবাহকারী হয়, যা দ্বারা হত্যা সংঘটিত করা সম্ভব হয়।

রাফে' ইবনে খাদীজ রা. বলেন: আমরা রসূলুল্লাহ্ সা. এর সাথে একটা সফরে ছিলাম। আমাদের সফর সংগীদের একটা উট সহসা ছুটে পালালো। অথচ আমাদের সাথে কোনো ঘোড়া ছিলনা। তখন এক ব্যক্তি একটা বর্শা ছুড়ে মেরে তাকে থামালো। রসূল সা. বললেন: এই সব জীবজন্তুর মধ্যে কতক আছে জংলী স্বভাবের। কাজেই তাদের মধ্যে যে জন্তু এরকম কাজ করবে, তার সাথে তোমরাও এরকম আচরণ করবে।' বুখারি ও মুসলিম।

আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি ও ইবনে মাজা আবুল আশ্রা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বললেন: হে রসূলুল্লাহ্, জবাই তো কেবল গলায় বা বুকের উপরি ভাগে হয়, তাই নয় কি? রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: তার উরুতে আঘাত করলেও যথেষ্ট হবে।' ইমাম আবুদাউদ বলেন: 'এটা শুধু পতনের কারণে মৃত ও জংলী জানোয়ারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।' ইমাম তিরমিযি বলেন: এটা শুধু অস্বাভাবিক অবস্থায় প্রযোজ্য, যেমন অবাধ্য, উচ্ছৃংখল ও ছুটে যাওয়া জন্তুর ক্ষেত্রে, যাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়না, অথবা যে জন্তু পানিতে পড়ে গেছে এবং তার ডুবে মরে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। এ ধরনের জন্তুর দিকে যদি ছোরা বা বর্শা ছুড়ে মারা হয় এবং তার ফলে তার রক্ত প্রবাহিত হয়ে মারা যায়, তাহলে তা হালাল হবে।

ইমাম বুখারি আলি, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমার ও আয়েশা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন: 'যে জন্তু তোমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, সে জন্তু শিকার করার জন্তুর মতো। আর যে জন্তু কোনো কুয়ায় পড়ে যায় তার উপর যখন যেভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যাবে সেভাবেই তাকে জবাই করা হবে।

গর্ভস্থ শিশু জবাই: কোনো জন্তুর গর্ভস্থ শিশু মায়ের পেট থেকে বের হয়ে এখনো জীবিত থাকলে,

তখনই তাকে যবাই করা ওয়াজিব। শিশু পেটে থাকা অবস্থায় তার মাকে জবাই করা হলে তার মার জবাইতেই তার জবাই সম্পন্ন হবে চাই সে জীবিত অবস্থায় পেট থেকে বের হোক বা মৃত অবস্থায়। কেননা গর্ভস্থ বাচ্চা সম্পর্কে রসূল সা. বলেছেন: 'মায়ের জবাই গর্ভের শিশুর জবাই।' (আহমদ, ইবনে মাজা, আবুদাউদ, তিরমিযি, দারকুতনি ও ইবনে হাব্বান)।

ইবনুল মুনযির বলেন: যারা বলেন মায়ের জবাইতেই বাচ্চার জবাই সম্পন্ন হবে এবং উল্লেখ করেননি যে, বাচ্চা টের পাক বা নাপাক, তাদের মধ্যে রয়েছেন আলি ইবনে আবু তালিব, সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব, আহমদ,ইসহাক, ও শাফেয়ি। শাফেয়ি বলেন: কোনো সাহাবি বা আলেম সম্পর্কে জানা যায়নি যে, গর্ভস্থ শিশুকে নতুন করে জবাই না করলে হালাল হবে না মর্মে মত প্রকাশ করেছেন। একমাত্র ইমাম আবু হানিফা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এরূপ মত প্রকাশ করেছেন। ইবনুল কাইয়েম বলেন: হাদিসে অর্থহীন ও অকাট্য ভাষায় বলা হয়েছে যে, গর্ভস্থ শিশুর জবাই তার মায়ের জবাইতেই সম্পন্ন হবে। এটা মূলনীতির পরিপন্থী। মূলনীতি হলো, মৃত জন্তু হারাম।

এ সম্পর্কে বলা যায়: রসূলুল্লাহ্ সা. এর ভাষায় মৃত জন্তু হারাম ঘোষিত হয়েছে এবং মাছ ও পঙ্গপালকে মৃত জন্তু থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। কিন্তু গর্ভের বাচ্চার ক্ষেত্রে এ কথা কিভাবে প্রযোজ্য হবে। গর্ভের বাচ্চা তো মৃত জন্তু নয়। কেননা সে তো তার মায়েরই দেহের অংশ। মায়ের জবাই দ্বারাই তো তার দেহের সকল অংশের যবাই হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তার প্রত্যেকটা অংশকে পৃথক পৃথকভাবে যবাই করার প্রয়োজন নেই। গর্ভের শিশু মায়ের অধীন ও তার দেহের অংশ। এটা যথার্থ মূলনীতির দাবি, এমনকি হাদিসে যদি তার হালাল হওয়া সম্পর্কে কিছু বলা নাও হতো তবুও মূলনীতি এ যুক্তির সাথে সংগতিপূর্ণভাবে হাদিস যখন রয়েছে তখন আর সমস্যা কোথায়? বস্তুত হাদিস মূলনীতি ও যুক্তি সবই মায়ের জবাইতে গর্ভস্থ বাচ্চার হালাল হওয়ার পক্ষে।

একান্নতম অধ্যায়

শিকার করা

সংজ্ঞা ও বিধান: শিকার করা পরিভাষাটি ইসলামে সেই হালাল প্রাণীকে ধরা অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা স্বভাবগতভাবে অপোষমানা, অবাধ্য ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

এটা মুবাহ বা হালাল। আল্লাহ্ সূরা মায়িদার ২নং আয়াতের নিম্নোক্ত উক্তি দ্বারা এটা হালাল করেছেন:

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا. 'যখন তোমরা ইহ্রাম মুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার।'

হারাম শরীফ ব্যতীত আর সকল জায়গার সকল শিকার হালাল, মুবাহ্। হারাম শরীফের শিকার সম্পর্কে হজ্জ অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। সমুদ্রে শিকার করা সর্বাবস্থায় জায়েয। আর ইহ্রাম অবস্থা ব্যতীত স্থলভাগে সব শিকার বৈধ। আল্লাহ্ বলেন:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ج وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا○

'তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ধরা ও খাওয়া হালাল করা হয়েছে, তোমাদের ও মুসাফিরদের ভোগের জন্য। আর যতোক্ষণ তোমরা ইহ্রাম অবস্থায় থাকবে ততোক্ষণ তোমাদের জন্য স্থলের শিকার ধরা হারাম করা হয়েছে।' (সূরা মায়িদা: আয়াত ৯৬)

যে শিকার হারাম: জবাইর উদ্দেশ্যে যে শিকার করা হয় সেটাই মুবাহ্। আর যে শিকারের উদ্দেশ্য জবাই করা নয় তা হারাম।

লাভজনক উদ্দেশ্য ব্যতীত প্রাণী হত্যা: রসূলুল্লাহ্ সা. খাওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যতীত কোনো প্রাণী হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। নাসায়ি ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'যে ব্যক্তি অযথা কোনো চড়ুইকে হত্যা করবে, উক্ত চড়ুই কিয়ামতের দিন এই বলে অভিযোগ করবে: 'হে আল্লাহ্, অমুক আমাকে বিনা কারণে হত্যা করেছে, এবং কোনো উপকার লাভের উদ্দেশ্যে হত্যা করেনি।'

মুসলিম ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'কোনো প্রাণীকে লক্ষ্যস্থল বানাবেনা।'

একদিন রসূলুল্লাহ্ সা. কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দেখলেন, কিছু লোক একটা পাখিকে লক্ষ্যস্থল বানিয়ে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে। তখন তিনি বললেন: 'যারা এমন কাজ করছে, আল্লাহ্ তাদের উপর অভিসম্পাত করুন।'

শিকারীর শর্তাবলী: জবাইকারীর মধ্যে যে শর্তবালী থাকা প্রয়োজন, শিকার করা জন্তু খাওয়া হালাল হওয়ার জন্য শিকারীর মধ্যেও সেই সব শর্ত থাকা জরুরি। শিকারীর মুসলমান বা কিতাবী হওয়া শর্ত। ইহুদি বা খ্রিষ্টানের শিকার তার জবাই করা জন্তুর মতোই হালাল। অনুরূপ শরয়ী জবাইর অধ্যায়ে অন্য যে সব শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, এ ক্ষেত্রেও সেই সব শর্ত প্রযোজ্য।

ক্ষত সৃষ্টিকারী অস্ত্র দ্বারা ও জন্তু দ্বারা শিকার করা: শিকার করা কখনো ক্ষত সৃষ্টিকারী অস্ত্র যথা বর্শা, তীর, তরবারি ইত্যাদি দ্বারা সম্পন্ন হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ সূরা মায়িদার ৯৪ নং আয়াতে বলেন:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ○

'হে মুমিনগণ! আল্লাহ্ অবশ্যই এমন কিছু শিকারের মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন, যা তোমাদের হাত ও বর্শা সহজেই নাগালে পায়।'

আবার কখনো শিকারী জন্তুর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যেমন আল্লাহ্ সূরা মায়িদার ৪নং আয়াতে বলেন:

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ط قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ لا وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ز فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ○

'লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে তাদের জন্য কী কী হালাল করা হয়েছে? বল, সমস্ত ভাল জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে এবং শিকারী পশুপক্ষী যাদেরকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছ যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, তারা যা তোমাদের জন্য ধরে আনে তা ভক্ষণ কর, তাতে আল্লাহ্‌র নাম নেবে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।'

আবু সালাবা খাশানি বলেন: আমি বললাম, হে রসূলুল্লাহ্, আমরা এমন একটা শিকারের এলাকায় বাস করি যেখানে ধনুক এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত কুকুর দিয়ে শিকার করি। এ ক্ষেত্রে আমার কী করণীয়? রসূলুল্লাহ সা. বললেন: যে প্রাণী ধনুক দিয়ে শিকার করেছ এবং যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেছ তা ভক্ষণ কর, আর যে প্রাণী অশিক্ষিত কুকুরকে দিয়ে শিকার করেছ, অত:পর তা জবাই করতে পেরেছ, তা ভক্ষণ কর।' (বুখারি ও মুসলিম)।

অস্ত্র দিয়ে শিকার করার শর্তাবলী: অস্ত্র দিয়ে শিকার করার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য:

১. অস্ত্রটি যেন শিকারের দেহ ক্ষত করে তার ভেতরে ঢুকে যায়। 'আদি ইবনে হাতিম বললেন: হে রসূলুল্লাহ্, আমরা তীর নিক্ষেপে অভ্যস্ত। আমাদের জন্য কী হালাল? রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: 'তোমরা যা জবাই করেছ তা ভক্ষণ কর, আর যে প্রাণীর উপর তোমরা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করেছ এবং তাকে ক্ষতি করেছ তা ভক্ষণ কর। ইমাম শাওকানি বলেন: এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হলো, একমাত্র ক্ষত করাই জরুরি, চাই তা ভোঁতা অস্ত্র দিয়েই হোক না কেন। সুতরাং আধুনিক বন্দুক দিয়ে গুলি ছুঁড়ে যে শিকার করা হয় তাও হালাল। কেননা গুলিতে অন্য অস্ত্রের চেয়ে বেশি ক্ষত হয়, কাজেই অন্য অস্ত্রের শিকার যেমন হালাল, বন্দুকের শিকারও তেমনি হালাল, কেবল গুলি করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করলেই হলো, পরে জবাই করার সুযোগ না পেলেও ক্ষতি নেই।

পক্ষান্তরে যে হাদিসে বন্দুক দ্বারা আহত কিন্তু জবাই করা হয়নি এমন প্রাণী খেতে নিষেধ করা হয়েছে এবং তাকে 'প্রহারে মৃত প্রাণী' বিবেচনা করা হয়েছে, সে হাদিসে উল্লেখিত বন্দুক দ্বারা এমন বন্দুক বুঝানো হয়েছে, যা মাটি দ্বারা বানানো হয়, অত:পর তা শুকানো হয় এবং শুকানোর পর তা দিয়ে গুলি ছোঁড়া হয়। ঐ বন্দুক গুলি-বারুদ ছোড়া বন্দুকের মত নয়। মাটির তৈরি বন্দুকের শিকার খেতে যেমন ইসলাম নিষেধ করেছে, তেমনি নিষেধ করেছে ইট পাথর বা অনুরূপ জিনিস দ্বারা মারা প্রাণী খেতেও। এর ব্যাখ্যা দিয়ে রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন ; 'ওটা কোনো শিকারও বধ করেনা, কোনো শত্রুকেও হত্যা করেনা, তবে তা কোনো প্রাণীর দাঁত ভাঙে ও চোখ উপড়ায়।'

তদ্রূপ লাঠি বা অনুরূপ কোনো ভোঁতা জিনিস দ্বারা যাকে আঘাত করা হয়, যদি তা জীবিত থাকতে থাকতে জবাই করা না হয়, তবে হারাম। আদি রা. রসূলুল্লাহ্ সা. কে বললেন: আমি তীর মেরে শিকার করি। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: তীর নিক্ষেপের ফলে যদি তা দেহে বিদ্ধ হয় তবে খাও। আর তীর তার পাশ দিয়ে চলে গেলে খাবেনা।'

২. শিকারকে তীর বর্শা বা গুলি ছোঁড়ার সময় শিকারী কর্তৃক আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা। ইতিপূর্বে আবু সা'লাবা বর্ণিত হাদিস, অন্যান্য হাদিস ও আয়াতের আলোকে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা যে শরিয়তের আলোকে প্রয়োজনীয় সে ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। মতভেদ রয়েছে শুধু এটা শর্ত কিনা সে ব্যাপারে। আবু সাওর, শা'বি, দাউদ যাহরি ও মুহাদ্দেসগণের একটি গোষ্ঠীর মত হলো, আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা সর্বাবস্থায় শর্ত। ইচ্ছায় হোক, বা ভুলক্রমে হোক, আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ না করা হলে হালাল হবে না। সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুসারে এটা ইমাম আহমদেরও মত। ইমাম আবু হানিফা বলেন: ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণে বিরত থাকলে হারাম আর ভুলক্রমে বিরত থাকলে হালাল। ইমাম মালেকের অভিমতও তদ্রূপ। ইমাম শাফেয়ি ও মালিকি ফকিহদের একদল বলেন: আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা সুন্নাত। তাই কেউ যদি এটা ইচ্ছাকৃভাবেও বর্জন করে, তবে শিকার হারাম হবে না বরং খাওয়া হালাল হবে। আল্লাহর নাম উচ্চারণের আদেশটি তাদের মতে মুস্তাহাব অর্থবোধক।

শিকারী জন্তু দ্বারা শিকার করার শর্তাবলী: বাজপাখি, চিতাবাঘ, কুকুর ইত্যাদি, যার শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা আছে, তা দ্বারা শিকার করার উপর নিম্নোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য:

১. প্রাণীটিকে শিকার শিক্ষা দেয়া। শিক্ষা কার্যকরী হচ্ছে বুঝা যাবে যদি তাকে যা আদেশ করা হয় তা করে এবং যা নিষেধ করা হয় তা থেকে বিরত থাকে।

২. ধৃত শিকার থেকে নিজে কিছু না খেয়ে মালিকের জন্য রেখে দেয়। যদি খায় তবে বুঝতে হবে সে নিজের জন্য ধরেছে এবং তার শিকার হালাল হবেনা। আদি ইবনে হাতিম বর্ণিত হাদিসে রসূল সা. তাকে বললেন: 'তোমার শেখানো কুকুরদেরকে যখন শিকার ধরতে পাঠাও এবং তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর, তখন তারা যা তোমার জন্য ধরে আনে তা খাও। আর কুকুর নিজে যদি খায় তবে খাবেনা। কেননা আমার আশংকা হয়, তার শিকার তার নিজের জন্য ধৃত।'

৩. শিকারী প্রাণীকে তার মালিক কর্তৃক আল্লাহর নাম উচ্চারণ পূর্বক পাঠানো চাই। আল্লাহ্র নাম উচ্চারণের বিধান ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। আর প্রাণীটি ইচ্ছাকৃভাবে পাঠানো শিকারের বৈধতার অন্যতম শর্ত। শিকারী প্রাণী যদি স্বতস্ফূর্তভাবে মালিক কর্তৃক তাকে না পাঠানো সত্ত্বেও বা কোনো প্রকার উৎসাহ না দেয়া সত্ত্বেও শিকার ধরতে চলে যায়, তবে তার শিকার খাওয়া ইমাম মালেক, শাফেয়ি ও আবু সাওর প্রমুখের মতে হালাল হবেনা। কেননা তাকে না পাঠানো সত্ত্বেও সে কেবল নিজের জন্য শিকার করেছে এবং এতে শিকারী প্রাণীর মালিকের কোনো ভূমিকা নেই। কাজেই এ শিকার যে তার, তা বলা যাবেনা। কেননা এর উপর আদি ইবনে হাতেমের হাদিস প্রযোজ্য নয়। শর্তের মর্মার্থ দাঁড়ায়, যাকে পাঠানো হয়নি, সে বৈধ শিকারকারী নয়। কিন্তু আতা ও আত্তযায়ি বলেন: শিকারী প্রাণীকে যখন শিকার শেখানো হয়েছে এবং তাকে শিকারের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে, তখন তার শিকার খাওয়া যাবে।

একটি শিকার ধরায় দুটি শিকারী প্রাণী শরীক হওয়া: যখন দুটো শিকারী প্রাণীকে তাদের মালিক শিকার ধরতে পাঠায়, এবং তারা উভয়ে একই শিকার ধরে, তখন তা হালাল। কিন্তু যখন দুটোর একটাকে পাঠানো হয় এবং অপরটাকে পাঠানো হয়না, তখন তা খাওয়া যাবেনা। রসূল সা. বলেছেন: 'তুমি তো তোমার কুকুর পাঠানোর সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করেছ, অন্যটা পাঠানোর সময় করনি।'

ইহুদি ও খ্রিষ্টানের শিকারী কুকুর দ্বারা শিকার করা: ইহুদি ও খ্রিষ্টানের প্রশিক্ষিত কুকুর ও বাজপাখি দ্বারা শিকার করা জায়েয যদি শিকারকারী মুসলমান হয়।

শিকারকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া: শিকারী যখন শিকারকে জীবিত অবস্থায় পায় অথচ তার কণ্ঠনালি ও শ্বাসনালি কাটা হয়ে গেছে, নাড়িভুড়ি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে এবং পেট থেকে যকৃত, পাকস্থলি ইত্যাদি বের হয়ে গেছে, তখন ঐ জন্তু আর কোনো জবাই ছাড়াই হালাল হয়ে যাবে। তবে যখন এমন অবস্থায় শিকারকে পাওয়া যাবে যে, তার মধ্যে জীবন স্থীতিশীল আছে, তখন তাকে জবাই করতেই হবে এবং জবাই ছাড়া হালাল হবে না।

শিকার আহত হওয়ার পর মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলে: শিকারকারী যখন শিকারকে আঘাত করে আহত করে, তারপর তার কাছ থেকে দূরে চলে যায়, অত:পর তাকে মৃত অবস্থায় পায়, তখন উক্ত শিকার তিন শর্তে হালাল হবে:

১. এমন না হওয়া চাই যে, তা পাহাড় থেকে পড়েছে, বা তাকে পানিতে পাওয়া গেছে। কেননা এরূপ হলে শিকার উপর থেকে পতিত হয়ে বা নিমজ্জিত হয়ে মারা গেছে এমন হয়ে থাকতে পারে। বুখারি ও মুসলিম আদি ইবনে হাতিম রা. থেকে বর্ণনা করেন: আমি (আদি) রসূলুল্লাহ্ সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: তুমি তীর নিক্ষেপ কালে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ কর, এরপর যদি দেখ সে নিহত হয়েছে, তবে তা খাও। তাকে যদি পানিতে পতিত দেখতে পাও তবে খাবেনা। কেননা তুমি জান না তাকে তোমার তীর হত্যা করেছে না পানি।'

২. শিকারীর নিশ্চিত হওয়া চাই যে, তার নিক্ষেপেই শিকার নিহত হয়েছে, আর তার মধ্যে এমন কোনো আলামত না থাকা চাই যা অন্যের নিক্ষেপ বা অন্য কোনো প্রাণীর আঘাত প্রমাণ করে। আদি রা. থেকে বর্ণিত, আমি বললাম: হে রসূলুল্লাহ্, আমি শিকারকে তীর নিক্ষেপ করি এবং পরের দিন তার দেহে আমার তীর পাই। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: 'তুমি যখন নিশ্চিত হও যে, তোমার তীরই তাকে হত্যা করেছে, এবং তার দেহে কোনো হিংস্র জন্তুর আক্রমণের চিহ্ন না পাও তখন খাও।' বুখারির এক বর্ণনায় রয়েছে:

'আমরা শিকারের দিকে তীর ছুড়ে মারি, অত:পর তার পিছু পিছু দু'তিন দিন যাই, অত:পর তাকে মৃত পাই এবং তার দেহে তীর বিদ্ধ থাকে।' রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: ইচ্ছা করলে সে খেতে পারে।

৩. শিকারের দেহে যেন এতটা বিকৃতি না আসে, যে দুর্গন্ধ হয়ে যায়। তেমন অবস্থা হলে তা হয়ে যাবে ক্ষতিকর বর্জ্য, যা খেতে মানুষের ঘৃণা হয়। আবু সা'লাবা খাশানি রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'যখন তুমি শিকারকে তীর নিক্ষেপ করলে, অত:পর শিকার তিনদিন অদৃশ্য রইল, তারপর তাকে খুঁজে পেলে, তখন দুর্গন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তা খেতে পার।' (মুসলিম)।

বায়ান্নতম অধ্যায়

কুরবানি

সংজ্ঞা: কুরবানির দিন অর্থাৎ জিলহজ্জ মাস ও আইয়ামে তাশরিকে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যে উট, গরু ও ছাগল-ভেড়া এবং মেষ-দুম্বা জবাই করা হয়, তাকে কুরবানি বলা হয়।

কুরবানি সম্পর্কে শরিয়তের বিধান: আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে কুরবানিকে শরিয়তের বিধান রূপে নির্ধারণ করেছেন:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ○ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ○ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ○

'আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। অতএব আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন ও কুরবানি করুন। আপনার দুশমনই নাম-চিহ্নহীন নির্বংশ।' (সূরা কাওসার)

আল্লাহ্ বলেন: 'উটকে করেছি আল্লাহ্র নিদর্শনগুলির অন্যতম, তোমাদের জন্য তাতে মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে ওগুলির উপর তোমরা আল্লাহ্র নাম লও।'

এ ছাড়া রসূলুল্লাহ্ সা. কুরবানি করেছেন, মুসলমানরাও কুরবানি করেছে এবং এ ব্যাপারে মুসলমানদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত চালু রয়েছে।

কুরবানির ফযিলত: ইমাম তিরমিযি আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: আদম সন্তান কুরবানির দিনে কুরবানি জন্তু যবাই করার চাইতে আল্লাহ্র কাছে অধিক প্রিয় আর কোনো কাজ করেনা। কুরবানির জন্তু কিয়ামতের দিন তার শিং, পশম ও নখরসহ আসবে, আর কুরবানির রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহ্র নিকটবর্তী স্থানে পতিত হয়। (অর্থাৎ জবাই করার সাথে সাথেই কবুল হয়।) সুতরাং তোমরা কুরবানি নিয়ে আনন্দ কর।'

কুরবানির বিধান: কুরবানি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এটা ত্যাগ করা মাকরূহ। বুখারি ও মুসলিম আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ্ সা. দুটো দুই থেকে চার বছরের শিং ওয়ালা সাদাকালো মেষ শাবক আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ ও আল্লাহু আকবর বলে নিজ হাতে জবাই করে কুরবানি করেছেন।'

মুসলিম উম্মে সালমা থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'তোমরা যখন জিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে এবং তোমাদের কেউ কুরবানি করতে ইচ্ছা করবে, তখন সে যেন তার চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকে।'

সুতরাং 'তোমাদের কেউ কুরবানি করতে ইচ্ছা করে' রসূলুল্লাহ্ সা. এর এই উক্তি থেকে প্রমাণিত হয়, কুরবানি করা ওয়াজিব নয়, সুন্নাত। আবু বকর রা. ও উমর রা. থেকে বর্ণিত, তারা তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানি করতেন না, যাতে এটাকে ওয়াজিব মনে না করা হয়।

ইবনে হায্ম বলেন: কোনো সাহাবি থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়নি যে, কুরবানি ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতে, মুসাফির নয় এমন নিসাবের অধিকারী স্বচ্ছল ব্যক্তির উপর কুরবানি ওয়াজিব। কেননা ইমাম আহমদ ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেন ও হাকেম সহিহ্ বলে আখ্যায়িত করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: যার সামর্থ্য আছে, তথাপি কুরবানি করলো না সে যেন আমাদের ঈদগাহ্ না আসে।' কিন্তু ইমামগণ এ হাদিস মওকুফ, এই মতকেই অগ্রগণ্য মনে করেন।

কুরবানি কখন ওয়াজিব: দুই অবস্থায় ব্যতীত কুরবানি ওয়াজিব হয় না:

১. যখন কেউ কুরবানি মান্নত করে। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মান্নত করে, তার আল্লাহ্র আনুগত্য করা উচিত।' এমনকি মান্নতকারী যদি মারাও যায়, তবুও মৃত্যুর পূর্বে সে যা মান্নত করেছে, তা তার পক্ষ থেকে অন্য কারো দেয়া জায়েয।

২. যদি কেউ বলে: এই জন্তু আল্লাহ্র জন্য বা এটা কুরবানির জন্তু। ইমাম মালেকের মতে, কুরবানির নিয়তে কেউ জন্তু কিনলে কুরবানি করা ওয়াজিব।

কুরবানির যৌক্তিকতা: আল্লাহ্ কুরবানিকে শরিয়তের বিধান হিসাবে চালু করেছেন ইবরাহিম আ. এর স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করা ও মানুষের জন্য ঈদের উৎসবকে দীর্ঘায়িত করার উদ্দেশ্যে। যেমন রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'এ দিনগুলো তো পানাহার ও আল্লাহ্কে স্মরণ করার দিন।'

কিসের দ্বারা কুরবানি বৈধ হয়: উট, গরু ও ছাগল, ভেড়া এবং মেষ, দুম্বা ব্যতীত অন্য কোনো জন্তু দ্বারা কুরবানি বৈধ হয় না। আল্লাহ্ সূরা হজ্জের ৩৪ নং আয়াতে বলেন:

لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ط

'আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানির নিয়ম করে দিয়েছি, যাতে আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছি সেগুলির উপর তারা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে।'

ছয় মাসের মেষ ও এক বছরের ছাগল এবং দুই বছরের গরু ও পাঁচ বছরের উট কুরবানি দেয়ার জন্য যথেষ্ট হবে, চাই নর হোক বা মাদি হোক।

১. ইমাম আহমদ ও ইমাম তিরমিযি আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: মেষ থেকে জাযা চমৎকার কুরবানির জন্তু। (জাযা হানাফি মযহাব অনুসারে ছয় মাস বয়সী মেষ এবং শাফেয়ি মযহাব অনুসারে এক বছর বয়সী মেষকে বলা হয়।

২. উক্‌বা ইবনে আমের রা. বলেন: আমি বললাম: হে রসূলুল্লাহ্, আমি একটা জাযা যোগাড় করেছি। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: ওটাই কুরবানি কর।' (বুখারি ও মুসলিম)

৩. ইমাম মুসলিম জাবির রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'মুসিন্না ব্যতীত কুরবানি করোনা। এটা যদি তোমার পক্ষে কষ্টকর হয় তবে মেষ থেকে একটা জাযা কুরবানি কর।'

মুসিন্না হচ্ছে পাঁচ বছর বয়সী উট, দুই বছর বয়সী গরু, এক বছর বয়সী ছাগল এবং এক বছর বা ছয় মাস বয়সী মেষ। শেষোক্তটির ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে যে মতভেদ রয়েছে, তা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

খাসি দ্বারা কুরবানি: খাসি দ্বারা কুরবানি করা জায়েয। ইমাম আহ্মদ আবু রাফে রা. থেকে বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ সা. দুটো সাদা কালো খাসি মেষ শাবক দিয়ে কুরবানি করেছেন, কেননা তার গোশত অধিকতর মজাদার ও ভালো।'

যে জন্তু দিয়ে কুরবানি জায়েয নেই: পশুর ক্রটি মুক্ত হওয়া কুরবানির অন্যতম শর্ত। সুতরাং ক্রটিযুক্ত পশু দ্বারা কুরবানি জায়েয নেই। (ক্রটিযুক্ত দ্বারা এমন সুস্পষ্ট ক্রটিযুক্ত পশু বুঝানো হয়েছে, যার

কারণে তার গোশত কম হয়। ছোট খাট দোষত্রুটিতে ক্ষতি নেই।) যেমন: ১. দর্শনীয়ভাবে রোগগ্রস্ত ২. এক চোখ কানা ৩. দর্শনীয়ভাবে খোঁড়া, ৪. এত বেশি ক্ষীণকায় যে, তার মস্তিস্ক বিকৃত হয়ে গেছে।

রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: চার ধরনের জন্তু জবাই করলে কুরবানি বৈধ হবেনা: দর্শনীয়ভাবে এক চোখ কানা, দর্শনীয়ভাবে রুগ্ন, দর্শনীয়ভাবে খোঁড়া এবং এতো বেশি ক্ষীণকায় যে, অস্থিতে মজ্জা নেই।' –তিরমিযি।

৫. অধিকাংশ কান বা শিং নেই এমন কানকাটা বা শিং ভাঙ্গা। সামনের চারটি দাঁত গোড়া থেকে উপড়ে গেছে, শিং এর ঢাকনা ভেঙ্গে গেছে, সম্পূর্ণ অন্ধ, এবং মাঠে ঘোরে কিন্তু ঘাস খায়না এমন জন্তুর কুরবানিও জায়েয নেই। অতিমাত্রায় চর্ম রোগে আক্রান্ত পশুরও কুরবানি শুদ্ধ হবে না।

কিন্তু জিভকাটা, লেজকাটা, গর্ভবতী, জন্ম থেকে কান নেই, অর্ধেক কান নেই, অর্ধেক নিতম্ব নেই, এমন জন্তুর কুরবানি চলবে। ইমাম শাফেয়ির বিশুদ্ধতম মত হলো, নিতম্ব ও ওলানকাটা জন্তুর কুরবানি জায়েয হবে না। কেননা খাওয়ার যোগ্য অংশ হারিয়েছে। অনুরূপ লেজকাটা জন্তুর জবাইও জায়েয নেই। ইমাম শাফেয়ি বলেন: দাঁত সম্পর্কে আমরা রসূলুল্লাহ্ সা. থেকে কিছু পাইনি।

জবাইর সময়: কুরবানির জন্য শর্ত, হলো, ঈদের দিন সূর্য ওঠার পরে ঈদের নামায পড়ার উপযুক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে জবাই করা চাই, তার আগে নয়। এরপর তিন দিনে, দিনে বা রাতে, যে কোনো সময় জবাই করা যাবে। এই তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পর কুরবানির সময় শেষ হয়ে যাবে। বারা রা. সূত্রে বর্ণিত, রসূল সা. বলেন: ঈদের দিন আমাদের প্রথম কাজ হলো নামায পড়া, তারপর বাড়িতে ফিরে যাওয়া এবং কুরবানি করা। যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে আমাদের সুন্নাত মেনে চলবে। আর যে ব্যক্তি এর আগে জবাই করবে, সে তার পরিবারের জন্য কিছু গোশ্তের ব্যবস্থা করতে পারবে বটে, তবে তার কুরবানি হবে না।'

আবু বুরদা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ সা. দশই জিলহজ্জ আমাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বললেন: 'যে ব্যক্তি আমাদের নামায পড়ে, আমাদের কেবলার মুখোমুখি হয় এবং আমাদের কুরবানি করে, সে যেন ঈদের নামায পড়ার আগে জবাই না করে।' বুখারি ও মুসলিম রসূলুল্লাহ্ সা. সূত্রে বর্ণনা করেন: 'যে ব্যক্তি নামাযের পূর্বে যবাই করে, সে কেবল নিজের জন্য জবাই করে। আর যে ব্যক্তি নামাযের পর ও দুই খুতবার পর জবাই করে সে তার কুরবানি পূর্ণ করে এবং মুসলমানদের সুন্নাত পালন করে।'

এক পরিবার থেকে এক কুরবানি যথেষ্ট: একটা ছাগল বা ভেড়া দিয়ে কেউ যদি কুরবানি করে, তবে সেটি তার জন্য ও তার বাড়ির লোকদের জন্য যথেষ্ট। একজন সাহাবিও একটা ছাগল দিয়ে নিজের ও পরিবারের সকলের পক্ষ থেকে কুরবানি করতেন। কেননা এটা সুন্নাতে ফেকায়া। ইবনে মাজা ও তিরমিযি বর্ণনা করেন, আবু আইয়ুব রা. বলেছেন: 'রসূলুল্লাহ সা. এর আমলে এক ব্যক্তি একটা ছাগল জবাই করে নিজের ও পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানি করতো। তা নিজেরা খেতো, অন্যকেও খাওয়াতো এবং লোকেরা পরস্পরে গর্ব করতো। এই রীতিই চলে আসছে যেমন দেখতে পাচ্ছো।'

কুরবানিতে একাধিক লোকের শরিক হওয়া জায়েয: উট বা গরু দ্বারা কুরবানি করলে তাতে একাধিক ব্যক্তির শরিক হওয়া বৈধ। সবাই যদি কুরবানির নিয়তে ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে আন্তরিক হয়, তবে একটা গরুতে বা উটে সাতজন পর্যন্ত শরিক হতে পারে। জাবের রা. বলেন: আমরা হোদাইবিয়াতে রসূলুল্লাহ্ সা. এর সাথে এক উট সাত জনে ও এক গরু সাত জনে কুরবানি করেছিলাম।' –মুসলিম, আবুদাউদ, ও তিরমিযি।

কুরবানির গোশ্ত বণ্টন: কুরবানিদাতার জন্য কুরবানির গোশ্ত নিজে খাওয়া, আত্মীয় স্বজনকে উপঢৌকন দেয়া ও দরিদ্রদেরকে সদকা দেয়া সুন্নাত। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: তোমরা কুরবানির গোশ্ত খাও, খাওয়াও ও সঞ্চয় করে রাখ।' আলেমগণ বলেন: এক তৃতীয়াংশ খাওয়া, এক তৃতীয়াংশ বণ্টন করা ও এক তৃতীয়াংশ সঞ্চিত রাখা সর্বোত্তম। এ গোশত অন্যত্র পাঠানো জায়েয, এমনকি দেশের বাহিরেও। তবে গোশত ও চামড়া বিক্রয় করা জায়েয নেই। (কসাইকে মজুরি হিসাবে পশুর কোনো অংশ দেয়া জায়েয নেই। তবে তার কাজের জন্য আলাদা মজুরি দেয়া জায়েয আছে।) কুরবানিদাতা কুরবানির পশুর চামড়া সদকা করতে পারে এবং তা দ্বারা নিজে উপকৃত হতে পারে। ইমাম আবু হানিফার মতে পশুর চামড়া বিক্রয় করে তার মূল্য সদকা করা এবং নিজে তা কিনে বাড়িতে ব্যবহার করা জায়েয।

কুরবানিদাতা নিজেও জবাই করতে পারবে: যে ব্যক্তি জবাইর কাজে পারদর্শী, তার পক্ষে নিজের কুরবানির পশু নিজে জবাই করা সুন্নাত। জবাই করার সময় বলবে:

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَنْ فُلَانٍ 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা হাযা আন ফুলান' (আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, হে আল্লাহ এটা অমুকের পক্ষ থেকে অমুকের স্থলে নিজের নাম বলবে।) রসূলুল্লাহ্ সা. একটা ভেড়া জবাই করে বললেন: 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার, হে আল্লাহ্, এই কুরবানি আমার পক্ষ থেকে এবং আমার উম্মাতের যারা কুরবানি করে না তাদের পক্ষ থেকে।' (আবুদাউদ, তিরমিযি)।

নিজে জবাই করতে পারদর্শী না হলে জবাই এর সময় উপস্থিত থাকা ও দেখা উচিত। রসূলুল্লাহ্ সা. ফাতেমা রা. কে বলেছিলেন: হে ফাতেমা, দাঁড়াও ও তোমার কুরবানি দেখ, কেননা ওর রক্তের প্রথম ফোটা পড়া মাত্রই তোমার অতীতের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করা হবে। তুমি বলো:

إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ-

'আমার নামায, আমার কুরবানি আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমাকে এরই আদেশ দেয়া হয়েছে এবং আমিই প্রথম আত্মসমর্পণকারী।' জনৈক সাহাবি বললেন: এটা কি শুধু আপনার ও আপনার পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট, না সকল মুসলমানের জন্য? রসূলুল্লাহ সা. বললেন: বরং সকল মুসলমানের জন্য।'

তিপ্পান্নতম অধ্যায়

আকিকা

সংজ্ঞা ও বিধান: নবজাতকের পক্ষ থেকে যে পশু জবাই করা হয় তাকে আকিকা বলা হয়।

আকিকা হচ্ছে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, এমন কি পিতা অভাবী হলেও। রসূলুল্লাহ্ সা. ও তাঁর সাহাবিগণ এটা করেছেন। আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. হাসান ও হুসাইন উভয়ের পক্ষ থেকে একটি করে ভেড়া আকিকা করেছেন। ইমাম লাইস ও দাউদ যাহেরির মতে এটা ওয়াজিব। আকিকার অন্য সকল বিধান কুরবানির মতই। কেবল আকিকায় একাধিক ব্যক্তি শরিক হতে পারে না।

ফযিলত: আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি ও ইবনে মাজা সামুরা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন:

১. 'প্রত্যেক নবজাতক তার আকিকার নিকট যিম্মী। (অর্থাৎ তার সুষ্টভাবে বেড়ে ওঠা ও পূর্ণ নিরাপত্তা আকিকার উপর নির্ভরশীল) জন্মের সপ্তম দিনে আকিকার পশু জবাই করা হবে, শিশুর চুল কামানো হবে ও নাম রাখা হবে।'

২. সালমান ইবনে আমর আস্ যাবিব থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: নবজাতকের সাথে থাকবে তার আকিকা। কাজেই তার জন্য পশু জবাই কর ও তার যাবতীয় নোংরামি ও অপবিত্রতা দূর কর।' (পাঁচটি সহিহ্ হাদিস গ্রন্থ কর্তৃক বর্ণিত)।

ছেলে ও মেয়ের পক্ষ থেকে কী জবাই করতে হবে: ছেলের পক্ষ হতে প্রায় একই বয়সের ও একই ধরনের দুটো ছাগল এবং মেয়ের পক্ষ থেকে একটা ছাগল জবাই করা উত্তম।

উম্মে কারয আল কাবিয়া রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'ছেলের পক্ষ থেকে প্রায় সমবয়সী ও প্রায় সমআকৃতির দুটো ছাগল এবং মেয়ের পক্ষ থেকে একটা ছাগল।' তবে ছেলের পক্ষ থেকে একটা ছাগল

দেয়াও জায়েয। কেননা রসূল সা. হাসান ও হুসাইনের পক্ষে থেকে একটা করে ছাগল জবাই করেছিলেন, যেমন ইতিপূর্বে হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

জবাইর সময়: সহজসাধ্য হলে জন্মের সপ্তম দিন, নচেৎ চতুর্দশ দিন, নচেৎ একুশতম দিনে জবাই করা উচিত। তাও সম্ভব না হলে যে কোনো দিন করা যেতে পারে। বায়হাকি বর্ণিত হাদিসে রয়েছে: সপ্তম দিনে, চতুর্দশ দিনে ও একুশতম দিনে জবাই করা হবে।

আকিকা ও কুরবানি এক সাথে করা: হাম্বলিগণ বলেন: আকিকার দিনের সাথে কুরবানির দিন একত্রিত হলে এ দুটোর যে কোনো একটি সম্পাদন করে উভয়টি সম্পাদনের সৌভাগ্য লাভ করা সম্ভব, যেমন ঈদের দিন ও জুমুয়ার দিন একত্রিত হলে এর যে কোনো একটির জন্য গোসল করলে উভয়টির গোসল সম্পন্ন হবে।

নাম রাখা ও চুল কামানো: নবজাতকের জন্য একটা ভাল নাম বাছাই করা, তার চুল কামানো ও কামানো চুলের ওজনে, সম্ভব হলে, রৌপ্য সদকা করা সুন্নাত। কেননা ইমাম আহমদ ও তিরমিযি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ্ সা. হাসানের পক্ষ থেকে একটা ছাগল দিয়ে আকিকা দিলেন এবং বললেন: 'হে ফাতেমা, ওর মাথা কামাও এবং মাথার চুলের ওজনে দরিদ্রদেরকে রৌপ্য সদকা করে দাও। এরপর আমরা চুল ওজন করলাম। দেখলাম, তা এক দিরহাম বা তার কিছু কম।

সর্বোত্তম নাম: মুসলিম বর্ণিত হাদিস অনুসারে সর্বোত্তম নাম আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান, আর সহিহ হাদিস অনুসারে হাম্মাম ও হারেস সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী নাম। আর ফেরেশ্‌তা ও নবীদের নামে এবং তোয়াহা ও ইয়াসীন নামেও নামকরণ করা জায়েয।

ইমাম ইবনে হায্‌ম বলেন: আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যে কোনো উপাস্য, দেবদেবী বা উপাসনালয়ের নামে নাম রাখা হারাম যথা আব্দুল উয্‌যা, আবদ হুবাল, আব্‌দ উমর ইত্যাদি। তবে আব্দুল মুত্তালিব জায়েয।

কতিপয় নামে নামকরণ করা মাকরূহ: রসূলুল্লাহ্ সা. ইয়াসার (স্বচ্ছলতা) রবাহ (মুনাফা) নাজীহ (সফল) আফলাহ (বেশি সফল) নামে নামকরণ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এগুলো ক্ষেত্র বিশেষে অশুভ লক্ষণ মনে করার উপলক্ষ হয়ে যেতে পারে। সামুরা বর্ণিত হাদিসে রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'তোমাদের ছেলের নাম ইয়াসার, রবাহ, নাজীহ ও আফলাহ রেখনা। কেননা তুমি হয়তো কখনো বলবে, সে কি ওখানে আছে? অথচ সে তখন ওখানে না থাকায় জবাব দেয়া হবে: 'নেই।' (মুসলিম)

নবজাতকের কানে আযান দেয়া: নবজাতকের ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দেয়া সুন্নাত, যাতে তার কানে আল্লাহ্ নাম সর্বপ্রথম শ্রুত হয়। আহ্‌মদ, আবুদাউদ ও তিরমিযি আবু রাফে রা. সূত্রে বর্ণনা করেন: হাসান ইবনে আলি রা. জন্ম গ্রহণের পর রসূলুল্লাহ্ সা. কে হাসানের কানে নামাযের আযান দিতে দেখেছি। ইবনুস সুন্নি হাসান ইবনে আলি রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: যার কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর তার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দেবে, তার সন্তান শিশুব্যাধিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।'

নবজাতক উপলক্ষে কয়েকটি জাহেলি প্রথা: আরবরা উটনীর প্রথম শাবককে তাদের দেবদেবীর নামে জবাই করতো এবং এর নাম ছিলো ফারা। আর রজব মাসের সম্মানার্থে একটা পশু জবাই করতো এবং এর নাম দিত উতায়রা। ইসলাম দেব-দেবীর সম্মানার্থে পশু জবাই করতে নিষেধ করেছে, জাহিলি রীতিনীতি পাল্টে দিয়েছে এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র নামে পশু জবাইকে বৈধ করেছে। আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'ফারা ও উতায়রা বৈধ নয়।' নুবায়শা রা. বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সা. কে বললো: আমরা জাহেলি যুগে রজব মাসে 'উতায়রা' জবাই করতাম। এ সম্পর্কে আপনার আদেশ কী? রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: আল্লাহ্‌র নামে যে কোনো মাসে জবাই কর এবং

আল্লাহ্‌র নামে দান কর ও খাওয়াও। সেই ব্যক্তি পুনরায় বললো: আমরা জাহেলি যুগে 'ফারা' যবাই করতাম, এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কী? রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: 'প্রত্যেক চরে খাওয়া পশুরই শাবক হয়, যাকে তোমাদের গবাদি পশু প্রতিপালন করে। যখন সেই শাবক উটে পরিণত হয়, তখন যদি তুমি তাকে জবাই কর, এবং তার গোশ্‌ত পথিকদেরকে দান কর, তবে সেটা উত্তম কাজ।' (আবু দাউদ, নাসায়ি)।

আবু রযীন বলেন আমি বললাম: হে রসূলুল্লাহ্, আমরা রজব মাসে পশু জবাই করে নিজেরা খেতাম ও অতিথিকে খাওয়াতাম। রসূলুল্লাহ সা. বললেন: এতে দোষের কিছু নেই।' ইমাম আহ্‌মদ ও নাসায়ি উমর ইবনুল হারিস রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তখন এক ব্যক্তি বললো: 'হে রসূলুল্লাহ, ফারা ও উতায়রা সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন: যার ইচ্ছা ফারা জবাই করুক বা না করুক, যার ইচ্ছা উতায়রা জবাই করুক বা না করুক, তবে ছাগল ভেড়ায় কুরবানী আছে।'

শিশুর কান ফুটানো: হাম্বলি গ্রন্থাবলীতে আছে: মেয়ে শিশুকে অলংকারের জন্য কানফুটানো জায়েয, কিন্তু ছেলেদের বেলায় এটা মাকরূহ। ফাতাওয়া 'কাজীখানে' আছে: মেয়ে শিশুর কান ফুটানোতে দোষ নেই। কেননা জাহিলি যুগে লোকেরা এটা করতো। পরে রসূল সা. এটা অপছন্দ করেননি।'

❖❖❖

চুয়ান্নতম অধ্যায়

কেফালা (জামিন হওয়া)

সংজ্ঞা: আভিধানিকভাবে কেফালার অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুকে নিজের সাথে যুক্ত করা, বুকে টেনে নেয়া। সূরা আলে ইমরানের ৩৭ নং আয়াতে আছে: 'তিনি তাঁকে (মারইয়ামকে) যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে দিলেন।' এখানে তত্ত্বাবধানে দেয়া তাঁর সাথে যুক্ত করা ও বুকে টেনে নেয়ার অর্থ থেকেই সংগৃহীত।

আর শরিয়তে বা ফিক্‌হ শাস্ত্রীয় পরিভাষায় কেফালা হচ্ছে, কোনো প্রাণী, ঋণ, বস্তু, বা কাজের দাবি জানানোর ব্যাপারে দায়বদ্ধ ব্যক্তির দায়কে এমন এক ব্যক্তি কর্তৃক নিজের দায়ের সাথে যুক্ত করা বা নিজের দায়রূপে গ্রহণ করা. যিনি তার তত্ত্বাবধায়ক বা অভিভাবক জামিন হিসাবে দায় গ্রহণে সম্মত হয়েছেন। এটা হানাফি মযহাব অনুসারে কেফালার সংজ্ঞা। অন্যান্য ইমামদের মতে, ঋণ ও দাবি জানানোর ব্যাপারে দুটি দায়কে এক সাথে যুক্ত করার নাম কেফালা।

উভয় সংজ্ঞা অনুসারেই এই কাজটির সাথে চারটি সত্তা যুক্ত: কফিল বা তত্ত্বাবধায়ক, (তথা দায় গ্রহণকারী) দায়বদ্ধ অর্থাৎ খাতক, যার জন্য দায় গ্রহণ করা হয়েছে অর্থাৎ ঋণদাতা, এবং যে জিনিস প্রদানের জন্যে দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে, অর্থাৎ সেই প্রাণী, ঋণ, বস্তু বা কাজ, যা প্রদানে খাতক দায়বদ্ধ।

কফিল বা তত্ত্বাবধায়ক বা দায় গ্রহণকারী: (জামিন) যিনি ঋণদাতার প্রাপ্য ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এরূপ ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্ক, নিজের সম্পদ ব্যবহার করার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, এবং স্বেচ্ছায় অপরের পাওনা আদায় করে দেয়া বা পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণকারী হতে হবে। (কেননা মূলত: তার উপর এই দায়িত্ব নেই। কেবল স্বেচ্ছায় গ্রহণ করার কারণেই তার উপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়।)

তাই কোনো পাগল অপ্রাপ্তবয়স্ক তত্ত্বাবধায়ক হতে পারবে না, এমনকি সে ভালোমন্দ বাছবিচারে সক্ষম হলেও নয়।

দায়বদ্ধ বা খাতক: এই ব্যক্তির প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, সুস্থমস্তিষ্ক হওয়া, উপস্থিত থাকা বা কেফালার ব্যাপারে সম্মতি দেয়া শর্ত নয়। বরং অপ্রাপ্তবয়স্ক, পাগল ও অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কফিল বা

তত্ত্বাবধায়ক হওয়া বৈধ। তবে কফিল যখন খাতকের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দেবে, তখন তার কাছে তা দাবি করতে পারবে না। বরং ওটা তার স্বেচ্ছা প্রণোদিত দান হিসাবে গ্রহীত হবে। তবে কেফালা যদি এমন অপ্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে করা হয়, যাকে ব্যবসায়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং কফিল তার আদেশক্রমেই কফিল যার জামিন হয়েছে।

যার জন্যে অন্য ব্যক্তি জামিন হয়েছে অর্থাৎ ঋণদাতা: এই ব্যক্তির জন্যে শর্ত হলো, কফিল বা জামিন যেন অবশ্যই তাকে চেনে। কেননা দাবি জানানোর ব্যাপারে মানুষের কঠোরতা ও নমনীয়তার মাত্রায় পার্থক্য রয়েছে। আর সেই অনুপাতে কেফালার উদ্দেশ্যও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং অচেনা ব্যক্তির জামিন হওয়া ধোঁকায় পর্যবসিত হতে পারে। তবে ঋণদাতা কর্তৃক তার জামিনকে চেনা শর্ত নয়।

যে বস্তু, ঋণ, কাজ বা প্রাণীর জন্যে জামিন হয়েছে: যে জিনিস দিতে বা পরিশোধ করতে খাতক দায়বদ্ধ। এর জন্য কিছু শর্ত রয়েছে, যা যথাস্থানে আলোচিত হবে।

শরিয়তে কেফালা বা জামানতের বৈধতা: কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমার আলোকে কেফালা বা জামানত বৈধ। কুরআনে আল্লাহ সূরা ইউসুফের যথাক্রমে ৬৬ নং ও ৭২ নং আয়াতে বলেন:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَأْتُنَّنِىْ بِهٖ ○ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّأَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ○

'(ইয়াকুব) বললো, আমি তাকে কখনই তোমাদের সাথে পাঠাবো না যতোক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা তাকে আমার নিকট নিয়ে আসবেই।'

এবং 'যে ওটা এনে দেবে সে এক উট বোঝাই মাল পাবে এবং আমি তার জামিন।' ইমাম আবুদাউদ ও তিরমিযি আবু উমামা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'জামিন অর্থ দায়বদ্ধ।'

কেফালাহ্ বা জামানতের বৈধতার ব্যাপারে আলেমগণ একমত। নবুয়তের যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মুসলমানরা একে অপরের জামিন হয়ে আসছে এবং আলেমদের মধ্য থেকে কেউ এটা অপছন্দ করেননি।

তাৎক্ষণিক, শর্তযুক্ত ও সময়নির্ভর জামানত: কেফালা বা জামানত তাৎক্ষণিক, শর্তযুক্ত ও সময়নির্ভর এই তিন ধরনের হতে পারে। তাৎক্ষণিক কেফালার উদাহরণ হলো, কফিল বা জামিন বলবে: 'আমি এই মুহূর্ত থেকেই অমুকের জামিন হচ্ছি ও তার তত্ত্বাবধানের ভার নিচ্ছি।' এ ছাড়া কেউ যদি বলে: 'আমি দায়িত্ব বহন করলাম, কফিল হলাম, জামিন হলাম, তত্ত্বাবধায়ক হলাম,অভিবাবক হলাম, কিংবা সে আমার দায়িত্বে রইল, সে আমার উপর ন্যস্ত রইল, তবে এ সবই কেফালা বা জামানত হবে।

এভাবে যখন কেফালা সম্পন্ন হবে, তখন তা সংশ্লিষ্ট ঋণ তাৎক্ষণিক, বা মেয়াদী বা কিস্তিভিত্তিক যে ভাবেই পরিশোধ করার চুক্তি থাকুক, কফিল বা জামিন তা সেই ভাবে পরিশোধ করতে বাধ্য হবে। তবে ঋণ যদি তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করার কথা থেকে থাকে, কিন্তু কফিল সেটিকে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিলম্বিত করার শর্ত আরোপ করে, তবে এই শর্ত বৈধ হবে। কেননা ইবনে মাজা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ সা. এমন এক ব্যক্তির দশ দিনারের ঋণের দায় গ্রহণ করেছিলেন, যা তার খাতকের উপর পরিশোধ করার অঙ্গীকার ছিলো এবং তিনি এক মাস পর পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, ঋণ যদি তাৎক্ষণিকও হয় কিন্তু কফিল নির্দিষ্ট মেয়াদের পর দেয়ার শর্তে তার দায় গ্রহণ করে, তবে এই শর্তযুক্ত দায় গ্রহণ শুদ্ধ এবং কাফিলের নিকট ঐ মেয়াদ অতিবাহিত হবার আগে পরিশোধের দাবি করা যাবে না।

আর শর্ত যুক্ত কেফালার উদাহরণ হলো, যেমন: 'তুমি যদি অমুককে ঋণ দাও তবে আমি তার জন্যে দায়ী।' সূরা ইউসুফের ৭২ নং আয়াতে যে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি ওটা এনে দেবে, সে এক উট বোঝাই মাল পাবে এবং আমিই তার জন্যে জামিন। এটাও শর্তযুক্ত জামানতের উদাহরণ।

আর সময় নির্ভর জামানতের উদাহরণ হলো, 'রমযান মাস যখন আসবে তখন আমি তোমার জামিন হব'।

এটা ইমাম আবু হানিফা ও কিছু সংখ্যক হাম্বলি ফকিহের মত। ইমাম শাফেয়ির মতে কেফালায় শর্ত প্রযোজ্য নয়।

কফিল ও খাতক উভয়ের নিকট একই সাথে ঋণ ফেরত চাওয়া: কেফালার চুক্তি যখন সম্পন্ন হবে, তখন কফিল তথা জামিন ও খাতক উভয়ের নিকট পাওনা পরিশোধের দাবি করা বৈধ। অনুরূপ দুজনের যে কোনো একজনের নিকট চাওয়াও বৈধ। এটাই অধিকাংশ আলেমের মত।

কেফালার শ্রেণীভেদ: কেফালা দু' ধরনের: ব্যক্তিগত কেফালা। আর্থিক কেফালা।

ব্যক্তিগত কেফালা: ব্যক্তিগত কেফালা হচ্ছে, কফিল কর্তৃক এই মর্মে দায়িত্ব গ্রহণ করা যে, সে যে ব্যক্তির দায়িত্ব নিয়েছে, যার জন্য দায়িত্ব নিয়েছে তাকে তার কাছে সশরীরে পৌঁছিয়ে দেবে। 'আমি অমুকের জামিন হলাম' 'অমুকের শরীরের জামিন হলাম' ইত্যাকার কথার মাধ্যমে ব্যক্তিগত কেফালা সম্পন্ন হয়। যার দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে, তার উপর যখন অন্য কারো কিছু পাওনা থাকে, তখন এ ধরনের কেফালা জায়িয। এই পাওনার পরিমাণ জানা শর্ত নয়। কেননা সে শরীরের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, সম্পদের নয়।

তবে কেফালা যখন আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তি বা হুদুদ সংক্রান্ত হয়, তখন কেফালা তথা জামানত জায়িয হবে না, চাই সে শাস্তি আল্লাহ্র হক সংক্রান্ত হোক, যেমন মদ খাওয়ার শাস্তি, অথবা মানুষের হক সংক্রান্ত হোক, যেমন অপবাদের শাস্তি। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। এর প্রমাণ আমর ইবনে শুয়াইব বর্ণিত হাদিস, যাতে রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: 'শরিয়ত নির্ধারিত কোনো শাস্তির ব্যাপারে কেফালা চলবে না।' (বায়হাকি)। এর যুক্তি হলো, এই শাস্তি যে কোনো সন্দেহের কারণে রহিত হয়ে যায়। কারো নিশ্চয়তা দানে কিছু যায় আসে না। কারণ অপরাধী ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে তা আদায় করা সম্ভব নয়।

ইমাম শাফেয়ির মতে যার উপর কোনো মানুষের হক সংক্রান্ত শাস্তি প্রযোজ্য, যেমন কিসাস ও অপবাদের শাস্তি, তাকে সশরীরে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য জামিন হওয়া জায়েয। কেননা এটা একটা সুনিশ্চিত ও অকাট্য হক। তবে আল্লাহ্র হক সংক্রান্ত শাস্তির ক্ষেত্রে কেফালা জায়েয নেই। ইবনে হায্মের মতে ব্যক্তিগত কেফালা অবৈধ। তিনি বলেন: 'সশরীরে হাজির করার দায়িত্ব গ্রহণ, চাই মালের ব্যাপারে হোক, চাই শাস্তির ব্যাপারে বা অন্য কোনো জিনিসের ব্যাপারে হোক, জায়েয নেই। কেননা আল্লাহর কিতাবে নেই এমন যে কোনো শর্ত বাতিল। যে ব্যক্তি ব্যক্তিগত কেফালা বৈধ মনে করে, তাকে জিজ্ঞাসা: যার জন্যে জামিন হয়েছে, সে যদি নিখোঁজ হয়ে যায়, তাহলে জামিনের সাথে কী আচরণ করা হবে? তাকে কি নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তির কাছে যা পাওনা ছিলো, তার জন্য দায়ী করা হবে? তা যদি করা হয় তবে তো এটা হবে যুলুম ও অবৈধ অর্থ আত্মসাৎ। কেননা সে তো কখনো এর দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। তবে কি তাকে অব্যাহতি দেয়া হবে? তা করলে তা ব্যক্তিগত জমানত বাতিল করা হবে। নাকি তার দাবির জন্য তাকে দায়ী করা হবে? তা করলে তো একটা অসাধ্য ও অসম্ভব কাজের দায় তার ঘাড়ে চাপানো হবে, যার দায়িত্ব কখনো আল্লাহ তার উপর চাপাননি।

অবশ্য একদল আলেম ব্যক্তিগত কেফালা জায়েয বলে রায় দিয়েছেন। তারা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ্ সা. একটা সন্দেহজনক বিষয়ে জামিন হয়েছিলেন। তবে এ তথ্যটি এমন দুর্বল হাদিসভিত্তিক, যা গ্রহণযোগ্য নয়।

যা হোক, যখন তাকে সশরীরে পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব কফিল গ্রহণ করেছে তখন তাকে পৌঁছিয়ে দিতেই হবে। কিন্তু জীবিতাবস্থায় তাকে পৌঁছানো অসম্ভব হলে অথবা কফিল তাকে পৌঁছানো থেকে বিরত থাকলে তার কাছে যা পাওনা, তা কফিলকেই পরিশোধ করতে হবে। কেননা রসূল সা. বলেন: 'কফিল দায়বদ্ধ।' তবে কফিল যদি শর্ত আরোপ করে থাকে যে, খাতককে সে সশরীরে পৌঁছাবে, কিন্তু মালের দায়িত্ব নেবেনা, তাহলে সে তার পাওনা পরিশোধ করতে বাধ্য হবে না। এটা মালিকি মযহাব ও মদিনার ফকিহদের মত। হানাফিরা বলেন: কফিল যার যামিন হয়েছে তাকে এনে না দেয়া বা তার মৃত্যুর খবর না

জানা পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। তারা আরো বলেছেন: মূল দায়বদ্ধ ব্যক্তি তথা খাতক যখন মারা যাবে, তখন মৃত ব্যক্তির কাছে যা পাওনা ছিল, কফিল তার জন্য দায়ী হবে না। কেননা সে তাকে শারীরিকভাবে পৌঁছানোর দায়িত্ব নিয়েছিল, তার কাছে পাওনা পরিশোধ করার নয়। কাজেই যার দায়িত্ব সে নেয়নি, তার জন্য সে দায়ী হবে না। এটা ইমাম শাফেয়ির একাধিক মতের মধ্যে অধিকতর প্রসিদ্ধ মত। মূল দায়বদ্ধ ব্যক্তি যদি নিজেই আত্মসমর্পণ করে, তবে কাফিলের আর কোনো দায়িত্ব থাকবে না। কফিল যার পাওনা পরিশোধের দায় গ্রহণ করেছে, সে মারা গেলে কফিল দায়মুক্ত হবে না বরং মৃতের উত্তরাধিকারীরা খাতককে সশরীরে পৌঁছিয়ে দেয়ার দাবি করার হকদার হবে।

আর্থিক কেফালা: আর্থিক কেফালা হচ্ছে, কফিল যাতে আর্থিক দায় গ্রহণ করে। এটা তিন প্রকার:

১. ঋণ পরিশোধ করে দেয়ার জামিন হওয়া: অর্থাৎ অন্য কোনো ব্যক্তির ঋণের বোঝা নিজের ঘাড়ে তুলে নেয়া। সাল্মা ইবনে আক্ওয়া' বর্ণনা করেন: রসূল সা. একজন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়তে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন আবু কাতাদা বললেন: হে রসূল, ওর জানাযার নামায পড়ুন, ওর ঋণের দায় আমি নিলাম। তখন রসূলুল্লাহ্ সা. তার জানাযা পড়লেন। (বুখারি ও আহমদ)।

অধিকাংশ আলেমের মতে মৃত ব্যক্তির জন্যে জামিন হওয়া বৈধ এবং যে ব্যক্তি জামিন হবে, সে ঐ মৃতের মাল থেকে কোনো দাবি করতে পারবে না। ঋণ পরিশোধের জামিন হওয়ার জন্যে দুটো শর্ত:

ক. জামিন হওয়ার সময় ঋণ বহাল থাকা: যথা, ধার গ্রহণজনিত ঋণ, মূল্য বাকি পড়া জনিত ঋণ, শ্রমের অপরিশোধিত মজুরি ও অপরিশোধিত দেনমোহর। এ সব ঋণ যদি বহাল না থাকে তবে কেফালা বৈধ হবে না। কেননা যে ঋণ পাওনা নেই, তার জামিন হওয়া অশুদ্ধ। এর উদাহরণ হলো কাউকে বলা: 'অমুকের কাছে জিনিসটা বেচে দাও, ওর মূল্যের জন্যে আমি দায়ী হলাম', অথবা 'অমুককে ঋণ দাও, আমি তা পরিশোধের দায়িত্ব নিলাম'। ইমাম শাফেয়ি, ইমাম মুহাম্মদ ও যাহেরি মযহাবের মতানুসারে এটা জায়েয নয়। কিন্তু আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আবু ইউসুফের মতে জায়েয। তাদের মতে, যা এখনো পাওনা হয়নি, তার জামিন হওয়াও জায়েয।

খ. যে মালের জামিন হবে, তা পরিচিত ও নির্দিষ্ট হওয়া চাই। অজানা মালের জামিন হওয়া বৈধ হবে না। কেননা এতে ধোঁকার অবকাশ থাকে। উদাহরণ স্বরূপ কেউ যদি বলে, 'অমুকের কাছে তোমার যা পাওনা আছে আমি তার জামিন হলাম' অথচ দুজনের কেউই তার পরিমাণ জানেনা, তবে এটা জায়েয হবে না। এটা ইমাম শাফেয়ি ও ইবনে হাযমের মত। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের মতে অজানা মালের জামিন হওয়াও জায়েয।

২. সুনির্দিষ্ট বস্তুর জামিন হওয়া: অর্থাৎ অন্যের হাতে রয়েছে এমন সুনির্দিষ্ট বস্তু হস্তান্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করা। যেমন জবরদখলকৃত বস্তুকে জবরদখলকারীর নিকট ফিরিয়ে দেয়া এবং বিক্রীত পণ্য ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা। এখানে শর্ত হলো, যে বস্তুর জামিন হয়েছে, তা যেন যার জন্যে জামিন হয়েছে, অর্থাৎ খাতকের জন্যে ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা প্রাপ্ত হয়। জবরদখলকৃত বস্তুর ক্ষেত্রে হয়। ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা যদি না হয়, যেমন ধারে নেয়া জিনিস ও আমানত হিসাবে রক্ষিত জিনিস তাহলে কেফালা জায়েয হবেনা।

৩. ঝুঁকি এড়ানোর জামিন হওয়া: অর্থাৎ বিক্রীত মালের উপর বিক্রয়ের আগেকার কোনো কারণ বশত: ঝুঁকি থাকলে তার জামিন হওয়া। অন্য কথায়, বিক্রয়ের পর যখন বিক্রীত মালের অন্য কোনো হকদার আত্মপ্রকাশ করে, তখন ক্রেতার প্রাপ্য যে ঝুঁকির সম্মুখীন হয়, তা থেকে তাকে উদ্ধার করার নিশ্চয়তা দেয়া ও বিক্রেতার বিপক্ষে ক্রেতার জন্যে নিশ্চিত ও নিরাপদ করা। উদাহরণ স্বরূপ, বিক্রয়ের পর জানা গেল, পণ্যটির মালিক বিক্রেতা নয়, অন্য একজন, অথবা ওটা বন্ধকী মাল।

জামিন কর্তৃক খাতকের কাছে পাওনা দাবি করা: জামিন যখন খাতকের ঋণ পরিশোধ করে দেয়, তখন সে যদি খাতকের অনুমতি বা অনুরোধক্রমে জামিন হয়ে থাকে ও পরিশোধ করে থাকে, তবে

খাতকের নিকট তা দাবি করতে পারবে। কেননা সে ঐ ব্যক্তিকে তার অনুমতিক্রমে নিজের সম্পদ ব্যয় করে উপকৃত করেছে। এ বিষয়ে চার ইমামেরই মতৈক্য রয়েছে। তবে তার অনুমতি বা আদেশ ব্যতীত জামিন হলে ও ব্যয় করলে তা দাবি করতে পারবে কিনা, তাতে মতভেদ রয়েছে ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আবু হানিফা বলেন: সে স্বেচ্ছায় ব্যয় করেছে কাজেই সে এটা চাইতে পারবে না। ইমাম মালেকের মতে, চাইতে পারবে। ইমাম আহ্মদের দুটি মত বর্ণিত: একটি মত অনুসারে চাইতে পারবে, অপর মত অনুসারে চাইতে পারবে না। ইমাম হায্ম বলেন: অনুরোধ বা অনুমতি নিয়ে জামিন হোক ও ব্যয় করুক, বা অনুমতি ও অনুরোধ ছাড়াই জামিন হোক ও ব্যয় করুক, যা ব্যয় করেছে তা চাইতে পারবে না। তবে খাতক যদি তার কাছে ধার চেয়ে থাকে, তবে চাইতে পারবে। ইবনে হায্ম বলেন: ইবনে আবি লায়লা, ইবনে শাব্রুমা, আবু নুর ও আবু সুলায়মান আমাদের মতের অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

কেফালার কয়েকটি বিধি: ১. কোনো ব্যক্তি যখন কারো জামিন হয়, তখন যার জামিন হয়, সে যদি নিখোঁজ হয় বা মারা যায়, তবে জামিন তার জন্য দায়ী হবে। নিজের পক্ষ থেকে অথবা যার জামিন হয়েছে তার কাছ থেকে নিয়ে পাওনা পরিশোধ করা, ঋণদাতা কর্তৃক তাকে ঋণ পরিশোধ থেকে অব্যাহতি দেয়া, অথবা নিজেই জামিন হওয়া থেকে অব্যাহতি নেয়া ছাড়া সে এই দায় এড়াতে পারে না। সে জামিন হওয়া থেকে অব্যাহতি নিতে পারে। কেননা এটা তার অধিকার।

২. ঋণদাতার ক্ষমতা রয়েছে কেফালার চুক্তি বাতিল করার, চাই তাতে খাতক বা জামিন সম্মত হোক বা না হোক। তবে খাতক বা জামিনের এ ক্ষমতা নেই।

পঞ্চান্নতম অধ্যায়

মুসাকাত

সংজ্ঞা: শরিয়তের পরিভাষায় গাছে পানি সেচ দিয়ে বড় করা ও ফল উৎপন্ন করা তার বিনিময়ে গাছের ফলের নির্দিষ্ট অংশ মালিক ও সেচদাতার মধ্যে ভাগ করে নেয়াকে মুসাকাত বলা হয়। এটা আসলে গাছ থেকে ফল ফলানোর উদ্দেশ্যে পরিচালিত যৌথ কৃষি কাজ। এতে গাছ থাকে এক পক্ষের, আর গাছের উপর কাজ করে আরেক পক্ষ এবং গাছ থেকে যে ফল পাওয়া যায় তা উভয় পক্ষের সম্মত হারে যথা অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশের হারে ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়া হয়। যে ব্যক্তি গাছে সেচ দেয় তাকে মুসাকি বলা হয়। যে গাছ জমিতে কম পক্ষে এক বছর টিকে থাকে এবং যার কাটার কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ বা সময় নেই, সেই গাছই এর আওতাধীন, চাই তা ফলজ হোক বা বনজ হোক। গাছ যদি বনজ হয়, তবে মুসাকি বা সেচকারী তার কাজের বিনিময়ে গাছ থেকে প্রাপ্ত জ্বালানী কাঠ, তক্তা ইত্যাদির ভাগ পাবে।

বিধান: মুসাকাত কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে বৈধ প্রমাণিত। ইমাম আবু হানিফা ব্যতীত অন্য সকল ফকিহের মতেও এটা বৈধ। যারা এটা বৈধ মনে করেন তাদের প্রমাণ নিম্নরূপ:

১. ইবনে উমর রা. থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ্ সা. খয়বরবাসীর সাথে সেখানকার উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের বিনিময়ে কৃষি কাজের চুক্তি করেন।

২. ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন, আনসারগণ রসূলুল্লাহ্ সা. কে বললেন: আমাদের (মুহাজির) ভাইদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে খেজুরের বাগান ভাগ করে দিন। রসূলুল্লাহ সা. বললেন: না। তখন তারা বললেন: তবে শ্রমের দায়িত্ব আপনারা নিন। আর আমরা ফলের ভাগ আপনাদেরকে দেই? তখন রসূল সা. বললেন: শুনলাম ও মেনে নিলাম।

আনসারগণ মুহাজিরদেরকে খেজুরের বাগানের শরীক করতে চেয়েছিলেন এবং রসূল সা. কে সে জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখান করেন। তখন তারা তাকে খেজুর বাগানের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ এবং এর বিনিময়ে তাদেরকে অর্ধেক ফল দেয়ার প্রস্তাব দেয়। এই প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করেন।

'নাইলুল আওতার' গ্রন্থে আছে, হাযেমি বলেন: আলি ইবনে আবু তালিব রা. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. আম্মার ইবনে ইয়াসার রা. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন, উমর ইবনে আব্দুল আযিয, ইবনে আবি লায়লা, ইবনে শিহাব যুহরি, বিচারপতি আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বলেন: যৌথ কৃষি কাজ ফসলের বা ফলের অংশ বিশেষের বিনিময়ে জায়েয, যেমন খয়বরে হয়েছিল।

মুসাকাতের মূল উপাদান: মুসাকাতের মূল উপাদান দুটি: ১ ইজাব (প্রস্তাব দেয়া) ২ কবুল (প্রস্তাব গ্রহণ) মৌখিকভাবে, লিখিতভাবে বা ইশারায় এমন যে কেউ ইজাব ও কবুল করলে মুসাকাতের চুক্তি সম্পাদিত হবে, যার চুক্তি সম্পাদনের শরিয়ত সম্মত যোগ্যতা রয়েছে।

শর্তাবলী: মুসাকাতের শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১. যে গাছ সম্পর্কে মুসাকাতের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে বা হবে, তা যেন দেখে বা বিবরণের মাধ্যমে জানা যায়। কেননা কোনো অজানা জিনিসের উপর চুক্তি জায়েয নেই।

২. এর মেয়াদ জানা থাকা চাই, যাতে কোনো অস্বচ্ছতা, অস্পষ্টতা ও ধোঁকার সম্ভাবনা না থাকে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ বলেন: মেয়াদ স্পষ্ট করে জানানো মুসাকাতের জন্য শর্ত নয়। কেননা ফল বা ফসল কখন পাকে তা প্রায় সবাই জানে এবং সামান্যই হেরফের হয়। যাহেরি মযহাবের মতে এটা আদৌ শর্ত নয়। তাদের প্রমাণ হচ্ছে ইমাম মালেক বর্ণিত হাদিস, রসূলুল্লাহ্ সা. ইহুদিদেরকে বলেছিলেন: 'আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে বিধি নির্ধারণ করেছেন, আমিও তাই নির্ধারণ করছি।' হানাফিদের মত হলো: ফল পাকার আগে মুসাকাতের মেয়াদ শেষ হলে গাছগুলোকে মুসাকির তদারকিতে রাখা হবে এবং সে ফল পাকা পর্যন্ত বিনা মজুরিতে তার কাজ করে যাবে।

৩. মুসাকাতের চুক্তি ফলের পরিপক্কতার স্তরে পৌঁছার আগে সম্পাদন করতে হবে। কেননা ঐ স্তরে থাকতে তার কাজ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পরিপক্কতা লাভের পর কোনো কোনো ফকিহের মতে মুসাকাত জায়েয নেই। কেননা তখন তার আর প্রয়োজন থাকে না, আর এরপর এ কাজ করা হলে তা হবে ইজারা, মুসাকাত নয়। কোনো কোনো ফকিহের মতে, পরিপক্কতা লাভের পরও মুসাকাত জায়েয। কেননা আল্লাহ্ ফল সৃষ্টি করার আগে যখন মুসাকাত জায়েয করেছেন, তখন ফল সৃষ্টির পরে তো আরো ভালোভাবে জায়েয হবে।

৪. অর্ধেক হোক বা এক তৃতীয়াংশ হোক, ফলের একটা অংশ মুসাকির জন্য আগে ভাগেই নির্ধারণ করে দিতে হবে। মুসাকি বা মালিকের জন্য গাছ নির্ধারণ বা পরিমাণ নির্ধারণ অবৈধ। 'বিদায়াতুল মুজ্‌তাহিদ' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে: 'যারা মুসাকাতের বৈধতার পক্ষপাতী, তারা একমত যে, সেচের সমস্ত খরচ মালিকের, আর শ্রম দেয়া ছাড়া মুসাকির আর কোনো দায়িত্ব নেই এ নীতির ভিত্তিতে মুসাকাত জায়েয নেই। কেননা এমন একটা জিনিসের বিনিময়ে এ ধরনের চুক্তি করা হয়, যা এখনো সৃষ্টিই হয়নি।

উল্লেখিত শর্তাবলীর একটিও বাদ পড়লে মুসাকাত বাতিল হবে। তথাপি এ ধরনের চুক্তির ভিত্তিতে মুসাকি যদি কাজ করে এবং তার কাজের কারণে গাছে ফল ধরে, তবে সে প্রচলিত নিয়মে মজুরি পাবে এবং গাছের ফল মালিকের থাকবে।

কিসে কিসে মুসাকাত জায়েয: মুসাকাত কিসে কিসে জায়েয তা নিয়ে ফকিহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম দাউদের মতে শুধু খেজুর গাছে, শাফেয়ির মতে খেজুর ও আঙ্গুরে, এবং হানাফিদের মতে মাটিতে যে সব উদ্ভিদের শিকড় বদ্ধমূল থাকে, এবং যা পেটে নিলেও তার শেকড় থেকে আবার

উদ্ভিদ জন্মে যেমন ইক্ষু, এ ধরনের সকল গাছেই মুসাকাত জায়েয। যখন মুসাকাতের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়না, তখন চুক্তি সম্পাদনের পর ফসল কাটার প্রথম যে সময় আসবে, সেই সময় পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ নির্ধারিত হবে।

ইমাম মালেকের মতে মুসাকাত সকল স্থায়ী শিকড়ধারী উদ্ভিদ যথা ডালিম, আঙ্গুর যয়তুন প্রভৃতিতে বিনা প্রয়োজনেও বৈধ। আর যে সকল উদ্ভিদের শিকড় থেকে গাছ জন্মে না, যেমন বাংগি ইত্যাদি, সেগুলোর মালিক চাষাবাদে অক্ষম হলে মুসাকাত জায়েয। অনুরূপ, শস্য ফলানোর ক্ষেত্রেও মুসাকাত জায়েয। আর হাম্বলি মযহাবে এমন প্রত্যেক ফলে মুসাকাত জায়েয, যা মানুষে খায়। 'আল মুগনি' গ্রন্থে বলা হয়েছে: যে গাছে সেচ লাগে এবং যে গাছে সেচ লাগেনা উভয়টাতে মুসাকাত জায়েয। ইমাম মালিকের মতও তাই এবং এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই।

মুসাকির দায়িত্ব: ইমাম নববি বলেন: ফসল ও ফলের উৎপাদন বাড়াতে ও সংস্কার করতে যা যা করা দরকার, তা করা মুসাকির কর্তব্য, চাই তা বছরে একাধিকবার করার প্রয়োজন হোক, যেমন সেচ দেয়া, খাল সংস্কার করা, গাছের গোড়া পরিষ্কার করা, গাছের পরাগায়ন, আগাছা পরিষ্কার করা, ডালপালা ছাঁটা, ফল ও তার চারার সুরক্ষা ইত্যাদি। তবে যে সব কাজ দ্বারা গাছের মূল ও শেকড়ের সুরক্ষা হয় এবং বছরে একাধিকবার করতে হয়না, যেমন প্রাচীর নির্মাণ, খাল খনন, সে সব কাজ করা মালিকের দায়িত্ব।

যখন মুসাকি কাজে অক্ষম হয়ে পড়ে: কোনো দুর্যোগের কারণে বা অনিবার্য সফরের কারণে যখন মুসাকি তার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয় তখন মুসাকাতের চুক্তি বাতিল গণ্য হবে। অবশ্য মালিক যদি মুসাকি স্বয়ং কাজ করতে হবে এরূপ শর্ত আরোপ না করে থাকে, তাহলে বাতিল হবে না, বরং সে অন্য কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করতে পারবে। এটা হানাফি মযহাবের মত। তবে ইমাম মালেক বলেন: মুসাকি যদি ফল বিক্রয়ের সময় সমাগত হওয়ার কাজে অক্ষম হয় তাহলে অন্য কাউকে মুসাকি নিয়োগ করা তার পক্ষে বৈধ হবে না। বরং তাকে অন্য শ্রমিক নিযুক্ত করতে হবে এবং তার মজুরি দেয়ার ক্ষমতা না থাকলে তার প্রাপ্য ফসলের অংশ থেকে মজুরি দেবে। শাফেয়ির মতে মুসাকির অক্ষমতায় মুসাকাতের চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

মুসাকাত চুক্তির পক্ষদ্বয়ের যে কোনো পক্ষ মারা গেলে: দুই পক্ষের এক পক্ষ যখন মারা যায় তখন গাছের ফল না পেকে থাকলে উভয় পক্ষের স্বার্থে মুসাকি অথবা তার উত্তরাধিকারী কাজ চালিয়ে যাবে, যতোক্ষণ না ফল পাকে। এ জন্য প্রয়োজনে মালিক বা তার উত্তরাধিকারীদের উপর বলপ্রয়োগ করতে হবে। কেননা এতে দুপক্ষের কারো ক্ষতি নেই। চুক্তি বাতিল হওয়া থেকে নিয়ে ফল পাকা পর্যন্ত সময়ের জন্য মুসাকি কোনো মজুরি পাবেনা। আর যদি মুসাকি বা তার উত্তরাধিকারীরা মেয়াদ শেষ অথবা চুক্তি বাতিল হওয়ার পর কাজ করা থেকে বিরত হয় তবে তাদের উপর জবরদস্তি করা যাবে না। অবশ্য তারা যদি ফল পাকার আগে তা কাটতে চায় তবে তাদেরকে সেটা করতে দেয়া যাবে না। এ ক্ষেত্রে মালিক বা তার উত্তরাধিকারীরা নিম্নের তিনটে পন্থার যে কোনো একটি অবলম্বন করতে পারবেন:

১. উভয় পক্ষের মতৈক্যের ভিত্তিতে ফল কাটা ও তা ভাগ করে নেয়া।

২. মুসাকি বা তার উত্তরাধিকারীদেরকে তাদের প্রাপ্য যা কাটার যোগ্য অংশের মূল্য মুদ্রার মাধ্যমে দেয়া।

৩. ফল পাকা পর্যন্ত গাছের উপর খরচ করতে থাকা, অত:পর মুসাকি বা তার উত্তরাধিকারীদের নিকট সেই খরচ চাওয়া অথবা তার বিনিময়ে ফল নেয়া। শেষোক্ত পন্থাটি হানাফি মযহাবের মত।

❖❖❖

ছাপ্পান্নতম অধ্যায়

অনিশ্চিত কাজের চুক্তি (জোয়ালা)

যে কাজে সফলতার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু অনিশ্চিত, সে কাজের জন্যে মজুরিসহ চুক্তি করা প্রয়োজনের খাতিরে জায়েয আছে। যেমন: কেউ ঘোষণা করে দিলো: 'যে ব্যক্তি তার হারানো দ্রব্য বা পালিয়ে যাওয়া জন্তুর সন্ধান দেবে বা এনে দেবে, বা তার জন্য প্রাচীর নির্মাণ করে দেবে বা পানি পাওয়া পর্যন্ত কুয়া খনন করে দেবে, কিংবা তার ছেলেকে কুরআনের হাফেজ বানিয়ে দেবে, রোগীর চিকিৎসা করে আরোগ্য করে দেবে বা অমুক প্রতিযোগিতায় জিতলে তাকে অমুক পুরস্কার বা প্রতিদান দেয়া হবে।'

বৈধতা: পবিত্র কুরআনে সূরা ইউসুফের ৭২ নং আয়াতে আছে:

وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

'যে ব্যক্তি (বাদশার হারানো পানপাত্র) এনে দেবে, তাকে এক উট বোঝাই মাল দেয়া হবে এবং আমিই তার জামিন।'

তাছাড়া ইতিপূর্বে ইজারা অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, রসূল সা. সূরা ফাতিহার তাবিজ দেয়ার পারিশ্রমিক নেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। এই দুটি প্রমাণই এর বৈধতা প্রতিপন্ন করে। এটা প্রয়োজনের খাতিরেই অনুমোদিত হয়েছে এবং অন্যান্য চুক্তিতে যে অজ্ঞতা বৈধ নয়, এখানে বৈধ।একাজটির সফলতা অজানা।

এ ধরনের কাজের চুক্তিতে চুক্তির উভয় পক্ষের উপস্থিতি প্রয়োজন নেই, যেমন অন্যান্য চুক্তিতে প্রয়োজন রয়েছে। এটা এমন এক বৈধ চুক্তি, যা এর দু'পক্ষের যে কোনো এক পক্ষের একতরফভাবে বাতিল করার অধিকার রয়েছে। এমনকি যে পক্ষ ঘোষিত কাজ করে দিতে সম্মত হয়েছে, সে ইচ্ছা করলে কাজ শুরু করার আগেও চুক্তি বাতিল করে দিতে পারে, আর যদি নিজের পাওনা ছেড়ে দিতে রাজি থাকে তবে কাজ শুরু করার পরও বাতিল করতে পারে। কিন্তু উদ্যোক্তা পক্ষ অপর পক্ষ কাজ শুরু করার পর চুক্তি একতরফাভাবে বাতিল করার অধিকার রাখেনা।

কোনো কোনো ফকীহ এ ধরনের চুক্তি আদৌ বৈধ নয় বলে মত প্রকাশ করেছে। তাদের মধ্যে ইব্‌নে হায্‌ম অন্যতম। তিনি বলেন:

'অনিশ্চিত-অজ্ঞাত কোনো কাজের চুক্তি করা বৈধ নয়। কেউ যদি বলে: তুমি আমার পালিয়ে যাওয়া ঘোড়াটা এনে দিলে তোমাকে এক দিনার দেব, অথবা তুমি অমুক কাজ করে দিলে তোমাকে এক দিরহাম দেব' অত:পর সে তা নিয়ে এলো, তবে তাকে কিছুই দিতে আদেশ দেয়া হবে না। অবশ্য সে যদি তার ওয়াদা পালন করে তবে তা মুস্তাহাব গণ্য হবে। তবে সে যদি এ জন্যে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করে কাউকে ভাড়া করে বা নিয়োগ করে, অথবা একটা পরিচিত স্থান থেকে তাকে এনে দিতে বলে তাহলে যে মজুরি তার জন্য স্থির করেছে, তা তাকে দিতে হবে। অন্য একদল ফকিহ্ এ ধরনের চুক্তি করলে তা পালন করা ওয়াজিব বলে রায় দিয়েছেন। তাদের প্রমাণ সূরা মায়িদার প্রথম আয়াতের এ উক্তি: 'হে মুমিনগণ, তোমরা চুক্তিসমূহ পালন কর।' তাছাড়া সূরা ইউসুফের ইতিপূর্বে উল্লেখিত ৭২ নং আয়াতও এর প্রমাণ।

সাতান্নতম অধ্যায়

অংশীদারিত্ব বা শির্কাত

সংজ্ঞা: ফিকহের পরিভাষায় শিরকাত বা অংশীদারী হচ্ছে, মূলধন ও মুনাফায় অংশ গ্রহণকারী দুই ব্যক্তির চুক্তি। (এটি হানাফি মযহাবের অনুমোদিত সংজ্ঞা।)

বৈধতা: কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা দ্বারা এর বৈধতা প্রমাণিত। কুরআনের সূরা নিসার ১২ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন: فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ 'তারা এক তৃতীয়াংশে শরিক হবে।' এবং সূরা সাদের ২৪নং আয়াতে বলা হয়েছে:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ○

'শরিকদের অনেকে একে অপরের উপর অবিচার করে থাকে।' অবশ্য যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তারা এক ব্যতিক্রম, আর তাদের সংখ্যা অতিনগণ্য।

হাদিসে রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন, আল্লাহ্ বলেন: 'দুইজন শরিকের একজন যতোক্ষণ অপরজনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে, ততোক্ষণ আমি তাদের তৃতীয় শরিক। একজন যদি তার সাথীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে আমি তাদের উভয়ের মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসি।' –আবু দাউদ। অর্থাৎ আল্লাহ্ দুই শরিকের সম্পদে বরকত দেন এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ করেন যতোক্ষণ তারা একে অপরের সাথে খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা না করে। যখন তাদের একজন বিশ্বাসঘাতকতা করে, তখন আল্লাহ্ বরকত প্রত্যাহার করেন।

যায়েদ বলেন: আমি ও বারা উভয়ে শরিক ছিলাম। (বুখারি) ইবনুল মুন্যির বলেন: আলেমগণ শিরকাতের বৈধতা সম্পর্কে একমত।

শিরকাতের প্রকারভেদ: শিরকাত দুই প্রকার: মালিকানার শিরকাত ও চুক্তি ভিত্তিক শিরকাত।

মালিকানায় শিরকাত বা যৌথ মালিকানা: একই জিনিসে বিনা চুক্তিতে একাধিক ব্যক্তির মালিকানা লাভকে মালিকানায় শিরকাত বলা হয়। এটি আবার দুই ধরনের: ইচ্ছাকৃত ও বাধ্যতামূলক। ইচ্ছাকৃতভাবে মালিকানায় শিরকাতের উদাহরণ হলো, একাধিক ব্যক্তিকে একটি জিনিস দান করা বা ওসিয়ত করা এবং উক্ত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক তা গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে দান বা ওসিয়ত সূত্রে প্রাপ্ত জিনিসটি তাদের সম্মিলিত বা যৌথ মালিকানাভুক্ত হবে, অনুরূপ, যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি তাদের জন্যে কোনো বস্তু খরিদ করে, তখন খরিদকৃত বস্তুটি তাদের যৌথ মালিকানার অধীন থাকবে। আর মালিকানায় বাধ্যতামূলক শিরকাত হলো, যে শিরকাত অনিচ্ছাকৃত ভাবে একাধিক ব্যক্তির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমন উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এখানে উত্তরাধিকারীরা তাদের ইচ্ছা ব্যতিরেকেই কোনো সম্পত্তির মালিক হয়ে থাকে এবং তাদের মালিকানা হয় শিরকাতের মালিকানা বা যৌথ মালিকানা।

যৌথ মালিকানায় বিধান: এ ধরনের শিরকাতের বিধান হলো, কোনো শরিকের জন্য তার অপর শরিকের অংশে হস্তক্ষেপ করা তার বিনা অনুমতিতে জায়েয নয়। কেননা এক শরিকের অংশে অপর শরিকের কোনো অধিকার নেই। এ ক্ষেত্রে সে তার নিকট একজন অপরিচিত ব্যক্তি।

চুক্তিভিত্তিক শিরকাত: দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক একটি সম্পত্তিতে শরিক হওয়া ও তা থেকে যে মুনাফা অর্জিত হবে, তাতে শরিক হওয়ার চুক্তি সম্পাদন করাকে চুক্তিভিত্তিক শিরকাত বলা হয়।

চুক্তিভিত্তিক শিরকাতের প্রকারভেদ: চুক্তিভিত্তিক শিরকাত বা যৌথ মালিকানা চার প্রকার:

১. অসম অংশীদারিত্ব ভিত্তিক যৌথ মালিকানা (শিরকাতুল ইনান)
২. সম অংশীদারিত্ব ভিত্তিক যৌথ মালিকানা (শিরকাতুল মুফাওয়াযা)
৩. মূলধন ব্যতীত যৌথ ব্যবসায় (শিরকাতুল উজুহ)
৪. শ্রমে অংশীদারিত্ব ভিত্তিক যৌথ ব্যবসায় (শিরকাতুল আবদান)

শিরকাতের মূল উপাদান: শিরকাতের মূল উপাদান হচ্ছে ইজাব বা কবুল। একজনে বলবে: তোমাকে অমুক কাজে শরিক করলাম, আর অপরজন বলবে: আমি গ্রহণ করলাম।

বিধান: হানাফি মযহাব অনুসারে উল্লিখিত সব কয় প্রকারের শিরকাত নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ সাপেক্ষে বৈধ। মালেকি মযহাব অনুসারে 'শিরকাতুল উজুহ' অর্থাৎ মূলধন বিহীন যৌথ ব্যবসায় ব্যতীত আর সবগুলো বৈধ। শাফেয়ি মযহাবে 'শিরকাতুল ইনান' অর্থাৎ অসম অংশীদারিত্ব ভিত্তিক শিরকাত ব্যতীত আর সব বাতিল। আর হাম্বলি মযহাবে 'শিরকাতুল মুফাওয়াযা' অর্থাৎ সম অংশীদারিত্ব ভিত্তিক শিরকাত ব্যতীত আর সবগুলো বৈধ।

শিরকাতুল ইনান বা অসম অংশীদারিত্ব ভিত্তিক শিরকাত: শিরকাতুল ইনান বা অসম অংশীদারিত্ব ভিত্তিক শিরকাত হলো, দুই ব্যক্তি কর্তৃক তাদের কোনো সম্পত্তিতে এরূপ শর্তে ব্যবসায় করতে সম্মত হওয়া যে, মুনাফা উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে। এতে সম্পত্তি, কর্তৃত্ব ও মুনাফায় সমতার শর্ত থাকে না। এক শরিকের সম্পত্তির পরিমাণ অন্য শরিকের চেয়ে বেশি হতে পারে এবং এক শরিক দায়িত্বশীল ও অপর শরিক দায়িত্বহীন হতে পারে। উভয়ের মুনাফায় সম অধিকারী হওয়া বা অসম অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে একমত হওয়া বৈধ। ব্যবসায়ে লোকসান হলে তা বিনিয়োগকৃত মূলধন অনুপাতে বণ্টিত হবে।

শিরকাতুল মুফাওয়াযা বা সমঅংশীদারিত্ব ভিত্তিক শিরকাত: এটা হচ্ছে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির নিম্নোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে কোনো কাজে অংশীদারি হওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া:

১. প্রত্যেক শরিকের বিনিয়োগকৃত সম্পত্তির পরিমাণ সমান হবে। কোনো শরিকের সম্পত্তি বেশি হলে শিরকাত শুদ্ধ হবেনা। (এই শিরকাতে শরিকদের মূলধন, মুনাফা ও ক্ষমতা সমান হয়ে থাকে। এক শরিকের মূলধন যদি একশো টাকা হয়, অপর শরিকের তার চেয়ে কম হয় তবে শিরকাত শুদ্ধ হবে না।)
২. ক্ষমতা প্রয়োগে সমতা। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক এমন দুই ব্যক্তির মধ্যে শিরকাত বৈধ নয়।
৩. ধর্মে সমতা। তাই একজন মুসলমান ও একজন কাফিরের মধ্যে শিরকাত শুদ্ধ নয়।
৪. ক্রয় ও বিক্রয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে প্রত্যেক শরিক তাতে অপর শরিকের জামিন ও প্রতিনিধি হবে। কাজেই কোনো শরিকের ক্ষমতা অপর শরিকদের চেয়ে বেশি হবেনা।

এই সকল দিক দিয়ে যখন সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন শিরকাত বৈধ ও কার্যকর হবে এবং প্রত্যেক শরিক অপর শরিকের প্রতিনিধি ও জামিন হবে একে অপরকে তার যাবতীয় তৎপরতা ও ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারবে। এই শিরকাত হানাফি ও মালিকি মযহাবে বৈধ, কিন্তু শাফেয়ি মযহাবে বৈধ নয়। ইমাম শাফেয়ি বলেন: 'সমতা ভিত্তিক শিরকাত যদি অবৈধ না হয়, তবে পৃথিবীতে আর কিছু অবৈধ আছে বলে আমার জানা নেই। কেননা এটা এমন একটা চুক্তি, যার নজির শরিয়তে নেই। এই শিরকাতে সমতা কার্যকর হওয়া কঠিন। কারণ এতে অজ্ঞতা ও ধোঁকার অবকাশ রয়েছে। আর 'তোমরা মুফাওয়াযা কর, কেননা এতে সর্বাধিক বরকত রয়েছে এবং যখন তোমরা পরস্পর মুফাওয়াযা করবে তখন তা ভালোভাবে করবে' মর্মে যে সব হাদিস বর্ণিত আছে, তার কোনোটাই সহিহ হাদিস নয়।

ইমাম মালেকের মতানুসারে মুফাওয়াযা বা সমতাভিত্তিক শিরকাতের বর্ণনা এরূপ: 'একজন শরিক অপর শরিকের নিকট নিজের যাবতীয় ক্ষমতা সমর্পণ করবে, চাই নিজে উপস্থিত থাক বা না থাক, উভয়ের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হবে সমান সমান। মুফাওয়াযায় সকল শরিকের সম্পদ সমান হওয়া বা তার সকল সম্পদ বিনিয়োগ করা শর্ত নয়।'

শিরকাতুল উজুহ বা মূলধন বিহীন যৌথ ব্যবসা: দুই বা ততোধিক ব্যক্তির কোনো মূলধন ছাড়াই শুধুমাত্র তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও তাদের প্রতি ব্যবসায়ীদের আস্থার ভিত্তিতে শরিক হওয়াকে শিরকাতুল উজুহ বা মুলধন বিহীন শিরকাত বলা হয়। এ ক্ষেত্রে শর্ত থাকে শুধু মুনাফায় অংশীদারী। এক কথায় বলা যায়, এটা কোনো কারিগরি বা সম্পত্তি ছাড়া শুধু প্রভাব ও কর্তৃত্ব ভিত্তিক শিরকাত। হানাফি ও হাম্বলি মযহাবে এটা জায়েয। কেননা এটা একটা কাজ। কাজেই এর ভিত্তিতে শিরকাত বৈধ এবং ক্রীত পণ্যে উভয়ের মালিকানায় পার্থক্য হওয়াও বৈধ। তবে মুনাফা উভয়ের মধ্যে মালিকানায় অংশ অনুপাতে বণ্টিত হবে। শাফেয়ি ও মালিকি মযহাবে এটা নাজায়েয। কেননা শিরকাত হতে হবে সম্পত্তি অথবা কাজভিত্তিক। অথচ এখানে এই দুটোর একটিও নেই।

শিরকাতুল আবদান বা শ্রমে অংশীদারিত্ব ভিত্তিক যৌথ ব্যবসা: দুই ব্যক্তি কর্তৃক যে কোনো কাজকে এই শর্তে গ্রহণ করা যে, ঐ কাজের পরিশ্রমিক তাদের মধ্যে ঐক্যমতের ভিত্তিতে বণ্টিত হবে। এ ধরনের শিরকাত সাধারণত মিস্ত্রী, কামার, দর্জি ইত্যাকার পেশাদার কারিগরদের মধ্যে হয়ে থাকে। উভয়ের পেশা এক হোক বা ভিন্ন ভিন্ন হোক, উভয় অবস্থায় এই শিরকাত বৈধ। তাছাড়া উভয়ে কাজ করুক বা একজন কাজ করুক, কিংবা উভয়ে এক সাথে কাজ করুক, বা পৃথক পৃথকভাবে করুক, উভয় অবস্থায় এই শিরকাত বৈধ। আবুদাউদ, নাসায়ি ও ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস এর বৈধতার প্রমাণ বহন করে। আবু উবায়দা আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন: আমি (আব্দুল্লাহ) আম্মার ও সা'দ বদর যুদ্ধের দিন এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলাম যে, আমরা যা পাবো, তাতে আমরা সবাই শরিক হব। কিন্তু সাদ দু'জনকে বন্দী করে আনলো, আর আমি ও আম্মার কিছুই পেলামনা।'

শাফেয়ির মতে এই শিরকাত অবৈধ। কেননা তাঁর মতে, শিরকাত শুধু সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত, কাজের সাথে নয়। আর 'রওযাতুন নাদিয়া' গ্রন্থে এ বিষয়ে একটা উত্তম আলোচনা রয়েছে। আলোচনাটি নিম্নরূপ:

'ফিক্‌হ শাস্ত্রীয় খুঁটিনাটি বিধি সংবলিত বিস্তৃত গ্রন্থাবলীতে রকমারি শিরকাতের যে নামগুলো পাওয়া যায়, যথা মুফাওয়াযা, ইনান, উজুহ ও আবদান, এগুলো শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বা অভিধান থেকে প্রাপ্ত কোনো নাম নয়। এগুলো সাম্প্রতিক কালের নব উদ্ভাবিত পরিভাষা। মূলত: দুই ব্যক্তি তাদের সম্পদকে একত্রিত করে তা দিয়ে ব্যবসায় করবে, এতে শরিয়তে কোনো বাধা নেই, যা হচ্ছে 'মুফাওয়াযা' পরিভাষাটির মর্ম। কেননা সম্পদের মালিক তার সম্পদকে শরিয়তে হারাম ঘোষিত হয়নি এমন যে কোনো উপায়ে কাজে লাগাতে পারে। এখানে প্রশ্ন শুধু উভয়ের সম্পদের সমতা, উভয় সম্পদের নগদ অর্থের আকারে একত্রিত হওয়া, এবং চুক্তিবদ্ধ হওয়ার শর্ত নিয়ে। এ শর্ত জরুরি এমন কোনো প্রমাণ নেই। বরং দু'জনের মূলধন একত্রিত করা ও তা দিয়ে ব্যবসা করার ব্যাপারে উভয়ের সম্মতিই যথেষ্ট।

একইভাবে এ ব্যাপারেও শরিয়তে কোনো বাধা নেই যে, দুই ব্যক্তি যৌথভাবে কোনো জিনিস এরূপ শর্তাধীনে ক্রয় করবে যে, ঐ জিনিসের মূল্যে উভয়ের মধ্যে যার যতোটুকু অংশ আছে, সে অনুপাতে ঐ জিনিসের অংশ প্রত্যেকে পাবে। আর এটাই হলো 'ইনানে'র অর্থ। এ শ্রেণীর শিরকাত রসূলুল্লাহ্ সা. এর আমলে চালু ছিলো এবং সাহাবিদের একটি দল এ ধরনের শিরকাতে অংশ নিতেন। তারা কোনো একটা জিনিস কয়েকজনে মিলে খরিদ করতেন এবং তাদের প্রত্যেকে তার মূল্যের একটা অংশ দিতেন, অত:পর দু'জনের একজন কিংবা উভয়ে একত্রে ক্রয় করার কাজটা সম্পন্ন করতেন। এখানে চুক্তিবদ্ধ হওয়া ও উভয়ের মূলধন মিশ্রিত করার শর্ত আরোপের বাধ্য বাধকতার প্রমাণ কোথাও নেই। একইভাবে এতেও কোনো বাধা নেই যে, দু'জনের একজন অপরজনকে কোনো মাল ধারে কিনে দেয়া ও তাতে ব্যবসায় করার ক্ষমতা অর্পণ করবে এবং উভয়ে তার মুনাফায় শরিক হবে, যা পরিভাষাগতভাবে শিরকাতুল উজুহের মর্মার্থ। তবে এ ব্যাপারে যে সব শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে, তার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। তদ্রূপ, দুই ব্যক্তির মধ্য থেকে একজন অপরজনকে তার পক্ষ থেকে মজুরির ভিত্তিতে ব্যবসায়ের কাজে নিয়োগ করবে, তাতেও শরিয়তে কোনো বাধা নেই এবং পরিভাষার দিক দিয়ে এটা হচ্ছে 'শিরকাতুল আবদান'। এখানেও শর্তারোপের কোনো অর্থ হয়না।

মোটকথা, এ সব ধরনের শিরকাতে যোগদানের জন্য শুধু উভয় পক্ষের সম্মতিই যথেষ্ট। কেননা এ সব ক্ষেত্রে প্রত্যেক শরিকের নিজ মালিকানাভুক্ত জিনিসকে ব্যবহার করা পারস্পরিক সম্মতির উপর নির্ভরশীল। পারস্পরিক সম্মতি ব্যতীত অন্য কিছু জরুরি নয়। যে সব ক্ষেত্রে শিরকাত 'ইজারা' বা 'ওয়াকালা'র পর্যায়ভুক্ত হয়, সে ক্ষেত্রেও তাতে শিরকাত ও ওয়াকালার বিধিই যথেষ্ট। এমতাবস্থায় ফকিহগণের এই সব শ্রেণী বিন্যাস ও শর্তারোপের কোনো যৌক্তিকতা নেই। এর পেছনে কোনো প্রমাণও নেই। প্রকৃত পক্ষে এ কাজ এমন কঠিন ও দীর্ঘসূত্রী কিছু নয়। শিরকাতের মোদ্দা কথা হলো, চাই তা মুফাওয়াযা, ইনান বা 'উজুহ' যেটাই হোক, যে কোনো হালাল জিনিসের ক্রয় ও বিক্রয়ে একাধিক ব্যক্তি অবাধে অংশ গ্রহণ করতে পারবে এবং মূল্যে যার যতটুকু অংশ, সে ততটুকু লভ্যাংশ পাবে। এটা একটা সহজ-সরল ব্যাপার, যে কোনো সাধারণ মানুষও এটা বোঝে, আলেম বা ফকিহ তো দূরের কথা। মোটামুটিভাবে এর বৈধতার পক্ষে ফতোয়া দেয়া হয় আর চাই প্রত্যেক শরিক ক্রীত জিনিসের মূল্যে সম

পরিমাণে অংশ নিক বা বিবিধ পরিমাণে, মূল্য নগদ অর্থের আকারে দেয়া হোক বা দ্রব্যের আকারে, ব্যবসায় খাটানো মূলধন উভয়ের সমগ্র সম্পত্তি হোক বা তার অংশ বিশেষ, এবং ক্রয়বিক্রয়ের কাজটা উভয় একত্রে করুক বা যে কোনো একজন করুক। যদিও মেনেও নেই যে, তারা শিরকাতের এই শ্রেণীগুলোকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করেছেন, কারণ পরিভাষা নির্ধারণ দোষের কিছু নয়। তথাপি প্রশ্ন ওঠে যে, এত সব শর্ত আরোপ এবং বিষয়গুলোকে এতো জটিল করার কী প্রয়োজন ছিলো? আপনি যদি একজন চাষীকে বা তরকারি বিক্রেতাকে কোনো জিনিসের ক্রয়বিক্রয় ও লভ্যাংশে শরিক হওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন, সে অতি সহজেই জবাব দেবে যে, এগুলো জায়েয ও সহজ। আর যদি জিজ্ঞাসা করেন, শিরকাতুল মুফাওয়াযা, ইনান ও উজুহ ইত্যাদি জায়েয কিনা, তবে সে এসব শব্দ বুঝতেই পারবে না। অবশ্য ফিক্‌হ শাস্ত্র নিয়ে যদি কিছু পড়াশুনা করে থাকে এবং তা মনে থেকে থাকে, তা হলে হয়তো কিছুটা বুঝতে পারবে। যুক্তি প্রমাণহীন বিষয়গুলোকে অনর্থক দীর্ঘ রূপ দেয়া কোনো প্রকৃত মুজতাহিদের কাজ হতে পারে না। প্রকৃত মুজতাহিদের কাজ হলো, সত্যকে অকপটে সত্য ও বাতিলকে অকপটে বাতিল বলে ঘোষণা করা এবং এ ব্যাপারে কারো বিরোধিতার পরোয়া না করা।'

পশু পালনে অংশিদারিত্ব: ইবনুল কাইয়েমের মতে, জীবজন্তু পালনেও শিরকাত বা অংশিদারিত্ব জায়েয। জন্তু একজনের মালিকানায় থাকবে আর অপরজন তা লালন পালন করবে এবং এর লভ্যাংশ উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে বন্টিত হবে। 'আলামুল মুকিইন' গ্রন্থে তিনি বলেন: 'আমাদের মতে, নারিকেল ইত্যাদির গাছ যৌথ উদ্যোগে চাষ করা যেতে পাারে। মালিক তার জমি চাষীকে দিয়ে বলবে, 'এতে অমুক গাছের চারা লাগাও, গাছ আমরা উভয়ে সমান ভাগ করে নেব।' এটা কাউকে মূলধন দিয়ে ব্যবসা করতে বলা ও লভ্যাংশ অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে নেয়ার মতই জায়েয। একইভাবে চাষের জন্য জমি দেয়া ও ফসল সমভাবে বন্টন করা, গাছ পালন করতে দেয়া ও উভয়ের মধ্যে ফল সম পরিমাণে বন্টন করা, গরু, ছাগল বা উট কাউকে পালন করতে দেয়া এবং দুধ ও বাচ্চা সমান সমান বন্টন করা, বাহক জন্তু কারো কাছে বাণিজ্যিকভাবে পরিবহণের জন্যে দেয়া এবং প্রাপ্ত পরিবহণ ভাড়া উভয়ে ভাগ করে নেয়া ইত্যাদি। এ সবই বৈধ শিরকাত। কুরআন, সুন্নাহ্, কিয়াস, সাহাবীদের মতৈক্য ও জনস্বার্থ এর বৈধতার পক্ষে। এতে এমন কিছু নেই, যা একে হারামে পর্যবসিত করে। যারা এটিকে অবৈধ বলে রায় দিয়েছেন তাদের যুক্তি এই যে, তাদের মতে এগুলো সব ইজারার আওতাভুক্ত। আর যেহেতু বিনিময় অজ্ঞাত থাকলে ইজারা শুদ্ধ হয় না, অথচ এ ক্ষেত্রে বিনিময় অজ্ঞাত, তাই এটা শুদ্ধ হবে না। কতক ফকিহ 'মুসাকাত' ও 'মুদারায়া'কে প্রত্যক্ষভাবে হাদিস দ্বারা ও 'মুদারাবা'কে ইজ্‌মা দ্বারা বৈধ প্রমাণিত বলে রায় দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ শুধু 'মুদারাবা'কে বৈধ এবং কেউ কেউ মুসাকাত ও মুদারায়ার কোনো কোনো প্রকারকে বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেন, যে কাজে শ্রমিককে তার কাজের পারিশ্রমিক দেয়া হয় যে জিনিসে সে কাজ করে তার অংশ বিশেষ দিয়ে, সে কাজ অবৈধ, আর যখন মূল জিনিসটি মালিকের কাছেই থাকে এবং শ্রমিক তার ফলের অংশ পায় যেমন গাভীর দুধ ও বাচ্চা, তখন সেটি বৈধ।

প্রকৃত ব্যপার এই যে, উল্লিখিত সব কাজই বৈধ এবং এটাই শরিয়তের মূলনীতি ও বিধিমালার দাবি। কেননা এগুলো সবই শিরকাতের আওতাভুক্ত এবং এতে শ্রমিক মালিকের সাথে অংশীদার। একজন নিজের সম্পদ দ্বারা শরিক, আর একজন তার কাজ দ্বারা শরিক। আর যে মুনাফা আল্লাহ্ দেবেন তা তাদের মধ্যে বন্টিত হবে। কিছু ফকিহর মতে এটা ইজারার আওতাভুক্ত ও জায়েয। এমনকি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন ; এই সব শিরকাতের কাজ ইজারার চেয়েও উত্তম ধরনের হালাল। কেননা যে জমি ইজারা নেয় সে তার মূলধন বিনিয়োগ করে। অথচ তার উদ্দেশ্য সফল হতেও পারে, নাও হতে পারে। পক্ষান্তরে যে ইজারা দেয় সে বিনিয়োগ কৃত মূলধন হাতে পেয়ে নিশ্চিত থাকে। কিন্তু যে ইজারা নেয় সে অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। কারণ ফসলের উত্তম ফলনও হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। কিন্তু সম্ভাবনা ও ব্যর্থতার ঝুঁকি সমান। আল্লাহ্ যদি মুনাফা দেন তবে তা তারা ভাগ করে নেবে। আর যদি মুনাফা না দেন তবে উভয়ে সমভাবে বঞ্চিত হয়। এটা সর্বোত্তম সুবিচার নিশ্চিত করে। সুতরাং শরিয়ত

ইজারাকে বৈধতা দেবে আর শিরকাতকে অবৈধ করবে এটা হতে পারে না। ইসলামের পূর্বে মুদারাবা যে ভাবে চালু ছিলো, রসূলুল্লাহ্ সা. তা সেই ভাবেই বহাল রেখেছেন। তাই সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ্ সা. এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর পরে মুদারাবা করেছেন। এবং এর বৈধতার পক্ষে সমগ্র উম্মাত একমত হয়েছে। খয়বরকে ইহুদিদের নিকট সোপর্দ করা হয়েছিল। তারা ওখানকার উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের বিনিময়ে সেখানে চাষাবাদ করেছে। এটা রসূলুল্লাহ্ সা. এর চোখের সামনেই ঘটেছে। এরপর তিনি এ কাজকে রহিতও করেননি, নিষেধও করেননি। তাঁর পরে সাহাবায়ে কেরাম ও খোলাফায়ে রাশেদুনও এটা বন্ধ করেননি। বরং তারা লভ্যাংশ ও ফসলের অংশের বিনিময়ে অন্যের কাছে চাষাবাদের জন্যে জমি ও ব্যবসায়ের জন্যে মূলধন বিনিয়োগ করতেন। কারণ তারা জেহাদ ইত্যাদিতে নিয়োজিত থাকার কারণে নিজেরা এ সব কাজ করতে পারতেন না। রসূলুল্লাহ্ সা. নিষিদ্ধ করেননি এমন কোনো কাজকে তারা নিষিদ্ধ করেননি। এরপর ইবনুল কাইয়েম বলেন: আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল হারাম করেননি এমন কোনো জিনিস হারাম নয়। উক্ত শিরকাত ও মুদারাবা ইত্যাদি কোনোটিকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল হারাম করেননি। অথচ কিছু সংখ্যক ফকিহ্ এগুলো করতে নিষেধ করেন। এমতাবস্থায় কেউ যদি এগুলো করতে বাধ্য হয় এবং করা মংগলজনক মনে করে, তবে সে যে কোনো উপায়ে তা করতে পারে। কেননা আল্লাহ্ ও তার রসূল তা হারাম করেননি।

বৈধ শিরকাতের কয়েকটি পন্থা: ইমাম ইবনে কুদামা বৈধ শিরকাতের কয়েকটি পন্থা উল্লেখ করেছেন। তিনি তার 'আলমুগনি' গ্রন্থে বলেন: 'একজন ধোপার যদি একটি যন্ত্র থাকে এবং অন্য জনের একটি ঘর থাকে, আর উভয়ে যদি এই মর্মে শিরকাতের চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, ঐ যন্ত্রটি দিয়ে ঐ ঘরে উভয়ে কাজ করবে, অত:পর যা আয় হবে তা উভয়ে ভাগ করে নেবে, তাহলে এটা জায়েয হবে এবং মজুরি তাদের স্থিরিকৃত শর্ত অনুসারে ধার্য হবে। কারণ শিরকাতের সিদ্ধান্ত হয়েছে তাদের কাজের উপর। আর শিরকাতে কাজের ভিত্তিতে লভ্যাংশ প্রাপ্য হয়। যন্ত্র ও ঘর দ্বারা কিছু প্রাপ্য হয়না। কেননা যন্ত্র ও ঘর যৌথ কাজে ব্যবহৃত হয়। তাই দুই ব্যক্তি যখন দুটো জন্তু তাদের পছন্দের জিনিস বহনের জন্য ভাড়া করে, তখন যে অবস্থা হবে, যন্ত্র ও ঘর ব্যবহারকারী ধোপা ও তার শরিকের অবস্থাও তদ্রূপ। আর যদি কোনো কারণে শিরকাত বাতিল হয়ে যায়, তাহলে তাদের যা আয় হয়েছে, তা তাদের উভয়ের কাজের মজুরি এবং ঘর ও যন্ত্রের ভাড়া অনুপাতে বন্টন করা হবে। আর যদি তাদের দু'জনের একজনের যন্ত্র থাকে এবং অপরজনের কিছুই থাকেনা, অথবা একজনের ঘর থাকে এবং অপরজনের কিছুই থাকেনা, অত:পর উভয়ে উক্ত যন্ত্র দ্বারা বা ঘরে কোনো কাজ করতে একমত হয় এবং মজুরি ভাগ করে নিতে সম্মত হয় তবে তাও জায়েয হবে।

ইবনে কুদামা আরো বলেন: কেউ যদি তার জন্তুকে অপর একজনের নিকট এই শর্তে সোপর্দ করে যে, সে ঐ জন্তুটি কাজে খাটাবে এবং তাতে যা আয় হবে তা তাদের উভয়ের মধ্যে সমান দু'ভাগে, অথবা অন্য কোনো ভাবে ভাগ হবে, তবে তা শুদ্ধ হবে। এটা আসরাম, মুহাম্মদ ইবনে আবি হারব, আহমদ ইবনে সাঈদ ও আওযায়ির মত। কিন্তু নাখয়ি ও হাসান এটা মাকরূহ এবং ইমাম শাফেয়ি, আবু সাওর, ইবনুল মুনযির ও যুক্তিবাদী ফকিহগণ অবৈধ মনে করেন। তাদের মতে, মুনাফা পুরোটা পাবে জন্তুর মালিক। কেননা এখানে একমাত্র পরিবহনই মুনাফা পাওয়ার যোগ্য কাজ। তবে জন্তুকে কাজে খাটানোর জন্যে ঐ ব্যক্তি প্রচলিত হারে মজুরি পাবে। কেননা এটা শিরকাতের আওতায় পড়ে না। অবশ্য মুদারাবা হলে সে মুনাফার অংশ পেত। আবুদাউদ আহমদ থেকে বর্ণনা করেছেন: কেউ যদি তার ঘোড়া অন্য কাউকে যুদ্ধে ব্যবহার করার জন্যে এই শর্তে দেয় যে, অর্ধেক গনিমত তাকে (ঘোড়ার মালিককে) দিতে হবে, তবে তা দূষণীয় হবে না। কিন্তু আবু আব্দুল্লাহ্ বলেন: তিনি চতুর্থাংশ মালিককে দিতে রাযী হলে জায়েয হবে। ইমাম আওযায়ির মতও তদ্রূপ। কিছু সংখ্যক ফকিহ্ বলেন: কেউ যদি জেলেকে এই শর্তে জাল দেয় যে, সে যত মাছ ধরবে তার অর্ধেক তার (জালদাতার) তবে শিরকাত শুদ্ধ ও কার্যকর হবে, কিন্তু সমস্ত মাছই জেলের প্রাপ্য, জালওয়ালা শুধু প্রচলিত হারে জালের ভাড়া পাবে। ইমাম আহমদের মতও তদ্রূপ বলে জানা গেছে।

আটান্নতম অধ্যায়

জীবন বীমা

শায়খ আহমদ ইব্‌রাহীম জীবন বীমাকে অবৈধ ঘোষণা করে ফতোয়া দিয়েছেন। তিনি বলেন: জীবন বীমা কোম্পানীর সাথে বীমা চুক্তি সম্পাদনকারী যখন জীবদ্দশায় তার সব কটা কিস্তি জমা দেয়া সম্পন্ন করে তখন সে কোম্পানীর কাছ থেকে তার জমা দেয়া সবকটা কিস্তির অর্থ কোম্পানীর সাথে ঐকমত্যে স্থিরকৃত লভ্যাংশ সহকারে ফেরত নেয়ার অধিকারী হয়ে থাকে। প্রশ্ন হলো, এটা শরিয়তে জায়েযকৃত মুদারাবা চুক্তির সাথে কিভাবে সংগতিপূর্ণ হয়?

মুদারাবার উদাহরণ হলো: যায়েদ বকরকে একশো পাউন্ড ব্যবসায় করার জন্য এরূপ শর্তে দিলো যে, তাদের মধ্যে উভয়ের সম্মতি আছে এমন একটা অনুপাতে লভ্যাংশ বণ্টিত হবে। ধরা যাক, মূলধনওয়ালা পাবে অর্ধেক লভ্যাংশ, আর মুদারিব (ব্যবসায়ী) পাবে অর্ধাংশ। প্রথমজন পাবে তার মূলধন বাবত আর দ্বিতীয়জন পাবে তার কাজের বাবদ। কোথাও বা মূলধনওয়ালার জন্য দুই তৃতীয়াংশ ও মুদারিবের জন্য এক তৃতীয়াংশ অথবা এর বিপরীত ধার্য হতে পারে।

মুদারাবার বৈধতার মুল শর্ত হলো, মুদারিবের ব্যবসায়িক তৎপরতার কল্যাণে মূলধনদাতার মূলধন দ্বারা ব্যবসায় যে মুনাফা আসে, মূলধনদাতা তা থেকে তার ধার্যকৃত প্রাপ্য অংশ পাবে। কিন্তু ব্যবসায় যদি কোনো মুনাফা অর্জিত না হয় তাহলে মূলধন ওয়ালা ও মুদারিব কেউ কিছু পাবে না। তবে মূলধন ওয়ালার মূলধন অক্ষত থাকবে। আর যখন ব্যবসায় লোকসান হয় তখন লোকসানটা মূলধনওয়ালার মূলধন থেকেই হয়। মুদারিবের কিছুই ক্ষতি হয় না। তবে মুদারিবের কোনো মজুরিও পাওনা হয় না। কেননা সে মজুর নয়, বরং শরিক।

মূলধনওয়ালা যদি শর্ত আরোপ করে যে, ব্যবসায়ে লাভ হোক বা লোকসান হোক, সে তার মূলধনের অতিরিক্ত একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ লভ্যাংশ নেবেই, তাহলে এই শর্ত অবৈধ। কেননা এটা লভ্যাংশে শরিক হওয়ার পথ রুদ্ধ করে। এটা মুদারাবার বিধিরও লংঘন। মূলধনওয়ালার এ ধরনের শর্ত মানতে হলে তাকে মুদারিবের পকেট থেকে কিছু অর্থ দিতে হবে, যা মানুষের অর্থ অবৈধভাবে আত্মসাতের শামিল।

মূলধন বিনিয়োগকারীর উক্ত শর্তের কারণে মুদারাবা বাতিল হয়ে যায় এবং ব্যবসায় যে মুনাফা আসে তা পুরোপুরি মূলধনদাতার পকেটে চলে যায়। আর এই শর্তই জীবনবীমায় বিদ্যমান। তবে মূলধনের মালিকের নিকট মুদারিবের ন্যায়সংগত পারিশ্রমিক প্রাপ্য থাকে, তার পরিমাণ যাই হোক না কেন। কেননা মুদারাবা বাতিল হয়ে যাওয়ায় সে শরিক থেকে মজুরে পরিণত হয়েছে। এটা ইমাম মুহাম্মদের অভিমত। ইমাম আবু ইউসুফের মতানুসারে মুদারিব ন্যায়সংগতভাবে মজুরী পাবে। তবে তা চুক্তিতে স্থিরকৃত সর্বসম্মত মজুরির অতিরিক্ত হতে পারবে না। (এমন একদল নিরপেক্ষ ও নি:স্বার্থ অভিজ্ঞ লোকদের দ্বারা এই মজুরি নির্ধারিত হওয়া চাই, যারা উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে অথবা শাসকের পছন্দ অনুসারে নিযুক্ত হবে)। কেননা মুদারাবা সঠিক হলেও মুদারিব উভয় পক্ষের মতানুসারে ধার্যকৃতের চেয়ে বেশি লভ্যাংশ পেতনা। তাই মুদারাবা যখন বাতিল হয়ে যায় তখন মুদারিবের এমন লভ্যাংশ পাওয়া সমীচীন নয়, যা বৈধ মুদারাবার লভ্যাংশের চেয়ে বেশি হয়, এ হচ্ছে শরিয়ত অনুমোদিত মুদারাবার প্রকৃত রূপ এবং এ হচ্ছে তার বিধান। এখন যদি প্রশ্ন করা হয়। বীমার চুক্তি কি যথার্থ মুদারাবার আওতায় পড়ে? তবে এর জবাব এটাই যে, পড়ে না। সুতরাং বীমার চুক্তি একটা বাতিল মুদারাবা। শরিয়তের আলোকে এটা সম্পূর্ণ অবৈধ। এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, কোম্পানী নিজের জন্য যা বাধ্যতামূলক করে নেয়, বীমাকারীর জন্য সেটা রাখে ইচ্ছাধীন। যেহেতু বীমা চুক্তির প্রকৃতিই এই যে, এটা একটা সম্ভাব্য ও অনিশ্চিত বিনিময় লাভের চুক্তি, তাই উক্ত কথা প্রযোজ্য নয়।

বলা হয় যে, বীমাকারী কোম্পানীকে যা দেয় তা তাকে ধার হিসাবে দেয় এবং জীবিতাবস্থায় তা লাভ সহকারে ফেরত নিতে পারে। এ কথা যদি সঠিক ধরে নেই তবে তার অর্থ দাঁড়ায়, এটা এমন একটা ঋণ, যা মুনাফা নিয়ে আসে। অথচ এটা হারাম। কেননা এটা হচ্ছে নিষিদ্ধ সুদ।

মোট কথা, বিষয়টাকে যেভাবেই ঘোরান ফেরানো হোক। ইসলামি শরিয়তের সাথে এর কোনোই মিল দেখতে পাবেন না।

উপরে যে কথা আমি বললাম, তা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে বীমাকারী তার প্রিমিয়ামের সকল কিস্তি শোধ করে জীবিত থাকে। পক্ষান্তরে সে যখন সব কটা কিস্তি পরিশোধ করার আগেই মারা যায়, এমনকি অনেক সময় মাত্র এক কিস্তি দিয়েই মারা যেতে পারে এবং একটা বড় অংকের অর্থ অবশিষ্ট থেকে যেতে পারে। কেননা বীমার অর্থের অংকটা কত বড় হবে, তা নির্ভর করে উভয় পক্ষের সম্পাদিত চুক্তিতে কত নির্ধারিত হয়েছে তার উপর। সুতরাং বীমা কোম্পানী যখন উভয় পক্ষের সম্পত্তিতে নির্ধারিত অংকের অর্থ তার উত্তরাধিকারীদের অথবা বীমাকারী যাকে নিজের মৃত্যুর পর কোম্পানীর প্রদেয় অর্থ গ্রহণের জন্য মনোনীত করে গেছে তাকে প্রদান করলো, তখন কোম্পানী কিসের বিনিময়ে এই অংকের অর্থ প্রদান করলো? এটা কি একটা পারস্পরিক ঝুঁকি গ্রহণ ও বেপরোয়া লড়াই নয়? যে শরিয়ত মানুষের সম্পদ অবৈধ ভোগে ভাগ ও আত্মসাৎ করাকে হারাম ঘোষণা করেছে, সেই শরিয়ত কোনো ব্যক্তির মৃত্যুকে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য অবৈধ মুনাফা উপার্জনের উৎসে পরিণত করবে- এটা কি কল্পনা করা যায়? মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে অনুমান ভিত্তিক মুনাফা তার উত্তরাধিকারী বা মনোনীত ব্যক্তিকে তার মৃত্যুর পরে দেয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেই এই অবৈধ মুনাফা কি বৈধ হয়ে যাবে, যা অনিশ্চয়তা ও সুদ এই উভয় কারণেই অবৈধ?

বস্তুত: মানুষের জীবন ও মৃত্যু যখন বাণিজ্যের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তখনই এ ধরনের অঢেল মুনাফাখুরীর সুযোগ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। পৃথিবীতে এমন বহু জিনিস রয়েছে, যার আর্থিক মূল্যের পরিমাপ কোনো নির্দিষ্ট সীমায় গিয়ে থেমে থাকেনা, বরং তা উভয় পক্ষের পরিমাপ নির্ধারণের উপর নির্ভরশীল থাকে। কিন্তু বীমার বাণিজ্য এই শ্রেণীর আওতায় পড়েনা। কেননা এখানে উভয় পক্ষের নির্ধারিত পরিমাণের মধ্যে বীমার অর্থ সীমাবদ্ধ থাকে না।

বস্তুত: এদিক দিয়েও এটা একটা অনিশ্চিত ঝুঁকির ব্যাপার। কারণ বীমাকারী সকল কিস্তি জীবদ্দশায় পরিশোধ করলে তার প্রাপ্য এক রকম হয় আর পরিশোধ করার আগে মারা গেলে উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য হয় অন্য রকম। এটা কি ঝুঁকি গ্রহণ ও জুয়া নয়? যেহেতু বীমাকারী ও বীমা কোম্পানী উভয়ের অজানা থাকে প্রাপ্য অংক কত হবে, তাই এটা সুনিশ্চিতভাবেই জুয়া।

ঊনষাটতম অধ্যায়

মীমাংসা ও আপোস

সংজ্ঞা: শাব্দিক অর্থে বা কোনো বিবাদের নিষ্পত্তিকে মীমাংসা বা আপোস বলা হয়। কিন্তু শরিয়তের পরিভাষায় এটা এমন একটা চুক্তির নাম, যা দুজন বিবাদীর বিবাদ বিসংবাদের অবসান ঘটায়। চুক্তিবদ্ধ উভয় পক্ষকে মীমাংসা গ্রহণকারী, বিবাদ সংক্রান্ত বিষয়কে মীমাংসিত বিষয় এবং এক পক্ষ অপর পক্ষকে যে জিনিস দিয়ে আপোস মীমাংসা করে তাকে বলা হয় মীমাংসার বদলা।

মীমাংসার বৈধতা: মানুষের পারস্পরিক বিরোধ ও দ্বন্দ্ব-কলহকে মৈত্রী ও সংহতিতে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে এবং বাদী-বিবাদীর বিদ্বেষ ও আক্রোশের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে কুরআন সুন্নাহ্ ও ইজমা দ্বারা আপোস ও মীমাংসা শরিয়ত সম্মত কাজ বলে প্রমাণিত হয়। সূরা হুজুরাতের ৯ নং আয়াতে হয়েছে:

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ج فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ج فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

'মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও, অত:পর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করবে ও সুবিচার করবে। আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন'। আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজা, হাকেম ও ইবনে হাব্বান আমর ইবনে আওফ রা. থেকে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন :

'একমাত্র আপোস যে হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল করে, তা ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে সম্পাদিত সকল আপোস ও মীমাংসা বৈধ।' তিরমিযি এই সাথে যোগ করেছেন : 'মুসলমানরা তাদের আরোপিত সমস্ত শর্ত মেনে চলবে।'

উমর রা. বলেন : 'তোমরা বাদী-বিবাদীকে ফিরিয়ে দাও, যাতে তারা নিজেরাই আপোস মীমাংসা করে। কারণ বিচারকের মীমাংসা তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষের জন্ম দেয়।'

ওদিকে বাদী বিবাদীর আপোস মীমাংসার বৈধতার পক্ষে মুসলমানদের ইজমা রয়েছে।

মীমাংসার মূল উপাদান: আপোস মীমাংসার মূল উপাদান দুটো : মীমাংসা বুঝা যায় এমন শব্দ দ্বারা ইজাব ও কবুল করা। যেমন বিবাদী বলবে : 'আমার কাছে তোমার যে একশো মুদ্রা পাওনা রয়েছে, সে বিষয়ে তোমার সাথে পঞ্চাশ মুদ্রায় আপোস মীমাংসা করলাম।' অপরজন বলবে: 'আমি মেনে নিলাম।'

এভাবে যখন আপোস মীমাংসা সম্পন্ন হয়ে যায়, তখন তা বাদী বিবাদী উভয়ের জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়। তখন আর কোনো এক পক্ষ এককভাবে অপর পক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকে তা বাতিল করতে পারে না। চুক্তি অনুযায়ী মীমাংসার বিনিময়ে বাদীর যা প্রাপ্য, সে তার মালিক হয়ে যাবে এবং বিবাদী তা তার কাছ থেকে ফেরত চাইতে পারবে না। আর এর মাধ্যমে বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাবে, অত:পর বাদীর নতুন কোনো দাবি দাওয়া শোনা হবে না।

মীমাংসা শর্তাবলী: মীমাংসার শর্ত তিন প্রকার : মীমাংসাকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট শর্ত, যে জিনিসের মাধ্যমে মীমাংসা কাম্য তার শর্ত, যে জিনিস বা অধিকার নিয়ে মীমাংসা কাম্য, তার শর্ত।

মীমাংসা গ্রহণকারী: এমন ব্যক্তি হওয়া শর্ত, যার কাউকে স্বেচ্ছায় কিছু দান করার যোগ্যতা রয়েছে। সে যদি এমন ব্যক্তি হয়, যার স্বেচ্ছায় দান করার যোগ্যতা (অর্থাৎ আইনানুগ যোগ্যতা) নেই, যথা : পাগল, অপ্রাপ্তবয়স্ক, এতিমের অভিভাবক ও ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক, তবে এ ধরণের লোকের

মীমাংসা গ্রহণ বৈধ নয়। কেননা এটা একটা স্বেচ্ছাকৃত দান, যার যোগ্যতা এসব ব্যক্তির নেই। তবে ভালোমন্দ ও ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে সচেতন অপ্রাপ্তবয়স্কের, এতিমের অভিভাবকের ও ওয়াক্ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের মীমাংসা গ্রহণকারী হওয়া সেই ক্ষেত্রে বৈধ যেখানে মীমাংসা উক্ত অপ্রাপ্তবয়স্কের, এতিমের বা ওয়াক্ফ সম্পত্তির জন্য কল্যাণজনক ও লাভজনক হয়। কারো কাছে কিছু ধারের অর্থ পাওনা রয়েছে, কিন্তু তার কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই, এরূপ ক্ষেত্রে ঋণের একাংশ নিয়ে অপর অংশ থেকে খাতককে অব্যাহতি দেয়ার জন্য মীমাংসায় উপনীত হওয়া জায়েয, যদিও মীমাংসা গ্রহণকারী অপ্রাপ্তবয়স্ক হয়।

মীমাংসা বিনিময়ের শর্ত: ১. বিনিময়টা যেন এমন কোনো মাল হয়, যার মূল্যায়ন করা যায় ও হস্তান্তরযোগ্য হয় অথবা কোনো সেবা বা কল্যাণমূলক কিছু হয়।

২. যখন বিনিময়টা হস্তান্তর ও গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়, তখন তা যেন সুপরিচিত ও সুনির্দিষ্ট হয় এবং তাতে এমন কোনো অস্বচ্ছতা না থাকে, যা কোনো বিতর্কের সূত্রপাত ঘটাতে পারে।

হানাফি ফকিহগণ বলেন : যে ক্ষেত্রে বিনিময়কে হস্তান্তর ও গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই, সেক্ষেত্রে তা সুপরিচিত ও সুনির্দিষ্ট হওয়া শর্ত নয়। যেমন দুই ব্যক্তি তাদের প্রতিপক্ষের নিকট কোনো জিনিস দাবি করলো, অত:পর দুজনেই একে অপরের প্রাপ্যের বিনিময়ে নিজের অংশ ছেড়ে দিয়ে মীমাংসা করলো। ইমাম শাওকানির মতে পরিচিত জিনিসের বাবতে অপরিচিত জিনিস দিয়ে মীমাংসা করা জায়েয। এ ব্যাপারে তিনি উম্মে সালমা রা. থেকে বর্ণিত এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ দর্শান :

'দুই ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট তাদের মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত একটি পুরনো বিবাদ মীমাংসার জন্য উপস্থিত হয়। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিলো না। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন : তোমরা আল্লাহ্র রসূলের নিকট বিবাদ মীমাংসার জন্য এসেছ। অথচ আমি তো একজন মানুষ। সম্ভবত তোমাদের একজন তার দাবিতে অপর জনের চেয়ে বেশি অগ্রগামী। কিন্তু আমি তো শুধু যা শুনবো তার ভিত্তিতেই তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করবো। এমতাবস্থায় আমি যদি কাউকে তার ভাই এর প্রাপ্য দিয়ে ফেলি, তবে সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা এ ধরনের মীমাংসায় আমি তাকে এক টুকরো আগুনই দেবো, যা সে কিয়ামতের দিন একটা লোহার শালাকায় করে নিজের ঘাড়ের উপর জ্বালাবে।' এ কথা শুনে দুই ব্যক্তিই কাঁদতে লাগলো এবং উভয়ে বলতে লাগলো : 'আমার হক আমার ভাইকে দিলাম।' রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন : তোমরা যখন এ কথা বলেছ, তখন যাও, তোমাদের প্রাপ্য ভাগ কর। তারপর কার কোন্ ভাগ, তা নির্ধারণের জন্য লটারি কর। তারপর তোমরা উভয়ে নিজের ভাগ অপর ভাই এর জন্য উৎসর্গ কর।' আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, আবু দাউদের অপর বর্ণনায় আছে : 'যে বিষয়ে আমার নিকট কোনো ওহি আসেনি, সে বিষয়ে আমি কেবল নিজের মত অনুসারেই ফায়সালা করবো।' ইমাম শাওকানি বলেন : এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, অজ্ঞাত প্রাপ্যের দাবি ছেড়ে দেয়া জায়েয। কেননা এখানে উভয়ের প্রাপ্য অজ্ঞাত। এ থেকে আরো প্রমাণিত হয়, জ্ঞাত জিনিসের বিনিময়ে অজ্ঞাত পাওনার মীমাংসা করা বৈধ। তবে এতদসত্ত্বেও উভয়ের নিজ দাবি অপর পক্ষের জন্য ছেড়ে দেয়া জরুরি। ইমাম আল লাহর' গ্রন্থে শাফেয়ি ও নাসের সূত্রে বর্ণিত, অজ্ঞাত পাওনার মীমাংসা জ্ঞাত জিনিস দ্বারা বৈধ নয়।

যে বিতর্কিত হকের মীমাংসা কাম্য, তার শর্ত: যে বিতর্কিত হকের মীমাংসা কাম্য, তার উপর নিম্নের শর্তাবলী প্রযোজ্য :

১. হয় তা মূল্যায়নযোগ্য সম্পদ হওয়া চাই, নতুবা সেবা জাতীয় বিষয় হওয়া চাই।

জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা ঋণগ্রস্ত অবস্থায় ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। অত:পর পাওনাদাররা তাদের পাওনা আদায়ের জন্য চাপ দিতে লাগলো, জাবির রা. বলেন : এমতাবস্থায় আমি রসূলুল্লাহ সা. এর নিকট উপস্থিত হলাম। রসূলুল্লাহ্ সা. তাদেরকে অনুরোধ করলেন যেন আমার বাগানের ফল নিয়ে আমার পিতাকে দায়মুক্ত করে। কিন্তু তারা অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলো। তখন রসূলুল্লাহ্ সা. তাদেরকে আমার

বাগানের ফল দিলেন না, আমাকে বললেন : পরদিন সকালে আমি তোমার কাছে আসবো। তিনি পরদিন সকালে আমার কাছে এলেন। আমার বাগানে পায়চারি করলেন এবং বাগানের ফলে বরকতের জন্য দোয়া করলেন। তারপর আমি ফল পাড়লাম এবং তাদের ঋণ পরিশোধ করলাম। পরিশোধ করার পরও আমার ফল অবশিষ্ট রইল।'

অন্য বর্ণনার ভাষা এ রকম : 'জাবিরের পিতা জাবিরের ঘাড়ে জনৈক ইহুদির ত্রিশ ওয়াসাক ঋণ রেখে মারা গেলেন। জাবির ইহুদির নিকট কিছু সময় চাইলেন। ইহুদি সময় দিতে রাজি হলো না। অত:পর জাবির তার পক্ষে সুপারিশ করার জন্য রসূলুল্লাহ্ সা. কে অনুরোধ করলেন। রসূলুল্লাহ্ সা. ইহুদির নিকট গিয়ে তাকে তাঁর পাওনার বিনিময়ে জাবিরের বাগানের খেজুর নিতে বললেন। কিন্তু সে তাঁর কথা অগ্রাহ্য করলো। এরপর রসূলুল্লাহ সা. জাবিরের বাগানে প্রবেশ করেন এবং তার ভেতরে কিছুক্ষণ ঘুরাফেরা করলেন। তারপর জাবির রা. কে বললেন : ইহুদির জন্য ফল পাড় এবং তার যা পাওনা তাকে দিয়ে দাও। অত:পর রসূলুল্লাহ্ সা. ফিরে যাওয়ার পর জাবির ইহুদিকে ত্রিশ ওয়াসাক পরিশোধ করে দিলেন এবং তার কাছে আরো সতেরো ওয়াসাক উদ্বৃত্ত রইল।' (বুখারি) ইমাম শওকানি বলেন : এ থেকে প্রমাণিত হয়, অজ্ঞাত জিনিসের বিনিময়ে জ্ঞাত জিনিসের ব্যাপারে আপোস মীমাংসা বৈধ।

২. বান্দার এমন হক হওয়া চাই, যার বিকল্প দেয়া জায়েয আছে। চাই তা কোনো মাল না-ই হোক, যেমন কিসাস, কিন্তু আল্লাহ্র হকের ব্যাপারে কোনো আপোস চলবেনা। চোর, ব্যভিচারী বা মদখোর যদি যে ব্যক্তি তাকে আদালতে সোপর্দ করার জন্য গ্রেফতার করেছে, তার সাথে কোনো মালের বিনিময়ে আপোস করে, যাতে সে তাকে ছেড়ে দেয়। তবে এই আপোস অবৈধ। কেননা এ ব্যাপারে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয নেই। এরূপ ক্ষেত্রে বিনিময় গ্রহণকে ঘুষ খাওয়া হিসাবে বিবেচনা করা হবে। তদ্রূপ অপবাদের শাস্তির ক্ষেত্রেও আপোস বৈধ নয়। কেননা ঐ শাস্তি প্রবর্তিত হয়েছে মানুষকে মানুষের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা থেকে সতর্ক করার জন্য। এটা যদিও বান্দার হকের সাথে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু এতে আল্লাহ্র হকই প্রবলতর। আর সাক্ষী যদি আল্লাহ্র হক বা বান্দার হকের ব্যাপারে সাক্ষ্য গোপন করার উদ্দেশ্যে কোনো মালের বিনিময়ে আপোস করে, তবে তা অবৈধ। কেননা সাক্ষ্য গোপন করা হারাম। আল্লাহ্ বলেন : وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ○

'তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করে, তার অন্তর অপরাধী।' (২ সূরা বাকারা : আয়াত ২৮৩)।

আল্লাহ আরো বলেন : وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ○ 'তোমরা আল্লাহ্র জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিও।' (৬৫ সূরা তালাক : আয়াত ২)।

শুফ্য়া বর্জন করার ব্যাপারেও আপোষ মীমাংসা বৈধ নয়। জমির ক্রেতা যদি শুফ্য়ার দাবিদারের সাথে শুফ্য়া বর্জনের জন্য আপোস করে তবে সেই আপোস বাতিল। কেননা শুফ্য়া শরিকের ক্ষতি দূর করার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত। এ দ্বারা আর্থিক সুবিধা ভোগ করা হবে এজন্য নয়। অনুরূপ দাম্পত্য সম্পর্ক দাবির ব্যাপারেও আপোস মীমাংসা বৈধ নয়।

আপোস মীমাংসার প্রকারভেদ: আপোস মীমাংসা কখনো স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে কখনো অস্বীকৃতির ভিত্তিতে আবার কখনো মৌনতার ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

স্বীকারোক্তি ভিত্তিক মীমাংসা: স্বীকারোক্তি ভিত্তিক মীমাংসা হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট তার দেয়া ঋণ বা অন্য কোনো পাওনার দাবি করলো। অত:পর যার কাছে দাবি করলো, সে তা মেনে নিলো। অত:পর উভয়ে পাওনা আংশিক পরিশোধের ভিত্তিতে আপোস করলো। এটা বৈধ। কেননা মানুষকে পুরোপুরি না হোক, আংশিক পাওনা থেকে খাতককে অব্যাহতি দিতে নিষেধ করা যায়না।

ইমাম আহমদ র. বলেন : এ ক্ষেত্রে কেউ যদি সুপারিশ করে তবে তাতে গুনাহ্ হবে না। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. জাবির রা. এর পাওনাদারদেরকে সুপারিশ করে অর্ধেক ঋণ মওকুফ করিয়েছিলেন এবং কা'ব ইবনে মালেককে সুপারিশ করে তার খাতকদের অর্ধেক ঋণ মওকুফ করিয়েছিলেন। ইমাম আহমদ ইমাম নাসায়ির এই হাদিসের দিকে ইংগিত করেছেন, যা তিনি কা'ব ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। কা'ব মসজিদে নববীতে ইবনে আবি হাদরাদের নিকট তার পাওনা দাবি করলেন। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে উচ্চস্বরে কথা কাটাকাটি হলো। রসূলুল্লাহ্ সা. নিজের ঘরে বসে তা শুনলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বের হয়ে তাদের দিকে এগিয়ে ডেকে বললেন : 'হে কা'ব। কা'ব বললেন : হে রসূলুল্লাহ সা. আমি হাজির।' রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন : তোমার ঋণের অর্ধেক মওকুফ কর। কা'ব বললেন : হে রসূলুল্লাহ্, সা. মওকুফ করলাম। তখন রসূলুল্লাহ্ সা. ইবনে আবি হাদরাদকে বললেন : ওঠ, পরিশোধ কর।

বিবাদী যদি নগদ ঋণের কথা স্বীকার করে ও নগদ প্রদান করে আপোস করে, তাহলে সেটা হবে নগদ লেনদেন এবং সে ক্ষেত্রে নগদ লেনদেনের শর্ত প্রযোজ্য হবে। আর যদি নগদ ঋণের কথা স্বীকার করে কিন্তু দ্রব্যাদি দিয়ে আপোস করে কিংবা দ্রব্যাদির ঋণের কথা স্বীকার করে এবং নগদ মুদ্রায় পরিশোধ করে, তবে সেটা হবে একটা বিনয়। এ ক্ষেত্রে বিক্রয়ের সমস্ত বিধি কার্যকর হবে। আর যদি নগদ মুদ্রা বা দ্রব্যাদির ঋণ স্বীকার করে এবং সেবা দিয়ে যথা বাড়িতে আবাসিক সুবিধা বা অন্য কোনো সেবা দিয়ে আপোস করে তবে এটা হবে ইজারা এবং এতে ইজারার বিধিমালা প্রযোজ্য হবে। আর যখন মীমাংসায় বিতর্কিত হক বাদীর প্রাপ্য বলে স্থির হয় তখন বিবাদী আপোসের জন্য তার বদলায় যে জিনিস দিয়েছিল তা ফেরত চাইতে পারবে। কেননা সে বদলা দিয়েছিলই ওটিকে রক্ষা করার জন্য। আর যখন বদলা প্রাপ্য হবে, তখন বাদী বিবাদীর কাছে দাবিকৃত জিনিসটি ফেরত চাইতে পারবে। কেননা সে বদলাকে সুরক্ষিত করার জন্যই দাবিকৃত জিনিস ছেড়ে দিয়েছিল।

অস্বীকৃতিজনিত আপোস মীমাংসা: অস্বীকৃতিজনিত আপোস মীমাংসা হলো, কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট কোনো পাওনার দাবি করলে সে দাবিকৃত জিনিস অস্বীকার করবে, অত:পর উভয়ে আপোস মীমাংসা করবে।

মৌনতা ভিত্তিক আপোস মীমাংসা: মৌনতা ভিত্তিক আপোস হলো, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট তার কোনো পাওনা দাবি করলে বিবাদী চুপ থাকবে, স্বীকারও করবেনা, অস্বীকারও করবেনা।

অস্বীকৃতি ও মৌনতাজনিত আপোস সম্পর্কে শরিয়তের বিধান: অধিকাংশ আলেমের মতে অস্বীকৃতি ও মৌনতা জনিত আপোস বৈধ। কিন্তু ইমাম শাফেয়ি বলেন : একমাত্র স্বীকারোক্তি ভিত্তিক আপোস ব্যতীত আর কোনো আপোস জায়েয নেই। কেননা আপোসের দাবি হলো, একটা প্রতিষ্ঠিত হক থাকা চাই। কিন্তু অস্বীকৃতি ও মৌনতার ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। যেখানে বিবাদী দাবি অস্বীকার করে সেখানে হক প্রতিষ্ঠিতই হয় না। কেননা হক প্রতিষ্ঠিত হয় দাবি দ্বারা। অথচ অস্বীকৃতি দাবিকে খন্ডন করে। দাবি খন্ডনের কারণে হক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

পক্ষান্তরে মৌনতাজনিত আপোস বৈধ নয় এজন্য যে, নীরবতা অবলম্বনকারীকে কার্যত: অস্বীকারকারী বিবেচনা করা হয়, যতোক্ষণ না তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। বিবাদ দাবির জন্য যে কোনো পক্ষের অর্থ ব্যয় অবৈধ। কেননা দাবি বাতিল। তাই এখানে অর্থব্যয় ঘুষের সমার্থক। কেননা আল্লাহ্ সূরা বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে বলেন :

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

'তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জেনে-শুনে অন্যায়রূপে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকদের নিকট পেশ করো না।'

কিছু সংখ্যক আলেম মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছেন। তারা একে পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধও করেননি, পুরোপুরিভাবে বৈধও করেননি। তাদের মতে সর্বোত্তম পন্থা হলো বাদী যদি সুনিশ্চিতভাবে জানে যে, তার প্রতিপক্ষের নিকট তার পাওনা আছে, তাহলে যে জিনিসের উপর আপোস মীমাংসা হয়েছে তা দখল করা তার জন্য বৈধ, যদিও তার প্রতিপক্ষ তা অস্বীকার করে। আর সে যদি অন্যায় দাবি করে তাহলে দাবি পেশ করা এবং যে জিনিসের উপর আপোস মীমাংসা হয়েছে তা হস্তগত করা তার জন্য হারাম।

পক্ষান্তরে বিবাদীর কাছে যদি তার নিশ্চিতভাবে জানা হক থেকে থাকে, অথচ সে কোনো স্বার্থজড়িত উদ্দেশ্যে তা অস্বীকার করে থাকে, তাহলে মীমাংসিত জিনিস হস্তান্তর করা তার কর্তব্য। আর যদি সে জানে, তার কাছে কারো কোনো হক পাওনা নেই, তাহলে তার দাবিদারের সাথে তার দ্বন্দ্ব নিরসন ও তার দু:খ-কষ্ট দূর করার জন্য তার অর্থ সম্পদের একাংশ তাকে প্রদান করা জায়েয। কিন্তু তার দাবিদারের পক্ষে তা গ্রহণ করা হারাম।

সুতরাং অস্বীকৃতিজনিত আপোস সর্বতোভাবে অবৈধ এ কথা যেমন বলা যাবে না, তেমনি তা সর্বতোভাবে বৈধ, একথাও বলা যাবে না, বরং উভয়টি বিশদ বিবরণসহ বলতে হবে।

আর যারা অস্বীকৃতি বা মৌনতাজনিত আপোসকে বৈধ বলে মত দিয়েছেন, তাদের যুক্তি হলো, বাদীর পক্ষে এটা তার পাওনা মেটানোর শামিল, আর বিবাদীর পক্ষে তার কসম খাওয়ার বদলা ও তার পক্ষ থেকে বিবাদ মেটানোর পদক্ষেপ। আর আপোসে গৃহীত বিনিময় যদি কোনে বস্তু বা দ্রব্য হয়, তাহলে এটা বিক্রয়ের পর্যায়ভুক্ত হবে এবং বিক্রয়ের যাবতীয় বিধান এতে প্রযোজ্য হবে। আর যদি বিনিময় কোনো সেবা হয় তাহলে সেটা হবে ইজারা এবং সে ক্ষেত্রে ইজারার যাবতীয় বিধি প্রযোজ্য হবে। আর যে বিষয়ে আপোস কাম্য তা এ রকম হবে না। কেননা তা হবে বিবাদ নিরসনের বিনিময়। ওটা কোনো মালের বিকল্প নয়। আর যখন আপোসের বিনিময় কারো প্রাপ্য বলে স্থির হবে, তখন বাদী বিবাদীকে তার দাবি পূরণের আহ্বান জানাবে। কেননা সে বিনিময় সুরক্ষিত থাকবে এই আশায়ই নিজের দাবি পরিত্যাগ করেছিল। আর যে জিনিসের ব্যাপারে আপোস কাম্য, তা যখন প্রাপ্য বলে স্থির হবে, তখন বিবাদী বাদীর কাছে তার বিনিময় ফেরত চাইবে। কেননা সে বিনিময় এজন্যই দিয়েছিল যে, তার দাবীকৃত জিনিসই অক্ষুণ্ন থাকবে। সেটি যখন প্রাপ্য বলে স্থির হয়েছে, তখন তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কাজেই সে বাদীর কাছে তা ফেরত চাইতে পারবে।

দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের একাংশ ত্বরিত পরিশোধ করে আপোস: দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের অংশ বিশেষ ত্বরিত পরিশোধ করত: আপোস করলে তা হাম্বলি মযহাবে ও ইমাম ইবনে হায্‌মের নিকট শুদ্ধ হবে না। ইবনে হায্‌ম 'মুহাল্লা' গ্রন্থে বলেন : 'যে আপোসে অংশ বিশেষ থেকে দায়মুক্তি দেয়া হয়, তাতে বিলম্বিত করার শর্ত আদৌ জায়েয নয়। কেননা এ ধরনের শর্ত আল্লাহ্‌র কিতাবের পরিপন্থী বলে বাতিল। বরং আপোস মীমাংসা তাৎক্ষণিক হবে এবং বিনা শর্তে যতোটুকু খুশি সময় দেয়া যাবে। কেননা এটা একটা ভালো কাজ।' ইবনুল মুসাইয়াব, মালিক, শাফেয়ি ও ইমাম আবু হানিফার মতে এটা মাকরূহ, ইবনে আব্বাস, ইবনে সিরীন ও নাখয়ির মতে জায়েয।

ষাটতম অধ্যায়

বিচার ব্যবস্থা

আল্লাহ্‌র সকল নবী আগমনের প্রধান উদ্দেশ্যই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা: ন্যায় বিচার যে ইসলামের সুমহান মূল্যবোধগুলোর অন্যতম, তাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। কেননা সত্য, ন্যায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠাই জগতে স্বস্তি, শান্তি ও নিরাপত্তার বিস্তার ঘটায়, জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ়তর করে। শাসক ও শাসিতের মধ্যে আস্থা জোরদার করে। সম্পদ, সুখ ও সমৃদ্ধি বাড়ায় এবং পরিস্থিতি ও পরিবেশকে মজবুত ও কলুষমুক্ত করে। এর ফলে সমাজ অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও সংঘাত থেকে মুক্ত হয়। শাসক ও শাসিত উভয়ে কর্মমুখী, উৎপাদনমুখী ও দেশ সেবায় ব্রতী হয় এবং কর্মের পরিবেশ বিঘ্নিত করে বা উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে এমন উপসর্গগুলো দেশ ও জাতির অগ্রগথিকে স্তব্ধ করতে পারে না।

ন্যায়বিচার তখনই প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত হয়, যখন প্রত্যেক সৃষ্টি তার যথাযোগ্য অধিকার ফিরে পায়। আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী দেশ শাসিত হয় এবং মানব সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রবৃত্তিপূজা নির্মূল করা হয়।

আর এ কাজটার সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ সম্পাদন ও বাস্তবায়নই ছিলো আল্লাহ্‌র রসূলগণের পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আর এই কাজ অব্যাহত রাখাই রসূলগণের অনুসরণের একমাত্র পথ ও পন্থা, যাতে নবুয়ত চিরদিন মানবজাতিকে তার সুখময় ছায়ার তলে আশ্রয় দিতে পারে। আল্লাহ্ বলেন:

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۝

'আমি আমার রসূলগণকে স্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সংগে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। (সূরা হাদিদ ২৪)।

ইসলামের বিচার ব্যবস্থা: ইসলামের পরিভাষায় বিচার হচ্ছে জনগণের পারস্পরিক বিরোধ ও বিবাদ-বিসংবাদ আল্লাহ্‌র প্রবর্তিত আইন ও বিধান অনুযায়ী মীমাংসা করা। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, অধিকারসমূহের সুরক্ষা এবং জান, মাল ও মানসম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অন্যতম প্রধান উপায় হলো, সেই বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন, যা আল্লাহ্ প্রবর্তন করেছেন, তার অন্যতম শিক্ষায় পরিণত করেছেন এবং যাকে তার সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ মৌল বিধান হিসেবে অভিহিত করেছেন। ইসলামে এই মহান দায়িত্ব সর্ব প্রথম যিনি পালন করেছেন, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হিজরতের পর মুসলমান ও ইহুদি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাতে লেখা ছিলো: 'এই চুক্তি সম্পদানকারীদের মধ্যে এমন যে কোনো ঘটনা বা বিবাদ ঘটুক, যার ফলে সমাজে অশান্তি ও অস্থিরতা সৃষ্টির আশংকা রয়েছে, তা মহান আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদের সা. নিকট নিয়ে যাওয়া হবে।'

আল্লাহ্ যা কিছু ওহির মাধ্যমে নাযিল করেছেন, তদনুসারে বিচার-ফায়সালা করতে তাঁর রসূলকে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন:

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰىكَ اللّٰهُ ط وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ۝
وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

'তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি যাতে তুমি আল্লাহ্ তোমাকে যা জানিয়েছেন সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর এবং বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করোনা, আর আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা কর, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (নিসা ১০৫, ১০৬, ১০৭ থেকে ১১৩ পর্যন্ত আয়াত দেখুন)

রসূলুল্লাহ্ সা. এর জীবদ্দশায় মক্কার বিচার ব্যবস্থার দায়িত্বে আত্তাব ইবনে উসাইদ এবং ইয়ামানের বিচার

ব্যবস্থার দায়িত্বে আলি রা. ছিলেন। আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি, ইবনে মাজা প্রমুখ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. যখন আলি রা. কে ইয়ামানে বিচারক হিসেবে পাঠালেন, তখন আলি রা. বললেন: 'হে রসূলুল্লাহ্ সা. আপনি ইয়ামানবাসীর কাছে পাঠাচ্ছেন, অথচ আমি একজন যুবক মাত্র, বিচার কি জিনিস তা জানি না। আলি রা. বলেন: তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ্ সা. আমার বুক থাপড়ালেন এবং বললেন: হে আল্লাহ্, একে সঠিক পথ দেখাও এবং এর জিহ্বাকে সংযত ও দৃঢ় কর।' আলি রা. বলেন: মহান আল্লাহ্‌র কসম, এরপর আমি দুই ব্যক্তির বিবাদ মিটাতে কখনো সন্দেহে পতিত হইনি।'

আলি রা. বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'হে আলি, যখন তোমার সামনে দু'জন বিচার প্রার্থী বসবে, তখন একজনের বক্তব্য যেমন শুনেছ, তেমনি অপর জনের বক্তব্য না শুনা পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোনো ফায়সালা করবে না। উভয়ের বক্তব্য শুনলে সুবিচার কিভাবে করা যায় তোমার নিকট তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কিসে কিসে বিচার-ফায়সালা করা হবে: যাবতীয় অধিকারের বিষয়েই বিচার-ফায়সালার প্রয়োজন হয়ে থাকে, চাই তা আল্লাহর অধিকার হোক বা মানুষের অধিকার। ইবনে খালদুন বলেন: 'বিচারপতি পদটির সর্বশেষ রূপ দাঁড়িয়েছে এরকম যে, বাদী বিবাদীদের বিবাদ মীমাংসার পাশাপাশি জনগণের কিছু সাধারণ অধিকার ফিরিয়ে দেয়াও এর আওতাভুক্ত হয়েছে,সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীসমূহের যথা পাগল, ইয়াতিম, হতদরিদ্র ও নির্বোধদের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণ, মুসলমানদের ওসিয়ত ও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, অভিভাবকহীনা অবিবাহিতা যুবতীদের বিয়ে দেয়া, রাস্তাঘাট ও ভবনসমূহের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, সাক্ষীগণ সাধকগণ ও জনপ্রতিনিধিদের পর্যবেক্ষণ, তাদেরকে সুবিচার সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিতরণ, যাতে তাদের উপর বিচারকের আস্থা সৃষ্টি হয়। এসবই বিচারকের দায়িত্বের সাথে সম্পৃক্ত।'

ন্যায় বিচারের মর্যাদা: দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার প্রতিহত করা ও পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসা করার লক্ষ্যে ন্যায়বিচার করা ফরযে কেফায়া। জনগণের জন্য বিচারক নিয়োগ করা শাসকের দায়িত্ব। যোগ্য ব্যক্তি এ দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলে শাসক তাকে দায়িত্ব গ্রহণে বলপ্রয়োগ করতে পারবে। কোনো ব্যক্তি যখন এমন কোনো ক্ষেত্রে অবস্থান করে, যেখানে সে ছাড়া আর কেউ বিচারক হওয়ার যোগ্য নেই, তখন তার জন্য এ দায়িত্ব গ্রহণ করা ওয়াজিব। ইসলাম সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে বিচার ফায়সালা করতে উৎসাহিত করেছে এবং একে একটা মর্যাদাপূর্ণ কাজ হিসেবে অভিহিত করেছে।

ইমাম বুখারি আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'একমাত্র দুই ব্যক্তিই ঈর্ষার পাত্র: যাকে আল্লাহ্ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা দান করেছেন এবং সে তা কাজে লাগিয়ে মানুষের বিবাদ মীমাংসা করে ও মানুষকে তা শেখায়। আর যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে তা সৎপথে ব্যয় করার ক্ষমতা দান করেছেন।' ইসলাম ন্যায়বিচারকের জন্য বেহেশ্‌তের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেন: 'যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিচারকের দায়িত্ব কামনা করে তা লাভ করে, অত:পর তার অবিচারের চেয়ে সুবিচার বেশি হয়, তার জন্য বেহেশত। আর যার সুবিচারের চেয়ে অবিচার বেশি হয় তার জন্য জাহান্নাম।' (আবু দাউদ)। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি আওফা রা. সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: ' বিচারক যতোক্ষণ সুবিচার করে ততোক্ষণ আল্লাহ্ তার সাথে থাকেন। যখন সে অবিচার করে তখন আল্লাহ তার সংগ ছেড়ে যান এবং শয়তান তার সাথী হয়।' (ইবনে মাজা, তিরমিযি)।

তবে কিছু সংখ্যক হাদিসে যে বিচারকের পদ গ্রহণ করতে সতর্ক করা হয়েছে, তা শুধু সে সব ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য, যারা এ কাজের পূর্ণ যোগ্যতা, দক্ষতা ও এর জন্য প্রয়োজনীয় সৎসাহস, নি:স্বার্থপরতা ও আত্মসংযমের গুণাবলীতে সজ্জিত নয়। যেমন রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'যে ব্যক্তি বিচারকের পদ লাভ করেছে সে বিনা ছুরিতেই জবাই হয়েছে।' –আবু দাউদ, তিরমিযি।

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, আবু যর রা. বলেন: হে রসূলুল্লাহ্ আপনি কি আমাকে কাজে লাগাবেন না।

(অর্থাৎ সরকারি পদে নিয়োগ দেবেন না?) তখন রসূলুল্লাহ্ সা. তার ঘাড়ে হাত রেখে বললেন: হে আবু যর, তুমি দুর্বল, এটা একটা আমানত, (অর্থাৎ একটা কঠিন দায়িত্ব। জনগণের অধিকার ও দাবি-দাওয়া পূরণ করা এর অনিবার্য দাবি)। কিয়ামতের দিন এটা অপমান ও অনুশোচনার কারণ হবে। তবে যে এর হক আদায় করতে পারবে তার কথা ভিন্ন।'

আবু মূসা আশ্'য়ারি রা. বলেন: আমি ও আমার দুই চাচাতো ভাই রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট উপস্থিত হলাম। তাদের একজন বললো: হে রসূলুল্লাহ্, সা. আল্লাহ্ আপনাকে যে সব দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তা থেকে আমাদের নিকট কিছু অর্পণ করুন। অপর জনও তদ্রূপ বললো। রসূলুল্লাহ্ সা. জবাব দিলেন: আল্লাহ্র কসম, আমি এ দায়িত্ব এমন কাউকে দেইনা যে এটা চায় অথবা যে এর জন্য লালায়িত।' আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সা. বলেন: 'যে ব্যক্তি বিচারকের পদ চায় এবং এজন্য সুপারিশকারীদের সাহায্য কামনা করে, আল্লাহ্ তাকে তার নিজের উপরই সোপর্দ করবেন। (অর্থাৎ তাকে সাহায্য করবেননা।) আর যাকে একাজে বাধ্য করা হয়, আল্লাহ্ তার উপর এমন একজন ফেরেশতা নাযিল করেন, যে তাকে সত্য ও ন্যায়ের দিকে পরিচালিত করে।' –তিরমিযি, আবু দাউদ।

যথাযথভাবে ও সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়ার আশংকার কারণে কোনো কোনো ইমাম বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। এ সম্পর্কে একটা মজার ঘটনা বর্ণিত আছে: হায়ওয়া ইবনে শুরাইহ্কে মিশরের বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানানো হলে, তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তখন শাসক তরবারি আনতে বললেন। এ অবস্থা দেখে হায়ওয়া নিজের পকেট থেকে তার ঘরের চাবির তোড়া বের করে বললেন: এই যে হলো আমার ঘরের চাবি। আমি আমার প্রতিপালকের সাথে মিলিত হতে উদগ্রীব।' শাসক তার অবিচলতা দেখে তাকে ছেড়ে দিলেন।

বিচারকের যোগ্যতা: বিচারকের দায়িত্ব একমাত্র এমন ব্যক্তিই পালন করতে পারে, যে কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাপারে পারদর্শী, আল্লাহ্র দীন সম্পর্কে সূক্ষ্ম ও বিশদ জ্ঞানের অধিকারী, ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য করতে সক্ষম এবং অবিচার করার মনোভাব থেকে মুক্ত ও প্রবৃত্তিকে সংযত রাখতে সক্ষম। ফকিহ্গণ বিচারকের জন্য ইজতিহাদের ক্ষমতা অর্জনের শর্ত আরোপ করেছেন। এজন্য বিশেষভাবে তাকে আহকাম (আইন ও বিধি) সংবলিত আয়াত ও হাদিসসমূহ জানা, প্রাচীন ফকিহ্গণের মতামত, কিসে কিসে তারা একমত ও কিসে কিসে দ্বিমত পোষণ করেবেন তা জানা, অভিধান ও কিয়াস সম্পর্কে দক্ষতা এবং প্রাপ্তবয়স্ক, ভারসাম্যপূর্ণ, সৎ, উত্তম শ্রোতা, উত্তম দ্রষ্টা, উত্তম বক্তা এবং পুরুষ হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। (ইমাম শায়েফি ও ইমাম মালেকের মতে বিচারকের মুজ্তাহিদ হওয়া শর্ত। ইমাম আবু হানিফার মতে মুজতাহিদ হওয়া শর্ত নয়।)

প্রকৃতপক্ষে এ শর্তগুলো যতটা সম্ভব পূরণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এগুলো যার ভেতরে বেশি পাওয়া যাবে তাকে নিয়োগ দেয়া জরুরি। অন্ধ অনুসারী, অমুসলিম, অপ্রাপ্তবয়স্ক, পাগল, ফাসেক ও মহিলা বিচারক পদের যোগ্য নয়। আবু বকরা রা. বর্ণনা করেন: পারস্যবাসী পারস্য সম্রাটের কন্যাকে সম্রাজ্ঞী বানিয়েছে, এ মর্মে সংবাদ পেলে আল্লাহ্র নবি বললেন: 'এমন জাতি কখনো সফলকাম হয়না, যারা কোনো নারিকে তাদের শাসকভার অর্পণ করে।' –বুখারি, নাসায়ি, তিরমিযি, আহমদ।

ইমাম আবু হানিফার মতে মহিলা আর্থিক বিষয়ের বিচারক হতে পারে। ইমাম তাবারী বলেন: মহিলা সকল ব্যাপারেই বিচারক হতে পারে। 'নাইলুল আওতার' গ্রন্থে ফাতহুল বারীর বরাত দিয়ে বলা হয়েছে: হানাফীগণ ব্যতীত আর সকলে বিচারকের জন্য পুরুষ হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। তবে শরিয়তের 'হুদুদে' (দন্ডবিধিতে) মহিলার বিচারক হওয়া হানাফিদের মতেও জায়েয নয়। অধিকাংশ ফকিহ্ বলেন, বিচারকের জন্য বুদ্ধির পরিপক্কতা প্রয়োজন। অথচ নারীর বুদ্ধি অপরিপক্ক। বিশেষত যেখানে পুরুষরাও কর্মরত রয়েছে। এসব শর্তের পাশাপাশি ফকিহ্গণ এ শর্তও আরোপ করেছেন যে, বিচারক সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়া জরুরি। এটা তার বিচারের বৈধতার শর্ত। পক্ষান্তরে বাদী বিবাদীদ্বয় নিজেরা যদি

স্বেচ্ছায় কাউকে তাদের বিরোধ মীমাংসার জন্য শালিশ নিয়োগে সম্মত হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে এটা শর্ত নয়। সে সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারক না হলেও ইমাম মালিক ও আহ্‌মদের মতে বিচার করতে পারবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতে তার রায় যদি দেশের সরকারি বিচারকের রায়ের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়, তাহলে তার বিচার বৈধ হবে, অন্যথায় নয়।

ইমাম আহ্‌মদ ও ইমাম মালিকের মতানুসারে, বাদী-বিবাদীর, মনোনীত বিচারক যখন রায় দেবে, তখন তার রায় মেনে নেয়া তাদের উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক হবে। তার রায়ে তাদের সম্মতি বিবেচ্য নয়। ঐ বিচারকের রায় বাতিল করা সরকারের জন্যও বৈধ নয়। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী থেকে দুটো মত বর্ণিত আছে: একটি মত হলো, তার রায় উভয়কে মানতেই হবে। অপরটি হলো, তাদের পছন্দমত না হলে মানা জরুরি নয়। ফতোয়ার ন্যায় ইচ্ছা হলে মানবে, না হয় মানবে না। বাদী বিবাদীর সম্মতিক্রমে এই শালিশ নিয়োগ কেবল আর্থিক বিরোধ মীমাংসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। হুদুদ, বিয়ে, ও লিয়ানে শালিশ সর্বসম্মতভাবে অবৈধ।

বিচারকের সর্বোত্তম মান ও আদর্শ কী, এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বাণী–

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَاتَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ○

'হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। অতএব তুমি জনগণের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। কেননা এটা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহ্‌র পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কারণ তারা বিচার দিবসকে ভুলে রয়েছে।' (সূরা সাদ: আয়াত ২৬)

এই আয়াতের সম্বোধন যখন দাউদ আলাইহিস সালামের প্রতি, তখন তা প্রকৃত পক্ষে সকল শাসকের প্রতি উচ্চারিত। কেননা আল্লাহ্ এটা শুধুমাত্র আমাদের নিকট সর্বোত্তম শাসনের মান ও আদর্শ তুলে ধরার জন্যই উল্লেখ করেছেন। একজন নিষ্পাপ নবি হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ দাউদ আ.-কে বলেছেন: 'খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। কেননা এটা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করবে।' নিষ্পাপ নবি সম্পর্কে খেয়াল-খুশির অনুসরণের আশংকা থাকে, যারা নবি নয় এবং নিষ্পাপ নয়, তাদেরতো খেয়াল-খুশির অনুসরণের আশংকা আরো বেশি থাকার কথা।

আবু বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'বিচারক তিন প্রকার: এক প্রকার বেহেশ্‌তবাসী, অপর দুই প্রকার দোযখবাসী। বেহেশ্‌তবাসী বিচারক হলো সেই ব্যক্তি, যিনি সত্য ও ন্যায় কি তা জানেন ও বোঝেন এবং সে অনুসারে বিচার-ফায়সালাও করেন। আর দ্বিতীয় বিচারক হলো সে ব্যক্তি, যে সত্য ও ন্যায় কি তা জেনে বুঝেও অন্যায় বিচার করে এবং দোযখবাসী হয়। আর তৃতীয় বিচারক হলো সে ব্যক্তি যে, সত্য ও ন্যায় কি তা জানে না। ফলে অজ্ঞতার ভিত্তিতেই মানুষের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করে ও দোযখবাসী হয়।' (আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি, ইবনে মাজা ও হাকেম) কুরআন ও সুন্নায় পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও ইজতিহাদের যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর কোনো বিচারক তার রায় দেয়ার সময় ইমামদের মতামত যাচাই ও তন্মধ্য থেকে যে মতটি অধিকতর শক্তিশালী এবং সত্যের সাথে সংগতিপূর্ণ তার অনুসরণ করতেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আলকিন্দী উল্লেখ করেন: ইবরাহীম ইবনুল জাবরাহ ২০৪ হিজরীতে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পর্কে উমর ইবনে খালিদ বলেন: ইবরাহীম ইবনুল জাররাহের মত আর কোনো বিচারকের সাহচর্য আমি পাইনি। আমি যখন তার জন্য কোনো বিচারের ফাইল তৈরি করতাম এবং তাকে পড়ে শুনাতাম, তখন যতক্ষণ ইচ্ছা তথায় অবস্থান করতেন এবং সে সম্পর্কে নিজের মতামত স্থির করতেন। অত:পর যখন সিদ্ধান্ত নিতেন যে, উক্ত বিষয়ে তার রায় ঘোষণা করবেন, তখন এটা

আমাকে দিতেন যেন আমি তার ভিত্তিতে একটা বিবরণী তৈরি করি। অত:পর সে বিবরণী পিঠে লিখিত দেখতাম ইমাম আবু হানিফা বলেছেন ......। আরেক লাইনে লিখতেন: ইবনে আবি লায়লা বলেছেন ....। আরেক লাইনে লিখতেন: আবু ইউসুফ ও মালেক বলেছেন ....।

তারপর অন্য এক লাইনে একটা রেখার মতো চিহ্ন দিতেন, যা দ্বারা আমি বুঝতে পারতাম যে, তাঁর রায় উক্ত মত অনুসারে স্থির হয়েছে। অত:পর আমি তদনুসারে রায় লিখতাম। কোনো কোনো আলেম মনে করেন, চিন্তার বিক্ষিপ্ততা এড়াতে বিচারকের কোনো নির্দিষ্ট মযহাবের আনুগত্য বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। মুহাদ্দিস দেহলবী বলেছেন: কোনো বিচারক তাদের রায়ে অবিচার করলে, তখন শাসকরা বিচারকদের জন্য একটা নির্দিষ্ট মযহাবের অধীনে রায় দেয়া ও তার সীমা লংঘন না করা বাধ্যতামূলক করেন এবং জনগণের মধ্যে কোনো সংশয় ও অস্থিরতা সৃষ্টি না করেও ইতিপূর্বে কেউ না কেউ সেরূপ মত ব্যক্ত করেছেন, এমন রায়ই গ্রহণ করতেন।

অযোগ্য বিচারকের বিচার: আলেমগণ বলেন: যে ব্যক্তি বিচারের যোগ্য নয়, তার বিচার করা অবৈধ। তথাপি বিচার করলে সে পাপী হবে এবং তার রায় কার্যকর হবে না, চাই তা সত্য ও ন্যায়ের সাথে সংগতিপূর্ণ হোক বা না হোক। কেননা যদি তা ন্যায়সংগত হয়ও, তবে তা নেহাৎ কাকতালীয় ব্যাপার। সে বিচার শরিয়ত সম্মত নীতিমালা থেকে উৎসারিত হয়নি। এ ধরনের বিচারক তার সকল রায়ে গুনাহগার, চাই তা ন্যায়সংগত হোক বা নাহোক। তার সকল রায় বাতিল। তার কোনো ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

বিচারের শরয়ি পদ্ধতি: রসূলুল্লাহ্ সা. মুয়ায রা. কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বিচারকের কোন পন্থা অনুসরণ করা উচিত, তা জানিয়ে দিয়েছেন। মুযায়কে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: কিসের দ্বারা বিচার ফায়সালা করবে? মুয়ায বললেন: আল্লাহ্র কিতাব দ্বারা। তিনি বললেন: যদি সেখানে না পাও? মুয়ায বললেন: তাহলে রসূলের সুন্নাহ্ দ্বারা। রসূল সা. আবার বললেন: সেখানেও যদি না পাও? তখন মুয়ায বললেন: তাহলে আমার নিজের বিবেক দ্বারা।

বিচারকের কর্তব্য হলো,সত্য খুঁজে বের করার জন্য সর্বাত্মক অনুসন্ধান এবং এমন যে কোনো জিনিস থেকে দূরে থাকা উচিত, যা চিন্তাধারাকে বিক্ষিপ্ত ও এলোমেলো করতে পারে। এ জন্য প্রচন্ড ক্রুদ্ধ, ক্ষুধার্ত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, ভীত, ঘুমে পাওয়া, গরমে অতিষ্ঠ, শীতে কাতর এবং মন এতটা চিন্তাভাবনায় মগ্ন থাকা অবস্থায় বিচার কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত, যা সত্য উদঘাটন ও সূক্ষ্ম উপলব্ধির পথে অন্তরায়।

বুখারি ও মুসলিমে আবু বাক্‌রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: কোনো শাসক বা বিচারক কোনো দুই ব্যক্তির বিবাদ নিজে রাগান্বিত থাকা অবস্থায় মীমাংসা করবে না।

তবে কোনো বিচারক যদি এ সব অবস্থার কোনো একটিতে বিচার করেই বসেন, তা ন্যায়সংগত হলে অধিকাংশ আলেমের মতে বৈধ ও গ্রহণযোগ্য হবে।

মুজতাহিদ সওয়াব পাবে: বিচারক সত্য অনুসন্ধান ও সঠিক সিদ্ধান্তের অন্বেষণে যতো চিন্তা-গবেষণা তথা ইজ্‌তিহাদ করবে, ততোই সওয়াব পাবে, চাই সে শেষ পর্যন্ত সত্যের সন্ধান না পাক। আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত, রসূল সা. বলেন: শাসক বা বিচারক যখন ইজতিহাদ করে ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেয় তখন দুটো পুরস্কার,যখন ইজতিহাদ করে ও ভুল সিদ্ধান্ত নেয় তখন একটা পুরস্কার পাবে। (বুখারি ও মুসলিম)।

ইমাম খাত্তাবি বলেন: মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেই সওয়াব পায়। কেননা তার ইজতিহাদ ইবাদত। ভুল সিদ্ধান্তে সওয়াব পায়না, শুধু গুনাহ থেকে মুক্তি পায়।

এ কথা সে ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যিনি ইজ্‌তিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত যোগ্যতা ও উপকরণের অধিকারী মূলনীতি সম্পর্কে অবহিত এবং কিয়াসে অভিজ্ঞ। কিন্তু যিনি ইজ্‌তিহাদের যোগ্যতা রাখেন না, তথাপি ইজ্‌তিহাদ করেন, তিনি কৃত্রিম মুজতাহিদ। তিনি ইজতিহাদের মাধ্যমে ভুল রায় দিলে তাকে

কোনো ছাড় দেয়া যাবে না, বরং তার সবচেয়ে বড় গুনাহ হবার আশংকা রয়েছে। উম্মে সালমা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'আমি তো মানুষ মাত্র। তোমরা আমার কাছে দাবি ও পাল্টা দাবি নিয়ে আস। হয়তো তোমাদের একজন অপরজনের চেয়ে নিজের যুক্তি প্রদর্শনে বেশি বাকপটু। আমি তোমাদের কথার ভিত্তিতে বিচার মীমাংসা করে থাকি। কাজেই আমি যদি কাউকে তার ভাইয়ের অধিকার দিয়ে থাকি তবে সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা আমি তো তার জন্য জাহান্নামের একটা টুকরো তৈরি করি। (অর্থাৎ অধিকতর বাকপটু লোকের কথায় প্রভাবিত হয়ে ভুল মীমাংসার মাধ্যমে একজনের হক অন্য জনকে দিয়ে থাকতে পারি।) –বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি ও ইবনে মাজা।

আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'দুজন মহিলার সাথে তাদের দুটো ছেলে ছিলো। হঠাৎ বাঘ এসে তাদের একজনের ছেলেকে নিয়ে গেল। তখন এক মহিলা দ্বিতীয় মহিলাকে বললো: বাঘ তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে। দ্বিতীয় মহিলা প্রথম মহিলাকে বললো: তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে। অত:পর উভয়ে নিজেদের বিবাদ মীমাংসার জন্য দাউদ আ. এর কাছে গেল। দাউদ আ. অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যোষ্ঠা মহিলার পক্ষে রায় দিলেন। এরপর তারা উভয়ে দাউদ আ. এর পুত্র সুলায়মান আ. এর কাছে গিয়ে তাকে দাউদ আ. এর মীমাংসার কথা জানালো। সুলায়মান আ. বললেন: আমাকে একটা ছুরি এনে দাও, ছেলেটাকে দ্বিখন্ডিত করে উভয়ের মধ্যে বন্টন করে দেই। তৎক্ষণাৎ কনিষ্ঠা মহিলা বললো: এ কাজ করবেন না। ছেলেটি ঐ মহিলার। ওকে দিয়ে দিন।' সুলায়মান আ. ছেলেটি কনিষ্ঠা মহিলাকেই দিলেন।

এ হচ্ছে সুলায়মান আ. এর বিচক্ষণতা ও সুবিচার। তিনি এই কৌশলটি অবলম্বন করলেন প্রকৃত মা চিনবার উদ্দেশ্যে। তিনি যখনই বললেন, ছুরি নিয়ে এসো, ছেলেকে দ্বিখণ্ডিত করে দেই, তখনই প্রকৃত মায়ের দরদ উথলে উঠলো। সে কিছুতেই তাকে হত্যা করতে দিলনা বরং হত্যার পরিবর্তে তার কাছ থেকে দূরে থাকুক এবং বেঁচে থাকুক এটাকেই সে অগ্রাধিকার দিলো। এই প্রতিক্রিয়া থেকে সুলায়মান প্রমাণ পেলেন যে, এটা তারই ছেলে।

আল্লাহ্ তায়ালা সূরা আম্বিয়ার ৭৮ ও ৭৯ নং আয়াতে হযরত দাউদ ও সুলায়মান আ: এর অন্য একটা বিচারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন–

وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ج وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ○ فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ج وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ز

'স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করছিল। একটি সম্প্রদায়ের মেষপাল ঐ শস্যক্ষেতে রাত্রিকালে প্রবেশ করেছিল। আমি তাদের বিচার প্রত্যক্ষ করছিলাম। আমি সুলায়মানকে মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম।

মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেন: মেষ পাল ক্ষেতে প্রবেশ করে শস্য নষ্ট করে ফেলেছিল। ফলে ক্ষেতের মালিক ঐ মেষের মালিকদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত বিবাদটি মীমাংসার্থে দাউদ আ. এর নিকট নীত হলো। দাউদ আ. ক্ষেতের মালিককে মেষগুলো দিয়ে দেয়ার পক্ষে রায় দিলেন।

এরপর বাদী বিবাদী দাউদ আ. এর দরবার থেকে বেরিয়ে যেতেই তাদের সাথে সুলায়মানের সাক্ষাৎ হলো। সুলায়মান আ. জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাদের বিবাদের মীমাংসা কিভাবে করা হলো? তারা তাকে মীমাংসার কথা জানালো। তখন সুলায়মান আ. বললেন: তোমাদের মামলাটা আমার কাছে এলে আমি উভয় পক্ষের জন্য অপেক্ষাকৃত নমনীয় হয় এমন মীমাংসা করতাম। এ কথা জানতে পেরে দাউদ আ. তাকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কিভাবে বিচার করতে? সুলায়মান আ. বললেন: ক্ষেতের মালিককে আপাতত মেষগুলো দিয়ে দিন সে এগুলোর দুধ, পশম, বাচ্চা ও অন্যান্য সেবা দ্বারা উপকৃত হতে থাকুক। এ সময় মেষের মালিক ক্ষেতের মালিকের জন্য তার ক্ষেত নিজের ক্ষেতের মতো চাষ করতে থাকুক। যখন ফসল সে দিনের মতো বড় হবে যেদিন মেষ ফসল খেয়েছিল, তখন ক্ষেতের

মালিক ক্ষেতের দখল বুঝে নেবে ও মেষের মালিক তার মেষ নিয়ে যাবে।' এ কথা শুনে দাউদ আ. বললেন: তোমার মীমাংসাই সঠিক। তিনি এই মীমাংসাকেই নিজের রায় হিসাবে ঘোষণা করলেন।

বিচারকের করণীয়: পাঁচটি বিষয়ে বাদী ও বিবাদীর প্রতি সমান আচরণ করা বিচারকের কর্তব্য:

১. বিচারকের কাছে যেতে দেয়া।
২. বিচারকের সামনে আসন গ্রহণ করা।
৩. উভয়ের প্রতি বিচারকের মনোযোগ দেয়া।
৪. উভয়ের বক্তব্য শোনা।
৫. উভয়ের প্রতি ন্যায়বিচার করা।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, উভয়ের প্রতি সমান আচরণ করা বাহ্যিক কাজের বেলায়ই জরুরি। মনের টানের বেলায় নয়। দু'জনের একজনের প্রতি যদি তার মন ঝুকে পড়ে এবং যুক্তির মাধ্যমে সে প্রতিপক্ষের উপর জয়ী হোক এটা পছন্দ করে তাহলে তার কোনো গুনাহ হবে না। কেননা এটি থেকে নিবৃত্ত থাকা সম্ভব নয়। তবে দু'জনের কোনো একজনকে তার যুক্তিতর্ক শিখিয়ে দেয়া ও কোনো সাক্ষীকে সাক্ষ্য শিখিয়ে দেয়া তার জন্য অনুচিত। কেননা এতে বাদী বিবাদীর একজন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিচারক বাদীকে দাবি পেশ করা ও শপথ করাও শেখাবেনা, বিবাদীকে স্বীকার বা অস্বীকার করাও শেখাবেনা, সাক্ষীদেরকে সাক্ষ্য দিতে বা সাক্ষ্য দেয়া থেকে বিরত থাকতেও বলবেনা এবং বাদী বিবাদীর একজনকে বাদ দিয়ে অপর জনের মেহমানদারী করবেনা। কেননা এতে অপর জন মনে কষ্ট পাবে। বিচারক নিজেও বাদী ও বিবাদী বা তাদের কোন একজনের মেহমানদারী গ্রহণ করবেনা যতক্ষণ তারা পরস্পরের প্রতিপক্ষ থাকবে।

বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সা. বাদী ও বিবাদীর কোনো একজনকে তার প্রতিপক্ষ ব্যতিরেকে মেহমানদারী করতেন না এবং কোনো একজনের উপহার গ্রহণ করতেন না। তবে কোনো ব্যক্তি যদি বিচারককে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণের প্রাক্কালে উপহার দিতে অভ্যস্ত থাকে, তাহলে তার উপহার নেয়া যাবে। যার এ ধরনের অভ্যাস নেই তার উপহার ঘুষ বিবেচিত হবে। বারিদা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'যাকে আমরা কোনো চাকরিতে নিয়োগ করি এবং তাকে তার বিনিময়ে কোনো জীবিকা দেই, সে এরপর যা গ্রহণ করবে, তা খিয়ানত।' (আবুদাউদ)

রসূল সা. আরো বলেন: 'বিচার ও শাসন কার্যে যে ঘুষ খায় এবং দেয়, উভয়ের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ।'

খাত্তাবি বলেন: উভয়ের ক্ষেত্রে অভিশাপ সমভাবে প্রযোজ্য কেবল তখনই, যখন উভয়ে একইভাবে স্বেচ্ছায় ঘুষের লেনদেন করবে। ঘুষদাতা যখন অবৈধ উদ্দেশ্যে ও কারো উপর যুলুম করার মানসে ঘুষ দেবে, তখন সেও ঘুষগ্রহীতার মত অভিশপ্ত হবে। কিন্তু সে যদি ন্যায্য পাওনা পাওয়ার উদ্দেশ্যে বা নিজের উপর থেকে যুলুম প্রতিহত করার লক্ষ্যে ঘুষ দেয়, তাহলে সে এই হুমকির আওতাভুক্ত হবে না। বর্ণিত আছে যে, ইবনে মাস্উদ রা. আবিসিনিয়ায় থাকাকালে অন্যায়ভাবে যুদ্ধবন্দী হিসাবে গ্রেফতার হন। তখন তিনি দুই দিনার দিয়ে গ্রেফতারি থেকে অব্যাহতি পান। হাসান, শা'বি, জাবির ও আতা র. বলেন: কেউ যদি যুলুমের ভয়ে নিজের জান ও মাল রক্ষার্থে আপোস করে তবে তাতে কোনো গুনাহ্ নেই। অনুরূপ, ঘুষ গ্রহীতার উপর এই অভিশাপের হুমকি তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন সে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করবে এবং ঘুষ না দেয়া পর্যন্ত সে দায়িত্ব পালন করবেনা অথবা কোনো অবৈধ কাজ, যা তার বর্জন করা উচিত, কিন্তু তাকে ঘুষ নাদেয়া পর্যন্ত সে তা বর্জন করেনা। 'ফাত্হুল আল্লাম' গ্রন্থে বলা হয়েছে: বিচারকগণ যে অর্থ গ্রহণ করেন তা চার প্রকার: ঘুষ, উপহার, পারিশ্রমিক ও বেতন।

১. **ঘুষ:** এটা যদি এজন্য দেয়া হয় যে, দাতার জন্য বিচারক অন্যায়ভাবে বিচার করবে, তবে তা দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের জন্য হারাম। আর যদি এজন্য দেয়া হয় যে, দাতার ন্যায্য প্রাপ্য বিচারক আদায় করে দেবে, তবে তা বিচারকের জন্য হারাম, দাতার জন্য নয়। কেননা এটা সে তার ন্যায্য পাওনা পাওয়ার

উদ্দেশ্যে দিয়েছে। কারো কারো মতে, এটা দাতার জন্যও হারাম। কেননা এর কারণে বিচারক গুনাহে লিপ্ত হয়।

২. উপহার: যদি বিচারকের বিচারক পদে অভিষিক্ত হবার আগে থেকেই এটা দেয়া হয়ে থাকে তবে পদ পাওয়ার পরও চালু রাখা হারাম হবে না। আর যদি বিচারক পদে অভিষিক্ত হবার পরেই দেয়া শুরু হয়ে থাকে, তাহলে দেখতে হবে দাতার সাথে কারো বিবাদ বিচ্ছেদ আছে কিনা। যদি না থাকে তবে উপহার জায়েয, কিন্তু মাকরূহ। আর যদি বিবাদ থেকে থাকে তবে এই উপহার বিচারক ও উপহারদাতা উভয়ের জন্য হারাম।

৩. পারিশ্রমিক: বিচারককে যদি সরকারের পক্ষ থেকে বেতন বা ভাতা দেয়া হয়, তাহলে এটা সর্বসম্মতভাবে হারাম। কারণ বিচারকের চাকুরির বাবতেই তাকে বেতন-ভাতাদি দেয়া হয়। এমতাবস্থায় পারিশ্রমিক হিসাবে কিছু নেয়ার কোনো যুক্তি নেই। আর যদি তাকে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো বেতনভাতা না দেয়া হয়, তা হলে বিচারক ব্যতীত অন্য পদে কাজের পরিমাণ অনুপাতে পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয। এর চেয়ে বেশি নিলে হারাম হবে। বিচারক হিসাবে কোনো পারিশ্রমিক নেয়া সর্বসম্মতভাবে হারাম। এ জন্য বলা হয়েছে যে, ধনী ব্যক্তির চেয়ে দরিদ্র ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করা উত্তম। কেননা সরকারি বেতনভুক্ত না হলে যে জিনিস গ্রহণ করা তার জন্য জায়েয ছিলনা, দারিদ্র্যের কারণে তা জায়েয হবে। কথাগুলো শরিয়া আদালত বা ইসলামি বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রযোজ্য। প্রচলিত আইন এবং বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অন্যায় যুলুম ও বাড়াবাড়ি। ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া ইসলামি আদালত এবং শরিয়াভিত্তিক বিচার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। তাই বিচ্ছিন্নভাবে ব্যভিচার, চুরির দায়ে কাউকে দণ্ডিত করা যাবে না। আগে সমাজ পরিবর্তন করতে হবে। তারপর ইসলামি দণ্ডবিধি প্রয়োগ করতে হবে।

বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে উমর রা. এর পত্র: আবু মূসা আশ্‌য়ারি রা. এর নিকট লিখিত পত্রতে উমর রা. বিচার কার্যের জন্য স্থায়ী মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পত্রটি নিম্নরূপ:

'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম,

আল্লাহ্‌র বান্দা আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব এরপক্ষ থেকে আব্দুল্লাহ্ ইবনে কায়িসের নিকট- তোমার উপর সালাম।

ন্যায়বিচার করা একটা অকাট্য ফরয ও আবহমান কাল থেকে অনুসৃত একটা সুন্নাত। বুঝে নাও, যখন কোনো বিচারকার্য তোমার উপর সোপর্দ করা হবে, তখন যে সত্য কার্যকর হবেনা, তা নিয়ে বাগাড়ম্বর করে কোনো লাভ নেই। তোমার সামনে অবস্থানে, তোমরা ন্যায়বিচারে ও তোমার মজলিসে সবার সাথে সমান আচরণ কর, যাতে কোনো অভিজাত ব্যক্তি তার প্রতি তোমার বিশেষ ঝোঁকের জন্য লালায়িত না হয় এবং কোনো দুর্বল তোমার সুবিচার থেকে হতাশ না হয়। বাদীর কর্তব্য হলো তার দাবির পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করা আর যে অস্বীকার করে তার কর্তব্য কসম খাওয়া। কেবল হারামকে হালাল ও হালালকে হারামে পরিণত করে এমন আপোস ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে আপোস মীমাংসা জায়েয। আজ তুমি যে রায় ঘোষণা করেছ, তা তুমি পুনর্বিবেচনা করে যেটি সত্য ও সঠিক মনে কর তার দিকে ফিরে যেতে পার। কেননা সত্য চিরন্তন এবং সত্যের দিকে ফিরে যাওয়া বাতিলকে আঁকড়ে ধরে থাকার চেয়ে ভাল। যে বিষয় কুরআন ও সুন্নাহতে নেই, তা নিয়ে যদি দ্বিধা দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাক, তাহলে বিষয়টি পুন:পুন: উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর। নজিরসমূহ জেনে নাও অত:পর তার সাথে নতুন বিষয়ের তুলনা কর। যেটি আল্লাহর নিকটতম ও সত্যের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা অন্বেষণ কর। যে ব্যক্তি কোনো প্রাপ্য দাবি করে ও সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে চায়, তার জন্য একটা সর্বশেষ মেয়াদ বেঁধে দাও। সে মেয়াদের মধ্যে সাক্ষ্য-প্রমাণ আনতে পারলে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও। নচেৎ তার দাবি রহিত কর। কেননা সন্দেহ মোচনে এটাই অধিকতর কার্যকর পন্থা। মুসলমানরা পরস্পরের জন্য সাক্ষী হওয়ার যোগ্য কেবল ব্যভিচারী হিসাবে, বেত্রদন্ড ভোগ করেছে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে কিংবা বংশগত বা

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযুক্ত হয়েছে এমন ব্যক্তি ব্যতীত। আল্লাহ সাক্ষ্য-প্রমাণ ও শপথ দ্বারা তোমাদের গোপনীয়তা সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। বিবাদ-বিচ্ছেদের সময় প্রতিপক্ষের দ্বারা কষ্ট পেয়ে ধৈর্যহারা, দিশেহারা হবে না। কেননা সত্য সত্যের স্থানেই থাকে এবং দু:খ কষ্ট দ্বারা আল্লাহ্ সওয়াব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। যার নিয়ত সৎ এবং যে আত্মসংযমে অভ্যস্ত, আল্লাহ্ ও মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। যে ব্যক্তি কৃত্রিমভাবে মানুষের সাথে এমন আচরণ করবে যা তার নিয়তের পরিপন্থী এবং যা সম্পর্কে আল্লাহ্ জানেন যে, ওটা তার স্বত:স্ফূর্ত আচরণ নয়, আল্লাহ তাকে অপদস্থ করবেন। সুতরাং আল্লাহ্র ত্বরিত জীবিকা ও তাঁর রহমতের ভান্ডার সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? এটা কি আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ তোমাকে দিতে পারে?

বিচারকের সুপারিশ: বিচারক ভাল মনে করলে সুপারিশ করতে পারেন। যেমন বাদী বিবাদীকে আপোস করতে বা তাদের পাওনার একাংশ ছেড়ে দিতে বলতে পারেন। ইতিপূর্বে উল্লেখিত এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ সা. কাব ইবনে মালিককে তার ঋণের অর্ধেক ছেড়ে দেয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন এবং কাব তা মেনে নিয়ে আপোস করেছিলেন।

বিচারকের রায়ের বাহ্যিক কার্যকারিতা: বিচারকের রায় কোনো হালাল জিনিসকে হারাম করেনা এবং কোনো হারাম জিনিসকে হালাল করেনা। এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে উম্মে সালমা বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: 'আমি তো মানুষ মাত্র। তোমরা আমার নিকট বিবাদ নিয়ে এসে থাক। হয়তো তোমাদের কেউ অপরের চেয়ে বেশি বাকপটু হতে পারে এবং নিজের যুক্তিপ্রমাণ তুলে ধরতে পারে। ফলে আমি যা শুনি তার ভিত্তিতে মীমাংসা করি। কাজেই আমি যদি কাউকে তার ভাইয়ের অধিকার দিয়ে থাকি তবে সে যেন তা না নেয়। কেননা আমি তো তার জন্য আগুনের টুকরো তৈরি করি।' (বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি ও ইবনে মাজা)। ইমাম শাফেয়ি বলেন, বিচারকের রায় হারামকে হালাল করতে পারেনা, এটা একটা সর্বসম্মত অভিমত। সুতরাং যখন কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো দাবি উপস্থাপন করে, সে দাবির উপর সাক্ষীদেরকেও হাজির করে এবং বিচারক দাবিকারীর পক্ষে রায় দেয়, তখন সাক্ষ্য-প্রমাণ সত্য হলে বিচারকের রায়ে পাওয়া হক গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ। কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ মিথ্যা হয়ে থাকলে এবং সে মিথ্যা সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিচারক রায় দিয়ে থাকলে সে রায় বাদীর জন্য দাবিকৃত হক গ্রহণ করাকে বৈধ করেনা, বরং সেটি তার মালিকের মালিকানার অধীনেই থাকবে। একমাত্র ইমাম আবু হানিফা ব্যতীত আর কোনো ফকিহ্ এই মতের বিরোধিতা করেননি। ইমাম আবু হানিফা বলেন: বিচারকের রায় চুক্তিসমূহের বহাল থাকা ও বাতিল হওয়ার ব্যাপারে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সর্বতোভাবেই কার্যকর।

সুতরাং কোনো মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা যখন বিচারকের নিকট কোনো মহিলার তালাকের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, অত:পর তদনুসারে বিচারক তালাকের পক্ষে রায় দেয়, তখন স্বামীর সাথে তার বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে এবং সে অন্য স্বামীর সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এমনকি যে ব্যক্তি তার তালাকের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে তার সাথেও বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। অনুরূপ, কেউ যদি কোনো মহিলা সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যে, সে অমুকের স্ত্রী, অথচ সে তার স্ত্রী নয়, অত:পর বিচারক এ সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় দেয়, তাহলে এ রায় অনুযায়ী মহিলাটি তার জন্য বৈধ হবে। ইমাম আবু হানিফা অবশ্য চুক্তি বহাল থাকা বা বাতিল হওয়া সংক্রান্ত মামলায় এবং খুন ও সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় পার্থক্য করেছেন। কিন্তু সে পার্থক্য সঠিক নয়। কেননা এ দুধরনের মামলায় কোনো পার্থক্য নেই। এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফার শিষ্যগণ তাঁর মতের বিরোধিতা করেছেন।

যে অনুপস্থিত ব্যক্তির কোনো প্রতিনিধি নেই, তার সম্পর্কে বিচারকের রায়: যে ব্যক্তি অনুপস্থিত এবং তার কোনো প্রতিনিধিত্ব (উকিল) নেই, বাদী তার বিরুদ্ধে দাবি তুলতে তথা মামলা করতে পারেন। আর দাবি প্রমাণিত হলে বিচারক উক্ত অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে রায় দিতেও পারেন।

এর প্রথম প্রমাণ: সূরা সাদের ২৬ নং আয়াত: 'হে দাউদ. মানুষের মধ্যে সত্য অনুযায়ী ফায়সালা কর'। যেহেতু সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত জিনিস সত্য, তাই সে অনুযায়ী রায় দেয়া ওয়াজিব।

দ্বিতীয় প্রমাণ: আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ রসূলুল্লাহ্ সা. কে জানালো যে, আবু সুফিয়ান কৃপণ মানুষ, তাই সে কি তার অনুমতি ছাড়া তার সম্পদ থেকে কিছু নিতে পারে? রসূল সা. তাকে বললেন: যতোটুকু নিলে তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট হয়, ততোটুকু নিতে পার।' এটা একজন অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রদত্ত রায়।

তৃতীয় প্রমাণ: ইমাম মালেক 'মুয়াত্তায় উল্লেখ করেন যে, উমর রা. বলেছেন: 'যে ব্যক্তির কারো কাছে কিছু পাওনা আছে সে যেন আগামীকাল আমার কাছে আসে। আমি খাতকের সম্পত্তি বিক্রয় করবো এবং তা তার পাওনাদারদের মধ্যে ভাগ করে দেব।' যে ব্যক্তির সম্পত্তি বিক্রয়ের ফায়সালা করা হয়েছিল সে অনুপস্থিত ছিলো।

চতুর্থ প্রমাণ: যেহেতু অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে রায় দানে বিচারক বিরত থাকলে হকদারের হক নষ্ট হবে, সেহেতু এ রূপ রায় দান অবৈধ নয়। আর অনুপস্থিত থাকার ওজুহাত কারো ঋণ পরিশোধ থেকে বিরত থাকার জন্য যথেষ্ট নয়। এটাই ইমাম মালিক, শাফেয়ি ও আহ্মদের মত। তাঁরা বলেন: 'অনুপস্থিত ব্যক্তির কোনো হক নষ্ট করা হয়না। সে উপস্থিত হলে তার যুক্তি শোনা হয় এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়, এমনকি তার ফলে রায়ও বাতিল করা হতে পারে। কেননা তার বক্তব্য শোনা শর্ত। বিচারপতি শুরাইহ, উমার ইবনে আব্দুল আযীয, ইবনে আবি লায়লা ও ইমাম আবু হানিফা বলেন:

অনুপস্থিত ব্যক্তির কোনো প্রতিনিধির উপস্থিতি ব্যতীত বিচারক তার বিরুদ্ধে কোনো রায় দিতে পারেননা। কেননা তার কাছে এমন কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকতে পারে, যা বাদীর দাবি বাতিল করে দেয়। তাছাড়া ইতিপূর্বে এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ সা. আলি রা. কে বলেন: 'হে আলি, যখন বাদী ও বিবাদী তোমার সামনে বসবে, তখন উভয়ের বক্তব্য না শোনা পর্যন্ত কোনো রায় দেবেনা। উভয়ের বক্তব্য শুনলে তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে বিচারটা কেমন হওয়া উচিত।'

খাত্তাবি বলেন: কিছু সংখ্যক ফকিহ্ কতিপয় ব্যাপারে অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে রায় দানের পক্ষপাতী। তন্মধ্যে মৃত ব্যক্তি ও শিশু সংক্রান্ত বিষয় উল্লেখযোগ্য। তারা আরো বলেন: যে ব্যক্তি তার সম্পদ কারো কাছে গচ্ছিত রেখে বিদেশে চলে যায়, তার স্ত্রী যখন খোরপোশ দাবি করবে এবং যার নিকট গচ্ছিত রেখেছে, তাকে হাজির করে, তখন বিচারক স্ত্রীর খোরপোশ দিতে বাধ্য করতে পারবে।

তিনি আরো বলেন: শুফ্য়ার দাবিদার যখন অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচারকের নিকট শুফ্য়ার দাবি জানাবে এবং প্রমাণ দেবে যে, সে তার সম্পত্তি বিক্রয় করেছে ও মূল্য হস্তগত করেছে, তখন বিচারক তার শুফয়ার পক্ষে রায় দেবেন। এ সব রায়ই অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রদত্ত রায়।

অমুসলিমদের বিরুদ্ধে বিচারকের রায়: অমুসলিমরা মুসলমান বিচারকদের নিকট বিবাদ পেশ করলে তা জায়েয। তাদের ব্যাপারে বিচারক ইসলামের বিধান অনুসারে মীমাংসা করবেন।

فَإِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ج وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا ط وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ط إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ○

'তারা যদি তোমার নিকট আসে তবে তাদের বিচার করো অথবা তাদেরকে উপেক্ষা করো। তুমি যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তবে তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা। আর যদি বিচার কর তবে ন্যায় বিচার করো। আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন।' (সূরা মায়িদা, ৪২)।

খাতক টালবাহানা করলে পাওনাদার দাবি না জানিয়েই পাওনা আদায় করতে পারবে কি?: শাফেয়ি ফকিহগণ বলেন: যে ব্যক্তির কারো কাছে কিছু পাওনা আছে, কিন্তু প্রমাণ বা সাক্ষী নেই এবং খাতক তা অস্বীকার করে, তাহলে সে তার সম্পত্তি থেকে হুবহু ঐ জিনিস নিতে পারলে নেবে। হুবহু ঐ জিনিস নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অন্য কোনো জিনিস থেকে পাওনা নিতে পারবেনা। অন্য জিনিস থেকে নেয়া ছাড়া উপায়ান্তর না থাকলে অন্য জিনিস থেকেই নিতে পারবে।

আর যদি বিচারকের সাহায্যে পাওনা আদায় করা সম্ভব হয়, যেমন খাতক তার পাওনা স্বীকার করে, কিন্তু টালবাহানা করে অথবা সে অস্বীকার করে, কিন্তু পাওনাদারের কাছে সাক্ষী-প্রমাণ আছে। অথবা খাতককে বিচারকের নিকট হাজির করলে এবং তাকে শপথ করতে বললে সে স্বীকার করবে বলে পাওনাদার আশা করে, তাহলেও কি সে নিজের ইচ্ছামত সরাসরি আদায় করে নিতে পারবে, না বিচারকের কাছে নেয়া বাধ্যতামূলক? এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। অগ্রগণ্য মত হলো, আদায় করা জায়েয। এর প্রমাণ আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দের ঘটনা। তাছাড়া আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি কষ্টকর, ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ হওয়ায় আদালতের আশ্রয় নেয়া বাধ্যতামূলক নয়।

শাফেয়ি ফকিহ্গণ আরো বলেন: সরাসরিভাবে আদায় করা যখন জায়েয, তখন যদি আদায় করার জন্য তার দরজা ভাঙ্গা অথবা প্রাচীর ছিদ্র করা ছাড়া উপায় না থাকে, তবে ওটাও জায়েয। এ ক্ষেত্রে তার যে ক্ষতি হবে তা পূরণ করা পাওনাদারের জন্য জরুরি নয়। এটা ঠিক তেমনি যেমন কোনো আক্রমণকারী থেকে আত্মরক্ষার জন্য যদি তার সম্পদ নষ্ট করা ছাড়া গত্যন্তর না থাকে তবে তাও করা যাবে এবং কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়া লাগবে না।

শাফেয়ি ফকিহ্গণের এ মত রসূলুল্লাহ সা. এর এ হাদিসের পরিপন্থী নয় যে, 'যে ব্যক্তি তোমার আমানত রক্ষা করে, তুমি তার আমানত রক্ষা কর। আর যে ব্যক্তি তোমার আমানতের খিয়ানত করে, তুমি তার আমানতের খেয়ানত করোনা'। কেননা খিয়নতকারী হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে যুলুম ও আগ্রাসনের মাধ্যমে যা নেয়ার অধিকার নেই তা কেড়ে নেয়। যে ব্যক্তি নিজের ন্যায্য প্রাপ্য তার প্রতিপক্ষের কাছ থেকে আদায় করার অধিকার রাখে এবং নিজের উপর কৃত যুলুমের প্রতিকার করার অনুমতিপ্রাপ্ত, সে খেয়ানতকারী নয়। হাদিসটির প্রকৃত অর্থ দাঁড়ায়: 'যে ব্যক্তি তোমার সাথে খেয়ানত করেছে, তার কৃত খিয়ানতের মতো তুমিও তার সাথে খেয়ানত করোনা'। এখানে যার কথা আলোচিত হচ্ছে, সে তো খেয়ানত করেনি। সে কেবল নিজের ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করেছে। আর হাদিসে উল্লেখিত খেয়ানতকারী অন্যের অধিকার অপহরণ করে।

বিচারকের মাথায় নতুন সিদ্ধান্তের উদয়: বিচারক যখন নিজের ইজতিহাদ তথা সর্বাত্মক চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে কোনো মামলায় একটা রায় ঘোষণা করে, অত:পর তার মাথায় নতুন রায়ের উদ্ভব হয়, যা প্রথম রায়টির বিপরীত, তখন সে উক্ত রায়টি বাতিল করবেনা। অনুরূপ যখন তার কাছে অন্য একজন বিচারকের রায় উত্থাপন করা হয়, কিন্তু তা তার পছন্দ হয়না, তখন সেটা সে বাতিল করবেনা। এর প্রমাণ হলো, জনৈকা মহিলার ব্যাপারে উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর যে রায় আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন। ঐ মহিলা স্বামী, মা, পিতা ও মাতার দিক থেকে দু সৎভাই ও মায়ের দিক থেকে দু সৎভাই রেখে মারা যায়। উমর রা. পিতা ও মাতার দিকের সৎভাই ও মায়ের দিকের দু সৎভাইকে সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশে অংশীদার করলেন, এটা দেখে এক ব্যক্তি তাকে বললো: অমুক বছর আপনি উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা করেছিলেন তখন এভাবে তাদেরকে অংশীদার করেননি। উমর রা. বললেন: 'সেদিন মীমাংসা করেছিলাম সেদিনকার প্রেক্ষাপটে, আর আজকে করলাম আজকের প্রেক্ষাপটে।' ইবনুল কাইয়েম বলেন: খলিফা উভয় দিনের ইজতিহাদে স্বাধীনভাবে যেটা সত্য ও সঠিক মনে করেছিলেন, সে অনুসারে মীমাংসা করেছেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিচার-ফায়সালার একটি নমুনা: আবু নুআইম তার 'হিল্য়া' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন: আলি ইবনে আবু তালেব রা. জনৈক ইহুদির নিকট তার একটা বর্ম পেলেন। ইহুদি সেটি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিল। আলি রা. দেখেই বর্মটি চিনে ফেললেন। তিনি বললেন: এটা আমার বর্ম। আমার ছাই রং এর একটা উটের উপর থেকে এটা পড়ে যায়। ইহুদি বললো: বর্মটি আমার এবং আমার হাতে রয়েছে। পরক্ষণে ইহুদি বললো: আমার ও আপনার বিরোধ মীমাংসার জন্য মুসলিম বিচারকের কাছে চলুন। উভয়ে বিচারপতি শুরাইহের নিকট গেলেন। শুরাইহ আলি রা. কে আসতে দেখে নিজের আসন থেকে সরে বসলেন এবং আলি রা. সেখানে বসলেন। অত:পর আলি রা. বললেন: আমার প্রতিপক্ষ যদি মুসলমান হতো তাহলে তার বসার জন্য আমার সমান আসনের ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু আমি রসূলুল্লাহ্ সা. কে বলতে শুনেছি: 'অমুসলিমদেরকে সমান আসনে বসাবেনা।'

এবার শুরাইহ্ বললেন: হে আমীরুল মুমিনীন, কী চান? আলি রা. বললেন: আমার একটা ছাই রং এর উটের উপর থেকে আমার বর্ম পড়ে গেছে। অত:পর এ ইহুদি সেটি কুড়িয়ে নিয়েছে।

শুরাইহ্ বললেন: হে ইহুদি, তোমার বক্তব্য কী?

সে বললো: ওটা আমার বর্ম এবং আমার হাতেই রয়েছে।

শুরাইহ্ বললেন: হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি সত্য বলেছেন। ওটা আপনার বর্ম। কিন্তু এ ব্যাপারে দুজন সাক্ষী প্রয়োজন।

তৎক্ষণাৎ তিনি কাম্বার ও আলি তনয় হাসানকে ডাকলেন এবং উভয়ে সাক্ষ্য দিলো যে, বর্মটি আলি রা.-এর ।

শুরাইহ্ বললেন: আপনার মুক্ত গোলাম কাম্বারের সাক্ষ্য আমি অনুমোদন করলাম। কিন্তু আপনার জন্য আপনার ছেলের সাক্ষী হওয়া অনুমোদন করতে পারিনা। আলি রা. বললেন: আপনি কি শোনেননি, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেছেন: রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: হাসান ও হুসাইন জান্নাতের যুবকদের নেতা?

শুরাইহ্ বললেন: হ্যাঁ, শুনেছি।

আলি রা. বললেন: তবুও বেহেশ্তের যুবকদের নেতার সাক্ষ্য অনুমোদন করছেননা? অত:পর ইহুদিকে বললেন: নাও, বর্মটা তুমিই নিয়ে যাও।

ইহুদি বললো: আমীরুল মুমিনীন আমার সাথে মুসলমানদের বিচারকের নিকট এলেন, সে বিচারক আমার পক্ষে রায় দিল এবং আমীরুল মুমিনীন তাতে রাজি হলেন। হে আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহ্‌র কসম, আপনি সত্যবাদী, এটা আপনারই বর্ম। আপনার একটা উটের উপর থেকে পড়ে গিয়েছিল। আমি ওটা কুড়িয়ে পেয়েছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সা. তাঁর রসূল।

এরপর আলি রা. বর্মটি ইহুদিকে উপহার দিলেন। উপরন্তু তাকে নয়শো মুদ্রা উপহার দিলেন। পরে সে সিফফিন যুদ্ধে আলি রা.এর পক্ষে যুদ্ধ করে শহীদ হয়।

একষট্টিতম অধ্যায়

দাবি ও প্রমাণ

সংজ্ঞা: শরিয়তের পরিভাষায় এটা হলো অন্যের দখলে বা তত্ত্বাবধানে থাকা কোনো জিনিসকে নিজের প্রাপ্য বলে উল্লেখ করা। যে দাবি করে তাকে বাদী বা ফরিয়াদি আর যার বিরুদ্ধে দাবি করা হয় তাকে বিবাদী বা আসামি বলা হয়। বাদী যদি তার দাবি সম্পর্কে নীরব থাকে, তাহলে সে দাবিদার গণ্য হবেনা এবং পরিত্যক্ত হবে। আর বিবাদী নীরব থাকলে অব্যাহতি পায় না।

কার দাবি বৈধ: একমাত্র স্বাধীন, সুস্থমস্তিষ্ক, প্রাপ্তবয়স্ক ও ভালমন্দ বোঝে এমন ব্যক্তির দাবিই বৈধ ও বিবেচনাযোগ্য। ক্রীতদাস, পাগল, অসুস্থমস্তিষ্ক, শিশু ও নির্বোধ ব্যক্তির দাবি বিবেচনার অযোগ্য। এ শর্তগুলো দাবিদারের বেলায় যেমন অপরিহার্য, তেমনি দাবি প্রত্যাখ্যানকারীর বেলায়ও জরুরি।

প্রমাণ ছাড়া দাবির কোনো মূল্য নেই: দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য এমন প্রমাণ প্রয়োজন, যা দ্বারা সত্য স্পষ্ট হয়। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'দাবি করলেই যদি মানুষকে যা দাবি করে তা দেয়া হতো, তাহলে বহু লোক মানুষের জান ও মাল সব কিছুই দাবি করে বসতো। তবে যার বিরুদ্ধে দাবি করা হয় তার কর্তব্য শপথ করা।' (আহমদ, মুসলিম)।

বাদীকেই প্রমাণ পেশ করতে হবে: দাবির যথার্থতা ও সত্যতা প্রমাণ করার দায়িত্ব বাদীর উপরই অর্পিত। কেননা বিবাদী বা আসামি মূলত দায়মুক্ত ও নির্দোষ। তাকে দোষী প্রমাণ করার দায়িত্ব একমাত্র বাদীর।

বায়হাকি ও তাব্‌রানি সহিহ সনদ সহকারে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'প্রমাণ উপস্থাপন বাদীর দায়িত্ব আর দাবি প্রত্যাখ্যানকারীর দায়িত্ব শপথ করা।'

প্রমাণ অকাট্য হওয়া শর্ত: প্রমাণের জন্য শর্ত হলো, তা অকাট্য, নিশ্চিত ও সংশয়মুক্ত হওয়া চাই; কেননা অনুমান প্রসূত প্রমাণ নিশ্চয়তা বহন করেনা। আল্লাহ্ বলেন: وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا 'সত্যের বিপরীতে অনুমানের কোনো মূল্য নেই।' (সূরা নাজম, ২৮)।

ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. এক ব্যক্তিকে বললেন: 'তুমি কি সূর্য দেখতে পাও? সে বললো: হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: তাহলে সূর্যের মতো সাক্ষ্য দাও, নতুবা বাদ দাও।'

দাবি প্রমাণের পদ্ধতি: দাবি প্রমাণ করার পদ্ধতি চারটি: ১. স্বীকারোক্তি দান ২. সাক্ষ্য ৩. শপথ ৪. আনুষ্ঠানিক প্রামাণ্য দলিলপত্র। এ চারটি পদ্ধতির প্রত্যেকটির জন্য কিছু বিধিমালা রয়েছে, যা আমরা একে একে বিশদভাবে বর্ণনা করবো।

বাষট্টিতম অধ্যায়

স্বীকারোক্তি

সংজ্ঞা: স্বীকারোক্তি হচ্ছে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে দাবি বা অভিযোগ করা হয়, তা বিবাদী বা অভিযুক্ত কর্তৃক মেনে নেয়ার নাম। বাদীর দাবি সত্য প্রমাণিত করার জন্য এটা সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ। এ জন্য একে 'শ্রেষ্ঠ প্রমাণ' বলা হয়। এর আর এক নাম নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া।

স্বীকারোক্তির বৈধতা: স্বীকারোক্তি যে কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা শরিয়ত সম্মত বলে প্রমাণিত, সে ব্যাপারে আলেমগণ একমত। আল্লাহ্ তায়ালা সূরা নিসার ১৩৫ নং আয়াতে বলেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ

'হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষী স্বরূপ, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে হয়।' রসূলুল্লাহ্ সা. সাহাবি উনাইস রা.কে বললেন: 'হে উনাইস, এই ব্যক্তির স্ত্রীর অনুসরণ কর। সে যদি স্বীকারোক্তি দেয় তবে তাকে রজম কর।'

তিনি আরো বলেন: 'যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার সাথে তুমি সম্পর্ক স্থাপন কর, যে ব্যক্তি তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে তার সাথে তুমি সদ্ব্যবহার কর এবং ন্যায্য কথা বল, যদিও তা তোমার বিরুদ্ধে যায়।' (আল জামেউস সগীর, ৫০০৪)।

আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'আমার বন্ধু রসূলুল্লাহ্ সা. আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যেন আমি আমার চেয়ে যে নীচে আছে তার দিকে তাকাই এবং আমার চেয়ে যে উপরে আছে তার দিকে না তাকাই, দরিদ্র লোকদেরকে যেন ভালবাসি এবং তাদের কাছাকাছি থাকি, রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে যেন সম্পর্ক মজবুত রাখি যদিও তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং আমাকে কষ্ট দেয়, আমি যেন হক কথা বলি যদিও তা তিক্ত হয়, আল্লাহর পথে আমি যেন কারো নিন্দার ভয় না করি, কারো কাছে যেন কিছু না চাই এবং বেশি করে لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) বলি, কেননা এটা বেহেশ্‌তের রত্নভান্ডার।

স্বীকারোক্তি দ্বারা রসূলুল্লাহ্ সা. হত্যা, হুদুদ ও আর্থিক বিরোধের মীমাংসা করতেন।

স্বীকারোক্তি বিশুদ্ধতার শর্তাবলী: স্বীকারোক্তির বিশুদ্ধতার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী জরুরি: স্বীকারোক্তিকারীর সুস্থমস্তিষ্ক হওয়া, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে স্বীকারোক্তি করা। নিজের সম্পত্তি স্বাধীনভাবে ব্যবহার বৈধ হওয়া, স্বীকারোক্তিকারীর তামাশাচ্ছলে স্বীকারোক্তি না করা, কোনো অসম্ভব জিনিসের স্বীকারোক্তি না করা। সুতরাং পাগল, অপ্রাপ্তবয়স্ক, যাকে বলপ্রয়োগে স্বীকারোক্তি করতে

বাধ্য করা হয়েছে, প্রতিবন্ধী, তামাশাকারী, প্রকৃতিগতভাবে বা যুক্তির বিচারে যা অসম্ভব তার স্বীকারোক্তিকারী এ সব ব্যক্তির স্বীকারোক্তি শুদ্ধ নয়। কেননা এ সব অবস্থায় তার স্বীকারোক্তি যে মিথ্যা, তা সবাই বুঝতে পারে। অথচ মিথ্যা জবানবন্দীর আলোকে বিচারকের রায় দেয়া ও বিচার করা বৈধ নয়।

স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার: স্বীকারোক্তি যখন সকল শর্ত পূরণ করার মাধ্যমে শুদ্ধ হয়, তখন তা স্বীকারোক্তিকারীর জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যায় এবং তা যখন মানুষের কোনো স্বার্থ বা অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তখন তা প্রত্যাহার করা তার জন্য বৈধ হয়না। তবে স্বীকারোক্তি যখন আল্লাহর কোনো অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত হয়, যেমন ব্যভিচার ও মদপানের শাস্তি, তখন তা প্রত্যাহার করা বৈধ। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'তোমরা সন্দেহের ভিত্তিতে হুদুদ রহিত কর।' ইতিপূর্বে হুদুদ অধ্যায়ে মায়েযের হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। তবে যাহেরি মযহাব এ মতের বিরোধী। তাদের মতে, স্বীকারোক্তি কোনো অবস্থায়ই প্রত্যাহার বৈধ নয়, চাই আল্লাহ্র হকের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক বা বান্দার হকের সাথে।

স্বীকারোক্তি একটি সীমিত প্রমাণ: স্বীকারোক্তি একটি সীমিত প্রমাণ। এ দ্বারা স্বীকারোক্তিকারীর নিজের সংশ্লিষ্টতা ব্যতীত অন্য কারো সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হয়না। অন্য কাউকে জড়িয়ে স্বীকারোক্তি করলে তার বিরুদ্ধে স্বীকারোক্তি গৃহীত হবেনা। কিন্তু সাক্ষ্য এর বিপরীত। সাক্ষ্য দ্বারা অন্যের অপরাধও প্রমাণিত হয়। কোনো বাদী যদি একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবি করে যে, তাদের কাছে তার কোনো ঋণের অর্থ পাওনা আছে এবং ঐ লোকদের কয়েকজন এই দাবি স্বীকার করে এবং অপর কয়েকজন অস্বীকার করে, তাহলে একমাত্র স্বীকারোক্তিকারী ব্যতীত আর কারো বিরুদ্ধে দাবি প্রমাণিত হয়না। কিন্তু বাদী যদি তার দাবি সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত করে তাহলে সবার বিরুদ্ধেই দাবি প্রতিষ্ঠিত হবে।

স্বীকারোক্তি অবিভাজ্য: স্বীকারোক্তি একটি অখন্ড উক্তি। এর অংশ বিশেষ গ্রহণ করা ও অংশ বিশেষ বর্জন করা বৈধ নয়।

ঋণের স্বীকারোক্তি: কোনো ব্যক্তি যখন তার কোনো উত্তরাধিকারীর ঋণের স্বীকারোক্তি করে, তাহলে সে স্বীকারোক্তি যদি সে তার মৃত্যু পূর্ব রোগ শয্যায় থাকা অবস্থায় করে থাকে তবে তা অন্যান্য উত্তরাধিকারী সত্যায়ন না করা পর্যন্ত শুদ্ধ হবেনা। কারণ তার রোগাবস্থায় থাকা দ্বারা বুঝা যায়, সে এই স্বীকারোক্তি দ্বারা তার উত্তরাধিকারীদেরকে বঞ্চিত করতে চেয়ে থাকতে পারে। তবে সুস্থাবস্থায় স্বীকারোক্তি করে থাকলে তা বৈধ। সে ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীদেরকে বঞ্চিত করার ইচ্ছার সম্ভাবনা নিরেট সম্ভাবনা মাত্র এবং নিছক কল্পনা, যা স্বীকারোক্তির কার্যকারিতা রোধ করতে পারেনা।

শাফেয়ি মযহাব মতে সুস্থ মানুষের স্বীকারোক্তি শুদ্ধ। কেননা শুদ্ধতার শর্তাবলী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকায় কোনো বাধা নেই। মৃত্যু-পূর্ব রুগ্নাবস্থায় যদি কোনো অনাত্মীয়ের জন্য স্বীকারোক্তি করে তাহলে তার স্বীকারোক্তি শুদ্ধ। কেউ কেউ বলেন: এটা এক তৃতীয়াংশ থেকে দেয়া হবে। আর যদি কোনো উত্তরাধিকারীর জন্য স্বীকারোক্তি করে থাকে, তবে স্বীকারোক্তি শুদ্ধ হবে, এটাই শাফেয়ি মযহাবের অগ্রগণ্য মত। কেননা স্বীকারোক্তি তার আয়ুষ্কালের এমন স্তরে পৌঁছেছে, যখন মিথ্যুকও সত্য বলে থাকে এবং পাপীও তাওবা করে। এ চরম অবস্থায় বাহ্যত এটাই প্রতীয়মান হয় যে, স্বীকারোক্তিকারী সঠিকভাবেই স্বীকারোক্তি করেছে এবং কাউকে বঞ্চিত করা তার ইচ্ছা নয়। শাফেয়ি মযহাবের কেউ কেউ এটাকে অশুদ্ধ মনে করেন। কারণ কিছু উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করা তার ইচ্ছা থাকতেও পারে। তারা আরো বলেন যে, সে যদি সুস্থাবস্থায় একজনের পক্ষে এবং রুগ্নাবস্থায় আরেকজনের পক্ষে স্বীকারোক্তি দেয়, তবে উভয়ে নিজেদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রাপ্য বণ্টন করে নেবে, প্রথম জনকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে না। ইমাম আহ্‌মদ বলেন: রোগী কর্তৃক উত্তরাধিকারীর জন্য কোনো স্বীকারোক্তি জায়েয নেই। ইমাম আওযায়ি ও একদল আলেম সম্পত্তির কিছু অংশ উত্তরাধিকারীর জন্য স্বীকারোক্তি করা রোগীর জন্য জায়েয মনে করেন। কেননা যার মৃত্যু আসন্ন, তার বিরুদ্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করা সুদূর পরাহত ব্যাপার। শরিয়তের বিধান বাহ্যিক অবস্থার উপরই নির্ভরশীল। কাজেই তার স্বীকারোক্তি সম্ভাব্য ধারণার অজুহাতে পরিত্যক্ত হওয়া সমীচীন নয়। তার ব্যাপার আল্লাহ্র হাতে সোপর্দ থাকবে।

❖❖❖

তেষট্টিতম অধ্যায়

সাক্ষ্য

সংজ্ঞা: সাক্ষ্য আরবি 'শাহাদাত' এর প্রতিশব্দ। এর আভিধানিক অর্থ দেখা। যেহেতু সাক্ষী যা দেখে বা জানে তাই অন্যের কাছে ব্যক্ত করে, তাই তার বক্তব্যকে সাক্ষ্য বলা হয়। সুতরাং শরিয়তের পরিভাষায় সাক্ষ্য হলো, কোনো ব্যক্তি যা জেনেছে, তা 'সাক্ষ্য দিচ্ছি' বা 'সাক্ষ্য দিলাম' ইত্যাকার বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা। আর সাক্ষী হচ্ছে, সাক্ষ্য বহনকারী বা ব্যক্তকারী। কেননা অন্যেরা যা জানেনা সে তা ব্যক্ত করে ও জানায়।

না জেনে সাক্ষ্য দেয়া অবৈধ: কোনো ব্যক্তির পক্ষে কোনো ব্যাপারে না জেনে সাক্ষ্য দেয়া জায়েয নেই। চাক্ষুষ দর্শন, শ্রবণ বা এমন ব্যাপক খ্যাতি, যা দ্বারা জ্ঞান বা প্রবল ধারণা জন্মে, এ গুলোর মাধ্যমে সাক্ষী তার সাক্ষ্য দেয়ার বিষয় জেনে নিতে পারে।

ব্যাপক খ্যাতির ভিত্তিতে সাক্ষ্য দেয়া শাফেয়ি মযহাবে যে কয়টি ক্ষেত্রে জায়েয তা হচ্ছে, বংশ পরিচয়, জন্ম, মৃত্যু, স্বাধীন হওয়া, উত্তরাধিকার, অভিভাবকত্ব, ওয়াক্ফ, আয্ল, বিয়ে, বিয়ে সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়, কাউকে সৎ বা অসৎ গণ্য করা, ওসিয়ত, বুদ্ধিমত্তা, নির্বুদ্ধিতা ও মালিকানা। ইমাম আবু হানিফার মতে, শুধু বিয়ে, বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর নির্জন সাক্ষাৎ, বংশ পরিচয়, মৃত্যু, বিচারিক ক্ষমতা লাভ এ পাঁচটি ব্যাপারেই ব্যাপক খ্যাতির ভিত্তিতে সাক্ষ্য দেয়া জায়েয। ইমাম আহমদ ও কিছু শাফেয়ি ফকিহের মতে সাতটি ক্ষেত্রে ব্যাপক খ্যাতির ভিত্তিতেই সাক্ষ্য দেয়া জায়েয। বিয়ে, বংশপরিচয়, মৃত্যু, স্বাধীন হওয়া, উত্তরাধিকার, ওয়াক্ফ ও মালিকানা।

সাক্ষ্য সম্পর্কে শরিয়তের বিধান: যার কাছে সাক্ষ্য দেয়ার মত তথ্য রয়েছে, তাকে যখন সাক্ষ্য দিতে ডাকা হবে এবং সাক্ষ্য না দিলে কারো হক নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকবে, তখন সাক্ষ্য দেয়া ফরযে আইন। এমনকি হক নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকলে না ডাকা হলেও সাক্ষ্য দেয়া ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ্ সূরা বাকারার ২৮৩ নং আয়াতে বলেন: 'তোমরা সাক্ষ্য গোপন করোনা। যে গোপন করবে তার অন্তর পাপী।' সূরা তালাকের ২নং আয়াতে বলেন: 'আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্য দাও।' সহিহ্ হাদিসে রয়েছে: 'তোমার ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত হোক।' সাক্ষ্য দিলে তার সাহায্য হয়।

যায়েদ ইবনে খালিদ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'সর্বোত্তম সাক্ষী কে তা কি তোমাদেরকে বলবো? ..... যে ব্যক্তি চাওয়ার আগেই সাক্ষ্য দেয়।'

তবে সাক্ষ্য দেয়া তখনই ওয়াজিব, যখন সে নিজের শরীর, সম্মান, সম্পদ ও পরিবার পরিজনের ক্ষতি ছাড়াই সাক্ষ্য দিতে সমর্থ হয়। কেননা আল্লাহ্ সূরা বাকারার ২৮২ নং আয়াতে বলেন: 'কোনো লেখক ও সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।'

যখন বহু সংখ্যক সাক্ষী থাকে এবং কারো হক নষ্ট হওয়ার আশংকা না থাকে তখন সাক্ষ্য দান মুস্তাহাব। এমতাবস্থায় সাক্ষ্য না দিলে গুনাহ হবেনা। যখন কারো সাক্ষ্যের উপর গোটা বিচারকার্য নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তখন সাক্ষ্যের জন্য মজুরি নেয়া হারাম। তবে হেঁটে চলা কষ্টকর হলে যানবাহনের ভাড়া নেয়া যাবে। আর যখন কারো সাক্ষ্যের উপর বিচারকার্য নির্ভরশীল না হয় তখন মজুরী নেয়া জায়েয হবে।

সাক্ষ্য গ্রহণের শর্তাবলী: সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য যে শর্তাবলী জরুরি তা হলো:

১. সাক্ষীর মুসলমান হওয়া: কাজেই কোনো মুসলমানের উপর কাফেরের সাক্ষ্য গৃহীত হবেনা, একমাত্র সফরকালে ওসিয়ত ব্যতীত। এ ক্ষেত্রে মুসলমানের উপর অমুসলিমের সাক্ষ্য ইমাম আবু হানিফা, বিচারপতি শুরাইহ, ইব্রাহীম নাখ্য়ী ও আওযায়ির মতে জায়েয। কেননা আল্লাহ্ সূরা মায়িদার ১০৬ ও ১০৭ নং আয়াতে বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ

مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَأَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ

فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ○ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ○

'হে মুমিনগণ, যখন তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে অসিয়ত করার সাক্ষী রাখবে। যদি তোমরা সফরে থাক এবং তোমাদের মৃত্যুর মুসিবত উপস্থিত হয় তবে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী রাখবে। তোমাদের সন্দেহ হলে তাদের উভয়কে নামাযের পর অপেক্ষমান রাখবে এবং তারা আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলবে: আমরা এর বিনিময়ে কোনো মূল্য গ্রহণ করতে চাইনা যদিও সে আত্মীয় হয়, আর আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করবনা। করলে আমরা গুনাহগারদের মধ্যে শামিল হব। তবে যদি জানা যায় যে, তারা দু'জন কোনো পাপে জড়িত হয়েছে তাহলে যাদের স্বার্থহানি ঘটেছে তাদের মধ্য থেকে নিকটতম দু'জন তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলবে: 'অবশ্যই আমাদের সাক্ষ্য তাদের সাক্ষ্য থেকে অধিক সত্য এবং আমরা সীমা লংঘন করিনি। করলে তো আমরা অবশ্যই যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

অনুরূপ হানাফিগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাক্ষ্য অনুমোদন করেন। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. দু'জন ইহুদি কর্তৃক ব্যভিচারের সাক্ষ্য দেয়ায় দু'জন ইহুদিকে রজম করেছিলেন।

ইমাম শাবি বলেন: দাকুকায় জনৈক মুসলমানের মৃত্যু উপস্থিত হয়। তখন তার অসিয়তের উপর সাক্ষী হয় এমন কোনো মুসলমান পাওয়া গেলনা। অগত্যা সে দু'জন কিতাবীকে সাক্ষী রাখলো। পরে ঐ সাক্ষীদ্বয় কুফায় পৌঁছে আবু মূসা আশ্‌য়ারির নিকট গেল, তাকে তার অসিয়তের খবর জানালো ও তার পরিত্যক্ত জিনিসপত্র তার নিকট জমা দিলো। আশয়ারি বললেন: এটা এমন একটা ঘটনা, যা রসূলুল্লাহ্ সা. এর আমলে সংঘটিত ঘটনার পর আর ঘটেনি। অত:পর আসরের নামাযের পর তাদের শপথ নিলেন যে, তারা কোনো খেয়ানত করেনি, কোনো মিথ্যাও বলেনি, কোনো পরিবর্তনও করেনি এবং কোনো কিছু গোপনও করেনি। এটা সে মৃত ব্যক্তিরই অসিয়ত ও পরিত্যক্ত সম্পদ। অত:পর তিনি তাদের দু'জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন।

খাত্তাবি বলেন: এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানের বিশেষভাবে সফরকালীন অসিয়তের উপর জিম্মীদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। ইমাম আহমদ বলেন: শুধুমাত্র এরূপ ক্ষেত্রে অনিবার্য প্রয়োজন বশত জিম্মীদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে, অন্য কোথাও নয়। ইমাম শাফেয়ি ও মালিক বলেন: সফরকালীন অসিয়ত হোক বা অন্য কিছু হোক, মুসলমানের উপর কাফেরের সাক্ষ্য কোনো অবস্থায়ই গৃহীত হবেনা। তাদের মতে এ আয়াত দুটি (অর্থাৎ আয়াতের বিধান) রহিত।

জিম্মীর জন্য জিম্মীর সাক্ষ্য: জিম্মীর জন্য জিম্মীর (অমুসলমানের জন্য অমুসলমানের) সাক্ষ্য নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম মালিক বলেন: অমুসলিমের সাক্ষ্য মুসলমান বা কাফির কারো ব্যাপারেই গৃহীত হবে না। ইমাম আহ্‌মদ বলেন: কিতাবীদের পরস্পরের ব্যাপারে পরস্পরের সাক্ষ্য গৃহীত হবেনা। হানাফিগণ বলেন: তাদের পরস্পরের ব্যাপারে পরস্পরের সাক্ষ্য বৈধ এবং সকল কাফেরই একই জাতিভুক্ত।

ইমাম শা'বি, ইবনে আবি লায়লা ও ইসহাক বলেন: ইহুদির ব্যাপারে ইহুদির সাক্ষ্য বৈধ। কিন্তু খ্রিষ্টান ও অগ্নি উপাসকের ব্যাপারে বৈধ নয়। কেননা এগুলো ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম। এক ধর্মের অনুসারীর ব্যাপারে অন্য ধর্মের অনুসারীর সাক্ষ্য বৈধ নয়।

২. সততা: এটা ইসলামের অতিরিক্ত এক বৈশিষ্ট্য, যা সাক্ষীদের মধ্যে থাকা জরুরি যাতে সৎ সাক্ষীরা অসৎ সাক্ষীদের উপর প্রাধান্য লাভ করে এবং মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত লোকেরা সাক্ষী হতে না পারে। কারণ আল্লাহ্ বলেন:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ.

'তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহ্র জন্য সঠিক সাক্ষ্য হবে।' (সূরা তালাক আয়াত ২)

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ 'সাক্ষীদের মধ্যে যাদের উপর তোমরা রাজি' .... (সূরা বাকারা, ২৮২)।

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا 'হে মুমিনগণ, যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের নিকট কোনো বার্তা আনয়ন করে তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে ..... ' (সূরা হুজুরাত, ৬)

আবু দাউদের বর্ণনা, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'কোনো খিয়ানতকারী ও খিয়ানতকারিণী এবং কোনো ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর সাক্ষ্য বৈধ নয়।' তাই মিথ্যাচারী, চরিত্রহীন ও খারাপ স্বভাবের লোক হিসাবে খ্যাত লোক ও পাপাচারীর সাক্ষ্য গৃহীত হবেনা। বস্তুত সততার এ অর্থই ব্যাপকভাবে গৃহীত। ইমাম আবু হানিফা বলেন: সততার জন্য সাক্ষীর বাহ্যত মুসলমান হওয়া এবং তার ভদ্রতা ও সুখ্যাতির পরিপন্থি কোনো বিষয় প্রকাশ না পাওয়াই যথেষ্ট। তবে এটা আর্থিক বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, হুদুদ তথা ফৌজদারি মামলায় যথেষ্ট নয়। বিয়ের জন্য তিনি ফাসেকের সাক্ষ্য অনুমোদন করে বলেন: দু'জন ফাসিকের সাক্ষ্য দ্বারা বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যাবে। মালেকি মযহাব অনুসারে অনন্যোপায় অবস্থায় অসৎ লোকের সাক্ষ্য দ্বারাও বিচার করা যাবে এবং ছোটখাট বিষয়ে সৎ কি অসৎ জানা যায় না, এমন লোকের সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

ফকিহ্গণ বলেন: সাক্ষীর জন্য ইসলামের বাস্তব অনুসারী ও ভদ্র হওয়া জরুরি। ইসলামের বাস্তব অনুসারী হওয়ার জন্য ফরয ও নফল আদায়, হারাম ও মাক্রূহ বর্জন এবং কবীরা (বড়) গুনাহ না করা ও সগীরা (ছোট) গুনাহ বারবার না করা যথেষ্ট। আর ভদ্রতা বলতে বুঝায়, কথা ও কাজে যা শোভনীয় তা করবে এবং যা অশোভন তা বর্জন করবে। পাপাচারী লোক তাওবা করলে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে। এ ব্যাপারে সকল ফকিহ্ একমত। তবে ইমাম আবু হানিফা বলেন: তার পাপাচারী হিসাবে পরিচিত হওয়ার কারণ যদি কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয় তা হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবেনা। কেননা আল্লাহ্ ব২৫২

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ج وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ○

'যারা সতী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনা, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেনা। তারাই তো সত্যত্যাগী।' (সূরা নূর, ৪)।

৩, ৪. প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া: সততা ও ন্যায়পরায়ণতা যেমন সাক্ষ্য গৃহীত হওয়ার শর্ত, তেমনি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ও সুস্থমস্তিষ্ক হওয়াও সততার শর্ত। কাজেই একজন শিশুর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবেনা যদিও সে তারই মতো একজন শিশুর ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়। অনুরূপ পাগল ও মানসিক প্রতিবন্ধীর সাক্ষ্যও গৃহীত হবেনা। কেননা তাদের সাক্ষ্য এমন বিশ্বাস জন্মাতে সাহায্য করেনা যার ভিত্তিতে বিচার করা যায়। ইমাম মালিক জখমের মামলায় শিশুদের সাক্ষ্য গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন, যতোক্ষণ তারা বিচ্ছিন্ন না হয় ও পরস্পর বিরোধী বক্তব্য না দেয়। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরও অনুরূপ শর্তে শিশুদের সাক্ষ্যের অনুমতি দিয়েছেন। একইভাবে সাহাবায়ে কিরাম ও মদিনার ফকিহ্গণ শিশুদের একে অপরকে আহত করার ঘটনায় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন এবং এটাই অগ্রগণ্য মত। কেননা তাদের খেলাধুলায় বয়স্ক লোকেরা সচারাচর উপস্থিত থাকেনা। এমতাবস্থায় তাদের সাক্ষ্য যদি গ্রহণ না করা হতো এবং মহিলাদের এককভাবে সাক্ষ্য গ্রহণ না করা হতো, তাহলে অনেকের অধিকার ও ন্যায্য প্রাপ্য নষ্ট হয়ে যেতো ও অবহেলিত হতো। অথচ সাধারণ মানুষ তাদের সত্যবাদিতায় প্রবল ধারণা অথবা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে থাকে। বিশেষত তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাওয়ার আগে যখন দলবদ্ধভাবে আসে এবং কোনো ঘটনা সম্পর্কে সবাই একই বক্তব্য দেয়, সে সময় তাদের সাক্ষ্য থেকে যে ধারণা জন্মে, তা দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য থেকে সৃষ্ট ধারণার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। ইসলামি শরিয়ত হচ্ছে একটা পূর্ণাংগ, মর্যাদাপূর্ণ এবং মানুষের ইহ-পরকালের স্বার্থ ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধানকারী বিধান। তাই তার ব্যাপারে এ কথা কল্পনা করা যায়না যে, তা এমন অকাট্য অধিকারকে সুস্পষ্ট ও অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও অবজ্ঞা ও বিনষ্ট করবে।

৫. বাকশক্তি: সাক্ষীকে অবশ্যই বাকশক্তি সম্পন্ন হতে হবে। সে যদি বোবা হয়, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবেনা- যদিও সে ইশারায় মনোভাব ব্যক্ত করে এবং তা বোধগম্য হয়। তবে সে যদি স্বহস্তে লিখে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু হানিফার মতে এবং ইমাম শাফেয়ির নির্ভরযোগ্যভাবে প্রাপ্ত মতানুসারে তা গৃহীত হবে।

৬. স্মৃতিশক্তি: যার স্মৃতিশক্তি দুর্বল বলে জানা যায় এবং প্রচুর ভুল হয় তার সাক্ষ্য গৃহীত হবেনা। অমনোযোগী ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একই বিধি পালনীয়।

৭. অভিযুক্ত ও সন্দেহভাজন না হওয়া: শত্রুতা বা ভালোবাসার কারণে অভিযুক্ত ও সন্দেভাজন ব্যক্তির সাক্ষ্য গৃহীত হবেনা। কিন্তু উমার ইবনুল খাত্তাব রা. বিচারপতি শুরাইহ্, উমার ইবনে আব্দুল আযীয, আবু সাওর, ইবনুল মুন্‌যির প্রমুখ এবং ইমাম শাফেয়ির প্রাপ্ত দুই মতের একটি মত অনুসারে পিতার জন্য সন্তানের ও সন্তানের জন্য পিতার সাক্ষ্য ততোক্ষণ গৃহীত হবে, যতোক্ষণ তারা উভয়ে সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও গ্রহণীয় সাক্ষ্যদাতা হবে। অপর দিকে শত্রুর বিরুদ্ধে শত্রুর সাক্ষ্য গৃহীত হবে না, যখন তাদের শত্রুতা হবে পার্থিব শত্রুতা। কেননা এ ক্ষেত্রে সাক্ষী অভিযুক্ত ও সন্দেহভাজন। তবে শত্রুতা যদি হয় ধর্মীয়, তাহলে সন্দেহের উদ্রেক করেনা। কেননা ইসলাম মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নিষেধ করে। কাজেই এ ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ নেই। অনুরূপ পিতা সন্তানের পক্ষে ও সন্তান পিতার পক্ষে সাক্ষ্য দিলে তা বৈধ হবেনা। কিন্তু তাদের বিপক্ষে দেয়া সাক্ষ্য গৃহীত হবে। মায়ের জন্য ছেলের ও ছেলের জন্য মায়ের সাক্ষ্যের ক্ষেত্রেও একই বিধি প্রযোজ্য। আর যে গৃহভৃত্যের খোরপোশ গৃহকর্তা বহন করে তার সাক্ষ্যও তদ্রূপ। এ সব সাক্ষী সন্দেহভাজন বিধায় গৃহীত হবেনা। আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'কোনো খিয়ানতকারী ও খিয়ানতকারিণী এবং কোনো বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তি তার মুসলমান ভাই এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে তা গৃহীত হবেনা। অনুরূপ, পিতার পক্ষে সন্তানের ও সন্তানের পক্ষে পিতার সাক্ষ্য গৃহীত হবেনা।'

কথা ও কাজ দ্বারা শত্রুতা ধরা পড়ে। শত্রুর অন্যতম আলামত হলো, শত্রুর বিপদাপদে খুশি হওয়া, শত্রুর সুখে দু:খ ভারাক্রান্ত হওয়া এবং শত্রুর জন্য যাবতীয় অকল্যাণ কামনা করা। ফকিহগণ মিথ্যা অপবাদ আরোপ, বলপূর্বক সম্পদ ছিনতাই ও জবরদখল, হত্যা ও ডাকাতিকে শত্রুর অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন। সুতরাং জবরদখলকৃত সম্পত্তির মালিক জবরদখলকারীর বিরুদ্ধে, অপবাদের শিকার ব্যক্তির অপবাদদাতার বিরুদ্ধে, চুরি হওয়া সম্পদের মালিক চোরের বিরুদ্ধে এবং নিহতের উত্তরাধিকারী হত্যাকারীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

আহ্‌মদ ও আবুদাউদ আমর ইবনে শুয়াইব থেকে বর্ণনা করেন, রসূল সা. বলেন: 'কোনো খেয়ানতকারী, খেয়ানতকারিণী ও বিদ্বেষ পরায়ণের সাক্ষ্য কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে এবং কোনো গৃহভৃত্যের সাক্ষ্য গৃহকর্তার পক্ষে গৃহীত হবেনা। রসূলুল্লাহ্ সা. আরো বলেন: কোনো বাদী বা বিবাদীর সাক্ষ্য তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে গৃহীত হবেনা।

স্বামী ও স্ত্রীর সাক্ষ্য পরস্পরের জন্য গৃহীত হবেনা। কেননা এখানে পক্ষপাতিত্বের সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কারণ এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই স্বজনপ্রীতি হয়ে থাকে। ইমাম মালিক, আহমদ ও আবু হানিফা এই মত অনুসরণ করেন। তবে ইমাম শাফেয়ি, আবু সাওর ও হাসান স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষ্য পরস্পরের জন্য গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। অন্যান্য আত্মীয়ের একে অপরের জন্য সাক্ষ্য, যথা ভাইয়ের জন্য ভাইয়ের সাক্ষ্য বৈধ। অনুরূপ বন্ধুর জন্য বন্ধুর সাক্ষ্যও বৈধ। যে হাদিসে আত্মীয়ের জন্য আত্মীয়ের সাক্ষ্য অবৈধ বলা হয়েছে,ইমাম তিরমিযির মতে সে হাদিস সহিহ নয়। ইমাম মালেক বলেন: বিচ্ছিন্ন ভাইয়ের সাক্ষ্য ভাইয়ের জন্য এবং বন্ধুর সাক্ষ্য বন্ধুর জন্য গৃহীত হবেনা।

চরিত্র অজানা এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য: চরিত্র জানা যায়না এমন লোকের সাক্ষ্য গৃহীত হবেনা। এক ব্যক্তি উমার রা. এর নিকট সাক্ষ্য দিলে তিনি তাকে বললেন: আমি তোমাকে চিনিনা। তবে আমি না চিনলেও তোমার ক্ষতি নেই। তোমাকে যে চিনে তাকে নিয়ে এসো।

উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে একজন বললো: আমি ওকে চিনি।

উমর রা. বললেন: কিভাবে চিন?
সে বললো: তার সততা ও মহত্ত্ব দ্বারা।
উমর রা. বললেন: সে কি নিকটতম প্রতিবেশী, যার সাথে তোমার দিন-রাত জানা শোনা আছে এবং কোথায় যায় ও কোথা থেকে আসে তা জান? সে বললো: না।
উমর রা. বললেন: তবে কি তুমি তার সাথে কোনো আর্থিক লেনদেন করেছ, যা দ্বারা তার পরহেজগারির প্রমাণ পাওয়া যায়? সে বললো: না।
উমর রা. বললেন: তবে কি সে তোমার সাথে কখনো সফর করেছে যা দ্বারা তার চরিত্র মাধুর্য জানতে পেরেছে।
সে বললো: না।
উমর রা. বললেন: তবে তুমি তাকে চিনইনা।
তারপর সাক্ষীকে বললেন: যাও, তোমাকে চিনে এমন কাউকে নিয়ে এসো।
ইবনে কাছীর বলেন, ইমাম বাগাবী হাদিসটি হাসান সনদে বর্ণনা করেন।

নগরবাসীর ব্যাপারে যাযাবরের সাক্ষ্য: ইমাম আহমদ, তার শিষ্যদের একটি গোষ্ঠী, আবু উবায়েদ ও এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম মালেকের মত এই যে, নগরবাসীর ব্যাপারে যাযাবরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: কোনো নগরবাসী সম্পর্কে যাযাবরের সাক্ষ্য গৃহীত হবেনা।' (আবুদাউদ, ইবনে মাজা)।

যাযাবরের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হওয়ার কারণ হলো, সে অত্যন্ত কষ্টে জীবন ধারণ করে, মূর্খ এবং জনপদে যা কিছু ঘটে, তা সে কমই প্রত্যক্ষ করে। তাই তার সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য নয়।

কিন্তু বিশুদ্ধ মত হলো, সে যদি সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হয় এবং মুসলমান হয়, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে। কুরআনে ন্যায়পরায়ণ লোকের সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যাপারে নগরবাসী বা যাযাবরে পার্থক্য করা হয়নি। তার যাযাবর হওয়া অন্য শহরের অধিবাসী হওয়ার মতই। এটাই ইমাম শাফেয়ি ও অধিকাংশ ফকিহের মত।

আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদিস মূর্খ লোকের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং সকল যাযাবর তার আওতাভুক্ত নয়। কেননা রসূল সা. চাঁদ দেখার ব্যাপারে যাযাবরের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন।

অন্ধের সাক্ষ্য: অন্ধ যদি আওয়াজ শুনে মানুষ চিনতে পারে তাহলে ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদের মতে বিয়ে, তালাক, বিক্রয়, ইজারা, বংশ নির্ণয়, ওয়াক্ফ, মালিকানা ও স্বীকারোক্তি ইত্যাদিতে অন্ধের সাক্ষ্য বৈধ, চাই ঘটনা অন্ধ অবস্থায় তার গোচরে আসুক বা অন্ধ হওয়ার আগে।

ইবনুল কাসিম বলেন: আমি ইমাম মালিককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোনো ব্যক্তি যদি তার প্রতিবেশীর কথা প্রাচীরের আড়াল থেকে শুনতে পায় এবং তাকে দেখতে না পায়, শুনতে পায় সে তার স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছে এবং তার আওয়াজ চিনতে পারে, তার ব্যাপারে তার সাক্ষ্য বৈধ হবে কি? ইমাম মালিক বললেন: বৈধ হবে।

শাফেয়ি মযহাবের মতে পাঁচটি ক্ষেত্রে ব্যতীত অন্ধের সাক্ষ্য গৃহীত হবেনা: বংশ পরিচয়, মৃত্যু, মালিকানা, অনুবাদ ও অন্ধ হওয়ার পূর্বে যা তার গোচরে এসেছে।

ইমাম আবু হানিফা বলেন: অন্ধের সাক্ষ্য আদৌ গৃহীত হবেনা।

সাক্ষীর নূন্যতম সংখ্যা: সাক্ষ্য আর্থিক অধিকার, শারীরিক অধিকার অথবা হুদুদ ও কিসাস সংক্রান্ত হতে পারে। এর প্রত্যেক ক্ষেত্রে দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব নিম্ন কত সংখ্যক সাক্ষী না হলেই নয়, তা শরিয়তে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। নিম্নে এর প্রত্যেকটি উল্লেখ করা যাচ্ছে:

চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন যেখানে: ব্যভিচারের শাস্তির জন্য নূন্যতম চারজন পুরুষ সাক্ষী প্রয়োজন। যাহেরি মযহাব অনুসারে প্রত্যেক পুরুষের স্থলে দু'জন মহিলার সাক্ষ্য চলবে। তাদের মতানুসারে শুধুমাত্র আটজন মহিলার সাক্ষ্যও গৃহীত হবে।

আল্লাহ বলেন: وَالّٰتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ

'তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী তলব করবে।' (সূরা নিসা, ১৫)।

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

'যারা সতী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনা, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে।' (সূরা নূর, ৪)

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ 'তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি?' (সূরা নূর, ১৩)।

তিনজন সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তা: হাম্বলি ফকিহ্গণ বলেন: যে ব্যক্তি স্বচ্ছল বলে খ্যাতি আছে, সে যদি যাকাত গ্রহণের জন্য নিজেকে অস্বচ্ছল বলে দাবি করে, তাহলে তার দাবি তিনজন সাক্ষী ব্যতীত গৃহীত হবে না। তাদের এ মতের পক্ষে তারা কুবাইসা ইবনে মুখারিকের এ হাদিস তুলে ধরেন: কুবাইসা ইবনে মুখারিক হিলালী রা. বলেন: আমি একটা রক্তপণের দায় বহন করছিলাম। তাই রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ জন্য সাহায্য চাইলাম। তিনি বললেন: কিছুক্ষণ অবস্থান কর। আমাদের নিকট যাকাত আসুক, তা থেকে তোমাকে কিছু দিতে বলবো।' তারপর বললেন: হে কুবাইসা, তিন ব্যক্তির মধ্য হতে যে কোনো একজনের পক্ষেই সাহায্য চাওয়া হালাল: একজন হলো সে ব্যক্তি, কোনো রক্তপণ বা জরিমানার দায় যার ঘাড়ে চেপেছে। তার জন্য সাহায্য চাওয়া হালাল, যাতে ঐ দায় থেকে মুক্ত হতে পারে, অত:পর আত্মসংযম করে। আর একজন হচ্ছে সে ব্যক্তি, যার উপর কোনো মুসিবত আপতিত হওয়ায় তার সহায়-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে। সে যাতে জীবন ধারণের অথবা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে, সে কারণে সাহায্য চাওয়া তার জন্য বৈধ। অপরজন হলো সে ব্যক্তি, যে এমন খাদ্যাভাবে জর্জরিত যে, তার গোত্রের তিনজন বুদ্ধিমান লোক সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক খাদ্যাভাবে জর্জরিত। এ ব্যক্তিও যাতে জীবন ধারণ অথবা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে সে জন্য সাহায্য চাওয়া তার পক্ষে বৈধ। হে কুবাইসা, এ ছাড়া আর যত রকম সাহায্য প্রার্থনা করা হয় ও ভোগ করা হয় তা অবৈধ।' (মুসলিম, আবুদাউদ, নাসায়ি)।

শুধু দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য: সকল অধিকার ও হুদুদ সংক্রান্ত মামলায় শুধু দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। কোনো মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়না। কেবল ব্যভিচারে চারজন সাক্ষী প্রয়োজন। হুদুদে মহিলাদের সাক্ষ্য যাহেরি মযহাব ব্যতীত অন্য সকল মযহাবের ফকিহ্দের মতে অবৈধ। আল্লাহ্ তালাক সম্পর্কে বলেন: 'তোমাদের মধ্য হতে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখ।' (সূরা তালাক ২)।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাগ সা. আশ্‌য়াস্‌কে বলেন: 'হয় তোমার দু'জন সাক্ষী নতুবা তার শপথ.....'

দু'জন পুরুষের অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষ্য: মহান আল্লাহ্ সূরা বাকারার ২৮২ নং আয়াতে বলেন:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ج فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ○

'সাক্ষীদের মধ্যে যাদের উপর তোমরা রাজি, তাদের মধ্য হতে দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখবে। যদি দু'জন পুরুষ না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করলে তাকে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেবে।'

এ ব্যবস্থা সকল আর্থিক লেনদেনের বেলায় প্রযোজ্য, যথা ব্যবসা, ঋণ, ইজারা, বন্ধক, স্বীকারোক্তি ও জবরদখল। হানাফি মযহাব মতে হুদুদ ও কিসাস ব্যতীত সকল আর্থিক লেনদেনে, বিয়ে, তালাক ও অন্য সর্ব ব্যাপারে পুরুষের সাথে মহিলার সাক্ষ্য চলবে। ইমাম ইবনুল কাইয়েম এই মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে বলেন: 'শরিয়ত যখন পুরুষদের দ্বারা লেখা ঋণের দলীলে, যা কিনা প্রধানত পুরুষদের সমাবেশে লেখা হয়ে থাকে, মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণকে বৈধ করেছে, তখন যে সব সমাবেশে প্রচুর মহিলার সমাগম

ঘটে থাকে যেমন অছিয়ত ও রাজয়ি তালাকের অনুষ্ঠানে, সে সব সমাবেশে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণ তো আরো ভালভাবেই অনুমোদনযোগ্য ও বৈধ হবে।'

ইমাম মালেক ও শাফেয়ি ফকিহ্গণ এবং অন্য বহু ফকিহ্রে মতে আর্থিক ও লেনদেনে বিশেষভাবে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। কিন্তু হুদুদ, কিসাস, বিয়ে, তালাক ইত্যাকার ঘটনাবলীতে, যা শরীর সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। পক্ষান্তরে শরীর সংক্রান্ত যে সব বিষয় নিছক আর্থিক বিষয় হিসাবে গণ্য, যথা প্রতিনিধিত্ব ও অছিয়ত, সেগুলি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন: এ ক্ষেত্রে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। আবার কেউ কেউ বলেন: কোনো মহিলার নয়, বরং শুধু দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। একমাত্র আর্থিক বিষয়ে মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়া ও অন্য বিষয়ে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ সম্পর্কে ইমাম কুরতুবি বলেন: 'যেহেতু অর্থ উপার্জনের উপায় ও উৎসের সংখ্যা অনেক এবং এগুলোতে প্রায়ই অনিয়ম ও অসততার প্রাদুর্ভাব ঘটে, তাই আল্লাহ্ অর্থ সংক্রান্ত বিষয়কে মজবুত করার উপায়-উপকরণকে ব্যাপকতর করেছেন। কখনো লেনদেনকে লিখে রাখা, কখনো তার উপর সাক্ষী রাখা, কখনো বন্ধক ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রাখা দ্বারা এর ভিত্তি মজবুত ও সংহত করেছেন এবং এর সব কটাতে পুরুষের সাথে সাথে মহিলাদেরও প্রবেশাধিকার রেখেছেন।'

একজন পুরুষের সাক্ষ্য: একজন মাত্র সৎ ও ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য আযান, নামায, রোযা প্রভৃতি ইবাদাতে গ্রহণযোগ্য। ইবনে উমর রা. বলেন: 'আমি একা চাঁদ দেখেছি বলে রসূলুল্লাহ্ সা. কে জানালাম। তাতেই তিনি রোযা রাখলেন এবং জনগণকে রোযা রাখার আদেশ দিলেন।'

এ ছাড়া আরো কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে হানাফি ফকিহ্গণ একজন পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলে রায় দিয়েছেন, যেমন শিশুদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন শিক্ষকের সাক্ষ্য, জন্ম সংক্রান্ত বিরোধে যে কোনো একজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য, নষ্ট হয়ে যাওয়া জিনিসে একজন বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য, সাক্ষীদের বাছাই ও জেরার কাজে একজন ন্যায়পরায়ণের সাক্ষ্য, প্রতিনিধি অপসারণ ও বিক্রীত জিনিসে ত্রুটি থাকার বিষয়ে একজন ন্যায়পরায়ণের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। একজন ন্যায়পরায়ণ অনুবাদকের অনুবাদ সম্পর্কে ফকিহ্দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ তার অনুবাদ গ্রহণের পক্ষে। কিন্তু অন্যান্য ইমামগণ ও মুহাম্মদ ইবনুল হাসান বলেন: 'অনুবাদ সাক্ষ্যের মতই। এতে একজন অনুবাদক গ্রহণযোগ্য নয়।' কিছু কিছু ফকিহ একজন সত্যবাদী পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন, তন্মধ্যে ইবনুল কাইয়েম অন্যতম। তিনি বলেন: 'প্রকৃত ব্যাপার হলো, সত্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে এমন যে কোনো জিনিসই সাক্ষ্য ও প্রমাণ হিসাবে গণ্য। যে কোনো উপায়েই হোক, সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর আল্লাহ্ তাকে অচল করে রাখেননি। বরং যে আল্লাহ্ ও রসূলের ফায়সালা ব্যতীত আর কারো ফায়সালার কোনোই মূল্য নেই, সে আল্লাহ্ ও রসূলের ফায়সালা হলো, সত্য যখনই যে কোনো উপায়ে উদঘাটিত হবে, তখন তা কার্যকরী করতে হবে এবং তাকে অকার্যকর ও বাতিল করে রাখা হারাম।'

ইমাম ইবনুল কাইয়েম আরো বলেন: 'একজন পুরুষ সাক্ষীর সত্যবাদিতা সম্পর্কে বিচারক নিশ্চিত হলে হুদুদ ব্যতীত আর সব ব্যাপারে তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচার করতে পারেন। আল্লাহ্ বিচারকদের জন্য এটা মোটেই বাধ্যতামূলক করেননি যে, দু'জন সাক্ষী ব্যতীত বিচার করতেই পারবেনা। তিনি শুধু হকদারকে আদেশ দিয়েছেন যেন সে দুজন পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী যোগাড় করে নিজের হক প্রাপ্তি নিশ্চিত করে। এ দ্বারা প্রমাণিত হয়না যে, বিচারক এর চেয়ে কমে বিচার করতেই পারবে না। বরং রসূলুল্লাহ্ সা. স্বয়ং কখনো একজন সাক্ষীর শপথের ভিত্তিতে এবং কখনো শুধু একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচার-ফায়সালা করেছেন ।'

সুতরাং বিচারকের বিচারকার্য পরিচালনার পথ আল্লাহ্ হকদারকে তার হক প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য যে সব পথ অবলম্বনের আদেশ দিয়েছেন তার চেয়ে প্রশস্ত। যেমন রসূলুল্লাহ্ সা. চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন মাত্র বেদুইনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন, লুণ্ঠিত মালামাল সংক্রান্ত মামলায় তিনি একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন এবং যে সব বিষয়ে নারীরা ছাড়া কোনো পুরুষ সঠিক তথ্য জানেনা, সে সব বিষয়ে একজন বিশ্বস্ত নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। তিনি খুযায়মার একক সাক্ষ্যকে দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন এবং বলেছেন: 'খুযায়মা যার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে, সে তার জন্য যথেষ্ট।'

আর এটা শুধু খুযায়মার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; সাহাবিদের মধ্যে যারা তার সমকক্ষ বা তার চেয়ে উচ্চমানের, তাদের অবস্থাও তদ্রূপ। আবু বকর, উমর, উসমান, আলি রা. উবাই ইবনে কা'ব রা. যদি সাক্ষ্য দিতেন, তাহলে তা খুযায়মার একার সাক্ষ্যের চেয়েও অগ্রগণ্য হতো। ইমাম আবু দাউদ তাঁর হাদিস গ্রন্থে একটি অধ্যায়ের শিরোনাম করেছেন: 'একজন মাত্র সাক্ষীর সত্যবাদিতা সম্পর্কে বিচারক নিশ্চিত হলে তার ভিত্তিতে তিনি বিচার করতে পারেন।'

শিশুর দুধ পান সংক্রান্ত সাক্ষ্য: ইবনে আব্বাস ও আহ্মদের মতে ধাত্রীর একার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কেননা ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন: উকবা ইবনুল হারিস যখন উম্মে ইয়াহিয়াকে বিয়ে করলেন, তখন জনৈকা মহিলা এসে বললো: আমি তোমাদের দু'জনকেই দুধ খাইয়েছি। তখন উকবা রসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: এ কথা যখন বলা হয়েছে, তখন আর বিয়ে কিভাবে বহাল থাকে? সংগে সংগে উকবা উক্ত মহিলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং মহিলা অন্য পুরুষকে বিয়ে করে। হানাফি ফকিহ্গণ বলেন: দুধ পান করানোর ব্যাপারেও দু'জন সাক্ষী লাগবে, ধাত্রীর একার সাক্ষ্য যথেষ্ট হবেনা। ইমাম মালেকের মতে দু'জন মহিলার সাক্ষ্য জরুরি। ইমাম শাফেয়ি বলেন: তিনজন মহিলাসহ ধাত্রীর সাক্ষ্য এ শর্তে গ্রহণযোগ্য যে, সে পারিশ্রমিক চাইতে পারবেনা। উকবার হাদিস সম্পর্কে তাদের ব্যাখ্যা ওটা মুস্তাহাব এবং ওতে সন্দেহজনক কাজ থেকে দূরে থাকার জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

ভূমিষ্ঠ হবার সময় শিশুর কান্না সম্পর্কে সাক্ষ্য: ভূমিষ্ঠ হবার সময় শিশু কেঁদেছে কিনা, সে বিষয়ে ধাত্রীর একক সাক্ষ্য গ্রহণকে ইবনে আব্বাস রা. অনুমোদন করেছেন, শা'বি ও আলি রা.ও এটি অনুমোদন করেছেন এবং আলি রা. ও শুরাইহ্ তদনুযায়ী বিচারও করেছেন। কিন্তু ইমাম মালিকের মতে, এ ব্যাপারেও দুজন মহিলার সাক্ষ্য জরুরি। ইমাম শাফেয়ি এ ব্যাপারে মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণ করলেও চারজন নারির সাক্ষ্যের শর্তারোপ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা র. বলেন: দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য প্রয়োজন। কেননা এটা উত্তরাধিকার প্রমাণ করে। তবে এ শিশু কাঁদার পর মারা গেলে তার জানাযা ও গোসলে একজন মহিলার সাক্ষ্য যথেষ্ট। হাম্বলিদের মতে যে বিষয়ে পুরুষরা সাধারণত অজ্ঞ থাকে, সে বিষয়ে একজন ন্যায়পরায়ণ মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. শুধু ধাত্রীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন।

পক্ষান্তরে মহিলাদের যে সব খুঁত গোপনীয় এবং পুরুষরা প্রায়ই জানেনা, যেমন কুমারিত্ব, মাসিক স্রাব, সন্তান হওয়া, জন্মের সময় শিশুর কাঁদা, দুধ পান, ইত্যাদি, যাতে সাধারণত পুরুষরা উপস্থিত থাকেনা, সেগুলি সম্পর্কে ফকিহ্গণ বলেন: এ সব ক্ষেত্রে পুরুষের সাক্ষ্য মহিলার সাক্ষ্যের সমান। তবে পুরুষ নারীর চেয়ে বুদ্ধিতে অধিকতর পরিপক্ক হওয়ায় তার সাক্ষ্য অগ্রগণ্য।

চৌষট্টিতম অধ্যায়

সাক্ষ্য ও শপথ

সাক্ষ্য পেশ করতে অসমর্থ হলে শপথ: যখন বাদী কারো কাছে কোনো হক দাবি করে কিন্তু দাবির স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ পেশ করতে সমর্থ হয়না, এবং বিবাদী (যার কাছে হক দাবি করা হয়েছে) তা অস্বীকার করে, তখন বিবাদী শপথ করে যা বলবে, তা ছাড়া বাদীর আর কিছু করার থাকে না। ঐ শপথেই মামলার নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। তবে এটা শুধু স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দাবির মধ্যেই সীমিত। হুদুদ বা দন্ডবিধি সংশ্লিষ্ট মামলায় এ প্রক্রিয়া কার্যকর হবেনা। বায়হাকি ও তাবরানি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেন: 'প্রমাণ পেশ করা বাদীর দায়িত্ব আর বিবাদীর দায়িত্ব শপথ করা।'

ইমাম বুখারি ও মুসলিম আশ্‌য়াস ইবনে কায়স সূত্রে বর্ণনা করেন, আশ্‌য়াস বলেন: 'একটা পুকুর নিয়ে এক ব্যক্তির সাথে আমার বিরোধ ছিলো। আমরা এটা রসূল সা. এর নিকট পেশ করলাম। তিনি আমাকে বললেন: 'হয় তুমি দু'জন সাক্ষী পেশ করো, নচেৎ তোমার প্রতিপক্ষ শপথ করুক।' আমি বললাম: 'সে খুবই বেপরোয়া মানুষ, শপথ করবে।' রসূল সা. বললেন: যে ব্যক্তি শপথের মাধ্যমে কোনো মুসলমানের সম্পত্তি আত্মসাত করবে, সে যখন আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষ্যৎ করবে তখন তিনি তার উপর ক্রুদ্ধ থাকবেন।'

ওয়ালে ইবনে হুজুর রা. থেকে মুসলিম বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সা. আল কান্দিকে বললেন: তোমার কি কোনো সাক্ষী-প্রমাণ আছে? সে বললো: না। রসূল সা. বললেন: তাহলে তোমার প্রতিপক্ষের শপথই তোমার প্রাপ্য। সে বললো: হে রসূল, লোকটি পাপাচারী। যে কোনো শপথ করতে কুণ্ঠিত হবেনা। সে কোনো ন্যায়-অন্যায়ের বাছবিচার করেনা।' রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: তথাপি তার কাছে তোমার ওটাই একমাত্র পাপ্য।' শপথ একমাত্র 'আল্লাহ্'র নামে অথবা আল্লাহর অন্য কোনো নামেই করতে হবে। রসূলুল্লাহ সা. বলেন: 'যে ব্যক্তি শপথ করবে সে হয় আল্লাহ্‌র নামে শপথ করবে, নচেৎ চুপ থাকবে।'

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ সা. এক ব্যক্তিকে শপথ করার আদেশ দিয়ে বললেন: 'আল্লাহ্‌র নামে শপথ কর, যিনি ব্যতীত আর কোনো মা'বুদ নেই, এ মর্মে যে তোমার কাছে তার কিছুই পাওনা নেই।' (আবুদাউদ, নাসায়ি)।

শপথ করার পর সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হবে কি?: বিবাদী শপথ করলে বাদীর দাবি অগ্রাহ্য হবে। এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। এরপর পুনরায় যদি বাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে হাজির হয়, তাহলে কী করা হবে, সে সম্পর্কে ফকিহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন: গ্রহণ করা হবে না। কেউ বলেন, গ্রহণ করা হবে। আবার কেউ কেউ বলেন: শর্ত সাপেক্ষে গৃহীত হবে। যারা বলেন: গ্রহণ করা হবেনা তারা হচ্ছেন যাহেরি মযহাবের অনুসারী, ইবনে আবি লায়লা ও আবু উবায়েদ এবং ইমাম শওকানি। শওকানি বলেন: 'যেহেতু রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন, হয় তুমি দু'জন সাক্ষী আন, নচেৎ সে শপথ করুক' সেহেতু শপথের পর আর সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা যাবেনা। বিবাদীর কাছে যখন শপথ চাওয়া হয় তখন তা অকাট্য ও সুস্পষ্ট হুকুমের ভিত্তিতেই চাওয়া হয়। শপথ করার পর এর বিপরীত যে প্রমাণ উপস্থাপন করা হবে, তা গ্রহণ করা যাবেনা। কারণ তখন শপথ ও প্রমাণ দুটোই কেবলমাত্র ধারণার সৃষ্টি করে। অকাট্য বিশ্বাস কোনোটাতেই অর্জিত হয়না। আর একটি ধারণা দ্বারা আর একটি ধারণাকে খণ্ডন করা সম্ভব নয়।

যারা বলেন, শপথের পরে সাক্ষ্য-প্রমাণ আনলে তা গৃহীত হবে, তারা হচ্ছেন হানাফি শাফেয়ি, হাম্বলি, তাউস, ইব্রাহিম নাখয়ি, ও বিচারপতি শুরাইহ। তারা বলেন: একজন সত্যবাদীর সাক্ষ্য একজন পাপাচারীর শপথের চেয়ে অগ্রগণ্য, এটা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এরও মত। তাদের যুক্তি হলো, শপথএকটা দুর্বল প্রমাণ, যা কোনো বিরোধের নিষ্পত্তি করতে পারেনা। কাজেই শপথের পরে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। কেননা সাক্ষ্য-প্রমাণই আসল। শপথ হচ্ছে সাক্ষ্য-প্রমাণের স্থলাভিষিক্ত। আসল যখন উপস্থিত হয় তখন স্থলাভিষিক্তের কার্যকারিতা থাকেনা।

ইমাম মালেক ও শাফেয়ি মযহাব থেকে ইমাম গাযালি বলেন: শপথের পরে সাক্ষ্য প্রমাণ শর্ত সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য। শর্ত হলো, শপথ পেশ করার পূর্বে সাক্ষ্য-প্রমাণের উপস্থিতি সম্পর্কে সে যদি অজ্ঞ থাকে,

তাহলে শপথের পরে সে তার দাবির যথার্থতা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করতে পারবে। কিন্তু যেখানে এ শর্ত অনুপস্থিত, এবং তার সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকার কথা জানা সত্ত্বেও বিবাদীর শপথ গ্রহণে সম্মত হয়েছে, অত:পর শপথ করার পর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেখানে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হবে না। কেননা শপথ নেয়ার মাধ্যমে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশের সুযোগ রহিত হয়েছে।

শপথ করতে অসম্মতি: বাদী সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন না করায় বিবাদিকে যখন শপথ করতে বলা হয়, তখন সে শপথ করতে সম্মত না হলে তার এ অসম্মতিকে বিবাদীর দাবির স্বীকৃতি বলে গণ্য করা হবে। কেননা সে অস্বীকৃতি জানানোর ব্যাপারে আন্তরিক হলে শপথ করতে অসম্মত হতো না। শপথ করার এ অসম্মতি সরাসরিও প্রকাশ করা হতে পারে, কিংবা মৌনতা দ্বারাও প্রমাণিত হতে পারে।

এরূপ অবস্থায় বাদীর উপর নিজের দাবির সত্যতার পক্ষে শপথ করার দায়িত্ব আরোপিত হবেনা। কেননা শপথ সব সময় অস্বীকৃতির পক্ষেই হয়ে থাকে। কারণ রসূল সা. বলেন: যে দাবি করে তার দায়িত্ব প্রমাণ পেশ করা, আর যে অস্বীকার করে তার দায়িত্ব শপথ করা। এটা হানাফি মযহাবের মত এবং ইমাম মালেক, শাফেয়ি ও ইমাম আহমদের দ্বিতীয় মত হলো শুধুমাত্র শপথে অসম্মতি বিবাদীর বিরুদ্ধে রায় দেয়ার জন্য যথেষ্ট হয়। কেননা এটা একটা দুর্বল প্রমাণ। এটিকে সবল করার জন্য বাদীর দাবির সত্যতা সম্পর্কে শপথ করা জরুরি, চাই বিবাদী সেটি চাক বা না চাক। বাদী শপথ করলে তার দাবির স্বপক্ষে রায় দেয়া হবে, নচেৎ তা প্রত্যাখান করা হবে। এর প্রমাণ হিসাবে বলা হয়, রসূল সা. একজন দাবিদারকে শপথ করতে বলেছিলেন। কিন্তু এই হাদিসটির সনদ বিভিন্ন কারণে দুর্বল। ইমাম মালেকের মতে এই বিধি কেবল অর্থসংক্রান্ত দাবির মধ্যে সীমিত। কিন্তু ইমাম শাফেয়ি বলেন: এটা সকল ধরনের দাবির বেলায় প্রযোজ্য।

যাহেরি মযহাব ও ইবনে আবি লায়লা বিবাদীর শপথে অসম্মতিকে ধর্তব্য মনে করেননা এবং তা দ্বারা কোনো ব্যাপারেই কোনো নিষ্পত্তি করা যায়না বলে মত প্রকাশ করেন। তারা বলেন, বাদীকে শপথ করতে বলা হবেনা। তবে বিবাদী হয় বাদীর দাবি মেনে নেবে, নতুবা অস্বীকার করবে এবং নিজেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করে শপথ করবে।

ইমাম শওকানির মতে, শেষোক্ত মতই অগ্রগণ্য। তিনি বলেন: শপথে অসম্মতির ভিত্তিতে বিচার নিষ্পত্তি করা বৈধ নয়। কেননা এতে বড়জোর এতটুকু বিষয় প্রমাণিত হয় যে, শরিয়তের বিধান অনুযায়ী যার শপথ করার দায়িত্ব ছিলো, সে সেটা করেনি এবং সে দায়িত্ব পালন করেনি। এটা না করার অর্থ এ নয় যে, সে বাদীর দাবি মেনে নিয়েছে। এর অর্থ শুধু এ যে, শরিয়তে তার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিল, তা সে পরিত্যাগ করেছে। সুতরাং বিচারকের করণীয় হলো, শপথ করতে অসম্মত হওয়ার পর বিবাদীকে দুটো কাজের একটা করতে বাধ্য করবে: হয় তার যে শপথ করার কথা, তা সে করবে, নচেৎ বাদী যা দাবি করেছে তা মেনে নেবে। এ দুটো কাজের যেটিই সে করবে, তার ভিত্তিতে বিচার নিষ্পত্তি করা যাবে।'

শপথ তলবকারীর নিয়তের উপর শপথ হবে: বাদী বিবাদীর একজন যখন শপথ করবে, তখন বিচারকের নিয়ত ও শপথ তলবকারীর নিয়তের উপর শপথ হবে, যার দাবি পূরণ ঐ শপথের উপর নির্ভরশীল, শপথকারীর নিয়তের উপর নয়। কেননা ইতিপূর্বে রসূলের এ হাদিস বর্ণিত হয়েছে: 'শপথ তলবকারীর নিয়তের উপর শপথ।' সুতরাং শপথকারী যখন শপথে তার ইচ্ছা গোপন করে, অর্থাৎ তার ব্যবহৃত শব্দ দ্বারা বাহ্যত যা বুঝা যায়, তা থেকে ভিন্ন কোনো অর্থ গোপন করে, তখন সেটা বৈধ হবেনা। কারো কারো মতে, কোনো ব্যক্তি অত্যাচারিত হওয়ার কারণে এটা করতে বাধ্য হলে তার জন্য বৈধ।

সাক্ষীর সাক্ষ্যের সাথে শপথ যুক্ত করে রায় দান: বাদীর সাথে যখন একমাত্র সাক্ষী ব্যতীত আর কোনো প্রমাণ থাকেনা, তখন ঐ সাক্ষীর সাক্ষ্য ও সে সাথে বাদীর শপথ যুক্ত করে বিচারের রায় দেয়া হবে। কেননা দারু কুতনি আমর ইবনে শুয়াইব সূত্রে বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ্ সা. দু'জন সাক্ষী দ্বারা বিচার করতেন। দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারলে বাদী তার পাওনা বুঝে নিত। আর যদি সে একজন সাক্ষী নিয়ে আসতো তখন সাক্ষীর সাক্ষ্যের সাথে সাথে বাদী শপথও করতো। হুদুদ ও কিসাস ব্যতীত যাবতীয় মামলায় একক সাক্ষীর সাক্ষ্যের সাথে বাদীর শপথ যুক্ত করে রায় দেয়া যাবে। তবে কোনো কোনো

আলেম সাক্ষ্য ও শপথের ভিত্তিতে নিষ্পত্তিকে কেবল আর্থিক ও তৎ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। একজন সাক্ষী ও শপথ দ্বারা বিচার নিষ্পত্তি বিষয়ক হাদিসগুলো বিশজনের বেশি বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন।

শাফেয়ি বলেন: একজন সাক্ষী ও শপথ দ্বারা বিচার নিষ্পন্ন করা কুরআনের প্রকাশ্য উক্তির বিরোধী নয়। কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় যে সংখ্যক সাক্ষী প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছে, এ ব্যবস্থা তা ব্যাহত করেনা।

এ পদ্ধতির পক্ষে রায় দিয়েছেন আবু বকর, আলি, উমর ইবনে আব্দুল আযীয ও অধিকাংশ প্রাচীন ও পরবর্তী কালীন ফকিহ্, যাদের মধ্যে ইমাম মালেক ও তাঁর শিষ্যগণ, ইমাম শাফেয়ি ও তাঁর অনুসারীগণ, ইমাম আহমদ, ইসহাক, আবু উবায়দ, আবু সাওর, ও দাউদ অন্যতম। আর হানাফি ফকিহগণ, আওযায়ি, যায়দ ইবনে আলি, যুহ্‌রি, নাসায়ি, ও ইবনে শাব্‌রুমা এর বিরোধিতা করে বলেছেন: একজন সাক্ষী ও শপথ দ্বারা কখনো বিচার সম্পন্ন করা যাবেনা। কিন্তু এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসগুলি তাদের বিপক্ষে।

অকাট্য পারিপার্শ্বিক প্রমাণ: পারিপার্শ্বিক প্রমাণ হলো সে আলামত, যা নিশ্চিত বিশ্বাস সৃষ্টি করে। এর উদাহরণ হলো: এক ব্যক্তি একটি নির্জন ঘর থেকে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় বের হলো, তার হাতে রক্তাক্ত ছোরা, এবং তৎক্ষণাৎ ঐ ঘরে প্রবেশ করে দেখা গেল একজন মানুষ গলাকাটা অবস্থায় পড়ে আছে। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তিই যে নিহত লোকটির খুনী, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকেনা। এ ক্ষেত্রে এরূপ কল্পনাসর্বস্ব সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখার সুযোগ নেই যে, লোকটি আত্মহত্যা করে থাকতে পারে। বিচারক যখন নিশ্চিত হবে যে, প্রকৃত ঘটনা এটাই, তখন তাকে ঐ অভিযোগে গ্রেফতার করা হবে।

হানাফি ফকিহগণ এর আরো উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন: একটি আটা বোঝাই নৌকায় দু'জন লোক রয়েছে। একজন ব্যবসায়ী ও অপরজন নৌকার মাঝি। দু'জনের মধ্যে আটা ও নৌকার মালিকানা নিয়ে বিবাদ বাধলো। অথচ দু'জনের কারো কাছেই কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। এ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীকে আটার মালিক ও নৌকার মাঝিকে নৌকার মালিক গণ্য করা হবে। অনুরূপ, একটা দম্পতির সদ্যজাত সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে স্বামীকেই তার পিতা গণ্য করা হবে। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'বিছানা যার সন্তান তার।'

বাড়ির আসবাবপত্র নিয়ে বিরোধ: যখন দু' ব্যক্তি বিবাদে লিপ্ত হয়, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাদের একজনের পক্ষে, তখন সেটাই আমলে নিতে হবে। এটা হাম্বলি ফকিহ্‌দের অভিমত। যেমন স্বামী ও স্ত্রী বাড়ির আসবাব পত্র নিয়ে বিবাদে লিপ্ত, তখন ঐ আসবাবপত্রের মধ্যে যেগুলো পুরুষের উপযোগী তা স্বামীকে এবং যেগুলো মহিলাদের উপযোগী তা স্ত্রীকে দেয়া হবে। আর যেগুলো উভয়ের উপযোগী, তা উভয়ের মধ্যে আধাআধি বণ্টন করে দেয়া হবে। আর যদি উভয়ের মধ্যে মৈত্রী ও সমতা থাকে কিন্তু একজনের প্রাধান্য বেশি থাকে, তাহলে রায় তার পক্ষে যাবে। যেমন একটি জন্তুকে একজন লাগাম ধরে টেনে নিচ্ছে, এবং অপরজন আরোহী, এমতাবস্থায় জন্তুটি আরোহীর বলে গণ্য হবে। কারণ সে অপরজনের চেয়ে অধিক প্রাধান্য ও আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে।

হস্ত লিখিত প্রমাণ ও দলিল-দস্তাবেজ: যখন থেকে জনগণ চেকের মাধ্যমে লেনদেন রপ্ত করেছে ও তার উপর আস্থাশীল হয়েছে, তখন থেকে কিছু আলেম হস্তলিখিত প্রমাণাদি গ্রহণ ও তদনুযায়ী কাজ করার পক্ষে ফতোয়া দিয়ে আসছেন। আদালতে এ গুলো গ্রহণ করা হচ্ছে এবং ঋণের চেক, ড্রাফট, ও বাণিজ্যিক দলিলসমূহ অনুমোদিত হচ্ছে, যখন তা কৃত্রিমতা ও জালিয়াতি থেকে মুক্ত থাকে। হস্তলিখিত স্বীকারোক্তি ও জবানবন্দি মৌখিক স্বীকারোক্তি ও জাবনবন্দির পর্যায়ভুক্ত গণ্য হয়ে থাকে। একইভাবে সরকারি দলিল দস্তাবেজ যদি জাল না হয়, তবে তাও গৃহীত হয়ে থাকে।

❖❖❖

পঁয়ষট্টিতম অধ্যায়

স্ববিরোধিতা

স্ববিরোধিতা দু'প্রকার: ১. সাক্ষীদের স্ববিরোধিতা ২, বাদীর স্ববিরোধিতা।

সাক্ষীর স্ববিরোধিতা বা সাক্ষ্য প্রত্যাহার: সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেয়ার পর যদি বিচারকের উপস্থিতিতেই রায় ঘোষণার আগে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তাদের দেয়া সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে এবং তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। এটা অধিকাংশ ফকিহ্দের মত। কিন্তু রায় ঘোষণার পর বিচারকের উপস্থিতিতে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে রায় বাতিল হবে না, কিন্তু রায় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিপক্ষকে ক্ষতিপূরণ দিতে সাক্ষী বাধ্য থাকবে। দু' ব্যক্তি আলি রা. এর নিকট অপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে চুরির সাক্ষ্য দেন। এর ফলে তার হাত কেটে ফেলা হয়। এরপর তারা উভয়ে অন্য এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে এসে বললো: আসলে এ লোকটি চোর। আলি রা. বললেন: দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করি না। তবে প্রথম জনের হাত কাটার জন্য তাকে দিয়াত দিতে তোমাদেরকে বাধ্য করবো। আমি যদি জানতে পারি যে, তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে এ কাজ করেছ, তবে তোমাদের উভয়ের হাত কেটে দেব।

অধিকাংশ ফকিহ্দের প্রদত্ত এ মতের কারণ বিশ্লেষণ করে শিহাবুদ্দীন কারাফি বলেন: ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও আইন সংগতকারণে রায় দেয়া হয়েছে। এরপর সাক্ষীরা নিজেদের মিথ্যাচারের স্বীকারোক্তি দিয়ে যে জবানবন্দি দিয়েছে, তা দ্বারা তারা নিজেদেরকে ফাসেক বলে স্বীকারোক্তি দিয়েছে। যেহেতু ফাসেকের উক্তিতে রায় বাতিল হতে পারে না, তাই রায় যেমন ছিল তেমনই থাকবে।' কিন্তু ইবনুল মুসাইয়াব, আওযায়ি ও যাহেরি মযহাবের ফকিহ্গণ সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে সর্বাবস্থায় রায় বাতিল হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কেননা রায় সাক্ষ্যের ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে। সাক্ষীরা যখন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলো, তখন রায়ের আর কোনো ভিত্তি রইলোনা। কোনো কোনো ফকিহ্দের মতে, হুদুদ ও কিসাসের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সাক্ষীরা রায় কার্যকর হওয়ার আগে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে রায় কার্যকর হবে না। কেননা যে কোনো সন্দেহের কারণে হুদুদ রহিত হয়ে থাকে।

বাদীর স্ববিরোধিতা: বাদী যদি এমন কোনো কথা বলে যা তার দাবির বিরোধী, তাহলে তার দাবি বাতিল হয়ে যাবে। সে যদি কোনো সম্পত্তি অন্য কারো প্রাপ্য বলে স্বীকারোক্তি করে, তারপর দাবি করে যে, ওটা তার, তবে তার স্বীকারোক্তির পরিপন্থী এই দাবি তার দাবিকে বাতিল করবে এবং তা গ্রহণে অন্তরায় হবে। আর যখন কেউ অন্য কাউকে সকল দাবি থেকে অব্যাহতি দেয়, তখন এই অব্যাহতি দেয়ার পর তার নিকট তার নিজের জন্য আর কোনো দাবি উত্থাপন বৈধ হবে না।

বাদীর প্রমাণ বাতিল করণ: বিবাদীর কাছে যদি এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকে, যা দ্বারা সে বাদীর দাবি ভুল ও অন্যায় বলে প্রমাণ করত নিজেকে দায়মুক্ত করতে পারে, তবে সে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা তার জন্য বৈধ। এ ধরনের সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলে সে ইচ্ছা করলে এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করতে পারবে, যা বাদীর সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতা খণ্ডন করে।

দু'সাক্ষীর পরস্পর বিরোধী সাক্ষ্য: যখন দু'জন সাক্ষী পরস্পর বিরোধী হয় এবং একজনকে অপরজনের উপর অগ্রাধিকার দেয়ার মত কিছুই পাওয়া যায় না, তখন দাবিকৃত জিনিসটি বাদী ও বিবাদীর মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে। আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ্ সা. এর আমলে দু' ব্যক্তি একটা উট দাবি করলো। উভয়ে তাদের দাবির স্বপক্ষে দু'জন করে সাক্ষী পাঠিয়ে দিলো। অগত্যা রসূলুল্লাহ্ সা. উটটাকে উভয়ের মধ্যে আধা আধি বণ্টন করে দিলেন। -(আবু দাউদ, বায়হাকি, হাকেম)

আহ্মদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও নাসায়ি আবু মূসা থেকে বর্ণনা করেন: 'দুই ব্যক্তি একটি জন্তুর দাবি নিয়ে রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট গেল। তাদের কারো কাছেই কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিলনা। রসূল সা. জন্তুটিকে উভয়ের মধ্যে আধাআধি বণ্টন করে দিলেন।' এটাই ইমাম আবু হানিফার মত। দাবিকৃত

জিনিসটি যদি দু'জনের একজনের দখলে থাকে তবে প্রতিপক্ষের দায়িত্ব হচ্ছে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করা। যদি হাজির করতে না পারে তবে যার দখলে আছে সে শপথ করে যা বলবে, সেটাই গৃহীত হবে। অনুরূপ, উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করলে দখল দ্বারা সাক্ষ্য-প্রমাণ অগ্রগণ্যতা পাবে। জাবির রা. বর্ণনা করেন, একটি উট নিয়ে দু' ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ দেখা দিলো। উভয়ে বললো, ওটা আমার কাছেই জন্মেছে এবং সাক্ষী উপস্থিত করলো। রসূল সা. উটটি যার দখলে রয়েছে, তার পক্ষে ফায়সালা করলেন। -(বায়হাকি, ইমাম শাফেয়িও অনুরূপ বর্ণনা করেন)।

সাক্ষীকে শপথ করানো: এ যুগে সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তাই শপথ দ্বারা সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা দৃঢ়তর করা জরুরি। 'মাজাল্লাতুল আহ্কামিল আদ্লিয়া'তে বলা হয়েছে:

'আসামী যখন বিচারকের নিকট অনুরোধ করবে যে, রায় দেয়ার আগে সাক্ষীদের এ মর্মে শপথ করানো হোক যে, তারা তাদের সাক্ষ্যে মিথ্যাবাদী ছিলনা, তখন বিচারক সাক্ষীদের শপথ গ্রহণ করাতে পারেন এবং বলতে পারেন যে, তোমরা শপথ করলে তোমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, নচেৎ করা হবে না।'

ইবনে আবি লায়লা, ইবনুল কাইয়েম, কর্ডোভার বিচারক মুহাম্মাদ ইবনে বশীর ও ইবনে নুজাইম এ মতের সমর্থক। কিন্তু হানাফি ফকিহদের মত হলো, সাক্ষীর কোনো শপথ করা জরুরি নয়। কেননা শাহাদাত বা সাক্ষ্য শব্দটাতেই শপথের অর্থ প্রচ্ছন্ন রয়েছে। হাম্বলি মযহাব অনুসারে এমন কোনো সাক্ষীকে শপথ করানো হবে না, যে সাক্ষী দায়দায়িত্ব গ্রহণে রাযি নয়, এমন কোনো বিচারককে শপথ করানো হবেনা, যে রায়কে অস্বীকার করে এবং কোনো অছিয়তধারীকে অছিয়তকারীর ঋণ অস্বীকার করতে শপথ করানো হবে না।

বিয়ে, তালাক, তালাক প্রত্যাহার, ঈলা, বংশ পরিচয়, কিসাস ও অপবাদ অস্বীকারকারীকে শপথ করানো হবে না। কেননা এগুলো অর্থ বিষয়ক নয়, অর্থপ্রাপ্তি এগুলোর উদ্দেশ্য নয় এবং শপথ করা থেকে বিরত থাকলে তার ভিত্তিতে রায় দেয়া হবে না।

মিথ্যা সাক্ষ্য দান: মিথ্যা সাক্ষ্য দান সবচেয়ে মারাত্মক কবিরা গুনাহগুলোর অন্যতম। কেননা এটা অত্যাচারীর পৃষ্ঠপোষকতা, অত্যাচারিতের অধিকার হরণ, বিচারককে বিপথে চালিত করা, অধিকার বঞ্চিতদের মানসিক যন্ত্রণা সৃষ্টি এবং মানব সমাজে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয়ার নামান্তর। আল্লাহ্ তায়ালা সূরা হজ্জের ৩০ নং আয়াতে বলেন: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ○

'তোমরা মূর্তিপূজার অপবিত্রতা বর্জন কর এবং মিথ্যা বলা থেকে দূরে থাক।'

ইব্নে উমার রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার জন্য আল্লাহ্ দোযখ অবধারিত না করা পর্যন্ত সে পা নাড়াতে পারবে না।' (ইবনে মাজা)।

ইমাম বুখারি ও মুসলিম আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন: রসূল সা. কে কবিরা গুনাহ্ কী জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন: আল্লাহ্র সাথে শরিক করা, হত্যা করা, পিতামাতার অবাধ্যতা। তিনি আরো বললেন: সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ কী তোমাদেরকে বলবো: তা হচ্ছে মিথ্যা বলা, বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ কী বলবো নাকি? আমরা বললাম: হে রসূল, বলুন। তিনি বললেন: আল্লাহ্র সাথে শরিক করা ও পিতামাতার অবাধ্য হওয়া। তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন। সহসা সোজা হয়ে বসে বললেন: সাবধান, মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। কথাটা তিনি এতো বেশি পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন যে, আমরা বলতে লাগলাম, 'আহা, উনি এখন চুপ করলে ভাল হতো।' (মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ব্যভিচার ও চুরির চেয়েও বড় অপরাধ। এ জন্য রসূলুল্লাহ্ সা. এটা সম্পর্কে সতর্ক করাকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ মিথ্যা সাক্ষ্য উচ্চারণে

অপেক্ষাকৃত সহজ। লোকেরা একে প্রায়ই হালকা মনে করে থাকে। এর ফলে হিংসা ও বিদ্বেষ ব্যাপক রূপ ধারণ করে, তাই এটিকে এত গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন ছিলো।)

মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার শাস্তি: ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আহমদের মতে 'মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে শাস্তি দিতে হবে এবং সে যে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা, তা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। ইমাম মালেক আরো বলেন: সকল বাজারে, জামে মসজিদে ও জনসমাবেশে তাকে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা বলে চিহ্নিত ও প্রচার করতে হবে, যাতে তার শাস্তি হয় ও অন্যরা সতর্ক হয়।

ছেষট্টিতম অধ্যায়

কারাগার ও কারাদন্ড

কারাগার ও কারাদণ্ড একটা প্রাচীন প্রথা। পবিত্র কুরআনে আছে, ইউসুফ আ. বলেছিলেন:

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ

'ইউসুফ বললো: হে আমার প্রতিপালক, এই নারীগণ আমাকে যেদিকে আহবান করছে, তার চেয়ে কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়।' (সূরা ইউসুফ, ৩৩)।

কুরআনে এ কথারও উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি কারাগারে প্রবেশ করেছিলেন এবং কয়েক বছর ছিলেন। রসূলুল্লাহ সা. এর আমলে, সাহাবিগণের আমলে এবং তাদের পরবর্তী কালেও কারাগার ছিলো, এখনও আছে।

ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলেন: আইনের দৃষ্টিতে কারাদণ্ড কোনো সংকীর্ণ স্থানে আটক রাখার নাম নয়, বরং মানুষকে স্বাধীনভাবে কাজ করা ও চলাফেরা করা থেকে বিরত রাখার নাম, চাই যে কোনো ঘরে থাকুক, অথবা মসজিদে থাকুক, অথবা প্রতিপক্ষ বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক তার তদারকীতে আটক রাখা হোক। এ জন্য রসূল সা. এ ধরনের আটক ব্যক্তিকে বন্দী নামে অভিহিত করেছেন। ইমাম আবু দাউদ ও ইবনে মাজা হিরমাস ইবনে হাবিব থেকে বর্ণনা করেন, হিরমাসের পিতা বলেন: আমার এক খাতককে সাথে নিয়ে রসূল সা. এর নিকট গেলাম। তখন রসূল সা. আমাকে বললেন: ওকে আটক রাখ। তারপর বললেন: হে বনু তামীমের ভাই, তোমার বন্দীর সাথে কী আচরণ করতে চাও? ইবনে মাজা'র বর্ণনায় আছে: পুনরায় বিকালের দিকে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: হে বনু তামিমের ভাই, তোমার বন্দী কি করছে? ইমাম ইবনে কাইয়েম পুনশ্চ বলেন: রসূল সা, ও আবু বকর রা. এর আমলে এভাবেই আটক করা হতো। অভিযুক্তদের আটক রাখার জন্য কোনো কারাগার নির্দিষ্ট ছিলনা। কিন্তু উমার ইবনুল খাত্তাব রা. এর আমলে যখন প্রজার সংখ্যা ব্যাপক আকার ধারণ করলো, তখন তিনি মক্কায় একটা বাড়ি কিনলেন এবং তাকে অভিযুক্তদের আটক রাখার কারাগারে পরিণত করলেন। এ কারণেই কারাগার স্থাপন শাসকের দায়িত্ব কিনা, আলেমগণ সে বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন। এ ব্যাপারে দুটো মত রয়েছে। যারা বলেন: কারাগার স্থাপন শাসকের দায়িত্ব নয়, তারা বলেন ; রসূল সা. ও খুলাফায়ে রাশেদীনের কোনো কারাগার ছিলনা। তবে তিনি অভিযুক্তকে কোনো এক জায়গায় রাখবেন, অথবা তার উপর কোনো প্রহরি নিযুক্ত করবেন, অথবা প্রতিপক্ষ তাকে সর্বক্ষণ তার কাছে থাকার আদেশ দেবে, যেমন রসূলুল্লাহ্ সা. দিয়েছেন। আর যিনি বলেন, কারাগার স্থাপন করা শাসকের কাজ, তিনি এর প্রমাণ স্বরূপ বলেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব চার হাজার মুদ্রায় সাফ্ওয়ান ইবনে উমাইয়ার কাছ থেকে একটা বাড়ি কিনে সেটিকে কারাগারে রূপান্তরিত করেছিলেন।

কারাগার নিরাপত্তা ও কল্যাণের স্থান: ইমাম শওকানি বলেন: 'অস্বীকার করার উপায় নেই যে, রসূলুল্লাহ্ সা. এর যুগ, সাহাবা ও তাবেইদের যুগ এবং তার পরবর্তী সকল যুগে ও সকল দেশে কারাবাসের প্রচলন ছিল। যে সব অপরাধী গোষ্ঠী নিরন্তর জনগণের ক্ষতি সাধনে নিয়োজিত ও অভ্যস্ত থাকে, তাদের দৌরাত্ম থেকে সমাজকে নিরাপদ ও মুক্ত রাখার ব্যবস্থা কারাগার দ্বারা নিশ্চিত হয় বিধায় এটা জনস্বার্থের অনুকূল ও রক্ষক। এ শ্রেণীর অপরাধীদের চরিত্র ও কার্যকলাপ এমন যে, তারা সাধারণত হুদুদ ও কিসাস জারি হয় এমন অপরাধ করে না। যদি তা করতো তবে তাদের উপর হুদুদ ও কিসাস জারি করে সমাজ ও দেশ থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করা যেত। এরা যে ধরনের অপরাধ করে, তা হুদুদ ও কিসাসের চেয়ে হালকা ধরনের হলেও তাদেরকে মুক্ত ছেড়ে দিলে সমাজে অনাচার ও অনাসৃষ্টি চরম আকার ধারণ করতো। আবার এ জাতীয় অপরাধের জন্য তাদেরকে হত্যা করলে অন্যায় রক্তপাত করা হতো। তাই তাদের দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় অবশিষ্ট ছিলো তাদেরকে কারাগারে আটক রাখা, যাতে তাদের অপরাধ থেকে সমাজকে আপাতত মুক্ত ও নিরাপদ রাখা যায়, তারা তাওবা ও আত্মশুদ্ধির অবকাশ পায় অথবা তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ যে সিদ্ধান্ত নেন তা কার্যকর হয়।

এ ধরনের দুরাচারী ও অপরাধপ্রবণ লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এ কাজটা করতে হলে আপাতত তাদেরকে আটক করে জনগণ এবং তাদের মধ্যে একটা অন্তরায় সৃষ্টি করা প্রয়োজন। যারা এ শ্রেণীটির স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল তারা এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।'

আটকাবস্থার প্রকারভেদ: ইমাম খাত্তাবি বলেন: আটকাবস্থা দু'রকমের: শাস্তিমূলক ও অনুসন্ধানমূলক।

শাস্তিমূলক আটকাবস্থাটা অপরাধের বিচার শেষে শাস্তি হিসাবেই দেয়া হয়। আর অপরাধের দায়ে অভিযুক্তকে আটক করা হয়, অভিযোগের সত্যাসত্য তদন্ত ও বিচার করার জন্য। বর্ণিত আছে: রসূলুল্লাহ্ সা. এক ব্যক্তিকে কোনো এক অভিযোগে দিনের কয়েক ঘন্টা আটক রাখার পর মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

অভিযুক্তকে প্রহার করা: বিনা কারণে কাউকে আটক করা বৈধ নয়। যখন কোনো অভিযোগে কাউকে আটক করা হয়, তখন তার ব্যাপারে তদন্ত চালানো জরুরি। তদন্তে সে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে ঐ সুনির্দিষ্ট অভিযোগে আটক দেখাতে হবে। অন্যথায় তাকে ছেড়ে দিতে হবে। অভিযুক্তকে প্রহার করা হারাম। কেননা এতে তাকে অপমান করা হয়। রসূলুল্লাহ্ সা. মুসলমানদেরকে মারপিট করতে নিষেধ করেছেন। তাবে চুরির অভিযোগে আটক ব্যক্তিকে মারপিট করা সম্পর্কে দু'রকমের মত রয়েছে।

হানাফি ও শাফেয়িদের মধ্য থেকে ইমাম গাযালীর মত এই যে, চুরির অভিযোগে ধৃতব্যক্তিকে মারপিট করা যাবে না। কেননা তার নিরপরাধ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। একজন অপরাধীকে মারপিট করা থেকে বিরত থাকা একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে মারপিট করার চেয়ে উত্তম। হাদিসে রয়েছে: 'শাসকের ভুলক্রমে ক্ষমা করা ভুলক্রমে শাস্তি দেয়ার চেয়ে উত্তম।'

ইমাম মালেক রা. চুরির দায়ে অভিযুক্তকে কারাগারে আটক রাখার অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম মালেকের শিষ্যদের মতে তাকে প্রহার করাও জায়েয আছে। কেননা এতে সে চোরাই মাল ফেরত দিতে এবং অন্যরা শিক্ষা লাভ করতে পারে। এ অবস্থায় সে যদি স্বীকারোক্তি দেয় তবে সে স্বীকারোক্তির মূল্য নেই। কেননা স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছায় ও স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে দেয়া শর্ত। সে নির্যাতনে বাধ্য হয়ে স্বীকারোক্তি দিয়েছে।

আটকাবস্থা কেমন হওয়া জরুরি: অভিযুক্ত বা অপরাধীকে যে স্থানে আটক রাখা হবে, সে স্থানটা প্রশস্ত হওয়া উচিত। আর আটক ব্যক্তির জন্য সরকারি কোষাগার থেকে খাদ্যবস্ত্র ও যাবতীয় মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। আটক ব্যক্তিকে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত রাখা যুলুম এবং সে জন্য আল্লাহ্র শাস্তি অবধারিত। ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: একজন মহিলা একটি বিড়ালকে আটক রেখেছিল, ফলে বিড়ালটি মারা যায়। এ জন্য ঐ মহিলা দোযখে যায়। আটক অবস্থায় মহিলা বিড়ালটিকে কোনো খাদ্য ও পানীয় দেয়নি এবং মাটিতে পড়ে থাকা আজে-বাজে জিনিস খাওয়ার জন্য তাকে ছেড়েও দেয়নি।' (বুখারি ও মুসলিম)।

সাতষট্টিতম অধ্যায়

বলপ্রয়োগ

সংজ্ঞা: আভিধানিক অর্থে 'বলপ্রয়োগ' হচ্ছে মানুষকে এমন কোনো কাজ করতে বাধ্য করা, যা সে স্বতস্ফূর্তভাবে বা আইনত করতে ইচ্ছুক নয়। আর শরিয়তের বা ফিকহের পরিভাষায় কাউকে হত্যা, প্রহার, জেল, সম্পদ বিনাশ, মারাত্মক কষ্ট দেয়া বা কঠিন শারীরিক নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে, যা সে স্বেচ্ছায় করতে প্রস্তুত নয় তা করতে বাধ্য করা।

এ ক্ষেত্রে যার উপর বলপ্রয়োগ করা হয়, তার মনে বলপ্রয়োগকারী যে জিনিসের ভয় দেখিয়েছে তা কার্যকর করা অবশ্যম্ভাবী বলে প্রবল ধারণা সৃষ্টি হওয়া শর্ত। বলপ্রয়োগ শাসক কিংবা ডাকাত বা অন্য যে কেউ করুক, কোনোই পার্থক্য নেই। উমর রা. বলেন: তুমি যখন কাউকে ভয় দেখাও, বা বেঁধে রাখ, বা প্রহার কর, তখন সে নিরাপদ নয়। ইবনে মাস্‌উদ রা. বলেন: কোনো ক্ষমতাবান ব্যক্তি যদি আমাকে বেত মারার ভয় দেখিয়ে কোনো কথা বলতে বাধ্য করে, তাহলে আমি তা বলবো। ইবনে হায্‌ম বলেন: কোনো সাহাবি ইবনে মাস্‌উদ রা.এর বক্তব্যের বিরোধী কিছু বলেননি।

বলপ্রয়োগের প্রকারভেদ: বলপ্রয়োগ দু প্রকার: ১. কোনো কথা বলার জন্য বলপ্রয়োগ ২. কোনো কাজ করার জন্য বলপ্রয়োগ।

কথা বলার জন্য বলপ্রয়োগ: কোনো কথা বলার জন্য বলপ্রয়োগ করা হলে সে জন্য যার উপর বলপ্রয়োগ করা হয়, তার উপর কোনো দায় বর্তেনা। কেননা সে সেজন্য দায়ী নয়। বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে সে যদি এমন কোনো কথা বলে, যা স্বাভাবিক অবস্থায় বললে মানুষ কাফির হয়ে যায়, তবে সে জন্য তাকে দায়ী করা হবে না। আর বাধ্য হয়ে সে যদি কাউকে অপবাদ দেয় তবে তার উপর অপবাদের শাস্তি কার্যকর হবে না। আর যখন সে বাধ্য হয়ে কোনো স্বীকারোক্তি দেয় তবে তাতেও তার উপর কোনো দায় আরোপিত হবেনা। আর বাধ্য হয়ে যদি কোনো বিয়ে, দান বা বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন করে তবে সে চুক্তি শুদ্ধ হবে না ও কার্যকর হবে না। আর যখন বাধ্য হয়ে কোনো শপথ বা মান্নত করে, তখনও তার উপর কিছুই ধার্য হবে না। বাধ্য হয়ে তালাক দিলে বা তালাক প্রত্যাহার করলে তাও কার্যকর হবে না। এর মূলনীতি রয়েছে সুরা নাহ্‌লের ১০৬ নং আয়াতে:

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۤ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

'কোনো ব্যক্তি ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করলে এবং কুফ্‌রির জন্য হৃদয়কে উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আল্লাহ্‌র গযব আপতিত হবে এবং তার জন্য মহা শাস্তি রয়েছে। তবে সে ব্যক্তির জন্য নয়, যাকে কুফ্‌রির জন্য বাধ্য করা হয়, কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচল।'

হৃদয়কে উন্মুক্ত রাখা অর্থ মনের আনন্দ ও চিরস্থায়ী পরকালের উপর নশ্বর ইহকালকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্বেচ্ছায় আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করলে তার উপর আল্লাহ্‌র গযব ও মহাশাস্তি অবধারিত।

আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ: এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ আল্লামা ইবনে কাছির তাঁর তাফসিরে আম্মার ইবনে ইয়াসারের ছেলে মুহাম্মদ সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: মুশরিকরা আম্মার ইবনে ইয়াসারকে ধরে নিয়ে গেল এবং তার উপর নির্যাতন চালালো। এর ফলে তারা তাকে দিয়ে যা যা বলাতে চেয়েছিল, তার প্রায় সবই বলতে তিনি রাযী হয়ে গেলেন। পরে তিনি এ ঘটনা রসূল সা.কে জানালে তিনি তাকে বললেন: 'তোমার মনের অবস্থা কেমন অনুভব করছ?' আম্মার বললেন: ঈমানে স্থির ও অবিচল। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: 'তারা যদি তোমার সাথে পুনরায় এমন করে, তবে তুমি পুনরায় এ রকম বলো।' ইমাম বায়হাকি এ হাদিস আরো বিশদভাবে বর্ণনা করে বলেন: আম্মার রসূলুল্লাহ সা.কে গালি দেন এবং তাদের দেবদেবীর প্রশংসা করেন। পরে তিনি রসূল সা.কে এ ঘটনা জানিয়ে বলেন: হে রসূলুল্লাহ! আপনাকে গালি না দেয়া ও তাদের দেবদেবীর প্রশংসা না করা পর্যন্ত আমাকে ছাড়া হয়নি।

রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: তোমার মনের অবস্থা তখন কেমন অনুভব করছ? আম্মার বললেন, ঈমানে স্থির ও অবিচল। রসূল সা. বললেন: 'তারা যদি আবার এরূপ করে তবে তুমি আবার এরূপ বলবে।' এ ঘটনা উপলক্ষেই আল্লাহ্ এ আয়াতটি নাযিল করলেন।

আয়াতটি কুফ্রি ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারেও নির্দেশনা দেয়: আয়াতটি যদিও কুফ্রি কথা উচ্চারণের সাথে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু এ দ্বারা অন্যান্য বিষয়েও দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। ইমাম কুরতুবি বলেন: আল্লাহ্ যখন বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে তাঁর সাথে কুফ্রী করারও অনুমতি দিয়েছেন এবং এ জন্য মৌখিক কুফরী উচ্চারণকারীকে দোষারোপ করেননি, অথচ ওটা হচ্ছে শরিয়তের ভিত্তি, তখন আলেমগণ শরিয়তের সকল শাখা-উপশাখাকেও এর আওতাভুক্ত করেছেন। কাজেই বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে কেউ শরিয়তের যে কোনো বিধিই লংঘন করুক, তার জন্য সে দায়ী হবে না এবং তাকে এর কোনো আইনী পরিণতি ভোগ করতে হবে না। এ ব্যাপারেই রসূলুল্লাহ্ সা. থেকে এ বিখ্যাত হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে: 'আমার উম্মতের সকল ভুলত্রুটি ও বাধ্য হয়ে যা কিছু করে,তা থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।' এ হাদিসটি সনদের দিক দিয়ে সহিহ না হলেও এর বক্তব্য যে সঠিক, সে ব্যাপারে আলেমগণ একমত। তবে ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবী ও আবু মহাম্মদ আব্দুল হক বলেছেন, হাদিসটি সহিহ। আবু বকর আল উসাইলি তার 'ফাওয়ায়েদ' ও ইবনুল মুনযির 'আল ইকনা' নামক গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন।

কুফরির বাক্য উচ্চারণে বলপ্রয়োগ কালে মূলনীতির উপর অবিচল থাকা উত্তম: বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে কুফরী বাক্য উচ্চারণের যদিও অনুমতি রয়েছে, কিন্তু মূলনীতির উপর অবিচল থাকা ও অত্যাচার-নির্যাতনে ধৈর্য ধারণ করা উত্তম, যদিও তা হত্যা পর্যন্ত গড়ায়। এতে ইসলামের সম্মান ও মর্যাদা সমুন্নত থাকবে। ইয়াসার ও সুমাইয়া এটাই করেছিলেন। এটা নিজেকে ধ্বংসের আবর্তে নিক্ষেপ করা নয়, বরং জিহাদ করে শহীদ হওয়ার শামিল।

ইব্নে আবি শায়বা হাসান সূত্রে ও আব্দুর রাযেক তার তাফসির গ্রন্থে মুয়াম্মার সূত্রে বর্ণনা করেন: 'মুসাইলামা দু ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলো: মুহাম্মদ সম্পর্কে তোমার মত কী? সে বললো: উনি তো আল্লাহ্র রসূল। মুসাইলামা বললো: আর আমার সম্পর্কে? সে বললো: আপনিও। তখন সে তাকে মুক্তি দিলো।

এবার দ্বিতীয় জনকে জিজ্ঞাসা করলো: তুমি মুহাম্মদকে কী মনে কর? সে বললো: আল্লাহ্র রসূল। মুসাইলামা বললো আর আমি? সে বললো: আমি কানে শুনিনা। মুসাইলামা তাকে তিনবার একই কথা জিজ্ঞাসা করলো। সে প্রত্যেকবার বললো: আমি কানে শুনিনা। তখন মুসাইলামা তাকে হত্যা করলো।

এ খবর শুনে রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, 'প্রথম জন আল্লাহ্র দেয়া অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় জন সত্যকে বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করেছে। তার জন্য সুসংবাদ।'

অবৈধ কাজে বাধ্য করা: দ্বিতীয় প্রকারের বলপ্রয়োগ হলো অবৈধ কাজে বাধ্য করা। এটা আবার দু প্রকার: ১. যা অনন্যোপায় অবস্থায় বৈধ হয়ে যায়। ২. যা অনন্যোপায় অবস্থায় বৈধ হয় না।

প্রথমটির উদাহরণ হলো মদ পান, মৃত জন্তু খাওয়া, শূকরের গোশ্ত খাওয়া, অন্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ করা বা অন্য কোনো হারাম জিনিস ভোগদখল করার উপর বলপ্রয়োগ করা। এ অবস্থায় এসব জিনিস খাওয়া বৈধ। এমনকি কোনো কোনো ফকিহের মতে, খাওয়া ওয়াজিব। কারণ না খেয়ে তার উপায় নেই। আর এতে কারো ক্ষতিও নেই। আল্লাহর কোনো হকও এতে নষ্ট হয়না। কারণ আল্লাহ বলেন :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ 'তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে না।' (সুরা ২, বাকারা: আয়াত ১৯৫)

অনুরূপ, যাকে রমযানের রোযা ভেংগে ফেলতে, কিবলা ব্যতীত অন্য দিকে মুখ করে নামায পড়তে, মূর্তির সামনে বা ক্রুসের সামনে সাজ্দা করতে বাধ্য করা হয়, তার জন্যও রোযা ভাংগা, যে কোনো দিকে মুখ করে নামায পড়া এবং যে কোনো বস্তুর সামনে সাজ্দা করা জায়েয। তবে মনে মনে আল্লাহর সামনে সাজ্দা করার নিয়ত করতে হবে।

দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হলো, হত্যা করা, আহত করা, প্রহার করা, ব্যভিচার করা ও সম্পদ নষ্ট করার জন্য কাউকে বলপ্রয়োগ করা। ইমাম কুরতুবি বলেন: 'আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কাউকে হত্যা করতে যাকে বাধ্য করা হবে, তার জন্য হত্যার কাজে অগ্রসর হওয়া জায়েয নয়, এমনকি চাবুক ইত্যাদি মেরে তাকে অপমান করাও বৈধ নয়। তার উপর যে মুসিবত এসেছে তাতে ধৈর্য ধারণ করবে। অন্যকে হত্যা করে নিজের প্রাণ বাঁচানো হালাল নয়। সে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ্র অনুগ্রহ কামনা করবে।'

বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে অপরাধ করলে তার উপর শরয়ি হদ জারি হবে না: যদি ধরে নেয়া হয় যে, কোনো ব্যক্তিকে ব্যভিচারে বাধ্য করায় সে ব্যভিচার করলো, তবে তার উপর ব্যভিচারের শরিয়ত সম্মত শাস্তি কার্যকর হবে না, চাই সে পুরুষ হোক, বা স্ত্রী। কেননা রসূল সা. বলেন: আমার উম্মাতের ভুলক্রমে কৃত অপরাধ, ভুলক্রমে বাদ পড়া ফরয কাজ এবং বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে করা অবৈধ কাজের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ি, আহমদ, ইসহাক, আবু সাওর, আতা ও যুহরির মতে, কোনো মহিলাকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হলে তাকে মোহরে মিসল দিতে হবে।

◆◆◆

আটষট্টিতম অধ্যায়

পোশাক

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে যে সব নিয়ামতে ভূষিত করেছেন, পোশাক তার মধ্যে অন্যতম।

يٰبَنِيٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

'হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পোশাক দিয়েছি এবং তাকওয়ার পোশাকই সর্বোৎকৃষ্ট। এটা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।' (সূরা আ'রাফ, ২৬)।

পোশাক সুন্দর, সুদর্শন ও পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ্ বলেন:

يٰبَنِيٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ○ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

'হে বনী আদম, প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পোশাক পরিধান করবে। আহার করবে ও পান করবে, কিন্তু অপচয় করবে না। তিনি অপচয়কারিকে পছন্দ করেননা। বল, আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের জন্য যে সব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে নিষিদ্ধ করেছে? বল, পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিন এ সমস্ত তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে। এভাবে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি।' (সূরা আ'রাফ, ৩১-৩২)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: যার অন্তরে কণা পরিমাণও অহংকার রয়েছে, সে বেহেশ্তে প্রবেশ করবেনা। এক ব্যক্তি বললো: মানুষ তো সুন্দর পোশাক ও সুন্দর জুতা পছন্দ করে। রসূলুল্লাহ সা. বললেন: আল্লাহ্ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহংকার হলো, সত্য ও অধিকার অস্বীকার করা এবং মানুষকে অবজ্ঞা করা।' (মুসলিম, তিরমিযি)।

ইমাম তিরমিযি বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: আল্লাহ্ পবিত্র, তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন, তিনি পরিচ্ছন্ন, পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন, তিনি সদাশয়, সদাশয়তাকে পছন্দ করেন, তিনি দানশীল, দানশীলতাকে পছন্দ করেন। তোমরা তোমাদের উঠানগুলো পরিচ্ছন্ন রাখ এবং ইহুদিদের মত হয়োনা।'

পোশাক সম্পর্কে শরিয়তের বিধান: পোশাক তিন প্রকার: ওয়াজিব, মুস্তাহাব ও হারাম।

ওয়াজিব পোশাক: যে পোশাক ছতর ঢাকে, গরম ও শীত থেকে শরীরকে রক্ষা করে এবং ক্ষতি নিবারণ করে, সে পোশাক ওয়াজিব। হাকিম ইবনে হিযামের পিতা বলেন, আমি বললাম: হে রসূলুল্লাহ্! আমাদের ছতরের কতটুকু ঢাকবো এবং কতটুকু ঢাকবোনা? তিনি বললেন: তোমার স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত আর সবার সামনে পুরো ছতর ঢাকবে। আমি বললাম: হে রসূলুল্লাহ্, যখন সবাই এক জায়গায় অবস্থান করে তখন? রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: যদি পার, কাউকেই ছতর দেখতে দেবেনা। আমি বললাম: আমাদের কেউ যদি একাকী থাকি? তিনি বললেন: তাহলে আল্লাহ্কে সবচেয়ে বেশি লজ্জা পাওয়া উচিত।' (আহমদ, আবুদাউদ, ইবনে মাজা, তিরমিযি, হাকেম। তিরমিযি ও হাকেম একে হাসান বলেছেন)।

মুস্তাহাব পোশাক: যে পোশাকে সৌন্দর্য আছে, তা মুস্তাহাব পোশাক। আবুদ দারদা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন ; 'তোমরা তোমাদের ভাইদের সামনে উপস্থিত হয়ে থাক। সুতরাং তোমাদের আবাসস্থল ও তোমাদের পোশাককে সুন্দর পরিচ্ছন্ন কর, যাতে তোমরা জনগণের মধ্যে অভিজাত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পার। (মনে রেখ) আল্লাহ্ অশালীন ও অশালঅনতাকে পছন্দ করেন না।' (আবু দাউদ)।

আবুল আহওয়াসের পিতা বলেন: আমি নিম্নমানের পোশাক পরে রসূলুল্লাহ্ সা. এর কাছে উপস্থিত হলাম। তা দেখে তিনি বললেন: তোমার কি কিছু ধন-সম্পদ আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন: কী ধরনের সম্পদ। আমি বললাম: আল্লাহ্ আমাকে উট, ভেড়া, ঘোড়া ও দাসদাসী দিয়েছেন। তিনি বললেন: তাহলে আল্লাহ যখন তোমাকে ধনসম্পদ দিয়েছেন, তখন তোমার বেশ-ভূষায় আল্লাহ্র নিয়ামতের নিদর্শন ও মর্যাদা প্রকাশ পাওয়া উচিত।' (আবুদাউদ)। বিভিন্ন ইবাদাতের সময়, জুমুয়া, দু ঈদ ও জনসমাবেশের স্থানগুলোতে এর গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়।

মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাব্বান বলেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন ; 'তোমাদের কেউ সমর্থ হলে সে যেন তার পেশাগত কাজে ব্যবহৃত পোশাক ব্যতীত জুমুয়ার দিনের জন্য এক জোড়া পোশাক তৈরি করে।' (আবু দাউদ)।

হারাম পোশাক: হারাম পোশাক হলো পুরুষের জন্য রেশমের পোশাক, স্বর্ণ এবং মহিলাদের জন্য নির্ধারিত পোশাক পুরুষরা পরা, আর মহিলাদের পুরুষদের জন্য নির্ধাররিত পোশাক পরা এবং খ্যাতি, বড়াই ও অপব্যয়মূলক পোশাক পরা।

রেশম পরিধান করা ও তার উপর বসা: হাদিসে স্পষ্টভাবে পুরুষদের জন্য রেশমের কাপড় পরা ও তার উপর বসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ধরনের কয়েকটি হাদিস নিম্নে উল্লেখ করছি:

১. উমর রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'তোমরা রেশম পরিধান করোনা। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশম পরিধান করবে, সে আখিরাতে তা পরিধান করতে পারবেনা।'

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.থেকে বর্ণিত: উমর রা. এক সেট পুরু রেশমের পোশাক বিক্রয় হতে দেখলেন, অত:পর তা নিয়ে রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট এসে বললেন: হে রসূল, এটা কিনুন, এ দ্বারা ঈদের জন্য ও প্রতিনিধিদলগুলোর জন্য সুসজ্জিত হোন। রসূল সা. বললেন: এ পোশাক শুধু তার জন্য, যার পরকালে এটা প্রাপ্য নেই। এরপর উমর রা. এর বেশ কিছু দিন কেটে গেল। সহসা একদিন রসূল সা. তার নিকট রেশমের আরেকটি জুব্বা পাঠালেন'। তখন উমর রা. রসূল সা. এর নিকট এসে বললেন: হে রসূল! আপনি বলেছেন: এটা সে ব্যক্তির পোশাক, যার পরকালে এটা প্রাপ্য নেই। তারপর আবার এটা পাঠিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: ওটা আমি তোমার কাছে তোমার পরিধানের জন্য পাঠাইনি, পাঠিয়েছি যাতে তুমি ওটা বিক্রয় করে নিজের প্রয়োজন মিটাতে পার।' (বুখারি, মুসলিম, নাসায়ি আবুদাউদ, ইবনে মাজা)।

৩. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. আমাদেরকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করতে এবং রেশমের কাপড় পরিধান করতে ও তার উপর বসতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন: ওটা দুনিয়ায় তাদের জন্য (অর্থাৎ আল্লাহ্র অবাধ্যদের জন্য) আর আখিরাতে আমাদের জন্য (বুখারি)।

এ সব হাদিসের আলোকে অধিকাংশ আলেমের মত হলো, রেশম পরা ও বিছানো হারাম। মাহ্দী 'বাহ্রে' উল্লেখ করেছেন যে, এটা সর্বসম্মত মত।

তবে কাযী ইয়ায বলেন: ইবনে উলিয়াসহ কিছু সংখ্যক আলেমের মতে এটা জায়েয। তারা নিম্নোক্ত হাদিসসমূহ দ্বারা তাদের মতের স্বপক্ষে প্রমাণ দর্শান:

১. উক্বা রা. বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. কে পেছন থেকে খোলা রেশমের কুবা (জামা) হাদিয়া পাঠানো হয়েছিল এবং তিনি তা পরেছিলেন, তা পরে নামাযও পড়েছিলেন, তারপর তা এমন প্রবল জোরে খুলে ফেললেন, যেন ওটা তিনি অপছন্দ করেছেন। তারপর বললেন: মুত্তাকীদের জন্য এটা শোভন নয়। (বুখারি ও মুসলিম)।

২. মিস্ওয়ার ইবনে মাখরামা সূত্রে বর্ণিত: রসূল সা. এর নিকট হাদিয়া হিসাবে কিছু কুবা এলো। তখন মিস্ওয়ার ও তার পিতা তা থেকে কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে রসূল সা. এর নিকট গেলেন। রসূল সা. তখন একটা রেশমি কুবা পরে বের হয়ে বললেন: হে মাখ্রামা, এটা আমি তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছি। তারপর তিনি কুবাটির কারুকার্য দেখাতে লাগলেন। তারপর বললেন: মাখরামা কি সন্তুষ্ট হয়েছে?

৩. আনাস রা. সূত্রে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ্ সা. অত্যন্ত উঁচুমানের একটা রেশমি পোশাক পরলেন, যা রোম সম্রাট তাকে উপঢৌকন স্বরূপ দিয়েছিলেন। পরে সেটি তিনি জাফরকে পাঠালেন। জাফর সেটি পরে রসূলুল্লাহ্র সা. কাছে এলে তিনি বললেন: তোমাকে আমি ওটা এজন্য দেইনি যে, তুমি ওটা পরবে। জাফর বললেন: তাহলে আমি কী করবো? তিনি বললেন: ওটা তোমার ভাই নাজাশীর নিকট পাঠিয়ে দাও। (আবু দাউদ)।

৪. বিশজনের বেশি সাহাবি রেশম পরিধান করেছেন। তাদের মধ্যে আনাস রা. ও বারা ইবনে আযিব অন্যতম। (আবু দাউদ)।

ইমাম আবু হানিফা, মালেকি ফকিহ্ ইবনে মাজেশূন ও কিছু সংখ্যক শাফেয়ি ফকিহ্ রেশমীবস্ত্র বিছানো ও তার উপর বসা জায়েয মনে করেন। তারা বলেন: রেশমীবস্ত্র শুধু পরিধান করাই নিষিদ্ধ। কিন্তু এ মত সহীহ হাদিসের পরিপন্থী।

যে সব সংখ্যাগুরু আলেম রেশম পুরুষের জন্য হারাম মনে করেন তারা এটাকে যারা বৈধ মনে করেন তাদের জবাবে নিষেধাজ্ঞা সংবলিত হাদিসগুলো তুলে ধরে বলেন:

উকবা বর্ণিত হাদিসেও তো রসূল সা. এর এ উক্তি রয়েছে যে, এটা মুত্তাকীদের জন্য শোভন নয়। বস্তুত মুত্তাকীদের জন্য যা শোভন নয় তা নিষিদ্ধ হওয়াই ভাল। আর মিস্ওয়ার ও আনাসের হাদিসে দেখানো হয়েছে রসূলুল্লাহ্ সা. এর কাজ যা তার নিষেধাজ্ঞা সংবলিত কথাকে রদ করতে পারে না। তবে এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ নেই যে, রসূলুল্লাহ্ সা. রেশম পরতেন, তারপর সবশেষে তা নিষিদ্ধ হয়। জাবির রা. বলেন: রসূল সা. তার কাছে উপহার হিসাবে পাঠানো একটা কুবা পরলেন, তারপর তা অনতিবিলম্বে খুলে ফেললেন এবং উমর ইবনুল খাত্তাবের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তখন বলা হলো: হে রসূলুল্লাহ্, আপনি এটি খুলে ফেললেন। রসূল সা. বললেন: জিব্রীল আ. আমাকে নিষেধ করেছেন। পরক্ষণে উমর রা. তার কাছে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তিনি বললেন: হে রসূল, আপনি একটা জিনিস অপছন্দ করলেন, আবার সেটা আমাকে দিলেন। এখন আমি কী করবো? রসূল সা. বললেন: তোমাকে পরার জন্য দেইনি। দিয়েছি তুমি ওটা বিক্রয় করবে সে জন্য। পরে তিনি দু'হাজার দিরহামে তা বিক্রয় করলেন।

শওকানির অভিমত: ইমাম শওকানি বলেন: নিষেধাজ্ঞা ও বৈধতা সংবলিত হাদিসগুলো একত্র করলে মনে হয়, নিষেধাজ্ঞা সংবলিত হাদিসগুলো রেশমীবস্ত্র পরিধান করাকে মাকরূহ প্রমাণ করে। তিনি 'নাইলুল আওতার' গ্রন্থে বলেন: 'রসূল সা. কর্তৃক নিজে রেশম পরিধান ও তা সাহাবিদেরকে বিতরণ নিষেধাজ্ঞা সংলিত হাদিসগুলোর আগে না পরে সংঘটিত হয়েছে, তার কোনো প্রমাণ নেই। এ থেকে বুঝা

যায়, উক্ত হাদিসগুলোতে নিষেধাজ্ঞা অর্থ মাকরূহ। এটা উভয় প্রকারের হাদিসের সমন্বয়ের ফল। এ মতটি আরো শক্তিশালী হয় এ উক্তি দ্বারা যে, বিশজন সাহাবি রেশম পরেছেন। শরিয়তে যা হারাম, তা উক্ত সাহাবিদের পক্ষে করা সুদূর পরাহত ব্যাপার। আবার এটাও সুদূর পরাহত যে, এটাকে হারাম জেনেও অন্য সাহাবিগণ উক্ত বিশজনের কাজে নীরব থেকেছেন। কেননা এর চেয়েও ক্ষুদ্র ব্যাপারে তারা একে অপরের কাজের সমালোচনা করতেন।'

রেশম পরা মহিলাদের জন্য বৈধ: রেশম পরা হারাম বা মাকরূহ যাই হোক, এটা শুধু পুরুষেদের জন্য। মহিলাদের জন্য তা পরা ও বিছানো সম্পূর্ণ হালাল। অনুরূপ ওযর থাকলে পুরুষদের জন্যও হালাল। এ ব্যাপারে নিম্নের হাদিসসমূহ লক্ষণীয়:

১. আলি রা. বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট একটা রেশমের পোশাক উপহার হিসাবে পাঠানো হলো। পরে তিনি সেটি আমার নিকট পাঠালেন। আমি সেটি পরলাম। এতে তাঁর চেহারায় অসন্তোষের চিহ্ন দেখতে পেলাম। তিনি বললেন: ওটা তোমার নিকট এ জন্য পাঠাইনি যে, তুমি পরবে। বরং এটি তোমার জন্য এ জন্য পাঠায়েছি যে, তুমি ওটা টুকরো টুকরো করে ওড়না বানিয়ে মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করবে।' (বুখারি, মুসলিম)।

২. আনাস রা. সূত্রে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ্ সা. আব্দুর রহমান ইবনে আওফ ও যুবাইরকে তাদের চর্মরোগের কারণে রেশমের পোশাক পরার অনুমতি দিয়েছিলেন। 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' গ্রন্থে বলা হয়েছে: রসূলুল্লাহ্ সা. তাদেরকে বিলাসিতা করার উদ্দেশ্যে নয়, তাদের রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে এ অনুমতি দিয়েছিলেন।

৩. উমর রা. থেকে বর্ণিত: দু'আংগুল, তিন আংগুল বা চার আংগুল স্থান ব্যতীত রেশম পরিধান রসূল সা. নিষেধ করেছেন। (বুখারি ও মুসলিম)।

মিশ্র রেশম পরিধান করা: ইতিপূর্বে যা কিছু বলা হয়েছে, তা অবিমিশ্র রেশম সংক্রান্ত। মিশ্র রেশম সম্পর্কে শাফেয়িদের মত এই যে, রেশমের পরিমাণ বেশি থাকলে হারাম, অর্ধেক বা তার কম হলে হারাম নয়। ইমাম নববী বলেন: মিশ্র রেশম হারাম নয়। তবে রেশমের ওজন বেশি হলে হারাম।

শিশুদের রেশম পরা বৈধ: পুরুষ শিশুদের জন্যও রেশম পরা অধিকাংশ ফকিহের মতে হারাম। কারণ এর নিষেধাজ্ঞায় সেও অন্তর্ভুক্ত। তবে ইমাম শাফেয়ি শিশুদের জন্য বৈধ মনে করেন। নিষেধাজ্ঞাটি অভিভাবকদের জন্য, শিশুদের জন্য নয়। কারণ তারা শরিয়ত পালনে দায়বদ্ধ নয়। ইমাম নববী বলেন: ঈদের দিন তাদেরকে অলংকার ও রেশম পরানো জায়েয। বছরের অন্য সময়েও কারো মতে জায়েয, কারো মতে হারাম, কারো মতে ন্যায় অন্যায় বুঝতে শেখার পর হারাম। তবে বিশুদ্ধতর মত হলো, বছরের অন্যান্য সময়েও জায়েয।

সোনা-রূপার আংটি পরা: অধিকাংশ আলেমের মতে সোনার আংটি পরা শুধু পুরুষদের জন্য হারাম, মহিলাদের জন্য নয়। (সোনা ব্যতীত যে কোনো ধাতুর তৈরি আংটি নারী-পুরুষ সবার জন্য বৈধ, চাই তা সোনার চেয়েও মূল্যবান হোক না কেন।) এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদিসসমূহ থেকে প্রমাণ দর্শানো হয়:

১. বারা ইবনে আযিব রা. বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. আমাদেরকে সাতটি কাজের আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ থেকে নিষেধ করেছেন: আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন মৃত ব্যক্তির সাথে (কবর পর্যন্ত) যাওয়ার, রোগীকে দেখতে যাওয়ার, দাওয়াত গ্রহণ করার, অত্যাচারিতকে সাহায্য করার, শপথ পূর্ণ করার এবং সালামের জবাব দেয়ার, অন্য বর্ণনা অনুসারে, সালাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার এবং হাঁচিদাতাকে ইয়ারহামুকাল্লাহু (يَرْحَمُكَ اللّٰهُ) আল্লাহ্ তোমার উপর রহম করুন বলে দোয়া করার। আর নিষেধ করেছেন রূপার পাত্র, সোনার আংটি, রেশমি কাপড়, রেশমি ঝালরযুক্ত কাপড়, রেশম মিশ্রিত তুলার কাপড়, মোটা রেশম, এবং ঘোড়ার পিঠে রেশমের লাল ঢাকনা ব্যবহার করতে।

২. আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ সা. সোনা দ্বারা একটা আংটি তৈরি করালেন এবং তার পাথরে খোদাই করলেন 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'। তখন অন্যরাও সে রকম আংটি তৈরি করালো। এটা দেখে তিনি নিজের আংটিটা ফেলে দিয়ে বললেন: আমি আর কখনো এটা পরবোনা। তারপর তিনি একটা রূপার আংটি তৈরি করালেন। অত:পর লোকেরা রূপার আংটি ব্যবহার করতে লাগলো। ইবনে উমর রা.

বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. এরপর ঐ আংটি আবু বকর, উমর ও উসমান রা. পরেছেন। শেষ পর্যন্ত সেটি মসজিদে কুবার পার্শ্ববর্তী আরিসের কুয়ায় উসমান রা. এর হাত থেকে পড়ে যায়।

৩. রসূল সা. এক ব্যক্তির হাতে একটি সোনার আংটি দেখে তা খুলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন: তোমাদের কেউ কেউ আগুনের টুকরো আনতে এগিয়ে যাও, অত:পর তা নিজের হাতে স্থাপন করে। রসূল সা. চলে যাওয়ার পর লোকটিকে বলা হলো: তোমার আংটিটা কুড়িয়ে নাও এবং তা দ্বারা উপকৃত হও। সে বললো: না, আল্লাহ্‌র কসম, রসূল সা. যা ছুড়ে ফেলেছেন, তা আমি আর নেবনা।' (মুসলিম)।

৪. আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: আমার উম্মাতের নারীদের জন্য সোনা ও রেশম হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে। (আহমদ, নাসায়ি ও তিরমিযি। মুহাদ্দিসগণ বলেন: হাদিসটি সনদের দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ)।

৫. ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, আলি রা. বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. আমাকে সোনার আংটি পরতে, রেশম মিশ্রিত কাপড় পরতে, রুকু ও সাজদায় কুরআন পাঠ করতে এবং লাল কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। অধিকাংশ সাহাবি, তাবেইন, ও ফকিহ্ লাল কাপড় পরা বৈধ মনে করেন। কিন্তু ইমাম আহমদ মাকরূহ্ তান্‌যিহি মনে করেন।

এগুলি হচ্ছে সোনার আংটি পরা নিষিদ্ধ সংক্রান্ত অধিকাংশ আলিমের অভিমতের প্রমাণ। ইমাম নববি বলেন: কিছু অংশ সোনার ও কিছু অংশ রূপার তৈরি হলেও একই বিধি প্রযোজ্য। কোনো কোনো আলেম পুরুষদের জন্য সোনার আংটি পরা মাকরূহ তানযিহি মনে করেন। কিছু সংখ্যক সাহাবি সোনার আংটি পরেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্, সুহাইব, হুযায়ফা, জাবির ইবনে সামুরা, ও বারা ইবনে আযিব। সম্ভবত তারা রসূল সা. এর নিষেধাজ্ঞাকে মাকরূহ্ তান্‌যিহি মনে করেছেন।

উনসত্তরতম অধ্যায়

সোনা ও রূপার পাত্র

পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই সোনা ও রূপার পাত্রে খাওয়া ও পান করা হারাম। মহিলাদের জন্য সোনা ও রূপার অলংকার কেবল শোভা ও সৌন্দর্যের জন্য ব্যবহার করা বৈধ। সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহার করা আল্লাহ্ তাদের জন্য হালাল করেননি। নিম্নোক্ত হাদিসসমূহ এর প্রমাণ:

১. বুখারি ও মুসলিম হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'তোমরা হাল্‌কা রেশম ও পুরু রেশম, কোনোটাই পরিধান করোনা। সোনা ও রূপার পাত্রে পান করোনা ও খাবেনা। কারণ এগুলো কাফিরদের জন্য দুনিয়ার জীবনে এবং তোমাদের জন্য আখিরাতে।'

২. বুখারি ও মুসলিম উম্মে সাল্‌মা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে তার পেটে কেবল জাহান্নামের আগুনই ঢুকায়।' মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে: 'যে ব্যক্তি সোনা বা রূপার পাত্রে খায় বা পান করে......' কোনো কোনো ফকিহ্ এটাকে হারাম নয়, মাক্‌রূহ মনে করে বলেন: এ ব্যাপারে যে সব হাদিস এসেছে, তা কেবল বিলাসিতা পরিহার করানোর জন্যই এসেছে। কিন্তু উম্মে সালমা বর্ণিত উপরোক্ত হাদিসে যে কঠোর ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, তা এই ফকিহদের মতকে খণ্ডন করে। কিছু সংখ্যক ফকিহ্ পানাহারের ন্যায় সোনা ও রূপার পাত্রে সুঘ্রাণযুক্ত জিনিস ও সুর্মা ব্যবহার করাও হারাম বা মাক্‌রূহ মনে করেন। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ফকিহ্গণ এর সাথে একমত হননি। আহমদ ও আবু দাউদের হাদিসে রয়েছে: 'তোমরা রূপা দিয়ে নিজেদের মনোরঞ্জন কর।' এটা উক্ত সূক্ষ্মদর্শী ফকিহ্দের মতকেই সমর্থন করে।

'ফাতহুল আল্লাম' গ্রন্থে বলা হয়েছে: 'প্রকৃত ব্যাপার হলো, পানাহার ব্যতীত অন্য কিছু হারাম নয়। এ বিষয়ে ইজ্‌মার যে দাবি করা হয়ে থাকে তা সঠিক নয়। এটা আসলে রসূল সা. এর ভাষা পরিবর্তনের

কুফল। কেননা তিনি পানাহার নিষিদ্ধ করার কথা বলেছেন, কিন্তু লোকেরা এটা পরিবর্তন করে 'ব্যবহার' শব্দটি প্রয়োগ করেছে। এভাবে রসূল সা. এর শব্দ বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া শব্দ তদস্থলে বসিয়েছে।'

অধিকাংশ ফকিহ্ ব্যবহার না করে শুধু সোনা ও রূপা দিয়ে বিভিন্ন পাত্র বানানোও নিষিদ্ধ মনে করেন। কিন্তু একদল ফকিহ এটা বৈধ মনে করেন।

সোনাও রূপা ব্যতীত অন্যান্য ধাতুর পাত্র: অন্যান্য মূল্যবান পদার্থের পাত্র তৈরি করা বৈধ, চাই তা সোনা ও রূপার চেয়ে বেশি দামেরই হোক না কেন। কেননা যে কোনো জিনিসের মূল অবস্থা হলো হালাল থাকা, যতোক্ষণ তা হারাম হওয়ার প্রমাণ পাওয়া না যায়। সোনা রূপা ব্যতীত অন্য কোনো ধাতু বা পদার্থ হারাম হওয়ার প্রমাণ নেই।

দাঁত ও নাক সোনা দিয়ে বানানো: প্রয়োজন হলে দাঁত ও নাক সোনা দিয়ে বানানো জায়েয। আরফাজা ইবনে আস্য়াদ সূত্রে তিরমিযি বর্ণনা করেন: 'কুলাবের ঘটনায় আমার নাক আহত হয়। আমি রূপা দিয়ে নাক বানালাম। কিন্তু তাতে আমার নাক ফুলে গেল। তখন রসূলুল্লাহ্ সা. আমাকে সোনার একটি নাক বানিয়ে নেয়ার আদেশ দিলেন।'

ইমাম তিরমিযি বলেন: একাধিক আলেম তাঁদের দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধিয়েছেন বলে জানা গেছে। নাসায়ি বর্ণনা করেন: কিছু সংখ্যক আনসার ও মোহাজির দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় মুয়াবিয়া রা. বললেন: রসূলুল্লাহ্ সা. যে রেশম পরিধান করতে নিষেধ করেছেন তা আপনারা জানেন তো? তাঁরা বললেন: জি, হাঁ। তিনি যে ছোট ছোট টুকরো আকারে ব্যতীত সোনা ব্যবহার করতেও নিষেধ করেছেন, তা জানেন? তারা বললেন: জি, হাঁ।

পুরুষদের সাথে মহিলাদের সাদৃশ্য: ইসলাম চায়, মহিলারা স্বতন্ত্র স্বভাব প্রকৃতি নিয়ে থাকুক এবং তাদের বেশভূষায় এই স্বতন্ত্র স্বভাব প্রকৃতির প্রতিফলন ঘটুক। ইসলাম পুরুষের জন্যও তাই চায়। তাই উভয়কে পরস্পরের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে নিষেধ করেছে এবং এটা হারাম ঘোষণা করেছে, চাই এ সাদৃশ্য পোশাকে হোক বা কথায় হোক, চালচলনে হোক বা অন্য কিছুতে হোক। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ সা. অভিসম্পাত দিয়েছেন সেই পুরুষকে যারা মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে এবং সেই সব মহিলাকে যারা পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে।' (বুখারি)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. নারী সদৃশ পোশাক পরিধানকারী পুরুষ ও পুরুষ সদৃশ পোশাক পরিধানকারী নারীকে অভিশাপ দিয়েছেন।' (আবুদাউদ, নাসায়ি, ইবনে মাজা)

খ্যাতি ছড়ানোর পোশাক: যে পোশাক মানুষকে অন্যান্য মানুষের চেয়ে বিখ্যাত করে তা হারাম।

১. ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি দুনিয়ায় খ্যাতির পোশাক পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছনাকর পোশাক পরাবেন।'
২. ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে পোশাক মাটিতে গড়িয়ে চলে, আল্লাহ্ তার দিকে তাকাবেননা।' (বুখারি, মুসলিম)
৩. আমর ইবনে শুয়াইব বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন:
'খাও, পান কর, পোশাক পর ও দান করো, অপচয় ও অহংকার করোনা।' (আবুদাউদ, আহমদ, বুখারি)

এক মহিলার চুলের সাথে অন্য মহিলার চুল যুক্ত করা বা পরচুলা লাগানো

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত: জনৈকা মহিলা রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট এল এবং বললো: হে রসূলুল্লাহ, আমার একটা সদ্য বিবাহিতা মেয়ে আছে। হামরোগের কারণে তার চুল ঝরে গেছে। আমি কি তার চুলকে অন্য চুলের সাথে যুক্ত করতে পারি? রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: যে মহিলা কারো মাথায় পরচুলা লাগায় এবং যে মহিলা নিজের মাথায় পরচুল গ্রহণ করে, যে মহিলা অপরের শরীরে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যারা উলকি উৎকীর্ণ করায়, তাদের উপর অভিসম্পাত।'

২. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. অভিসম্পাত করেছেন সেই সব নারীর উপর, যারা শরীরে উলকি উৎকীর্ণ করে, যারা উলকি উৎকীর্ণ করায়, যারা কপালের উপরিভাগের চুল

উপড়ে ফেলে, যারা সৌন্দর্যের জন্য ধাতব জিনিস দিয়ে দাঁত ঘষে দাঁত সরু করে বা দাঁতের মাঝে ধাতব পাত ঢুকিয়ে ফাঁক বড় করে এবং বিভিন্ন উপায়ে আল্লাহ্র সৃষ্টিকে বিকৃত করে।'

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্উদের রা. এ উক্তি বনু উসাইদের উম্মে ইয়াকুব নাম্নী জনৈকা কুরআন পাঠে অভ্যস্তা মহিলা শুনতে পেয়ে তার কাছে এসে তাকে এ সম্পর্কে কিছু বললো। আবদুল্লাহ্ বললেন: আল্লাহ্র রসূল যাকে অভিসম্পাত করেছেন, তাকে আমি অভিসম্পাত করবোনা কেন? এটা তো কুরআনেও রয়েছে। মহিলা বললো: আমি তো কুরআন পড়েছি। তাতে কোথাও এটা পাইনি। তিনি বললেন: আপনি যদি পড়তেন (মনোযোগ দিয়ে) তাহলে অবশ্যই পেতেন।

আল্লাহ্ বলেছেন: وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

'রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।' (সূরা হাশর, ৭) হাদিসটি তিরমিযি ব্যতীত অবশিষ্ট পাঁচটি সহিহ হাদিসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

৩. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্উদ রা. থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ্ সা. রোগের কারণ ব্যতীত মুখমণ্ডল থেকে চুল তোলা, দাঁত ঘষে পাতলা ও ধারালো করা, পরচুলা লাগানো ও উল্কি দেয়া নিষিদ্ধ করেছেন।

'নাইলুল আওতা'র গ্রন্থে বলা হয়েছে: অভিসম্পাত দেয়া থেকে প্রমাণিত হয়, পরচুলা লাগানো হারাম। কেননা হারাম নয় এমন কোনো কাজে অভিসম্পাত উচ্চারিত হয়না। ইমাম নববী বলেন: এই মতটিই ব্যাপকভাবে গৃহীত। তবে এ ব্যাপারে কিছু বিবরণ রয়েছে। আলেমদের একটি গোষ্ঠী বলেন: পরচুলা যদি মানুষের চুল দিয়ে করা হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তা হারাম, চাই তা পুরুষের চুল হোক বা স্ত্রীর চুল হোক, স্বামী, মুহাররম ও অন্য কারো চুল হোক, তাতে কিছু আসে যায়না। কেননা মানুষের চুল ও তার দেহের প্রতিটি জিনিসই সমমান বিধায় তা ব্যবহার করা হারাম। বরঞ্চ মানুষের চুল, নখ ও অন্য সব অংশ মাটিতে পুঁতে রাখতে হয়। আর যদি পরচুলা মানুষ ব্যতীত অন্য কোনো প্রাণীর হয়, তাহলে দেখতে হবে তা কোনো নাপাক চুল অর্থাৎ জীবন্ত অবস্থায় শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এমন, নাকি মৃত প্রাণীর বা যে প্রাণীর গোশ্ত হারাম সে প্রাণীর চুল কিনা। যদি তাই হয় তবে হাদিস অনুযায়ী তাও হারাম। কেননা সে ইচ্ছাকৃত ভাবে নামাযে ও নামায ছাড়া অন্যান্য সময়ে নাপাকী নিজের সাথে রাখবে। উভয় ক্ষেত্রে নারী বা পুরুষ বিবাহিত বা অবিবাহিত যা-ই হোক, উভয়ই সমান। পক্ষান্তরে মানুষ ব্যতীত অন্য প্রাণীর পবিত্র চুল বহনকারীণীর যদি স্বামী বা মনিব না থেকে থাকে, তাহলে সেটাও হারাম। আর যদি স্বামী বা মনিব থেকে থাকে তাহলে তিনটি মত রয়েছে: প্রথমত হাদিসের শাব্দিক অর্থের আলোকে নাজায়েয। দ্বিতীয়ত জায়েয। তৃতীয়ত বিশুদ্ধতম মত হলো, স্বামী বা মনিবের অনুমতিক্রমে পরচুলা গ্রহণ করলে জায়েয, নচেত হারাম।' মানুষের চুল ব্যতীত অন্য কিছু যেমন রেশম, পশম ইত্যাদি দিয়ে পরচুলা বানালে সাইদ ইবনে জুবাইর, আহমদ ও লাইসের মতে জায়েয।

কাযী ইয়ায বলেন: রঙ্গিন রেশমের সুতো ইত্যাদি, যার চুলের সাথে সাদৃশ্য নেই, নিষিদ্ধ নয়। কেননা এটা পরচুলার পর্যায়ভুক্ত নয়। বরং এটা মামুলি সৌন্দর্য চর্চার পর্যায়ে পড়ে।

পরচুলা লাগানো যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি নারীর মুখমণ্ডল থেকে চুল উপড়ে ফেলাও নিষিদ্ধ। অবশ্য কারো যদি চুল-দাড়ি গজায়, তবে তা উপড়ানো না জায়েয তো নয়ই, বরং মুস্তাহাব। এটা ইমাম নববীর অভিমত। দাঁত ঘষে চিকন করা বা দাঁতের মাঝে কৃত্রিমভাবে ফাঁক সৃষ্টি করা বা বড় করা যে করে ও যে করায় উভয়ের জন্য হারাম।

'নাইলুল আওতরা' গ্রন্থে বলা হয়েছে : এ কাজটি যদি শুধু সৌন্দর্য ও শোভা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে করা হয় তাহলেই হারাম, রোগ নিরাময়ের জন্য করা হলে হারাম নয়। হাদিসে 'আল্লাহ্র সৃষ্টিকে বিকৃত করার কথা' বলা হয়েছে। আল্লাহ্র সৃষ্টি করা শরীরের অংগ বা অংশ যেভাবে আছে, তা থেকে পরিবর্তন করাই বিকৃত করা এবং এটাই নাজায়েয। আবু জাফর তাবারি বলেন:

এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ্ নারীকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন তাতে কোনো প্রকারের পরিবর্তন করা, চাই তা কমিয়ে বা বাড়িয়ে যেভাবেই করা হোক এবং চাই তা স্বামীর জন্য বা অন্য কারো জন্য

সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে করা হোক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে করা হোক, অবৈধ। যেমন তার যদি একটা দাঁত বা অন্য কোনো অংগ বেশি থাকে তবে তা কেটে ফেলা বা উপড়ে ফেলা জায়েয নয়। কেননা সেটা হবে আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করার শামিল। অনুরূপ কারো দাঁত যদি বেশি লম্বা হয় এবং তার প্রান্ত কেটে সমান করা হয় তবে তাও জায়েয হবেনা। কাযী ইয়ায বলেন: এই বাড়তি অংশ যদি কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকর হয় তাহলে তা কাটকাটি করাতে দোষ নেই।

সত্তরতম অধ্যায়

ছবি

ছবি তোলা ও মূর্তি বানানো: বহু সংখ্যক সহিহ হাদিসে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রাণীর ছবি তোলা ও মূর্তি বানানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে, চাই তা মানুষ, পশু বা পাখি হোক। যে সব জিনিসের প্রাণ নেই যেমন গাছ, ফুল ইত্যাদি, সে সব জিনিসের ছবি তোলা বৈধ।

১. ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেন:

যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোনো ছবি বানাবে, কেয়ামতের দিন তাকে ঐ ছবিতে প্রাণ সঞ্চার করতে বলা হবে। অথচ সে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবেনা। (বুখারি)।

২. রসূলু সা. বলেন: যারা ছবি তৈরি করে, কেয়ামতের দিন তারা হবে কঠিনতম শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

৩. ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন: এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস রা. এর নিকট এসে বললো: আমি এ সব ছবি তৈরি করি এবং এগুলোর প্রতি আমি আসক্ত। ইব্‌নে আব্বাস তাকে বললেন: 'আমার কাছে এসো।' সে কাছে এলো। তারপর তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো এবং আরো কাছে এলো। তখন তিনি তার মাথায় হাত রেখে বললেন: 'আমি যা শুনেছি, তা তোমাকে জানাচ্ছি। আমি রসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি: 'প্রত্যেক চিত্রকর জাহান্নামে যাবে। সে যে সব চিত্র তৈরি করেছে, তার প্রত্যেক চিত্রের পরিবর্তে তার জন্য একটা করে প্রাণী সৃষ্টি করা হবে এবং প্রত্যেকটা প্রাণী তাকে আযাব দেবে।' তারপর তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন: 'ছবি যদি তৈরি করতেই চাও তবে গাছ ও যে সব জিনিসের প্রাণ নেই, সে সব জিনিসের চিত্র তৈরি কর।'

৪. আলি রা. বলেন: রসূলুল্লাহ সা. একটি জানাযার নামাযে ছিলেন। তারপর বললেন: তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে মদিনায় যাবে এবং সেখানে যত মূর্তি রয়েছে সব ভেঙ্গে ফেলবে, যতো কবর আছে, সমান করে দেবে এবং যতো ছবি আছে, তা নষ্ট করে ফেলবে। এক ব্যক্তি বললো: হে রসূলুল্লাহ, আমি প্রস্তুত। অত:পর বললো: হে রসূলুল্লাহ, আমি প্রতিটি ছবি নষ্ট করে এসেছি। অত:পর রসূলুল্লাহ সা. বললেন: যে ব্যক্তি এ ক'টি জিনিসের একটিও পুনরায় তৈরি করবে সে মুহাম্মদ সা. এর উপর যা কিছু নাযিল হয়েছে তার উপর কুফরি করবে। (আহমদ)।

শিশুদের খেলাধুলার পুতুল বৈধ: শিশুদের খেলাধুলা, বিয়ের উৎসব ইত্যাদির ছবি বা পুতুল এর ব্যতিক্রম। এ সব পুতুল বা ছবি তৈরি করা ও বিক্রয় করা জায়েয। এর প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদিসসমূহ:

১. আয়েশা রা বলেন: আমি কিছু সংখ্যক কিশোরীর সাথে খেলা করতাম। তারা থাকা অবস্থায় কখনো কখনো রসূলুল্লাহ সা. বাড়িতে ঢুকে পড়তেন। তিনি ঘরে ঢুকলেই তারা বেরিয়ে যেত। আর তিনি বেরিয়ে গেলেই তারা প্রবেশ করতো। (বুখারি, আবু দাউদ)।

২. আয়েশা রা. আরো বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. খয়বর বা তবুক থেকে ফিরে আয়েশার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন আয়েশার র‍্যাকে একটা পর্দা ছিলো। সহসা বাতাস এসে আয়েশার খেলার সাথী কিশোরীদের পুতুল উন্মোচন করলো। রসূলুল্লাহ সা. বললেন: হে আয়েশা, এগুলো কী? আয়েশা বললেন: আমার (খেলার) মেয়েরা। তাদের মাঝে একটা ঘোড়া দেখলেন, যার চামড়ার তৈরি পাখা রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: ওদের মাঝে এটা কী দেখছি? আয়েশা রা. বললেন: একটা ঘোড়া। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: ওর উপর ওটা

কী? আয়েশা রা. বললেন: দুটো পাখা। রসূল সা. বললেন: ঘোড়ার আবার পাখা? আয়েশা রা. বললেন: কেন, শোনেননি, সুলায়মান আ. এর ঘোড়ার পাখা ছিলো? আয়েশা রা. বললেন: এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ্ সা. এমনভাবে হেসে দিলেন যে, তার মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ পেলো।' (আবুদাউদ, নাসায়ি)।

বাড়িতে ছবি বা মূর্তি রাখা নিষেধ: মূর্তি বা ভাস্কর্য তৈরি করা যেমন হারাম, তেমনি তা বাড়ি-ঘরে রাখাও নিষেধ। মূর্তি বা ছবিকে এমনভাবে ভেঙ্গে রাখা উচিত, যাতে তার মূল আকৃতি বহাল না থাকে।

১. ইমাম বুখারি বর্ণনা করেছেন: রসল সা. তার ঘরে কোনো ক্রুশের ছবি রাখতেন না।

২. বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেন, রসূল সা. বলেন: যে বাড়িতে ছবি বা মূর্তি আছে, সে বাড়িতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

যে সকল ছবির ছায়া নেই: এতোক্ষণ যা কিছু আলোচিত হলো, তা সে সব ছবি-মূর্তি সংক্রান্ত, যার দেহ ও ছায়া আছে। কিন্তু যে সকল ছবির কোনো ছায়া নেই, যেমন দেয়ালে ও কাগজে অংকিত নকশা এবং কাপড়ে, পর্দায় ও ফটোতে যে ছবি থাকে তার সবই জায়েয। প্রথম দিকে এগুলিও নিষিদ্ধ ছিল, পরে তার অনুমতি দেয়া হয়। এগুলো যে প্রথম নিষিদ্ধ ছিলো, তা আয়েশা রা. কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিস থেকে জানা যায়:

'রসূলুল্লাহ্ সা. (একদিন) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন আমার একটা তাক একটা পাতলা পর্দা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম, যাতে কিছু ছবি ছিলো। তিনি এগুলো দেখে তার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করলেন এবং তার মুখের রং পাল্টে গেল। তিনি বললেন: হে আয়েশা, যারা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য অবলম্বনের চেষ্টা করে, কেয়ামতের দিন তাদের উপর সবচেয়ে বেশি আযাব হবে।' আয়েশা রা. বলেন: এ কথা শুনে আমি পর্দাটা কেটে ফেললাম এবং তা দিয়ে কয়েকটা বালিশ বানালাম। আর নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারা এটা বৈধ প্রমাণিত হয়:

১. আবু তাল্‌হা বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: যে ঘরবাড়িতে ছবি থাকে তাতে ফেরেশতারা প্রবেশ করেনা। পরে যায়েদ ইবনে খালেদের অসুখ হলে আমরা দেখতে গেলাম। দেখলাম, তার দরজার উপর ছবি আঁকা পর্দা ঝুলছে। তখন রসূলুল্লাহ্ সা. এর স্ত্রী মাইমুনার পালিত পুত্র উবায়দুল্লাহকে বললাম: যায়েদ না আমাদেরকে আগের দিন ছবি সম্পর্কে বলছিল? উবায়দুল্লাহ বললো: আপনি কি শোনেননি, যায়েদ বলেছিল: কাপড়ের নকশা এর ব্যতিক্রম? (পাঁচটি সহিহ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত)।

২. আয়েশা রা. বলেন: 'আমাদের একটা পর্দা ছিলো, তাতে একটা পাখির ছবি ছিলো। কেউ ঘরে ঢুকতে গেলেই সেটি তার সামনে পড়তো। তাই রসূলুল্লাহ সা. বললেন: ওটা উল্টে দাও। কারণ আমি যখনই ঘরে প্রবেশ করতে গিয়ে ওটা দেখি, অমনি দুনিয়ার কথা আমার মনে পড়ে যায়।' (মুসলিম)।

এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, এটা হারাম নয়। যদি হারাম হতো, তা হলে তা নষ্ট করে ফেলার আদেশ দিতেন এবং শুধু উল্টিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না। তাছাড়া তিনি উল্লেখ করেছেন যে, পর্দাটা উল্টিয়ে দেয়ার কারণ হলো, ওটা দুনিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হানাফি ইমামদের মধ্য থেকে তাহাবী এই মত সমর্থন করে বলেন: 'শরিয়ত প্রথমে সব রকমের প্রতিকৃতি নিষিদ্ধ করেছে, এমনকি তা যদি নক্‌শামাত্র হয় তবুও। কেননা মুসলমানরা স্বল্পকাল আগেই মূর্তিপূজা থেকে উদ্ধার পেয়েছে। তারপর এই নিষেধাজ্ঞা যখন পালিত হলো, তখন একান্ত প্রয়োজনে কাপড়ের নকশা হিসাবে স্বল্প মাত্রায় অনুমোদন করা হয়েছে। কেননা স্বল্পমাত্রার ছবি অজ্ঞ লোকের জন্যও নিরাপদ। তবে অধিক মাত্রায় ছবির উপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখা হয়েছে।'

ইবনে হায্‌ম বলেন: অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের জন্য পুতুল ও ছবি নিয়ে খেলা জায়েয আছে, অন্য কারো জন্য নয়। এ ছাড়াও কাপড়ের নকশা ছাড়া আর সমস্ত ছবি ও প্রতিকৃতি হারাম। এরপর ইবনে হায্‌ম আবু তাল্‌হার হাদিস উল্লেখ করেছেন।

❖❖❖

একাত্তরতম অধ্যায়

প্রতিযোগিতা

প্রতিযোগিতা বৈধ এবং প্রশংসনীয় ব্যায়াম। নিয়ত ও উদ্দেশ্য অনুসারে এটা কখনো মুবাহ, কখনো মুস্তাহাব। প্রতিযোগিতা একাধিক ব্যক্তির দৌড়াদৌড়ি দ্বারাও হয়ে থাকে। আবার তীর, অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর দ্বারাও হয়। দৌড়াদৌড়ির প্রতিযোগিতার প্রমাণ আয়েশা রা. কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিস: আয়েশা রা. বলেন: রসূলুল্লাহ সা. এর সাথে আমি দৌড়ের প্রতিযোগিতা করে জিতেছি। পরে যখন মোটা হয়ে গেছি, তখন প্রতিযোগিতায় রসূলুল্লাহ সা. জিতেছেন। তখন আমি বলেছি: এটা আগের বিজয়ের বদলা।' –বুখারি। তীর, বল্লম, এবং ছুড়ে মারা যায় এমন যে কোনো অস্ত্র দ্বারা প্রতিযোগিতা করা যায়। আল্লাহ্ সূরা আনফালের ৬০ নং আয়াতে বলেন:

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ .... الخ

'তোমরা কাফেরদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে।'

১. উকবা ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. মিম্বরের উপর থেকে ভাষণ দেয়ার সময় 'তোমরা কাফেরদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তিপ্রস্তুত রাখবে' এই আয়াত পড়ে বললেন: 'জেনে রাখো, তীর-বল্লম নিক্ষেপই শক্তি, তীর-বল্লম নিক্ষেপই শক্তি' (সহীহ্ মুসলিম)

২. রসূল সা. বলেন: তোমরা তীর-বল্লম নিক্ষেপ রপ্ত কর। এটা তোমাদের শ্রেষ্ঠ খেলাধুলার অন্তর্ভুক্ত।'

৩. রসূলুল্লাহ্ সা. আরো বলেন: 'তিনটে খেলা ব্যতীত আর সমস্ত খেলা হারাম। স্ত্রীর সাথে স্বামীর চিত্তবিনোদন, ধনুক দিয়ে তীর নিক্ষেপ, ঘোড়াকে দৌড় শেখানো।'

তীর-বল্লম ছোড়ার সময় কোনো প্রাণীকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা হারাম। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. একবার দেখলেন, একদল লোক একটা মুরগীকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ছে। তখন তিনি বললেন: 'কোনো প্রাণীকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপকারীকে রসূলুল্লাহ্ সা. অভিশাপ দিয়েছেন।' (বুখারি, মুসলিম)। প্রাণীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের বৈধতা হাদিস থেকে প্রমাণিত:

১. আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: উট, ঘোড়া বা তীর-বল্লম ব্যতীত আর কোনো কিছুর প্রতিযোগিতা বৈধ নয়।' (আহমদ)।

২. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: চল্লিশ দিন ধরে বিশেষ নিয়মে ঘাস খাইয়ে মোটাতাজা করা ঘোড়া দিয়ে রসূলুল্লাহ্ সা. হাফ্ইয়া থেকে 'সানইয়া' পর্যন্ত এবং মোটাতাজা করা হয়নি এমন ঘোড়া দিয়ে 'সান্ইয়া' থেকে বনু যিররিকের মসজিদ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা করেছেন। প্রতিযোগীদের মধ্যে ইবনে উমরও ছিলেন।' –(বুখারি, মুসলিম)। ইমাম বুখারি বলেন, সুফিয়ান বলেছেন: হাফ্ইয়া থেকে সান্ইয়ার দূরত্ব পাঁচ বা ছয় মাইল, আর সানিয়া থেকে বনু যিররিকের মসজিদ পর্যন্ত দূরত্ব এক মাইল। (হাফ্ইয়া মদিনার বাইরের একটি জায়গা।)

পরস্পরে বাজি ধরার বৈধতা: বাজি ধরা ব্যতীত প্রতিযোগিতা সর্বসম্মতভাবে জায়েয। বাজি ধরার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা নিম্নোক্ত অবস্থায় জায়েয:

১. শাসক বা অন্য কোনো ব্যক্তি পুরস্কার দিতে চাইলে তা গ্রহণ করা জায়েয। যেমন বলা হলো: তোমাদের মধ্যে যে জয়ী হবে সে এই পরিমাণ অর্থ পুরস্কার পাবে।

২. অথবা, প্রতিযোগীদের একজন কোনো সামগ্রী দেখিয়ে তার প্রতিপক্ষকে বলবে, তুমি জয়ী হলে এটা তোমার, আর আমি জিতলে আমরা কেউ কিছু পাবনা।

৩. পুরস্কারের সামগ্রীটি প্রতিযোগীদের একজন দেবে, তবে তাদের সাথে একজন তৃতীয় ব্যক্তি থাকবে, যে বিজয়ীকে সেটি গ্রহণ করতে দেবে এবং পরাজিতের উপর কোনো জরিমানা আরোপ করবেনা।

আনাস রা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো: রসূল সা. এর আমলে আপনারা কি বাজি ধরতেন? রসূল সা. কি বাজি ধরতেন? আনাস রা. বললেন: হাঁ, তিনি 'সুব্হা' নামক একটি ঘোড়ার উপর বাজি ধরেছিলেন। সেটি সবাইকে পরাজিত করেছিল। তাতে রসূলুল্লাহ্ সা. খুবই আনন্দিত হন। –(আহমদ)।

যে সব পরিস্থিতিতে বাজি ধরা হারাম: প্রতিযোগীদের মধ্যে যে জিতবে সে পুরস্কার পাবে এবং যে হারবে সে জরিমানা দেবে এরূপ বাজি ধরা হারাম। কেননা এটা জুয়া ও হারাম। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: ঘোড়া তিন রকম: আল্লাহ্‌র ঘোড়া, মানুষের ঘোড়া, শয়তানের ঘোড়া। আল্লাহ্‌র ঘোড়া হলো, যে ঘোড়া আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে ব্যবহৃত হয়। তার পেশাব, পায়খানা, ঘাস সব কিছুতেই সওয়াব পাওয়া যায়। শয়তানের ঘোড়া হলো, যার উপর জুয়া খেলা হয় বা বাজি ধরা হয়। আর মানুষের ঘোড়া হলো, যা মানুষের সাথে যুক্ত থাকে, মানুষ তার পেটের বাচ্চা কামনা করে এবং তাকে দারিদ্র্য থেকে রক্ষা করে।

প্রতিযোগিতায় কারচুপি জায়েয নেই: রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: বাজি ধরায় 'জাল্‌ব' ও 'জান্‌ব' পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয়। (আবুদাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি, ইবনে মাজা)

'জাল্‌ব' হলো, এমন ব্যক্তিকে সহিস নিয়োগ করা, যে ঘোড়াকে দ্রুত দৌড়তে বাধ্য করে। আর 'জান্‌ব' হলো, অন্য ঘোড়াকে ধাক্কা দেয়া, যাতে সে পিছনে পড়ে যায়।

জীবজন্তুকে কষ্ট দেয়া হারাম: জীবজন্তুকে কষ্ট দেয়া ও তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হারাম। যদি কেউ সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা বহনে বাধ্য করে, তবে শাসক তাকে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করতে পারবে। জন্তু যদি দুধেল হয় তবে তা থেকে এত দুধ দোহন করা জায়েয নেই, যাতে তার শাবক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা ইসলামে, মানুষই হোক বা জীবজন্তুই হোক, কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া জায়েয নেই।

জীবজন্তুর শরীরে চিহ্ন খোদাই করা ও খাসি করা: জীবজন্তুর মুখমণ্ডল ব্যতীত শরীরের অন্য যে কোনো স্থানে চিহ্ন খোদাই করা জায়েয। রসূলুল্লাহ সা. দেখতে পেলেন, একটা গাধার মুখে চিহ্ন খোদাই করা হয়েছে। তখন তিনি বললেন: তোমরা কি জাননা, যে ব্যক্তি জীবজন্তুর মুখে চিহ্ন খোদাই করে বা প্রহার করে, তাকে আমি অভিশাপ দিয়েছি?' (আবুদাউদ)

জাবির রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. মুখমণ্ডলে প্রহার করা ও চিহ্ন আকা নিষিদ্ধ করেছেন।' -(মুসলিম, তিরমিযি)।

এ হাদিসে মানুষ বা জীবজন্তুর উল্লেখ না থাকায় ফকিহগণ প্রমাণ করেছেন যে, মানুষ বা জীবজন্তু, কারোই মুখমণ্ডলে প্রহার করা ও চিহ্ন অংকিত করা জায়েয নেই। কেননা মুখমণ্ডল সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল এবং আল্লাহ্ তাকে সম্মানিত করেছেন। জীবজন্তু যাতে চেনা সহজ হয়, সে জন্য তার মুখমণ্ডল ব্যতীত অন্য কোথাও চিহ্ন আঁকা শুধু জায়েয নয়, বরং মুস্তাহাব। মুসলিমে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. যাকাতের উটকে চিহ্নিত করে রাখতেন।

আবু হানিফার মতে এটা মাকরূহ। কেননা এতে তাকে কষ্ট দেয়া হয় ও দেহ বিকৃত করা হয়, যা রসূল সা. নিষিদ্ধ করেছেন। আবু হানিফার বক্তব্যের জবাব হলো, এটা ব্যতিক্রমী বিষয় এবং স্বয়ং রসূল সা. থেকে এই ব্যতিক্রম প্রমাণিত। অর্থাৎ জীবকে কষ্ট দেয়া ও বিকৃত করা তাকে চিহ্নিত করার প্রয়োজন ব্যতীত নিষিদ্ধ। জীবজন্তুকে খাসি করাও একদল ফকিহ্‌র মতে জায়েয, যাতে জীব মোটা হয় এবং মালিক লাভবান হয়। উরওয়া ইবনুয যুবাইর তার একটা খচ্চরকে খাসি করেছিলেন। উমর ইবনে আব্দুল আযীয ঘোড়া খাসি করণ ও ইমাম মালিক ছাগলভেড়া খাসি করণে অনুমতি দিয়েছেন।

মানুষকে খাসি করা: মানুষকে খাসি করা জায়েয নয়। কেননা এটা দেহ বিকৃত করার পর্যায়ভুক্ত। তাছাড়া এতে প্রজনন ক্ষমতা লোপ পায়। এমনকি যাকে খাসি করা হয়, সে মারাও যেতে পারে।

জীবজন্তুর মধ্যে লড়াই উস্কে দেয়া: রসূলুল্লাহ সা. জীবজন্তুর মধ্যে লড়াই বাধানো নিষিদ্ধ করেছেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন: রসূল সা. জীবজন্তুর মধ্যে যুদ্ধের উসকানি দিতে নিষেধ করেছেন। (আবুদাউদ, তিরমিযি)

১. আনাস ইবনে মালেক হাকাম ইবনে আইয়ুবের বাড়িতে ঢুকে দেখলেন, কয়েক ব্যক্তি একটি মুরগীকে তীর নিক্ষেপ করার জন্য আটক করেছে। তখন তিনি বললেন: রসূল সা. কোনো জীবকে আটক করে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।' (মুসলিম)

২. জাবির রা. বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. কোনো প্রাণীকে আটক করে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম) এটা নিষেধ করার কারণ হলো, এতে জীবকে কষ্ট দেয়া হয়, তার প্রাণ হনন করা হয় ও তার মূল্য নষ্ট করা হয়।

তাস বা পাশা খেলা: অধিকাংশ আলেমের মতে তাস বা পাশা খেলা হারাম। তারা নিম্নোক্ত হাদিসসমূহ দ্বারা এর প্রমাণ দর্শান:

১. বারিদা বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন:

'যে ব্যক্তি তাস ও পাশা খেললো, সে যেন নিজের হাতকে শূকরের রক্ত ও মাংস দ্বারা রঞ্জিত করলো। (মুসলিম, আহমদ, আবুদাউদ)

২. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'যে ব্যক্তি তাস বা পাশা খেললো, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানি করলো।' (আহমদ, আবুদাউদ, ইবনে মাজা, মালেক)

সাঈদ ইবনে জুবাইর রা. পাশা খেলারত লোকদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় সালাম করতেন না। ইমাম শওকানি বলেন: পাশা বা তাস যদি জুয়ার ভিত্তিতে না খেলা হয়, তাহলে ইবনুল মুসাইয়াব ও ইবনে মুগাফফালের মতে জায়েয। মনে হয়, তারা হাদিসটিকে জুয়া খেলা নিষিদ্ধ করার অর্থে গ্রহণ করেছেন।

দাবা খেলা: হাদিসে দাবা খেলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে এ সব হাদিসের একটিও সহিহ নয়। হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী বলেন: দাবা খেলা হারাম এ মর্মে কোনো সহিহ বা হাসান হাদিস নেই। তাই এর বৈধতা নিয়ে ফকিহ্দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, হারাম। কেউ বলেন, হালাল। ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের মতে হারাম। ইমাম শাফেয়ি ও কোনো কোনো তাবেয়ির মতে হারাম নয়, মাক্রূহ। সাহাবা ও তাবেয়িদের কেউ কেউ এটা খেলেছেন।

'আলমুগনি' গ্রন্থে ইবনে কুদামা বলেন: 'দাবা পাশার মতই নিষিদ্ধ। তবে পাশা দাবার চাইতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, কারণ এটি সম্পর্কে হাদিস রয়েছে। তবে দাবা পাশার মতোই। তাই এটিতে পাশার বিধি প্রযোজ্য হবে কিয়াসের ভিত্তিতে।'

আবু হুরায়রা, সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব ও সাঈদ ইবনে জুবাইরের মতে মুবাহ। তাদের প্রমাণ এই যে, সব জিনিস মূলত হালাল, যতোক্ষণ হারাম হওয়ার প্রমাণ না পাওয়া যায়। যেহেতু দাবা সম্পর্কে কোনো হাদিস বা আয়াত নেই, তাই এটা হালাল হিসাবেই বহাল থাকবে। যারা এটি হালাল বলেন, তারা তিনটি শর্তে হালাল বলেন:

১. খেলোয়াড়কে যেন ইসলামের কোনো কাজ থেকে বিরত না রাখে।
২. এতে যেন জুয়ার মিশ্রণ না ঘটে।
৩. খেলা চলাকালে শরিয়ত বিরোধী কাজ না হয়।

বাহাত্তরতম অধ্যায়

ওয়াক্ফ

সংজ্ঞা: আভিধানিক অর্থে ওয়াক্ফ্ হচ্ছে থামানো বা আটক করা। শরিয়তের পরিভাষায় ওয়াকফ হচ্ছে মূল বস্তুকে বহাল রাখা ও তার উৎপাদনকে দান করা। অর্থাৎ সম্পত্তি বহাল রাখা ও তার ফল বা ফসল আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা।

ওয়াক্ফ কত প্রকার: ওয়াক্ফ কখনো পৌত্র, প্রপৌত্র, আত্মীয়-স্বজন ও সাধারণ দরিদ্র মানুষের জন্য করা হয়ে থাকে। একে পারিবারিক বা বংশগত ওয়াক্ফ বলা হয়। আবার কখনো সর্বপ্রকার কল্যাণমূলক কাজে ওয়াক্ফ করা হয়। একে বলা হয় দাতব্য বা কল্যাণধর্মী ওয়াক্ফ।

ওয়াক্ফের বৈধতা: মহান আল্লাহ্ ওয়াক্ফকে একটি মুস্তাহাব কাজ হিসেবে প্রবর্তন করেছেন এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। জাহেলি যুগের আরবরা এর সাথে পরিচিতি ছিলনা। রসূলুল্লাহ্ সা. সর্বপ্রথম এটির প্রচলন করেন, এ দিকে সকলকে আহ্বান করেন ও এটিকে জনপ্রিয় করেন, যাতে দরিদ্র ও অভাবক্লিষ্ট মানুষ উপকৃত হয়।

আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: মানুষ মারা গেলে তিনটি কাজ ব্যতীত তার আর সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যায়: চলমান দান বা সদকায়ে জারিয়া, উপকারী বিদ্যা এবং নেককার সন্তান, যে মৃতের জন্য দোয়া করতে থাকে। এ সদ্কায়ে জারিয়ার-ই অপর নাম 'ওয়াক্ফ'। হাদিসটির মর্মার্থ হলো: মৃত ব্যক্তি যতো সৎকাজই করুক, তার মৃত্যুর সাথে সাথে তা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এই তিনটি কাজ এমন যে, এ দ্বারা ক্রমাগত সওয়াব হতে থাকে এবং তা ক্রমাগতভাবে চালু থাকে। তার সৎ সন্তান, তার রেখে যাওয়া ও শিখিয়ে যাওয়া উপকারী বিদ্যা এবং সদকায়ে জারিয়া, এগুলো তারই চেষ্টার ফল। অথচ মৃত্যুর পর এগুলোর সুফল বন্ধ হয়না।

ইব্নে মাজা বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'মুমিনের যে সব সৎ কাজ তার মৃত্যুর পরও তার কাছে পৌছতে থাকে তা হচ্ছে ১. তার প্রচারিত সৎ বিদ্যা, ২. তার রেখে যাওয়া কোনো নেক সন্তান ৩. তার রেখে যাওয়া কুরআন, ৪. তার নির্মিত কোনো মসজিদ, ৫. তার নির্মিত কোনো মুসাফিরখানা, ৬. তার খনন করা কোনো জলাশয়, ৭. তার জীবদ্দশায় তার সম্পত্তি থেকে দান করা কোনো সদ্কা, যা তার মৃত্যুর পরও তার কাছে পৌছতে থাকে।'

এই সাতটির সাথে আরো তিনটি জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লামা সুয়ূতীর ভাষায় সে তিনটি হচ্ছে; ৮. কোনো ফলের গাছ লাগিয়ে যাওয়া ৯. কোনো সীমান্তে প্রহরা দেয়া, ১০. আল্লাহ্র স্মরণের (ইসলামী অনুষ্ঠান করার) জন্য কোনো ঘর নির্মাণ করে যাওয়া।

রসূলুল্লাহ্ সা. ও তাঁর সাহাবিগণ মসজিদ, জমি, পুকুর, বাগান ও ঘোড়া ওয়াক্ফ করেছেন, তাদের অনুসরণে পরবর্তী কালে জনগণ বহু সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে এসেছে এবং আজও করছে। রসূলুল্লাহ্ সা. এর আমলের কিছু ওয়াক্ফের দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ:

১. আনাস রা. সূত্রে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ্ সা. মদিনায় পদার্পণ করত মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিয়ে বললেন: হে বনুনাজ্জার, তোমরা তোমাদের এই বাগানটি আমাকে মূল্যের বিনিময়ে দেবে? তারা বললো: আমরা ওটার মূল্য শুধু আল্লাহ্র কাছে চাই। অত:পর তারা ওটা বিনামূল্যে দিয়ে দিল এবং রসূলুল্লাহ্ সা. তার উপর মসজিদ নির্মাণ করলেন। (তিনটি সহিহ হাদিসগ্রন্থ)।

২. উসমান রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: যে ব্যক্তি রুমার কূপ খনন করবে, তার জন্য জান্নাত রয়েছে।' উসমান রা. বলেন: তখন আমি কূপটি খনন করলাম। (বুখারি, তিরমিযি, নাসায়ি)। বাগাবীর বর্ণনায় রয়েছে: 'রুমার কূপটি বনু গিফারের একজনের মালিকানাধীন ছিলো। সে তা থেকে এক এক মশক পানি এক মুদ্ গমের বিনিময়ে বিক্রয় করতো। তখন রসূলুল্লাহ্ সা. তাকে বললেন: বেহেশতের একটি ঝরনার বিনিময়ে তুমি এটি আমার কাছে বিক্রয় করবে? সে বললো ; হে রসূলুল্লাহ, আমার ও আমার পরিবারের এটি ছাড়া আর কিছু নেই। ব্যাপারটা উসমান রা. জানতে পেরে তিনি পঁয়ত্রিশ হাজার দিরহাম দিয়ে সেটি ক্রয় করলেন। তারপর রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট এসে বললেন: আপনি ঐ লোকটির জন্য যা বরাদ্দ করেছেন (অর্থাৎ বেহেশতের ঝরনা) তা কি আমার জন্যও বরাদ্দ করবেন? রসূল সা. বললেন: হ্যাঁ। তখন উসমান রা. বললেন: ওটা মুসলমানদের জন্য দান করলাম।'

৩. সাদ ইবনে উবাদা রা. বললেন: হে রসূলুল্লাহ্ সা'দের মা মারা গেছে। কোন্ সাদকটি সর্বোত্তম হবে? তিনি বললেন: পানি। তখন তিনি একটি পুকুর খনন করলেন এবং বললেন: এটি সাদের মা'র জন্য।

৪. আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মদিনায় আবু তাল্হা সবচেয়ে বিত্তশালী আনসারী ছিলেন। 'বায়রাহা' (মসজিদে নববীর পার্শবর্তী একটা খেজুরের বাগান) তার সবচেয়ে প্রিয় সম্পত্তি ছিলো। সেটি মসজিদের সামনেই অবস্থিত ছিলো। রসূলুল্লাহ্ সা. ঐ বাগানে যেতেন এবং সেখানকার একটা সুপেয় পানির কূপ থেকে পানি পান করতেন। যখন এ আয়াতটি নাযিল হলো:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ 'তোমার যা ভালোবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করতে পারবে না।' (সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৯২)। তাল্হা রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট গিয়ে বললেন: আল্লাহ্ তো তাঁর কিতাবে বলেছেন: 'তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত পুণ্য লাভ করতে পারবেনা। আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হচ্ছে 'বায়রাহা'। ওটা আল্লাহ্র জন্য সদকা করে দিলাম। আমি এর প্রতিদান আল্লাহ্র কাছে সঞ্চিত থাকার আশা করি। হে রসূলুল্লাহ্, আপনি এটি যেভাবে ইচ্ছা কাজে লাগান। রসূল সা. বললেন: চমৎকার। এটা একটা লাভজনক সম্পত্তি। এটা একটা লাভজনক সম্পত্তি। তুমি এটি সম্পর্কে যা বলেছ তা শুনলাম। আমি মনে করি, তুমি এটি তোমার আত্মীয়স্বজন ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। অত:পর আবু তাল্হা সেটি তার আত্মীয়স্বজন ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।' (বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি)

ইমাম শওকানি বলেন: জীবিত ব্যক্তি যদি মৃত্যু পূর্ব রোগাবস্থা ছাড়া অন্য সময় নিজের সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের বেশি দান করে তবে তা জায়েয। কারণ আবু তালহা যে সম্পত্তিটা দান করেছিলেন, তার পরিমাণ কত, সেটা রসূলুল্লাহ্ সা. জানতে চাননি। তিনি সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস্কে তার রোগাবস্থায় বলেছিলেন: এক তৃতীয়াংশ অনেক।

৫. ইবনে উমর রা. বলেন: উমর রা. খয়বরে কিছু জমি পেলেন। সে সম্পর্কে আদেশ ও পরামর্শ লাভের জন্য তিনি রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট গেলেন। তাঁকে বললেন, হে রসূলুল্লাহ্, আমি খয়বরে একটু জমি পেয়েছি। এত ভাল সম্পত্তি আমি ইতোপূর্বে কখনো পাইনি। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কী নির্দেশ দেবেন? রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: ইচ্ছা করলে মূল জমি তুমি রেখে দাও এবং ওর ফসল দান করে দাও। অবশেষে উমর রা. ফসল সদকা করে দিলেন। ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করা যায়না, দান করা যায়না এবং উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিত হয়না। উক্ত জমির ফসল দরিদ্র, আত্মীয়-স্বজন, দাস মুক্ত করণ, আল্লাহ্র পথে জিহাদ, পথিক ও অতিথিদের জন্য দান করা যায়। যে ব্যক্তি এর তত্ত্বাবধান করবে, সে ন্যায়সংগতভাবে তা থেকে খেতে পারে এবং কাউকে খাওয়াতেও পারে। তবে নিজের মালিকানাভুক্ত করতে পারবোনা।'

ইমাম তিরমিযি বলেন: সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্য আলেমগণ এ হাদিস অনুযায়ী ওয়াক্ফ সম্পত্তির কার্য পরিচালনার পক্ষপাতী। কেউ এ ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন বলে জানা যায়না। এটাই ছিলো ইসলামে প্রথম ওয়াক্ফ।

৬. ইমাম আহ্মদ ও বুখারি আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: যে ব্যক্তি একটি ঘোড়া আল্লাহ্র পথে ওয়াক্ফ করবে ঈমানের সাথে ও আল্লাহ্র সুন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য, কেয়ামতের দিন ঐ ঘোড়ার সমস্ত খাদ্য, মল-মূত্র তার পাল্লায় পুণ্য কাজ হিসেবে মাপা হবে।'

৭. খালেদ বিন ওলিদের বর্ণিত হাদিসে রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: খালিদ তার সমস্ত যুদ্ধ সরঞ্জাম আল্লাহ্র পথে ওয়াক্ফ্ করে দিয়েছে।

ওয়াক্ফ কীভাবে সম্পন্ন হবে: ওয়াক্ফ দু'টি উপায়ে কার্যকর হবে:

১. এমন কাজ দ্বারা, যা দ্বারা ওয়াক্ফ বুঝা যায়। যেমন মসজিদ নির্মাণ ও তাতে নামাযের জন্য আযান দেয়া। এ জন্য কোনো শাসকের সিদ্ধান্তের প্রয়োজন নেই। অথবা, ২. কথা দ্বারা, কথা দু প্রকার: স্পষ্ট কথা বা ইংগিতপূর্ণ কথা। স্পষ্ট কথার উদাহরণ: ওয়াক্ফ করে দিলাম, আল্লাহ্র ওয়াস্তে দিলাম, চিরতরে দিলাম ইত্যাদি।

ইংগিতপূর্ণ কথার উদাহরণ: সদ্কা করে দিলাম। তবে এ দ্বারা তার নিয়ত থাকা চাই ওয়াক্ফ করার।

তবে কেউ যদি নিজের মৃত্যুর শর্তে ওয়াক্ফ করে, যেমন বলে: 'আমার বাড়িটা আমার মৃত্যুর পরে

ওয়াক্‌ফ রইল।' এরূপ ওয়াক্‌ফ ইমাম আহমদের মতে জায়েয। কেননা এটা এক ধরনের অসিয়ত, যা মৃত্যুর পরেই কার্যকর হয়।

ওয়াক্‌ফ কখন বাধ্যতামূলক হয়: যে কাজ বা কথা দ্বারা ওয়াক্‌ফ বুঝা যায়, সে কাজ যখন কেউ করে বা সে কথা যখন কেউ বলে, তখন সে যদি প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক, স্বাধীন ও জোরজবরদস্তির আওতামুক্ত হয়, তবে ওয়াক্‌ফ বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে এবং যার বা যে প্রতিষ্ঠানের নামে ওয়াক্‌ফ করেছে তার কবুল করা শর্ত নয়। আর ওয়াক্‌ফ যখন বাধ্যতামূলক হবে তখন ওয়াক্‌ফকারীর জন্য ওয়াকফকৃত সম্পত্তি বিক্রয়, দান বা এমনভাবে ব্যবহার করা, যাতে তা ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে বহাল থাকতে পারে না, বৈধ হবে না। ওয়াক্‌ফকারী মারা গেলে ওয়াক্‌ফ্‌কৃত সম্পত্তি তার উত্তরাধিকার হিসেবে বণ্টিত হবে না। কেননা এটাই ওয়াক্‌ফের দাবি। ইতোপূর্বে ইবনে উমর রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিসেও রয়েছে যে, ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি বিক্রয় দান ও উত্তরাধিকার হিসেবে হস্তান্তর করা যায়না।

ইমাম আবু হানিফার মতে, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বিক্রয় করা বৈধ। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন: ইবনে উমার রা. এর উক্ত হাদিস যদি আবু হানিফার নিকট পৌঁছতো তাহলে তিনি তদনুযায়ীই রায় দিতেন। ইমাম শাফেয়ির মযহাবের অগ্রগণ্য মত হলো, ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির মালিকানা আল্লাহ্‌র নিকট হস্তান্তরিত হয়ে যায়। তাই তা আর ওয়াক্‌ফ্‌কারীরও সম্পত্তি থাকে না, যার নামে ওয়াক্‌ফ্ করা হয় তারও সম্পত্তি থাকে না। ইমাম মালিক ও আহ্‌মদ বলেন: যার নামে ওয়াক্‌ফ্ করা হয় মালিকানা তার কাছে হস্তান্তরিত হয়।

যে যে সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ্ করা বৈধ এবং বৈধ নয়: অধিকাংশ আলেমের মতে, জমি ও যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি যথা আসবাবপত্র, কুরআন, বই কিতাব, অস্ত্র ও গৃহপালিত জীবজন্তু ইত্যাদি ওয়াক্‌ফ্ করা বৈধ। (কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম মালেকের মতে জীবজন্তু ওয়াকফ করা অবৈধ।) অনুরূপ, এমন প্রত্যেক বস্তু ওয়াক্‌ফ করা বৈধ, যা বিক্রয় করা বৈধ এবং যার মূল বস্তু বহাল রেখে তার উপকারিতা গ্রহণ করা যায়। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যে জিনিসের উপকারিতা গ্রহণ করলে মূল বস্তুটাই নষ্ট বা নি:শেষ হয়ে যায় তা ওয়াক্‌ফ্ করা জায়েয নয়, যেমন মুদ্রা, মোমবাতি, খাদ্য ও পানীয়। অনুরূপ, যা দ্রুত নষ্ট হয় তাও ওয়াক্‌ফ করা জায়েয নয়, যেমন সুগন্ধী দ্রব্য। অনুরূপ যে সব জিনিস বিক্রয় করা জায়েয নেই যেমন বন্ধক দেয়া সামগ্রী, কুকুর, শূকর, হিংস্র জন্তু এবং যে সব হিংস্র পশুপাখি শিকারের যোগ্য নয়, তাও ওয়াক্‌ফ্ করা জায়েয নেই।

কার নামে ওয়াক্‌ফ্ করা জায়েয: নিজের সন্তান, আত্মীয়-স্বজন বা সুপরিচিত কোনো ব্যক্তির নাম ব্যতীত এবং পুণ্য কর্ম ব্যতীত যথা মসজিদ, ব্রীজ, ইসলামী পুস্তক বা কুরআন ব্যতীত ওয়াক্‌ফ করা জায়েয নেই। অপরিচিত কোনো পুরুষ বা নারীর নামে ওয়াকফ করা জায়েয নেই। অনুরূপ কোনো গুনাহ্‌র কাজে ওয়াক্‌ফ করা জায়েয নেই, যেমন গির্জার নামে ওয়াক্‌ফ করা।

সন্তানের নামে ওয়াক্‌ফ্ করা হলে পৌত্র প্রপৌত্ররাও তার আওতাভুক্ত হবে: যে ব্যক্তি তার সন্তানের নামে ওয়াক্‌ফ করবে, তার ওয়াক্‌ফের আওতায় তার পৌত্র ও প্রপৌত্ররাও পড়বে। অনুরূপ মেয়ের সন্তানরাও তার আওতায় আসবে। আবু মুসা আশ্‌য়ারি রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'কোনো গোত্রের ভাগ্নেরাও ঐ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।' (বুখারি, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসায়ি, তিরমিযি)

যিম্মীদের নামে ওয়াক্‌ফ্ করা: যিম্মীদের নামে ওয়াক্‌ফ্ করলে তাও বৈধ। যেমন খ্রিস্টান যিম্মীদের নামে ওয়াক্‌ফ করা। তাদের সদকাও দেয়া যাবে। রসূলুল্লাহ্ সা. এর স্ত্রী সফিয়া বিনতে হুয়াই তার ইহুদি ভাই এর নামে সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করেছিলেন।

সম্মিলিত ওয়াক্‌ফ: সম্মিলিতভাবে একাধিক লোকের সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ্ করাও বৈধ। কেননা ইমাম শাফেয়ি, ইমাম মালেক ও ইমাম আবু ইউসুফ বলেন: উমর রা. খয়বরে তাঁর সম্পত্তির একশো অংশ ওয়াকফ করেছেন। ঐ সম্পত্তি বিভক্ত ছিলনা। কোনো কোনো আলিমের মতে যৌথ বা সম্মিলিত ওয়াক্‌ফ করা অবৈধ। কেননা সুনির্দিষ্টভাবে পরিচিতি সম্পত্তি হওয়া ওয়াক্‌ফের শর্ত। এই মত ইমাম মুহাম্মদের।

নিজের নামে ওয়াক্‌ফ করা: কোনো কোনো আলেম মনে করেন, নিজের নামেও ওয়াক্‌ফ করা জায়েয। কেননা এক ব্যক্তি বলেন: আমার নিকট একটি দিনার আছে। রসূলুল্লাহ্ সা. তাকে বললেন: ওটা তুমি নিজের উপর সদ্‌কা কর। তাছাড়া, যেহেতু ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা, আর নিজের উপর ব্যয় করাতেও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। এটা ইমাম আবু হানিফা, ইবনে আবি লায়লা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম আহ্‌মদের অভিমত। মালিকি মযহাবের ইবনে শাবান, শাফেয়ি

মযহাবের ইবনে সুরাইজ, ইবনে শাব্‌রুমা ও ইব্‌নুস সাব্বাগও অনুরূপ মত পোষণ করেন। তাদের কেউ কেউ নির্বুদ্ধিতার কারণে লেনদেনে অযোগ্য ঘোষিত ব্যক্তি নিজের নামে ও নিজের সন্তানদের নামে ওয়াক্ফ করলে তাও জায়েয মনে করেন। কেননা তাকে লেনদেনের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে তার সহায়সম্পদ রক্ষার উদ্দেশ্যেই। আর তার এ ধরনের ওয়াক্ফ উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক। কেউ কেউ আবার এটা অবৈধ মনে করেন। কেননা নিজের নামে ওয়াক্ফ করা নিজেকে মালিক বানানোর শামিল। অথচ ওয়াক্ফ্ করা সম্পত্তির মালিক ওয়াক্ফ্কারী হতে পারে না। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'ওয়াক্ফ করা সম্পত্তির ফসল দান করে দাও।' এ হাদিস থেকে স্পষ্ট যে, তার মালিক অন্য কেউ হবে, ওয়াক্ফ্কারী নয়। এটাই শাফেয়ি মযহাব ও অধিকাংশ মালেকি ফকিহ্‌দের মত।

উদ্দেশ্যহীন ওয়াক্ফ: যখন কোন ব্যক্তি ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য উল্লেখ ছাড়াই তার সম্পত্তি ওয়াকফ করে, যেমন শুধু বললো: এই বাড়িটা ওয়াক্ফ করলাম, কী উদ্দেশ্যে কার নামে বা কোন্ কাজের জন্য ওয়াক্ফ করা হলো, তা কিছুই উল্লেখ করলো না, সে ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ্ শুদ্ধ হবে কি না তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেকের মতে শুদ্ধ ও শাফেয়ি মযহাবে অশুদ্ধ হবে।

মৃত্যু প্রাক্কালীন রোগাবস্থায় ওয়াক্ফ্ করা: মৃত্যু প্রাক্কালীন রোগাবস্থায় রোগী উত্তরাধিকারী নয় এমন ব্যক্তির নামে ওয়াক্ফ্ করলে সে ওয়াক্ফ্ তার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ থেকে কার্যকর করা হবে, যেমন ওছিয়তের ক্ষেত্রে করা হয়। এটা উত্তরাধিকারীদের সম্মতির উপর নির্ভর করেনা। তবে এক তৃতীয়াংশের বেশি হলে তাদের অনুমতি ব্যতীত বৈধ হবেনা।

রোগাবস্থায় কোনো উত্তরাধিকারীর নামে ওয়াক্ফ্ করা: মৃত্যু প্রাক্কালীন রুগ্নাবস্থায় উত্তরাধিকারীর নামে ওয়াক্ফ্ ইমাম শাফেয়ির মতে এবং এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমদের মতে নাজায়েয হবে। ইমাম শাফেয়ি ব্যতীত অন্যদের মতে ও অপর বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহ্‌মদের মতে এক তৃতীয়াংশের মধ্য থেকে উত্তরাধিকারীদের নামেও ওয়াক্ফ্ করা যাবে। ইমাম আহ্‌মদকে যখন বলা হলো: আপনি কি মনে করেন না যে, কোনো উত্তরাধিকারীকে অসিয়ত করা যাবে না, তখন তিনি বললেন: হ্যাঁ। কিন্তু ওয়াক্ফ অসিয়ত থেকে ভিন্ন জিনিস। কেননা ওয়াক্ফ্ বিক্রয়ও করা যায়না, দানও করা যায় না, উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টনও করা যায় না এবং উত্তরাধিকারীদের মালিকানাভুক্ত হয়না, যাতে তারা তার ফসল দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

ধনীদের নামে ওয়াক্ফ্ করা: ওয়াক্ফ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের সহায়ক একটি ইবাদত। এ কাজ করতে গিয়ে কেউ যদি এমন শর্ত আরোপ করে, যা কোনো সওয়াবের কাজ নয় বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের সহায়ক নয়, যেমন শর্ত করলো যে, ধনীদের ছাড়া আর কাউকে কিছু দেবে না। তাহলে সে ওয়াক্ফ নিয়ে ফকিহ্‌দের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। কারো কারো মতে এটা জায়েয। কেননা এটা গুনাহ্‌র কাজ নয়। কেউ কেউ বলেন: জায়েয নয়। কেননা এটা একটা অবৈধ শর্ত। তাছাড়া এ শর্ত দ্বারা ওয়াক্ফ্ সম্পত্তির ব্যয় এমনভাবে সীমিত করা হয় যাতে ওয়াক্ফ্কারীর কোনো লাভ হয়না, দুনিয়াতেও নয়, আখিরাতেও নয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া শেষোক্ত মতটি সমর্থন করে বলেন: 'এটা একটা অপব্যয় ও অপচয়, যা নিষিদ্ধ। তাছাড়া যেহেতু আল্লাহ্ সম্পদের আবর্তন ধনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা অপছন্দ করেছেন, তাই এটা অবৈধ। আল্লাহ্ সূরা হাশরের ৭নং আয়াতে বলেন: كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۝

'যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ধন-সম্পদ আবর্তন না করে'। সুতরাং যে ব্যক্তি তার ওয়াক্ফ্ বা ওছিয়তে শর্ত আরোপ করে যে, তার ওয়াক্ফ্ বা অসিয়তকৃত সম্পদ শুধু ধনীদের মধ্যে আবর্তিত হোক, সে একটা কুরআন বিরোধী শর্ত আরোপ করে। আর কুরআন বিরোধী শর্ত অবশ্যই বাতিল, চাই একশোটা শর্তই হোক না কেন। কেননা আল্লাহ্‌র কিতাব অগ্রগণ্য এবং আল্লাহ্‌র শর্ত অধিকতর নির্ভরযোগ্য।'

ইমাম ইবনে তাইমিয়া আরো বলেন: 'ওয়াক্ফ্কারী বা অসিয়তকারী যদি এমন শর্ত আরোপ করে, যা শরিয়তে ওয়াজিবও নয়, মুস্‌তাহাবও নয়, তবে সে ধরনের শর্ত বাতিল এবং কুরআনের পরিপন্থী। কেননা যা ওয়াজিবও নয়, মুস্তাহাবও নয়, তা অনর্থক নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করা অপব্যয় বিধায় নিষিদ্ধ।'

ওয়াক্ফ্ সম্পত্তির তদারককারীর জন্য ওয়াক্ফ্ সম্পত্তি থেকে পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয: ওয়াকফ সম্পত্তি দেখাশুনা ও তদারকীর দায়িত্বশীলের জন্য তা থেকে পারিশ্রমিক নেয়া বৈধ। কারণ ইতোপূর্বে ইবনে উমরের বর্ণিত হাদিসে রয়েছে: 'ওয়াক্ফ্কৃত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা থেকে পারিশ্রমিক নিতে পারবে।' এখানে 'ন্যায় সংগত' বলতে সেটাই বুঝায়, যা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য। ইমাম কুরতুবি বলেন: 'তদারককারী ওয়াক্ফ সম্পত্তির ফসল থেকে নিজের পারিশ্রমিক নেবে এটাই প্রচলিত রীতি। এমনকি ওয়াক্ফ্কারী যদি তদারককারী কিছু নেবেনা–এই শর্ত আরোপ করে, তাহলে তা হবে অন্যায় শর্ত।

ওয়াক্ফ্ সম্পত্তির ফসল বা লভ্যাংশের উদ্বৃত্ত অংশ অনুরূপ কাজে ব্যয় করা হবে: ইমাম ইব্নে তাইমিয়া বলেন: 'ওয়াক্ফ্ সম্পত্তির ফসল থেকে যা উদ্বৃত্ত থাকবে এবং যা নিষ্প্রয়োজন বিবেচিত হবে তা অনুরূপ অন্যান্য কাজে ব্যয়িত হবে। যেমন মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ্ কৃত সম্পত্তির ফসল তার প্রয়োজনে ব্যয় করার পর যা উদ্বৃত্ত থাকবে তা অপর মসজিদে ব্যয় করা হবে। কারণ ওয়াক্ফ্কারীর উদ্দেশ্য হলো সমপর্যায়ের কাজ। যদি এরূপ বিবেচিত হয় যে, প্রথম মসজিদ বিরান হয়ে গেছে এবং তা দ্বারা এখন আর কেউ উপকৃত হতে পারছে না, তাহলে তার ফসল বা লব্ধ সম্পদ অন্য মসজিদ নির্মাণে বা মেরামতে ব্যয় করা হবে। অনুরূপ, যখন তার প্রয়োজন পূর্ণ করার পর কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে তখন তা অনুরূপ অন্য কোনো মসজিদে ব্যয় করা হবে। অলস ফেলে রাখা হবেনা।'

মান্নত ও ওয়াক্ফের সম্পত্তিকে তার চেয়ে উত্তম আকারে রূপান্তর: ইমাম ইবনে তাইমিয়া আরো বলেন:

যে জিনিস ওয়াক্ফ্ বা মান্নত করা হয়, তা পরিবর্তন করে তার চেয়ে ভাল জিনিস ওয়াক্ফ্ বা মান্নত করা দুই রকমের:

১. অনিবার্য প্রয়োজনবশত পরিবর্তন করা। যেমন তা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেল, তাই তা বিক্রয় করে তার মূল্য দ্বারা তার বিকল্প ক্রয় করা। উদাহরণ স্বরূপ, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতকৃত ঘোড়া। এই ঘোড়া যদি যুদ্ধে ব্যবহারের যোগ্য না থাকে, তাহলে তা বিক্রয় করা হবে এবং তার বিকল্প ক্রয় করা হবে। অনুরূপ, মসজিদের পরিবেশ যখন এত খারাপ হয় যে, মসজিদ ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়। তখন তা অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হবে অথবা বিক্রয় করা হবে এবং তার মূল্য দিয়ে বিকল্প মসজিদ নির্মাণ করা হবে। আর যখন ওয়াক্ফ্কৃত সম্পত্তি ব্যবহারপূর্বক ওয়াক্ফ্কারীর উদ্দেশ্য সফল করার সম্ভাবনা না থাকে, তখন তা বিক্রয় করে তার মূল্য দ্বারা তার বিকল্প ক্রয় করা হবে। আর যখন ওয়াক্ফ্ করা ভবন নষ্ট হয়ে যায় তখন তা বিক্রয় করা হবে এবং সে মূল্য দিয়ে তার বিকল্প খরিদ করা হবে। এ সবই বৈধ।

২. অগ্রাধিকারযোগ্য বা বৃহত্তর স্বার্থে পরিবর্তন করা, যেমন কুরবানীর জন্তু পরিবর্তন করে তার চেয়ে ভাল জন্তু খরিদ করা। অনুরূপ মসজিদের পরিবর্তে এলাকার লোকদের জন্য অধিকতর উপযোগী অন্য মসজিদ নির্মাণ করা ও প্রথমটি বিক্রয় করা। এ কাজ বা এ ধরনের কাজ ইমাম আহ্মদের মতে জায়েয। ইমাম আহমদ এর প্রমাণ দর্শিয়ে বলেন, উমার ইবনে খাত্তাব রা. কুফার প্রাচীন মসজিদকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করেছিলেন। তখন প্রথম মসজিদটি খেজুর বিক্রেতাদের বাজারে পরিণত হয়। উমার রা. যখন জানতে পারলেন যে, কুফার বাইতুল মালে ছিদ্র করা হয়েছে, তখন তিনি সা'দ রা. কে লিখলেন: খেজুর বিক্রেতাদের নিকট যে মসজিদ রয়েছে, সেটি সরিয়ে নাও এবং বাইতুল মালকে মসজিদের ভেতরে নাও। কেননা মসজিদে সব সময়ই কোনো না কোনো নামাযী থাকে। এটা মসজিদের জায়গা পরিবর্তনের পর্যায়ভুক্ত। মসজিদের ভিত্তিও অন্য ভিত্তি দ্বারা পরিবর্তন করে নেয়া যায়। কেননা উমর রা. ও উসমান রা. মসজিদে নববীকে তার পূর্ববর্তী ভিত্তির পরিবর্তে অন্য ভিত্তির উপর তৈরি করেছিলেন এবং তাকে আরো সম্প্রসারিত করেছিলেন।

অনুরূপ মসজিদুল হারামের বেলায়ও ঘটেছে। বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. আয়েশা রা. কে বললেন: 'তোমাদের জনগণ যদি জাহিলিয়াত থেকে সদ্য উদ্ধারপ্রাপ্ত না হতো তাহলে আমি কা'বা শরিফকে ভেঙ্গে ফেলতাম, ওটিকে মাটির সাথে যুক্ত করতাম এবং ওর দুটো দরজা বানাতাম, একটা

দিয়ে মানুষ প্রবেশ করতো আর অপরটা দিয়ে বের হতো।' সুতরাং অগ্রাধিকারযোগ্য বিপরীত চিন্তা না থাকলে রসূলুল্লাহ্ সা. কা'বা শরীফের ভিত্তিও পাল্টে ফেলতেন। কাজেই ওয়াক্ফ্ সম্পত্তির ভিত্তির আকৃতি পাল্টানো বৈধ। বৃহত্তর স্বার্থে এটা করা যায়। জমি বা প্রাঙ্গণ পাল্টানোও ইমাম আহমদ প্রমুখ বৈধ মনে করেন। কারণ সাহাবিগণ, বিশেষত উমর রা. এরূপ করেছেন এবং সেটা ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে। কেউ তার বিরোধিতা করেনি। কেবল শস্যাদির জন্য যে জমি ওয়াক্ফ্ করা হয়, তা যদি তার চেয়ে উত্তম বিকল্প জমি দিয়ে পাল্টানো হয়, তবে তাও জায়েয। অনুরূপ যদি ঘর, দোকান, বাগান বা গ্রাম ওয়াক্ফ্ করা হয় এবং তার প্রাপ্তি খুব কম হয়, তবে ওয়াক্ফের জন্য অধিকতর লাভজনক ঘর বা দোকান ইত্যাদি দিয়ে তা পরিবর্তন করা যায়। ইমামদের মধ্যে আবু সাওর ও মিশরের বিচারক আবু উবায়েদ এটিকে বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। ইমাম আহ্মদ বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে মসজিদের জমি পরিবর্তন জায়েয বলে যে উক্তি করেছেন, তার আলোকে কিয়াস করে আবু সাওর ও আবু উবায়েদ উপর্যুক্ত মত দিয়েছেন। তবে ইমাম আহ্মদের শিষ্যদের মধ্য থেকে কেউ কেউ মসজিদ, কুরবানীর জন্তু ও ওয়াক্ফ্কৃত জমি পরিবর্তনের বিপক্ষে। ইমাম শাফেয়ি এবং ইমাম মালেকও এর বিপক্ষে। কিন্তু হাদিস, আসার ও যুক্তি এর বৈধতাই প্রমাণ করে। মহান আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভাল জানেন।

উত্তরাধিকারীদের স্বার্থের ক্ষতি হয় এমন ওয়াক্ফ্ হারাম: কোন ব্যক্তির এমন ওয়াক্ফ্ করা হারাম, যা দ্বারা উত্তরাধিকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: ইসলামে কারো ক্ষতি করারও অবকাশ নেই, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ারও সুযোগ নেই।' সুতরাং এ ধরনের ওয়াক্ফ করা হলে তা বাতিল হবে। আর 'রওযাতুন নাদিয়া' গ্রন্থে রয়েছে:

'মোট কথা, আল্লাহ্ যে সম্পর্কগুলো জুড়ে রাখার আদেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করা এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত ফরযসমূহের বিরোধিতা করা যে ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য, তা বাতিল এবং কোনোক্রমেই তা গ্রহণযোগ্য হবেনা। যেমন কেউ তার কন্যা সন্তানদের বাদ দিয়ে শুধু পুরুষ সন্তানদের নামে ওয়াক্ফ্ করলে তা বাতিল হবে। কারণ এ ধরনের ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা নয়, বরং আল্লাহ্র হুকুম লংঘন করা এবং আল্লাহ্ তার বান্দাদের জন্যে যেসব অধিকার নির্ধারণ করেছেন তা হরণ করা। বস্তুত এটা একটা তাগুতি ওয়াক্ফ্, যা শয়তানের উদ্দেশ্য সফল করার সহায়ক। কাজেই পাঠক! আপনার এটা স্মরণ রাখা উচিত, এ যুগে এগুলো ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুরূপ যে ব্যক্তি শুধু নিজের সম্পত্তিকে নিজের বংশধরের মধ্যে গুটিয়ে নেয় এবং তাদের বাইরে যেতে না দেয়ার উদ্দেশ্যে শুধু নিজের বংশধরের নামে ওয়াক্ফ্ করে, আল্লাহ্র বিধানের বিরোধিতাই তার উদ্দেশ্য। আল্লাহ্র বিধান হলো, উত্তরাধিকারের মাধ্যমে মালিকানা হস্তান্তর এবং উত্তরাধিকারীকে তার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে যেমন খুশি হস্তান্তর বা লেনদেন করার স্বাধীনতা প্রদান। উত্তরাধিকারীরা ধনী না গরীব সেটা দেখা ওয়াক্ফ্কারীর ইখতিয়ার নয়, বরং আল্লাহ্র ইখতিয়ার। নিজের সন্তান ও বংশধরদের জন্য ওয়াক্ফ্ করায় আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য থাকা খুবই বিরল। সুতরাং প্রত্যেক ওয়াক্ফ্কারীর সূক্ষ্মভাবে এ বিষয়টি বিবেচনা করা কর্তব্য। এই সাথে এ কথাটাও মনে রাখতে হবে যে, নিজের বংশধরদের মধ্যে যারা সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বা ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত, তাদের নামে সম্পত্তির একটা অংশ ওয়াক্ফ্ করলে তা ন্যায়সঙ্গত এবং তা দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ নিশ্চিত হতে পারে। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে খুব কম লোকই ওয়াক্ফ্ করে থাকে। তাই আল্লাহ্ সম্পদ বণ্টনের যে বিধান তার বান্দাদের জন্যে চালু করেছেন এবং যে বিধান তাঁর মনোনীত, সে বিধানকে কার্যকর করাই সর্বোত্তম পন্থা।

তিয়াত্তরতম অধ্যায়

হিবা ও হাদিয়া

সংজ্ঞা: পবিত্র কুরআনে সূরা আলে ইমরানের ৩৮নং আয়াতে বলা হয়েছে:

قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ○

'সে (যাকারিয়া) বললো, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে তুমি তোমার নিকট থেকে সৎ বংশধর দান কর। তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী।' হিবার শব্দার্থ হচ্ছে, দান করা বা কারো প্রতি অনুগ্রহ করা, চাই অর্থবিত্ত দিয়ে হোক বা অন্য কিছু দিয়ে। আর শরিয়তের পরিভাষায় এটা এমন চুক্তির নাম, যার উদ্দেশ্য কোনো মানুষ কর্তৃক অপর কাউকে জীবিতাবস্থায় কোনো বিনিময় ছাড়া নিজের কোনো সম্পদ বা সামগ্রীর মালিক বানিয়ে দেয়া। আর মালিক না বানিয়ে কেউ যদি কাউকে নিজের সামগ্রী শুধু ব্যবহারের জন্যে দেয় তবে সেটা হিবা নয়, ধার। আর যখন কেউ এমন কোনো জিনিস কাউকে দেয়, যা সম্পদ পদবাচ্য নয়, যেমন মদ বা মৃত প্রাণী, তখন তা হিবা বা হাদিয়া হবে না। আর যখন মালিক বানানোর কাজটা জীবদ্দশায় নয়, বরং মৃত্যুর পরে হবে, তখন তার নাম হবে অসিয়ত। আর যখন এ কাজটা কোনো বিনিময় সহকারে হবে, তখন তার নাম হবে বিক্রয় এবং তার উপর বিক্রয়ের বিধি কার্যকর হবে। ইমাম আবু হানিফার মতে বিনিময় দেয়ার শর্তে যে হিবা করা হবে তা শুরুতে হিবা হলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে তা বিক্রয়ে পরিণত হবে। সে ক্ষেত্রে বিনিময় পাওয়ার আগে কাউকে তার মালিক বানানো হবে না, যতোক্ষণ না সে উক্ত সামগ্রী নিজ দখলে নিয়ে নেয়। দখলে নেয়ার পূর্বে যাকে হিবা করা হয়েছে, সে তার লেনদেন করতে পারবে না। হিবাকারী লেনদেন করতে পারবে।

বিনিময়টি নির্দিষ্ট ও পরিচিত হওয়া শর্ত। নচেৎ হিবা বাতিল গণ্য হবে।

শর্তহীন হিবায় কোনো বিনিময় যুক্ত থাকে না, চাই সে হিবা হিবাকারীর সমপর্যায়ের ব্যক্তিকে করা হোক, বা তার চেয়ে নিম্নতর অথবা উচ্চতর পর্যায়ের লোককে।

এ হচ্ছে বিশেষ অর্থের আলোকে হিবার মর্ম। ব্যাপকতর অর্থে 'হিবা' দ্বারা তিনটি জিনিস বুঝানো হয়:

১. কারো কাছে ঋণ থাকলে তা মওকুফ বা মাফ করে দেয়া।

২. সদকা অর্থাৎ পরকালে সওয়াব কামনা করা হয় এমন দান-দক্ষিণা।

৩. হাদিয়া বা উপহার: অর্থাৎ যাকে হাদিয়া বা উপহার দেয়া হয় তার হাদিয়ার বিনিময় দেয়া জরুরি। এর নাম হিবা বিল এওয়াজ।

হিবা সম্পর্কে শরিয়তের বিধি: আল্লাহ্ হিবাকে শরিয়তসিদ্ধ করেছেন। কারণ এতে মানুষের পরস্পরের প্রতি মমত্ব ও প্রীতি জন্মে এবং ভালোবাসার সম্পর্ক মজবুত হয়। আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'তোমরা পরস্পর হাদিয়া লেনদেন কর, পরস্পরে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।' (বুখারি, আল আদাবুল মুফরাদ, বায়হাকি)। রসূলুল্লাহ্ সা. হাদিয়া গ্রহণ করতেন ও তার প্রতিদান দিতেন। তিনি হাদিয়া গ্রহণ করতে অনুরোধ ও উৎসাহিত করতেন। ইমাম আহ্মদ খালিদ ইবনে আদি রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: যার কাছে তার ভাই এর কাছ থেকে কোনো প্রকারের অনুরোধ বা দাবি ছাড়াই কোনো উপহার আসে, তার সেটি গ্রহণ করা উচিত এবং ফেরত দেয়া উচিত নয়। কেননা সেটি আল্লাহ্র দেয়া একটি নিয়ামত, যা তিনি (অযাচিতভাবেই) তার কাছে পাঠিয়েছেন।' আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: আমাকে যদি একটা জন্তুর পায়ের নিচের অংশটা হাদিয়া পাঠানো হয়, তবে আমি তাও গ্রহণ করবো, আর যদি তা খাওয়ার জন্যে আমাকে দাওয়াত করা হয় তবে আমি তাও কবুল করবো।' (আহমদ, তিরমিযি)

আয়েশা রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম: হে রসূলুল্লাহ্, আমার দু'জন প্রতিবেশী। তাদের মধ্যে কোন্ জনকে হাদিয়া (উপহার) পাঠাবো? রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: যার দরজা তোমার কাছ থেকে অধিক নিকটে।' আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: পরস্পরে উপহার বিনিময় কর। এটা মনের হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে। কোনো প্রতিবেশিনী তার অপর প্রতিবেশিনীকে তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়,

যদিও সে একটা ছাগলের পায়ের একাংশ পাঠায়।' রসূলুল্লাহ্ সা. কাফেরদের হাদিয়াও গ্রহণ করতেন। রোম সম্রাট, পারস্য সম্রাট ও মুকাওকিসের উপহার গ্রহণ করেছেন। অনুরূপ তিনি কাফেরদেরকে হাদিয়া ও দানসামগ্রী পাঠাতেন।

তবে ইমাম আহ্মদ, আবু দাউদ ও তিরমিযি বর্ণনা করেন: ইয়ায্ রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট একটা উপহার পাঠালেন। রসূলুল্লাহ সা. তাকে বললেন: তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছ? সে বললো: না। তিনি বললেন: আমাকে মুশরিকদের উপহার গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।' এ হাদিস সম্পর্কে খাত্তাবি বলেন: হাদিসটি সম্ভবত রহিত হয়েছে। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. একাধিক মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করেছেন।

ইমাম শওকানি বলেন: ইমাম বুখারি তার সহিহ্ হাদিস গ্রন্থে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয। হাফেয ইবনে হাজর আসকালানি 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে বলেন: 'উল্লিখিত হাদিসে বর্ণিত উপহারদাতা মুশরিক। কাজেই হাদিয়া ফেরত দেয়ার ঘটনা কোনো কিতাবির ক্ষেত্রে ঘটেছে বলার অবকাশ নেই।'

হিবার মূল উপাদান: কোনো বিনিময় ছাড়াই প্রদত্ত সামগ্রীটির মালিক বানানো হচ্ছে- এ কথা বুঝা যায় এমন যে কোনো বাক্য প্রয়োগে ইজাব ও কবুল সম্পন্ন হলেই হিবা শুদ্ধ হবে। যেমন: দাতা বলবে: তোমাকে দিলাম, উপহার দিলাম বা দান করলাম ইত্যাদি। আর অপরজন বলবে, গ্রহণ করলাম। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ি মনে করেন, হিবার ক্ষেত্রে কবুল বলাটা গুরুত্বপূর্ণ। তবে কোনো কোনো হানাফি ফকিহের মতে শুধু দাতার ইজাবই (প্রস্তাব) যথেষ্ট। প্রকৃতপক্ষে শেষোক্ত মতটাই সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ। হাম্বলি ফকিহগণ বলেন: পারস্পরিক লেনদেন দ্বারাই হিবা শুদ্ধ হবে। রসূলুল্লাহ্ সা. হাদিয়া পাঠাতেন ও গ্রহণ করতেন। সাহাবিরাও তদ্রূপ করতেন। তারা ইজাব ও কবুলের কোনো শর্ত আরোপ করতেন বলে শোনা যায়নি।

হিবার শর্তাবলী: হিবার জন্যে একজন হিবাকারী, একজন হিবা গ্রহণকারী এবং হিবা সামগ্রী প্রয়োজন। এই তিনটির প্রত্যেকটির জন্যে কিছু শর্ত রয়েছে।

হিবাকারীর শর্ত: হিবাকারীর মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তাবলী থাকা জরুরি:

১. প্রদত্ত সামগ্রীটির মালিকানা।
২. এমন কোনো ব্যক্তি না হওয়া, যাকে কোনো কারণে আইনত লেনদেন করতে নিষেধ করা হয়েছে।
৩. তার প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া। কেননা অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি লেনদেনের যোগ্য নয়।
৪. তার স্বেচ্ছায় ও স্বত:স্ফূর্তভাবে ও বলপ্রয়োগ ব্যতিরেকে হিবা করা। কেননা হিবার চুক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে সম্পাদিত হওয়া জরুরি।

যাকে হিবা করা হয় তার শর্তাবলী: যাকে হিবা করা হয় তার মধ্যে যেসব শর্ত থাকা প্রয়োজন: দান করার সময় তার বাস্তবে উপস্থিত থাকা জরুরি। সে যদি অনুপস্থিত থাকে কিংবা মায়ের গর্ভে থাকে, তবে হিবা বৈধ হবে না। দান করার সময় যাকে দান করা হয় সে যদি উপস্থিত থাকে কিন্তু সে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা পাগল হয়, তবে তার অভিভাবক বা লালন পালনকারী বা অছিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা গ্রহণ করবে, চাই সে অনাত্মীয় হোক না কেন।

হিবা বা দানের সামগ্রীর শর্তাবলী: দান বা হিবার সামগ্রীটির শর্ত হলো:

১. সেটি কার্যত উপস্থিত থাকা চাই।

২. এমন জিনিস হওয়া চাই, যার মূল্য আছে। (যা ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য)।

হাম্বলি ফকিহ্দের মতে পালিত কুকুর ও যেসব অপবিত্র জিনিস দ্বারা মানুষ উপকৃত হওয়া বৈধ, তা হিবা করা জায়েয।

৩. সামগ্রীটি যেন দাতার মালিকানাধীন হয়। অর্থাৎ যার লেনদেন ও হস্তান্তর বৈধ। তাই নদীর পানি, সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখি এবং মসজিদ ও ইবাদতখানা হিবার অযোগ্য। কেননা এসব জিনিস কারো মালিকানাধীন নয় এবং লেনদেন ও হস্তান্তরের অযোগ্য।

৪. সামগ্রীটি দাতার অন্যান্য সম্পত্তির সাথে স্থায়ীভাবে যুক্ত না হওয়া চাই, যেমন ফসল, বৃক্ষ ও ভিত্তি। সামগ্রীটি আলাদা করা জরুরি এবং যাকে দান করা হবে তার কাছে হস্তান্তর করা ও তাকে তার মালিক বানিয়ে দেয়া প্রয়োজন।

৫. সামগ্রীটি যৌথ মালিকানাধীন না হওয়া চাই। তার দখল পৃথকভাবে ব্যতীত শুদ্ধ নয়, যেমন ধনুকের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আহমদের মতে এটা শর্ত নয়। তারা বলেন, অবিভক্ত অবস্থায় যৌথ মালিকানাভুক্ত জিনিস দান করা জায়েয। মালেকি মযহাবে যে জিনিস বিক্রয় করা বৈধ নয়, তা হিবা করা বৈধ, যেমন পালানো উট, অপরিপক্ক ফল ও ফসল এবং জবরদখলকৃত সামগ্রী।

যে রোগে রোগীর মৃত্যু হয় সে রোগে রোগীর হিবা: যে রোগে রোগী মারা যায় সে রোগে আক্রান্ত থাকা অবস্থায় যদি কেউ কিছু দান করে, তবে তার বিধি হবে অসিয়তের মতো। অর্থাৎ যতোক্ষণ উত্তরাধিকারীরা অনুমতি না দেবে ততোক্ষণ তা দেয়া হবে না। কেউ যদি উত্তরাধিকারীদের কাউকে কোনো জিনিস হিবা করে, অত:পর মারা যায় এবং অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা দাবি করে যে, সে তার মৃত্যুর পূর্বকালীন রোগে আক্রান্ত অবস্থায় হিবা করেছে, কিন্তু যাকে হিবা করা হয়েছে সে দাবি করে যে, সুস্থ অবস্থায় হিবা করেছে, এমতাবস্থায় যাকে দান করা হয়েছে তার দায়িত্ব তার দাবির সত্যতা প্রমাণ করা। সে যদি তা না করে তবে ধরে নেয়া হবে যে, মৃত্যুপূর্ব রোগাবস্থায় হিবা করেছে এবং সে অনুযায়ী অসিয়তের বিধি কার্যকর হবে। উত্তরাধিকারীরা অনুমতি না দিলে হিবা অকার্যকর ও বাতিল গণ্য হবে। আর মৃত্যুপূর্ব রোগাবস্থায় হিবা করার পর দাতা সুস্থ হয়ে গেলে হিবা বৈধ হবে।

হিবাকৃত সামগ্রীর দখল: কোনো কোনো ফকিহ্ মনে করেন, যাকে হিবা করা হয়েছে নিছক হিবার চুক্তি বলেই হিবাকৃত সামগ্রীটি তার পাওনা হয়, দখল করা মোটেই শর্ত নয়। কেননা সকল চুক্তির ক্ষেত্রে এটাই মূলনীতি যে, দখলের শর্ত ছাড়াই তা বৈধ হয়, যেমন বিক্রয়। এটা ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ, আবু সাওর ও যাহেরি মযহাবের মত। এ মূলনীতির ভিত্তিতে দাতা বা যাকে দান করা হয়েছে সে জিনিসটি দখলে নেয়ার আগে মারা গেলে হিবা বাতিল হবে না। কেননা শুধু চুক্তির বলেই সে জিনিসটির মালিক হয়ে গেছে। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ি ও সাওরি বলেন: হিবাকৃত সামগ্রী দখলে নেয়া হিবার বৈধতার শর্ত। যতোক্ষণ হিবাগ্রহীতা তা দখল না করবে, ততোক্ষণ তা দাতার জন্যে বাধ্যতামূলক নয়। তাই দখলের পূর্বে দাতা বা যাকে দান করা হয়েছে সে মারা গেলে হিবা বাতিল হয়ে যাবে।

সমগ্র সম্পত্তি দান করা: অধিকাংশ আলেমের মতে কোনো মানুষ তার সমগ্র সম্পত্তি অন্যকে দান করে দিলে তা বৈধ। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ ও কোনো কোনো হানাফি ফকিহ্ বলেন: সমগ্র সম্পত্তি দান করা বৈধ হবে না, চাই তা যত বড় সৎ কাজেই করা হোক। এ ধরনের কাজ যে করবে তাকে তারা নির্বোধ গণ্য করেছেন এবং তার সমস্ত লেনদেনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা ওয়াজিব বলে মত প্রকাশ করেছেন। 'আর রওযাতুন নাদিয়্যাহ্' গ্রন্থের লেখক এ সম্পর্কে বলেন:

'অভাব অনটন ও অসচ্ছলতায় যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করতে পারে তার জন্যে নিজের অধিকাংশ বা সমগ্র সম্পত্তি দান করা বৈধ। কিন্তু যে ব্যক্তি অভাবে পড়লে অন্যের কাছে ভিক্ষার হাত পাতে, তার জন্যে অধিকাংশ বা সমগ্র সম্পত্তি দান করা বৈধ নয়।' এ মতটি দ্বারা এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তির বেশি দান করা বৈধ প্রমাণকারী ও অবৈধ প্রমাণকারী হাদিসগুলোর মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব বলে মনে করা যেতে পারে।

হাদিয়া বা উপহারের প্রতিদান: হাদিয়ার প্রতিদান দান করা মুস্তাহাব, চাই তা যত উঁচু স্তরের ব্যক্তির পক্ষ থেকে যত নিম্ন স্তরের ব্যক্তিকেই দেয়া হোক। কেননা ইমাম আহ্মদ, বুখারি, আবুদাউদ ও তিরমিযি আয়েশা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ্ সা. হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদান দিতেন।' ইবনে আবি শায়বার বর্ণনা মতে প্রাপ্ত হাদিয়ার চাইতে উৎকৃষ্ট মানের প্রতিদান দিতেন, যাতে কারো পক্ষ থেকে প্রদর্শিত সৌজন্য ও মহানুভবতায় তিনিও সমান অংশীদার হতে পারেন এবং কেউ এ জন্যে তাকে খোঁটা দেয়ার সুযোগ না পায়।

ইমাম খাত্তাবি বলেন: কিছু সংখ্যক ফকিহ্ হাদিয়া প্রদানের ক্ষেত্রে মানুষকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেন:

১. ভৃত্য প্রভৃতি নিম্নতর শ্রেণির লোকের মনিব বা অনুরূপ কোনো উচ্চতর পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষ থেকে হাদিয়া প্রাপ্ত। এটা স্নেহের নিদর্শন। এর প্রতিদান দেয়া জরুরি নয়।

২. নিম্নতর পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক উচ্চতর পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে হিবা বা হাদিয়া প্রদান। এটা সাধারণত সহানুভূতি ও কৃপা দৃষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রতিদান দেয়া জরুরি।

৩. সমমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে হিবা বা হাদিয়া প্রদান। এ ক্ষেত্রে প্রধানত প্রীতি ও নৈকট্য লাভই কাম্য হয়ে থাকে। কেউ কেউ বলেন: এতে প্রতিদান দেয়া যেতে পারে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে হিবার প্রতিদান দেয়া শর্ত, সে ক্ষেত্রে প্রতিদান দেয়া জরুরি।

সন্তানদের কাউকে অগ্রাধিকার দিয়ে হিবা করা: সন্তানদের কাউকে অন্য সন্তানের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে কিছু হিবা বা হাদিয়া করা অবৈধ। কেননা এতে পরিবারে বিভেদ, বিদ্বেষ ও শত্রুতার বীজ বপন করা হয় এবং যে পারস্পরিক সম্পর্ককে আল্লাহ্ মজবুত করার আদেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করা হয়। এটা ইমাম আহ্মদ, ইস্হাক, সাওরি, তাউস ও কোনো কোনো মালেকি ফকিহের মত। তারা বলেন: 'সন্তানদের মধ্যে বৈষম্য করা ও একজনকে অপরজনের উপর অগ্রাধিকার দান বাতিল ও যুলুম এবং যে ব্যক্তি এ কাজ করে স্বয়ং তারই এটা রহিত করা ওয়াজিব। ইমাম বুখারি এ মতটি দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ করেছেন এবং প্রমাণ স্বরূপ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণিত এ হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন ; 'সন্তানদের মধ্যে দানের বেলায় সমতা অবলম্বন কর। আমি যদি কাউকে অগ্রাধিকার দিতাম তবে মেয়েদেরকে দিতাম।' (তাবরানি, বায়হাকি)

ইমাম আহ্মদের মত হলো, বিশেষ কোনো কারণ না থাকলে সন্তানদের মধ্যে কাউকে কারো উপর অগ্রাধিকার দেয়া হারাম। কিন্তু অগ্রাধিকার দেয়ার কোনো কারণ বা প্রয়োজন থাকলে এটা দূষণীয় নয়। 'আলমুগ্নি' গ্রন্থে বলা হয়েছে: পিতা যদি কোনো সন্তানকে এমন কোনো কারণে অগ্রাধিকার দেয়, যা অগ্রাধিকার দাবি করে, যেমন কোনো সন্তানের পরমুখাপেক্ষিতা, বিকলাঙ্গতা বা প্রতিবন্ধিতা, অন্ধত্ব, অধিক সন্তান, জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত থাকা, অথবা অনুরূপ কোনো উত্তম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া, কিংবা কোনো সন্তান ফাসিক বা অবেদাতী হওয়া, বা পিতার দেয়া হিবা বা হাদিয়াকে গুনাহ্র কাজে ব্যবহার বা ব্যয় করার কারণে উক্ত সন্তানকে কোনো হিবা থেকে বঞ্চিত করাকে ইমাম আহ্মদ অনুমোদন করেন বলে কোনো কোনো বর্ণনা সূত্রে জানা গেছে।

ইমাম শাবি সূত্রে বর্ণিত, নুমান ইবনে বশির বলেন: 'আমার পিতা আমাকে একটা উপহার দিলেন। এই হাদিসের জনৈক বর্ণনাকারী ইসমাইল ইবনে সালিম বলেন: নুমান ইবনে বশিরকে তার পিতা একটা ভৃত্য দিয়েছিল। তখন তার পিতাকে আমার মাতা উমরা বিনতে রওয়াহা বললেন: রসূলুল্লাহ্ সা. এর কাছে যাও এবং তাকে সাক্ষী রাখ। সে রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট গিয়ে তাঁকে ব্যাপারটা জানালো। সে বললো: আমি আমার ছেলে নুমানকে একটা উপহার দিয়েছি। এ ব্যাপারে আপনাকে সাক্ষী রাখতে উমরা আমাকে পরামর্শ দিয়েছে। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: নুমান ছাড়া তোমার আর কোনো সন্তান আছে? সে বললো: আছে। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: নুমানকে যা দিয়েছ, তাদের প্রত্যেককে কি তদ্রূপ উপহার দিয়েছ? সে বললো: না। অত:পর এই সব বর্ণনাকারীর কেউ কেউ নুমানের পিতাকে বললো: এটা অন্যায়। আবার কেউ কেউ বললো: এটা অন্যায় আসকারা। কাজেই আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে এ ব্যাপারে সাক্ষী রাখ। মুগীরা বললেন: তোমার সন্তানরা সবাই তোমার নিকট সমান স্নেহধন্য ও তোমার প্রতি সমান যত্নশীল হোক, তা কি তুমি চাওনা? সে বললো: হাঁ। তখন মুগীরা বললেন: তাহলে এ কাজে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে সাক্ষী রাখ। মুজাহিদ তাকে বললেন: তোমার সন্তানদের তোমার কাছ থেকে ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। অনুরূপ তোমারও তাদের কাছ থেকে সদাচার ও যত্ন লাভের অধিকার রয়েছে।'

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম বলেন: 'যে ন্যায়বিচারের আদেশ আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে দিয়েছেন, যে ন্যায়বিচারের উপর আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, এবং যে ন্যায় বিচারের উপর ইসলামী শরিয়ত দণ্ডায়মান, সে ন্যায় বিচারের একটা বিশদ বিবরণ এই হাদিসটিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যত রকমের যুক্তিতর্ক আছে, তার সব কিছুর চাইতে এ হাদিস কুরআনের সাথে অধিকতর সংগতিশীল এবং এটি একটি অকাট্য প্রমাণ।' হানাফি, শাফেয়ি, মালিকি ও অধিকাংশ ফকিহের মত হলো, সন্তানদের মধ্যে সমতা অবলম্বন করা মুস্তাহাব এবং কাউকে কারো উপর অগ্রাধিকার দেয়া মাক্রূহ, হারাম নয়। কেউ যদি অগ্রাধিকার দেয় তবে তা কার্যকর হবে। নু'মান ইবনে বশিরের হাদিসের তারা দশটি জবাব দিয়েছেন।

কিন্তু এই দশটি জবাবই ভুল। এই জবাবগুলো হাফেজ ইবনে হাজর 'ফাত্হুল বারি' গ্রন্থে উদ্বৃত করেছেন। শওকানি 'নাইলুল আওতারে'ও উদ্ধৃত করেছেন:

এক: ইবনে আব্দুল বার বর্ণনা করেন যে, নুমান ইবনে বশিরকে তার পিতা যে উপহার দিয়েছিল, তা ছিলো তার সমগ্র সম্পত্তি। অথচ হাদিসটি একাধিক সূত্রে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে: তাতে স্পষ্ট যে, ওটা সমগ্র সম্পত্তি ছিলনা, বরং তার একটা অংশ মাত্র। ইমাম মুসলিমের বর্ণনায়ও বলা হয়েছে: 'আমার পিতা আমাকে তার সম্পত্তির একটা অংশ দিলেন।' অন্য হাদিসে বলা হয়েছে যে, একটি ভৃত্য দিয়েছিলেন।

দুই: উল্লিখিত উপহারটি বাস্তবে দেয়া হয়নি, শুধু প্রস্তাব করা হয়েছিল। বশির ঐ বিষয়ে রসূলুল্লাহ্ সা. এর পরামর্শ নিতে এসেছিলেন। রসূলুল্লাহ্ সা. এটা না করার পরামর্শ দিলে তিনি এটি পরিহার করেন। এটা তাবারীর বর্ণনা।

এর জবাব এই যে, রসূলুল্লাহ্ সা. কর্তৃক উপহার প্রত্যাহারের আদেশ থেকে বুঝা যায়, উপহার দেয়া হয়েছিল। উমরা কর্তৃক রসূল সা. কে সাক্ষী করার অনুরোধ থেকেও অনুরূপ ধারণা পাওয়া যায়।

তিন: নুমান প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন এবং তিনি তখনো উপহারটি হস্তগত করেননি। তাই তার পিতা সেটি প্রত্যাহার করতে পেরেছিলেন। এটা ইমাম তাহাবির বর্ণনা। হাফেজ ইবনে হাজর বলেন: এটা অধিকাংশ বর্ণনার বিপরীত। বিশেষত রসূলুল্লাহ্ সা. এর উক্তি: 'ফেরত নাও' প্রমাণ করে যে, আগেই উপহারটি হস্তগত করা হয়েছিল। তা ছাড়া অধিকাংশ বর্ণনা থেকে জানা যায়, নুমান তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন এবং সে কারণে তা তার পিতার কাছেই সংরক্ষিত ছিলো। তাই রসূল সা. তাকে উক্ত উপহার ফেরত নেয়ার আদেশ দেন। কেননা পিতার কাছে থাকলেও তা সন্তানের দখলে থাকার সমার্থক ছিলো।

চার: রসূলুল্লাহ্ সা. এর উক্তি 'উপহারটি ফেরত নাও' উপহার দেয়ার বৈধতা প্রমাণ করে। যদি বৈধ না হতো তাহলে ফেরত নেয়া বৈধ হতোনা। তিনি ফেরত নেয়ার আদেশ এ জন্যেই দিয়েছিলেন যে, পিতা সন্তানকে যা দেয় তা ফেরত নেয়ার অধিকার তার থাকে। অবশ্য তা না করাই উত্তম। তবে সন্তানদের প্রতি সমান আচরণ করা মুস্তাহাব হওয়ায় তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজর বলেন: এই যুক্তি ভ্রান্ত। রসূলুল্লাহ্র উক্তি 'ফেরত নাও' এর অর্থ হিবাটি কার্যকর করোনা। আর এ দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, হিবাটি ইতোপূর্বে বৈধ ছিলো।

পাঁচ: 'আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে এ ব্যাপারে সাক্ষী কর' কথাটা দ্বারা এ কাজে সাক্ষী রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তিনি নিজে সাক্ষী হতে চাননি তার কারণ এই যে, তিনিই সর্বোচ্চ শাসক। সর্বোচ্চ শাসকের পক্ষে সাক্ষী হওয়া মানায়না। তিনি তো ফায়সালাকারী। এটা তাহাবির বর্ণনা।

এর জবাব এই যে, শাসকের সাক্ষী হওয়া মানায়না বলে তিনি যখন সাক্ষী হয়েই গিয়েছেন তখন সাক্ষী হওয়া থেকে বিরত থাকা তার জন্য জরুরি নয়। হাদিসের অবশিষ্ট অংশ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অন্যকে সাক্ষী করার অনুমতি দান আসলে তার ক্ষোভ প্রকাশের সমার্থক। ইবনে হাজর বলেন: অধিকাংশ ফকিহের মত এটাই।

ছয়: রসূলুল্লাহ্ সা. এর উক্তি: 'তুমি কি সকল সন্তানের সাথে সমান আচরণ করনি? থেকে প্রমাণিত হয় যে, সমান আচরণের আদেশ যে হাদিসে আছে, তার অর্থ মুস্তাহাব এবং নিষেধাজ্ঞার অর্থ মাকরূহ তান্যিহি। কিন্তু বর্ণনায় ইবনে হাজর বলেন: এ জবাবটি সঠিক হতো যদি অপর বর্ণনায় সরাসরি এরূপ নির্দেশ না থাকতো: 'সন্তানদের মধ্যে সমান আচরণ কর।'

সাত: নুমান বর্ণিত হাদিসে 'সন্তানদের মধ্যে নৈকট্য বজায় রাখ' বলা হয়েছে, 'সমতা বজায় রাখ' নয়। তবে জবাবে বলা হয়েছে যে, আপনারা তো সমতা ও নৈকট্য কোনোটাই জরুরি মনে করেন না।

আট: সন্তানদের প্রতি ইনসাফ ও সমআচরণের সাথে পিতার প্রতি সন্তানদের যত্ন সমাদরের তুলনা প্রমাণ করে যে, সমআচরণের আদেশ মুস্তাহাব অর্থবোধক। এই জবাব ভুল এ জন্যে যে, সমান আচরণ না করাকে যুলুম আখ্যায়িত করা ও অগ্রাধিকার দিতে নিষেধ করা প্রমাণ করে যে, সমআচরণ করা ওয়াজিব।

নয়: অন্য হাদিস থেকে জানা যায়, আবু বকর রা. আয়েশা রা. কে উপহার দিয়েছেন এবং তাহাবির বর্ণনা

থেকে জানা যায়, উমর রা. আসেমকে উপহার দিয়েছেন, অন্যান্য সন্তানকে দেননি। অগ্রাধিকার দেয়া নাজায়েয হলে এই দুই খলিফা তা করতেন না। এর জবাব এই যে, উভয় ক্ষেত্রে অন্যান্য সন্তানের সম্পত্তি ছিলো। তা ছাড়া রসূলুল্লাহ সা. এর উক্তির সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক হলে আবু বকর রা. ও উমা রা. যাই করুন না কেন, তা গ্রহণযোগ্য হবেনা।

দশ: এটা সর্বসম্মত মত যে, সন্তান ছাড়া অন্য কাউকে নিজের সম্পত্তি দান করা জায়েয। সকল সন্তানকে বঞ্চিত করে অন্যকে দেয়া যখন জায়েয, তখন কতক সন্তানকে বঞ্চিত করা তো জায়েয হবেই। ইবনে হাজর বলেন: এ বক্তব্য ভুল। কেননা কুরআন বা হাদিসের সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকা অবস্থায় কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং সন্তানদের প্রতি সমান আচরণ ওয়াজিব এবং বৈষম্য হারাম।

সন্তানদের প্রতি সম আচরণের ধরন: যারা সম আচরণ ওয়াজিব মনে করেন, তারা এর ধরন নির্ণয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। মুহাম্মদ, আহ্মদ, ইসহাক এবং শাফেয়ি ও মালেকি ফকিহ্দের কেউ কেউ বলেন: উত্তরাধিকারের ন্যায় পুরুষ সন্তানকে কন্যা সন্তানের দ্বিগুণ দেয়াই ন্যায়বিচার। তাদের যুক্তি এই যে, বাবা মারা গেলে তো সন্তানরা এ রকমই পেতো। অন্যদের মত হলো, ছেলে ও মেয়েতে কোনো পার্থক্য নেই। যেহেতু হাদিসে স্পষ্টভাবে সমতার উল্লেখ রয়েছে, তাই সমতাই শিরোধার্য।

হিবা ফেরত নেয়া: অধিকাংশ আলিমের মতে হিবা ফেরত নেয়া হারাম, চাই তা ভাইবোনদের বা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই হোক না কেন। তবে পিতা সন্তানকে যা হিবা করে তা ফেরত নিতে পারে।

ইমাম মালেক বলেন: পিতা সন্তানকে দেয়া সামগ্রী ততক্ষণই ফেরত নিতে পারে, যতক্ষণ তা পরিবর্তিত না হয়। পরিবর্তিত হয়ে গেলে ফেরত নিতে পারবে না। ইমাম আবু হানিফা বলেন: শুধু রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় নয় এমন ব্যক্তিকে দেয়া সামগ্রী ফেরত নেয়া যায় না। ইমাম আবু হানিফার এ মত হাদিসের পরিপন্থী হওয়ায় শক্তিশালী নয়।

আবুদাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি ও ইবনে মাজা ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'কোনো ব্যক্তির জন্য এটা বৈধ নয় যে, কাউকে কোনো সামগ্রী দান করার পর তা ফেরত নেবে। কেবল পিতা সন্তানকে দেয়া সামগ্রী ফেরত নিতে পারে। যে ব্যক্তি কাউকে কিছু দেয়ার পর তা ফেরত নেয় সে সেই কুকুরের মত, যে তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পর বমি করে এবং পরক্ষণে তার বমি খেয়ে নেয়।' (তিরমিযি এ হাদিসকে সহিহ বলেন।) এ হাদিস থেকে আরো জোরদারভাবে প্রমাণিত হলো যে, সন্তান ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে প্রদত্ত সামগ্রী ফেরত নেয়া হালাল নয়।

অনুরূপ প্রতিদান পাওয়ার জন্যে যে হিবা করা হয়, তা প্রতিদান না পেলে ফেরত নেয়া যায়। সালেম বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: যে ব্যক্তি কাউকে কোনো সামগ্রী হিবা করলো, সে যতোক্ষণ তার প্রতিদান না পায় ততোক্ষণ তা ফেরত পাওয়ার জন্যে সে অধিকতর হকদার।' ইবনুল কাইয়িম 'আলামুল মুকিইন' গ্রন্থে এই মতকে অগ্রাধিকার দিয়ে বলেন: 'শুধু সেই হিবাকারীর জন্যে হিবাকৃত জিনিস ফেরত নেয়া হারাম, যে কোনো রকম প্রতিদানের আশা ব্যতীতই হিবা করে। যে হিবাকারী প্রতিদান লাভের জন্যে হিবা করে এবং প্রতিদান পায়না, সে তার হিবাকৃত জিনিস ফেরত নিতে পারে। রসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নাত পুরোপুরিভাবে পালন করা উচিত, আংশিকভাবে নয়।'

যে সকল হিবা ও হাদিয়া ফেরত নেয়া যায় না: ১. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: তিনটি হিবা ফেরত নেয়া যায়না: বালিশ, সুগন্ধি দ্রব্য ও দুধ। (তিরমিযি)।

২. আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: যাকে কোনো ফুল দেয়া হয় সে যেন তা ফেরত না দেয়। কারণ তা সহজে বহনযোগ্য এবং সুগন্ধিযুক্ত। -মুসলিম।

৩. আনাস রা. বলেন: রসূলুল্লাহ সা. কোনো সুগন্ধি প্রত্যাখ্যান করতেন না।

হাদিয়াদাতার প্রশংসা করা ও তার জন্যে দোয়া করা: ১. আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহ্র প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা। (আহমদ, তিরমিযি)।

২. জাবির রা. সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'যে ব্যক্তিকে কোনো উপহার দেয়া হয়, সে যদি তার প্রতিদান দিতে সক্ষম হয় তবে তা দেয়া উচিত। আর সক্ষম না হলে তার প্রশংসা করা ও ধন্যবাদ দেয়া উচিত। যে প্রশংসা করে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যে প্রশংসা গোপন করে সে অকৃতজ্ঞ। আর যে ব্যক্তি এমন জিনিস দ্বারা সাজসজ্জা করে যা তাকে দেয়া হয়নি, সে যেন প্রতারণার পোশাক পরে। (আবুদাউদ, তিরমিযি)।

৩. উসামা ইবনে যায়দ রা. সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: যার প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করা হলো এবং সে সৌজন্য প্রকাশকারীকে বললেন: আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন সে প্রচুর প্রশংসা করলো। (তিরমিযি)।

৪. আনাস রা. বলেন: রসূলুল্লাহ্ সা. মদিনায় এলেন, তাঁর কাছে মুহাজিরগণ এসে বললো: হে রসূলুল্লাহ, আমরা এখানে যাদের কাছে এসেছি, তাদের চাইতে অকাতরে ধন-সম্পদ দানকারী এবং সহানুভূতিশীল মানুষ আর দেখিনি। তারা আমাদের জন্যে প্রচুর পরিশ্রম করে এবং তাদের প্রাচুর্যে আমাদেরকে শরিক করে। ফলে আমাদের আশংকা জন্মেছে যে, আখিরাতের সমস্ত সওয়াব তারাই নিয়ে যাবে। তিনি বললেন: না, যতোক্ষণ তোমরা তাদের প্রশংসা করবে ও তাদের জন্যে দোয়া করবে ততোক্ষণ তোমরাও সওয়াবে শরীক থাকবে।' (তিরমিযি)।

চুয়াত্তরতম অধ্যায়

উম্‌রা

সংজ্ঞা: উম্‌রা এক ধরনের হিবা, যা কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন ভোগ করার জন্যে দেয় এবং তার মৃত্যুর পর তা দাতার নিকট ফেরত আসে। এর জন্যে বিভিন্ন রকমের বাক্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন 'তোমাকে এ জিনিসটা জীবন সত্ত্ব দিলাম।' বা 'এই বাড়িটা আজীবন ভোগ দখলের জন্যে দিলাম'। রসূল্ সা. দাতার মালিকানায় ফেরত আসার ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছেন। যাকে দান করা হয় তার মৃত্যুর পর উক্ত দানকৃত সামগ্রী তার উত্তরাধিকারীদের মালিকানাভুক্ত হবে। উত্তরাধিকারী না থাকলে তা বাইতুল মালে যাবে। কিন্তু কোনো অবস্থায়ই তা দানকারী বা হিবাকারীর নিকট ফেরত যাবেনা।

১. উরওয়া রা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'উমরা যাকে দেয়া হয় তারই থাকবে।' (বুখারি, মুসলিম, আবুদাউদ ও নাসায়ি)।

৩. আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রসূল সা. বলেন: 'উমরা বৈধ।' (বুখারি, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসায়ি)।

৪. আবু সালমা রা. সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'উমরা যাকেই দেয়া হোক, তা তারই থাকবে এবং তার পরে তার উত্তরাধিকারীদের থাকবে। তা কখনো দাতার কাছে ফেরত যাবেনা। সে এমন জিনিস দিয়েছে, যার উপর উত্তরাধিকার বলবৎ হয়েছে।' (মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি, ইবনে মাজা)।

৫. আবুদাউদ তারেক মক্কী সূত্রে বর্ণনা করেন, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ বলেন: জনৈক আনসারী মহিলাকে তার ছেলে একটা খেজুরের বাগান দান করেছিল। অত:পর মহিলা মারা গেল। তখন ছেলেটি বললো: বাগানটি তো আমি মাকে আজীবন ভোগ করার জন্যে দিয়েছিলাম। তার কয়েকজন ভাই ছিলো। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: ঐ বাগান মহিলার জীবনভর ভোগের জন্য এবং মৃত্যুর পরেও। সে বললো ; আমি ওটা তাকে সদ্‌কা করেছি। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: 'সেটি তোমার জন্যে আরো সুদূর পরাহত।' (সদকা করলে তো ফেরত পাওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা।) এটাই হানাফি, শাফেয়ি ও ইমাম আহমদের মত। ইমাম মালেক বলেন: উম্‌রা কোনো জিনিসের শুধু উপকারিতা ভোগ-দখলের জন্যে দেয়া হয়, মূল জিনিসের মালিকানা দেয়া হয় না। কেউ কাউকে উমরা দিলে সেটা শুধু তার আজীবন ভোগ দখলের জন্য, উত্তরাধিকার হিসাবে হস্তান্তরিত হবে না। তবে দাতা যদি উল্লেখ করে যে, ওটা তার ও তার উত্তরসূরীদের জন্যে, তাহলে তা উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিত হবে। কিন্তু ইমাম মালেকের এই মত উল্লিখিত হাদিসের পরিপন্থী।

পঁচাত্তরতম অধ্যায়

রুক্বা

সংজ্ঞা: রুক্বা হচ্ছে একজন কর্তৃক আরেকজনের নিকট এরূপ প্রস্তাব দেয়া: 'আমার বাড়িটা তোমাকে রুক্বা দিলাম, তোমাকে ওটা আজীবন ভোগদখলের জন্যে দিলাম। তুমি যদি আমার আগে মারা যাও, তাহলে ওটা আমার কাছে ফিরে আসবে। আর যদি তোমার আগে আমি মারা যাই, তাহলে ওটা তোমার ও তোমার পরবর্তীদের থাকবে।' দু'জনের মধ্যে যে জন পরে মারা যাবে, বাড়িটি তার হবে। মুজাহিদ বলেন: যদি কেউ অপর জনকে বলে: ' এ জিনিসটা তুমি যতোদিন বেঁচে থাকবে ততোদিন তোমার' তাহলে তা উমরা, আর যদি বলে: 'আমার ও তোমার মধ্যে যে পরে মারা যাবে এটা তার' তাহলে তা হবে রুক্বা।

বৈধতা: শরিয়তে রুক্বা বৈধ।

জাবির রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'উম্রা যাকে দেয়া হয় তার জন্যে বৈধ। রুক্বাও যাকে দেয়া হয় তার জন্যে বৈধ।' -(আবুদাউদ, নাসায়ি, ইবনে মাজা)।

বিধান: ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আহ্মদের মতে রুকবা উম্রার মতো।

ইমাম আবু হানিফার মতে উম্রা উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিত হয়। আর রুকবা ধারে দেয়া হয়।

ছিয়াত্তরতম অধ্যায়

খোরপোশ বা ভরণ-পোষণ

ইতোপূর্বে আমরা স্বামীর উপর স্ত্রীর খোরপোশের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছি। বাকি রয়েছে ছেলের উপর পিতামাতার ভরণ-পোষণ, পিতার উপর ছেলের এবং আত্মীয়-স্বজন ও জীবজন্তুর জন্য ব্যয় নির্বাহের দায়িত্বের কথা।

পিতামাতার খোরপোশের দায়িত্ব ও ছেলের সম্পদ থেকে তা আদায়: ছেলে যখন স্বচ্ছল এবং পিতামাতা অস্বচ্ছল থাকে, তখন ছেলের উপর পিতামাতার খোরপোশের দায়িত্ব অর্পিত। আম্মারা ইবনে উমাইরের ফুফু আয়েশা রা. কে জিজ্ঞাসা করলেন: আমি একজন ইয়াতিম পালন করি। আমি কি উক্ত ইয়াতিমের সম্পত্তি থেকে প্রয়োজনীয় খোরপোশ নিতে পারি? তখন আয়েশা রা. বললেন: রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: যে কোনো ব্যক্তির সর্বোত্তম খোরপোশ হচ্ছে যা সে নিজের আয় থেকে গ্রহণ করে, অনুরূপ তার সন্তানের সর্বোত্তম খোরপোশ হচ্ছে যা সে তার আয় থেকে গ্রহণ করে।' -(আবুদাউদ, নাসায়ি, ইবনে মাজা, তিরমিযি)। পক্ষান্তরে ছেলের সম্পত্তি থেকে পিতামাতার খোরপোশ গ্রহণ করা জায়েয, চাই ছেলে তার অনুমতি দিক বা না দিক। আর অপচয়, অপব্যয় ও নির্বোধ সুলভ খরচ না করলে পিতামাতার জন্যে ছেলের সম্পত্তি থেকে খরচ করাও জায়েয। এর প্রথম প্রমাণ উপরোল্লিখিত হাদিস আর দ্বিতীয় প্রমাণ জাবির রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিস: এক ব্যক্তি বললো: হে রসূলুল্লাহ্, আমার সম্পত্তি আছে, সন্তান আছে। অথচ আমার পিতা আমার সম্পত্তি সাবাড় করে নিতে চান। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: তুমি ও তোমার সম্পত্তি তোমার পিতার।' -ইবনে মাজা। উল্লেখ্য, এখানে 'তোমার সম্পত্তি তোমার পিতার' কথাটার অর্থ এ নয় যে, পিতাই ছেলের সম্পত্তির মালিক। কেননা ছেলেই তার উপার্জিত সম্পত্তির মালিক, তার যাকাত দেয়াও তারই দায়িত্ব এবং তার সন্তানরা তার উত্তরাধিকারীও।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম মালিকের মত হলো, পিতা ছেলের সম্পদ থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করতে পারবে না। আর ইমাম আহমদের মতে প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে যতো খুশি গ্রহণ করতে পারবে।

সচ্ছল পিতা অসচ্ছল সন্তানের খোরপোশের জন্য দায়ী: অসচ্ছল পিতার ভরণ-পোষণের জন্যে যেমন সচ্ছল সন্তান দায়ী, ঠিক তেমনি অসচ্ছল সন্তানের ভরণ-পোষণের জন্যে সচ্ছল পিতা দায়ী। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. হিন্দকে (আবু সুফিয়ানের স্ত্রী) বলেছিলেন: 'তোমার ও তোমার ছেলের যতোটা প্রয়োজন, ততোটা তার (স্বামীর) সম্পত্তি থেকে গ্রহণ কর।' ইমাম আহ্মদ বলেন: সন্তান যদি অসচ্ছল অবস্থায় অথবা বেকার অবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং তার কোনো সম্পত্তি বা উপার্জন না থাকে, তবে পিতা তার ভরণ-পোষণের দায় থেকে অব্যাহতি পাবেনা।

অসচ্ছল আত্মীয়দের ভরণ-পোষণ: সচ্ছল আত্মীয়রা অসচ্ছল আত্মীয়দের ভরণ-পোষণের জন্য দায়ী কিনা, সে ব্যাপারে ফকিহ্দের বিপুল মতপার্থক্য রয়েছে। একদল বলেন: এটা বাধ্যতামূলক নয়, তবে রক্তের বন্ধন রক্ষা ও সদাচার হিসাবে যতোটা দরকার করা উচিত। ইমাম শওকানি বলেন: রক্ত সম্পর্ক রক্ষা করতে যতোটা প্রয়োজন, তার বেশি আত্মীয়ের প্রতি আত্মীয়ের কোনো দায় নেই। রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় ছাড়া অন্য কোনো পর্যায়ের আত্মীয়ের ভরণ পোষণ জরুরি না হওয়ার কারণ এই যে, এর স্বপক্ষে কুরআন বা হাদিসে কোনো প্রমাণ নেই। বরঞ্চ কিছু হাদিসে শুধু রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা বজায় রাখার নির্দেশনা আছে। তবে সেগুলো সাধারণ ধরনের। আর যে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ভরণ পোষণ অন্যের মুখাপেক্ষী, সে আত্মীয়ই আত্মীয়তা নিবিড় করণের অধিক হকদার। আল্লাহ্ সূরা তালাকের ৭ নং আয়াতে বলেছেন:

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰهُ اللّٰهُ ط لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰهَا ط سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ○

'বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত, সে আল্লাহ্ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। আল্লাহ্ কষ্টের পর স্বস্তি দেবেন।' এবং সূরা বাকারার ২৩৬ নং আয়াতে বলেন:

عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ- 'বিত্তবান তার সাধ্যমত এবং বিত্তহীন তার সামর্থ্য অনুযায়ী বিধিমত খরচের ব্যবস্থা করবে।'

শাফেয়ি মযহাবের মত হলো: সচ্ছল আত্মীয় মুসলমান হোক বা অমুসলমান, তার উপর বাপ, দাদা, থেকে যত উর্ধ্বের হোক এবং পুত্র ও পৌত্র থেকে যত নিম্নের হোক, তাদের ভরণ-পোষণ দেয়া ওয়াজিব। এই দুই শ্রেণী ব্যতীত আর কোনো আত্মীয়ের ভরণ-পোষণ দেয়া ওয়াজিব নয়।

মালেকি মযহাবের মত হলো: পিতা, মাতা, ছেলে ও মেয়ে ছাড়া আর কোনো আত্মীয়ের ভরণ-পোষণ ওয়াজিব নয়। দাদা, পৌত্র ও অন্য কোনো আত্মীয়ের ভরণ-পোষণ ওয়াজিব নয়। ধর্মের পার্থক্য ভরণ-পোষণ বাধ্যবাধকতার অন্তরায় নয়। হাম্বলি মযহাবের মত হলো: যে সচ্ছল আত্মীয় দরিদ্র আত্মীয়ের মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, সেই সচ্ছল আত্মীয়ের উপর দরিদ্র আত্মীয়ের ভরণ পোষণ ওয়াজিব। এটা উত্তরাধিকারের পাশাপাশি অপ্রতিহত গতিতে চলতে থাকে। কেননা আয় দ্বারাই ব্যয় নির্বাহ হয়। তাছাড়া অধিকারগুলো দ্বিপক্ষীয় বিষয়, একতরফা বিষয় হয়। পিতামাতা ও তদুর্ধ্বের সকলের জন্যে এবং ছেলে ও তদনিম্নের সকলের জন্যে ভরণ পোষণ জরুরি। তাদের মতে, রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় যারা উত্তরাধিকারের অংশ পায়না এবং যারা পিতার দিকের আত্মীয় নয়, তারা যদি ও উর্ধ্বতনদের ও নিম্নতনদের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে কোনো ভরণ-পোষণ পাবেও না, কাউকে দিতেও বাধ্য নয়। কেননা একেতো তাদের আত্মীয়তার বন্ধন দুর্বল, তদুপরি কুরআন ও সুন্নাহতে তাদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো আদেশ নেই। ইবনে হায্ম বিষয়টিকে ব্যাপকতর রূপ দিয়ে বলেন:

'যার ভরণ-পোষণ দেয়ার সামর্থ্য আছে সে তার পরমুখাপেক্ষী ও অস্বচ্ছল পিতামাতা, দাদাদাদী ও

উর্ধ্বতনদের এবং ছেলে মেয়ে পৌত্র দৌহিত্র ও নিম্নতনদরে ভরণ-পোষণ দিতে বাধ্য থাকবে। অনুরূপ সে ভাই বোন ও স্ত্রীদেরও ভরণ-পোষণ দিতে বাধ্য থাকবে। এই সকল ব্যক্তিবর্গকে সমভাবে ভরণ-পোষণ দেয়া ওয়াজিব। এদের কাউকে কারো উপর অগ্রাধিকার দেয়া হবেনা। এদের ভরণ পোষণের পর কিছু যদি উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তা রক্ত সম্পর্কীয় মুহাররমদের ও যাদের উত্তরাধিকার সে পাবে (তাদের মৃত্যুর পর) তাদের ভরণ-পোষণ দিতে তাকে বাধ্য করা হবে, যদি উল্লিখিত আত্মীয়রা নিস্ব ও উপার্জনহীন হয়। এ সব আত্মীয় হচ্ছে চাচা, ফুফু ও উর্ধ্বতন, মামা, খালা ও উর্ধ্বতন, ভাইয়ের সন্তানেরাও নিন্মতল। এদের মধ্য থেকে যারা আয়-রোজগারে সক্ষম হবে, চাই তা যত সামান্যই হোক, তারা আর ভরণ পোষণের অধিকারী হবে না। তবে পিতামাতা, দাদাদাদী ও স্ত্রীরা সর্বাবস্থায় ভরণ-পোষণের হকদার থাকবে। এ সব আত্মীয়কে অপর্যাপ্ত উপার্জনের উপর নির্ভরশীলতা থেকে রক্ষা করতে সে অসমর্থ হলে তাকে তা করতে বাধ্য করা হবে। প্রয়োজনে তার উদ্বৃত্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে।

জীবজন্তুর ভরণ-পোষণ: জীবজন্তুর জীবন ধারণে যা কিছু খাদ্য ও পানীয় অপরিহার্য, তা যোগান দেয়া তার মালিকের উপর ওয়াজিব। যদি না দেয় তবে শাসক তা দিতে অথবা জীবগুলো বিক্রয় বা যবাই করতে তাকে বাধ্য করবে। অন্যথায় শাসক যা অপেক্ষাকৃত কল্যাণকর তা করবে।

১. ইবনে উমার রা. সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: জনৈকা মহিলাকে এজন্যে আযাব দেয়া হয়েছিল যে, সে একটা বিড়ালকে আটক রেখেছিল। এর ফলে শেষ পর্যন্ত বিড়ালটি মারা যায়। আটক অবস্থায় তাকে কিছু খেতেও দেয়নি, কিছু পানও করায়নি। আর তাকে ছেড়েও দেয়নি যে মাটির উপর পড়ে থাকা আজেবাজে জিনিস খাবে। এজন্যে মহিলাটি দোযখে যায়।

২. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে পিপাসায় কাতর হয়ে পথিপার্শ্বে একটা কুয়া দেখে তাতে নেমে পানি পান করলো। পান করে যখন উপরে উঠলো, দেখলো একটা কুকুর পিপাসায় ছটফট করছে ও ভিজে মাটি চেটে খাচ্ছে। লোকটি মনে মনে বললো পিপাসায় আমার যে শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল কুকুরটার তদ্রূপ অবস্থা হয়েছে। তখন সে আবার কূয়ায় নামলো, নিজের পায়ের মোজায় করে পানি ভরে মুখ দিয়ে চেপে ধরে উপরে এনে এবং কুকুরকে পান করালো। আল্লাহ্ এজন্যে তার শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন এবং তার গুনাহ মাফ করলেন।' লোকেরা বললো: হে রসূলুল্লাহ্ জীবজন্তুর সেবা করলেও আমরা সওয়াব পাবো?' রসূলুল্লাহ সা. বললেন: যে কোনো প্রাণীর সেবা করলেই সওয়াব রয়েছে।

সাতাত্তরতম অধ্যায়

হিজ্‌র

সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ: শরিয়তের বা ফিকহের পরিভাষায় হিজ্‌র বলা হয় কারো সম্পদের ব্যবহার ও লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। হিজ্‌র দুই প্রকার:

১. অন্যের অধিকার রক্ষার্থে হিজ্‌র। যেমন: সেই দেউয়া ব্যক্তির উপর হিজ্‌র, যার পুরো সম্পত্তি ঋণে আটকা পড়েছে। এ ধরনের ব্যক্তিকে তার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত রাখা হয়, যাতে তার ঋণদাতাদের অধিকার সুরক্ষিত থাকে অর্থাৎ তাদের ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত থাকে। রসূলুল্লাহ্ সা. মুয়াযের উপর হিজ্‌র (নিষেধাজ্ঞা) আরোপ করেছিলেন এবং তার সম্পত্তি বিক্রয় করে তার ঋণ পরিশোধ করেন। (সাঈদ ইবনে মানসূর কর্তৃক বর্ণিত)

২. ব্যক্তির স্বীয় স্বার্থ রক্ষার্থে হিজর: যেমন কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও পাগলের উপর হিজ্‌র। এতে এদের সম্পত্তি রক্ষা পায়।

দেউলিয়ার উপর হিজ্‌র: দেউলিয়া সে ব্যক্তি, যার নিজের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের উপযোগী সম্পদ নেই। তার কিছু সম্পত্তি থাকলেও যেহেতু সে গোটা সম্পত্তিই ঋণ পরিশোধে ব্যয় করা প্রয়োজন, তাই তার সম্পত্তি কার্যত পাওনাদারদের প্রাপ্য। কাজেই কার্যত সে নি:স্ব। ফকিহ্‌দের ভাষায় সে এমন এক ব্যক্তি, যার ঋণ এতো বেশি হয়ে গেছে যে, তা সে শোধ করতে পারেনা। তাই শাসক তাকে দেউলিয়া ঘোষণা করেছে।

ঋণ পরিশোধে সক্ষম হয়েও গড়িমসি করা: যে ব্যক্তি তার ঋণ পরিশোধে সক্ষম এবং পরিশোধের সময়ও সমাগত, অথচ পরিশোধ করেনা, তাকে অত্যাচারী গণ্য করা হয়। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'ধনীর ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করা যুলুম।' এ হাদিসের আলোকে অধিকাংশ আলেম বলেন: ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করা কবীরা গুনাহ। তাকে ঋণ পরিশোধের আদেশ দেয়া শাসকের উপর ওয়াজিব। তথাপি পরিশোধ না করলে এবং ঋণদাতা দাবি করলে তাকে গ্রেফতার করা হবে। রসূল সা. বলেছেন: 'ধনীর গড়িমসি তার সম্মান ভূলুণ্ঠিত করে এবং তার জন্য শাস্তি বৈধ করে।'

ইবনুল মুন্‌যির বলেন: অধিকাংশ আলেম ও বিচারকের মতে ঋণের দায়ে খাতককে আটক রাখা হবে। উমর ইবনে আব্দুল আযীয ঋণগ্রস্তের সম্পত্তি পাওনাদারদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন, তাকে গ্রেফতার করতেন না।

লায়েসও একই মত পোষণ করেই বলেন: এরপরও যদি সে ঋণ পরিশোধ না করে এবং তার সম্পত্তি বিক্রয় না করে তবে শাসক তা বিক্রয় করবে এবং পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করে তাকে আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে।'

দেউলিয়ার উপর লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা ও তার সম্পত্তি বিক্রয় করা: যে ব্যক্তির ধন-সম্পদ আছে, তথাপি ঋণ পরিশোধ করে না, তার পাওনাদাররা সবাই বা কতক পাওনাদার চাইলে শাসক তার উপর লেনদেনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে, যাতে তারা ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়। অধিকন্তু সে যদি অনুমতি পেয়েও নিজের সম্পত্তি বিক্রয় না করে তবে শাসক তার সম্পত্তি বিক্রয় করতে পারবে এবং তার বিক্রয় বৈধ হবে। কেননা শাসক তার স্থলাভিষিক্ত। এর প্রমাণ সাঈদ ইবনে মানসূর, আবু দাউদ ও আব্দুর রাজ্জাক কর্তৃক আব্দুর রহমান ইবনে কা'ব সূত্রে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিস:

'মুয়ায্ ইবনে জাবাল একজন দানশীল যুবক ছিলেন। তিনি নিজের জন্যে কিছুই সঞ্চিত রাখতেন না। ফলে ঋণগ্রস্ত হতে হতে এক সময় তার গোটা সম্পত্তিই ঋণের দায়ে ডুবে যায়। তখন তিনি রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট এসে তাকে অনুরোধ করলেন যেন তার পাওনাদারদেরকে বুঝিয়ে তার জন্য অবকাশ সৃষ্টি করেন। কারণ পাওনাদাররা যদি কাউকে অবকাশ দিত তবে রসূলুল্লাহ্ সা. এর খাতিরে মুয়াযকেই দিত। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ সা. মুয়াযের সম্পত্তি বিক্রয় করে দিলেন। ফলে মুয়ায একেবারে নি:স্ব হয়ে পড়লেন।'

'নাইলুল আওতা'র গ্রন্থে বলা হয়েছে: 'মুয়াযের উপর লেনদেনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে কোনো ঋণগ্রস্তের উপর লেনদেনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা বৈধ। তাছাড়া ঋণগ্রস্তের ঋণ পরিশোধের জন্য তার সম্পত্তি বিক্রয় করা শাসকের জন্যে জায়েয, চাই তার ঋণ তার গোটা সম্পত্তিকে গ্রাস করুক বা না করুক।' এভাবে যখন দেউলে ঋণগ্রস্তের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়, তখন তার প্রধান সম্পত্তির উপর তার যে কোনো হস্তক্ষেপ অচল ও অকার্যকর হবে। কেননা এটা হিজ্‌রের দাবি। ইমাম মালিকের মত এবং ইমাম শাফেয়ির দুই মতের মধ্যে অগ্রগণ্য মত এটাই।

শুধু সে সব পাওনাদারের ঋণ হিস্‌সা অনুযায়ী পরিশোধ করা হবে যারা ঋণ পরিশোধের দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে এবং যাদের ঋণের মেয়াদ শেষ হয়েছে। যে পাওনাদার উপস্থিত কিন্তু পরিশোধের দাবি করছে না, যে পাওনাদার অনুপস্থিত এবং কোনো প্রতিনিধি নিয়োগ করেনি এবং যে উপস্থিত বা অনুপস্থিত এবং দাবিদার বা অদাবিদার পাওনাদারের ঋণের মেয়াদ শেষ হয়নি, সে এর আওতাভুক্ত হবেনা এবং তার ঋণ পরিশোধ করা হবেনা। এটা ইমাম আহ্‌মদের মত ও ইমাম শাফেয়ির দুই মতের মধ্যে অপেক্ষকৃত বিশুদ্ধ মত।

পক্ষান্তরে ইমাম মালেকের মত হলো, ঋণ যদি অবিলম্বে পরিশোধযোগ্য হয় তাহলে নিষেধাজ্ঞা আরোপের সাথে সাথেই ঋণ পরিশোধ করা হবে। আর যে দেউলে মৃত্যুবরণ করেছে, তার ঋণ সকল পাওনাদারকেই পরিশোধ করা হবে, তাই সে উপস্থিত হোক বা অনুপস্থিত, ঋণ পরিশোধের দাবি করুক বা না করুক এবং ঋণ দীর্ঘমেয়াদী হোক বা ত্বরিত পরিশোধযোগ্য হোক।

ঋণ পরিশোধ করার সময় সর্বাগ্রে আল্লাহ্‌র হক অত:পর বান্দার হক পরিশোধ করা হবে। কেননা রসূলুল্লাহ সা. বলেন: 'আল্লাহ্‌র ঋণ সর্বাগ্রে পরিশোধযোগ্য।'

ইমাম আবু হানিফা বলেন: ঋণগ্রস্তের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করাও জায়েয নেই, তার সম্পত্তি বিক্রয় করাও বৈধ নয়। ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত শাসক তাকে আটক রাখবে। তবে প্রথমোক্ত মতটি হাদিসের অনুকূল বলে অগ্রগণ্য।

দেউলিয়া ব্যক্তির কাছে যদি ধারে দেয়া মালামাল হুবহু পাওয়া যায়: যখন কোনো ব্যক্তি দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ব্যক্তির কাছে তার ধারে দেয়া সামগ্রী হুবহু পেয়ে যায় তবে তার কয়েকটা অবস্থা রয়েছে, যা নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে।

১. যে ব্যক্তি তার দেয়া সামগ্রী হুবহু ও অক্ষত অবস্থায় দেউলিয়ার কাছে পেয়ে যায়, সে অন্য সকল পাওনাদারের তুলনায় তা ফেরত পাওয়ার অধিক হকদার। কেননা রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: "যে ব্যক্তি দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ব্যক্তির কাছে তার ধার দেয়া দ্রব্য হুবহু ও এমন অপরিবর্তিত অবস্থায় পেয়ে যায় যে, বাড়েও নাই, কমেও নাই, সে অন্য পাওনাদারের চেয়ে তার বেশি হকদার।' (বুখারি ও মুসলিম)।

২. প্রাপ্ত দ্রব্য যদি কম-বেশি হয়ে পরিবর্তিত হয়ে থাকে, তাহলে তার মালিক অন্যান্য পাওনাদারের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবেনা; বরং তার সমপর্যায়ের পাওনাদার গণ্য হবে।

৩. সে যদি দ্রব্যটি বিক্রয় করে দিয়ে মূল্য আংশিক হস্তগত করে থাকে, তাহলেও সে অন্য পাওনাদারদের সমপর্যায়ের গণ্য হবে এবং অধিকাংশ আলেমের মতে সে বিক্রীত পণ্য ফেরত পাওয়ার হকদার হবেনা। তবে ইমাম শাফেয়ির দুটি মতের মধ্যে এই মতটিই অগ্রগণ্য যে, বিক্রয়কারীই অগ্রাধিকার পাবে।

৪. ক্রেতা যদি মারা গিয়ে থাকে এবং বিক্রয়কারী মূল্য হস্তগত না করে থাকে, অত:পর বিক্রয়কারী তার বিক্রীত দ্রব্য পেয়ে যায়, তবে উপর্যুক্ত হাদিসের আলোকে সে তা ফেরত পাওয়ার অধিক হকদার। এর পেছনে এই যুক্তিও রয়েছে যে, মৃত্যু ও দেউলে হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এ মতটি ইমাম শাফেয়ির।

আবু হুরায়রা রা. বলেন: 'আমি অবশ্যই তোমাদের মধ্যে রসূলুল্লাহ সা. এর মত বিচার করবো: যে ব্যক্তি দেউলে হয়েছে বা মারা গেছে, অত:পর কোনো ব্যক্তি তার নিকট তার দ্রব্য অপরিবর্তিত অবস্থায় পেয়েছে, সেই তার অধিক হকদার।'

অভাবগ্রস্তের উপর হিজ্র নেই: দেউলিয়ার উপর হিজ্র আরোপিত হবে তখনই, যখন তার অভাবগ্রস্ত হওয়া স্পষ্ট হয়না। যদি স্পষ্ট হয়ে যায় সে অভাবগ্রস্ত, তাহলে তাকে আটক করাও হবেনা। তার উপর হিজ্রও (লেনদেনের নিষেধাজ্ঞা) আরোপিত হবে না এবং পাওনাদাররা তার পেছনে লেগে থেকে ক্রমাগত চাপও দেবে না, বরং তার সচ্ছলতা ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ও তাকে সময় দেয়া হবে। কারণ আল্লাহ্ বলেন: 'যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া বিধেয়।' ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন: এক ব্যক্তি কিছু ফল কিনে মুসিবতে পড়ে গেল। ফলে তার দায়দেনা এতো বৃদ্ধি পেল যে, রসূলুল্লাহ্ সা. জনতাকে অনুরোধ করলেন তাকে সদ্কা দিতে। লোকেরা সদকা দিল। কিন্তু তাতেও ঋণ পরিশোধ করার মতো পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হলোনা। তখন রসূলুল্লাহ্ সা. তার পাওনাদারদেরকে বললেন: তোমরা যা পেয়েছ তাই নিয়ে যাও। এর চেয়ে বেশি পাবে না।'

অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবকাশ দেয়ার সওয়াব বহুগুণ বেশি। বারিদা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্তকে অবকাশ দিলো, সে প্রতিদিনের জন্য দ্বিগুণ সদ্কার সওয়াব পাবে।'

খাতককে যতোটুকু রেয়াত দেয়া জরুরি: শাসক যখন দেউলিয়ার সম্পত্তি বিক্রয় করে পাওনাদারদের ঋণ পরিশোধ করে, তখন তার জীবন ধারণের জন্যে ন্যূনতম যা প্রয়োজন, তা তার জন্যে ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব। যেমন তার বাড়িটি বিক্রয় করা যাবেনা। কেননা বাড়ি ছাড়া তো তার মাথা গোঁজার ঠাই নেই। অনুরূপ, তার সম্পত্তি থেকে ততোটুকু পরিমাণ ছেড়ে দেয়া জরুরি, যতোটুকু দিয়ে সে তার মত ব্যক্তির উপযোগী একজন চাকর রাখতে পারে। খাতক যদি ব্যবসায়ী হয়, তবে ব্যবসায়ের ন্যূনতম সম্বল তার জন্য ছেড়ে দিতে হবে। আর যদি সে পেশাদার হয়, তবে তার পেশার প্রয়োজনীয় সাজ-সর াম ও যন্ত্রপাতি তাকে ছেড়ে দিতে হবে। আর তার জন্য ও তার উপর নির্ভরশীলদের জন্যে তার মতো ব্যক্তির উপযোগী ন্যূনতম খাদ্য ও বস্ত্র সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরি।

ইমাম শওকানি বলেন: খাতকের ও তার উপর নির্ভরশীলদের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য বাসস্থান, পরিধানের ও শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার বস্ত্র ও ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য-পানীয় ব্যতীত তার কাছে যা কিছু পাওয়া যায়, তার সব কিছু নেয়া পাওনাদারদের জন্য বৈধ। তার এই বক্তব্যের ব্যাখ্যায় তিনি মুয়ায রা. এর হাদিস উল্লেখপূর্বক বলেন: এমন কোনো প্রমাণ নেই যে, পাওনাদাররা মুয়াযের পরিধানের পোশাক নিয়ে গেছে, তাকে তার বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে বা তিনি ও তার উপর নির্ভরশীলরা তাদের জীবন ধারণের ন্যূনতম অবলম্বন ছেড়ে চলে গেছে। এ জন্যেই আমি বলেছি যে, এই জিনিসগুলো কোনো অবস্থায়ই খাতকের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া যাবেনা। এটা ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদের মত। ইমাম শাফেয়ির মতে, তার বাড়ি এ অবস্থায় বিক্রয় করা যাবে।

নির্বোধের উপর হিজর: নির্বোধ ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হলেও তার নির্বুদ্ধিতা ও কান্ডজ্ঞানহীন তৎপরতার কারণে তার উপর হিজ্র আরোপিত হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا .....

'তোমাদের সম্পদ, যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে উপজীবিকা করেছেন, তা নির্বোধদের হাতে অর্পণ করোনা।' (সূরা নিসা: আয়াত ৫)।

এ আয়াত দ্বারা নির্বোধ ব্যক্তির উপর হিজ্রের বৈধতা প্রমাণিত।

আল্লামা ইবনুল মুন্যির বলেন: 'অধিকাংশ আলেমের মতে যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ নষ্ট করে, সে প্রাপ্তবয়স্ক হোক বা না হোক, তার উপর হিজ্র আরোপ করা হবে।'

ইমাম আবু হানিফা বলেন: বয়োপ্রাপ্তির সময় যে ব্যক্তি স্বাভাবিক বিবেকবুদ্ধির অধিকারী ছিলো, সে পরে নির্বোধ হয়ে গেলেও তার উপর হিজর আরোপ করা হবে না। তবে নিজের সম্পদ নষ্ট করতে দেখা গেলে হিজ্র আরোপ করা হবে। সে ক্ষেত্রে তার বয়স পঁচিশ বছর না হওয়া পর্যন্ত তার কাছে তার সম্পত্তি অর্পণ করা হবেনা। পঁচিশ বছর হলে চাই সে নষ্ট করুক বা না করুক, তার সম্পত্তি তার কাছে অর্পণ করা হবে। ইমাম মালেক বলেন: বয়োপ্রাপ্ত হয়েও যদি স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা অর্জিত না হয়, বুড়ো হয়ে যাওয়ার পরও তার উপর হিজ্র থাকবে।

'নাইলুল আওতর' গ্রন্থে 'আল-বাহ্‌র' থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে: 'হিজ্‌রের যোগ্য নির্বুদ্ধিতা হলো পাপকার্যে কিংবা যে কাজে দুনিয়া বা আখেরাতের কোনো কল্যাণ নেই, এমন কাজে অর্থ ব্যয় করা, যেমন এক দিরহামের সামগ্রী একশো দিরহাম দিয়ে খরিদ করা। ভালো খাদ্য, ভালো পোশাক ও ভালো সুগন্ধী ইত্যাদি খরিদ করা কোনো নির্বুদ্ধিতার কাজ নয়। আল্লাহ্ সূরা আ'রাফের ৩২ নং আয়াতে বলেন:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ط قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ .....

'বলো, আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের জন্য যে সব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে নিষিদ্ধ করেছে? বলো, পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এসমস্ত তাদের জন্য যারা ঈমান আনে। এরূপে আমি জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি।'

তদ্রূপ, ধনীর কার্যকলাপে খরচ করাও নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ নয়।

নির্বোধের কৃতকর্মসমূহ: হিজ্‌র আরোপের আগে নির্বোধ ব্যক্তি যে সব কাজ করে তা বৈধ ও কার্যকর। হিজ্‌র আরোপ করার পর তার নিজের সম্পত্তিতে আর কোনো হস্তক্ষেপ বৈধ হবে না। তার ক্রয়, বিক্রয়, ওয়াক্‌ফ বা স্বীকারোক্তি বৈধ ও কার্যকর হবে না।

নিজের বিরুদ্ধে নির্বোধের স্বীকারোক্তি: ইবনুল মুনযির বলেন: আমি যতো জন আলেমের মতামত স্মরণ রেখেছি, তারা সবাই একমত যে, নির্বোধ ব্যক্তি নিজের বিরুদ্ধে ব্যভিচার, চুরি, মদপান, অপবাদ বা হত্যার স্বীকারোক্তি করলে তা বৈধ এবং তার উপর হদ কার্যকর হবে। আর যদি তার কাছে কারো কোনো পাওনা আছে মর্মে স্বীকারোক্তি করে তবে তার উপর থেকে হিজ্‌র অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত তার কাছ থেকে তা দাবি করা যাবেনা।

নির্বোধ ও দেউলিয়ার উপর হিজ্‌র আরোপের প্রচার: নির্বোধ ও দেউলিয়ার উপর হিজ্‌র আরোপিত হয়ে থাকলে তার ব্যাপক প্রচার মুস্তাহাব, যাতে জনগণ তা জানে, তাদের ব্যাপারে ধোঁকায় না পড়ে এবং মানুষ তাদের সাথে লেনদেন করতে চাইলে জেনে বুঝে করে।

অপ্রাপ্ত বয়স্কের উপর হিজ্‌র: নির্বোধের উপর যেমন তার নির্বুদ্ধিতার কারণে হিজ্‌র আরোপিত হয়, তেমনি অপ্রাপ্তবয়স্কের উপরও হিজ্‌র আরোপিত হয় এবং তাকে তার ধন-সম্পদে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখা হয়, যাতে তার সম্পত্তি নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায়। কেবল দুই শর্তে তাকে তার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেয়া যায়।

এক: প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া; দুই: বুদ্ধিমত্তা লাভ।

সূরা নিসার ৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন:

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ج فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ....

'ইয়াতীমদেরকে যাচাই করো যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বিয়ের যোগ্য হয়। যদি তাদের মধ্যে ভাল মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখতে পাও তবে তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দাও।'এ আয়াতটি সাবিত ইবনে রিফায়া ও তার চাচা সম্পর্কে নাযিল হয়। রিফায়া তার অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে সাবিতকে রেখে মারা গেলে সাবিতের চাচা রসূল সা. এর নিকট এসে বললো: আমার এই ভাতিজা ইয়াতিম এবং আমার নিকট লালিত-পালিত হচ্ছে। তার সম্পদ থেকে কতটুকু আমার জন্যে হালাল এবং কবে তার সম্পদ তার কাছে অর্পণ করবো? তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করলেন।

বয়োপ্রাপ্তির নিদর্শনাবলী: নিম্নোক্ত নিদর্শনাবলীর যে কোনোটি প্রকাশ পেলে বয়োপ্রাপ্তি প্রমাণিত হয়:

১. বীর্যপাত, চাই তা ঘুমের মধ্যে হোক বা জাগ্রত অবস্থায়। আল্লাহ্ সূরা নূরের ৫৯ নং আয়াতে বলেন:

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ -

'তোমাদের সন্তানেরা বয়োপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে যেমন অনুমতি প্রার্থনা করে থাকে তাদের বয়োজ্যেষ্ঠগণ।'

আবু দাউদ আলি রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: তিন ব্যক্তি দায়মুক্ত: শিশু যতক্ষণ না তার বীর্যপাত হয়, ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগ্রত হয় এবং পাগল যতক্ষণ না তার জ্ঞান ফিরে আসে।'

আলি রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: বীর্যপাতের পর আর কেউ ইয়াতিম (অর্থাৎ নাবালক) থাকেনা।' (আবু দাউদ)।

২. বয়স্ক পনেরো বছর অতিক্রম করা। কেননা ইবনে উমর রা. বলেন: 'আমার বয়স যখন চৌদ্দ বছর, তখন আমি ওহুদ যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে রসূল সা. এর সামনে নিজেকে পেশ করি। কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। খন্দকের দিন যখন তাঁর সামনে নিজেকে পেশ করলাম তখন আমার বয়স পনেরো বছর। রসূল্ সা. তখন আমাকে অনুমতি দিলেন।'

উমর ইবনে আব্দুল আযীয এ হাদিস শুনে তাঁর কর্মকর্তাদের নিকট লিখলেন, তারা যেন পনেরো বছরের কম বয়সী কাউকে কোনো আদেশ না দেয়।' ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানিফা বলেন: যার বীর্যপাত হয়নি, তার সতেরো বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে বয়োপ্রাপ্ত গণ্য করা হবেনা। সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুসারে ইমাম আবু হানিফার মতে উনিশ বছর। তিনি মেয়ের ক্ষেত্রে বলেছেন: তার বয়োপ্রাপ্তি সতেরো বছরে। দাউদ বলেন: বয়স দ্বারা কেউ বয়োপ্রাপ্ত গণ্য হবেনা, যতোক্ষণ বীর্যপাত না হয়, চাই তার বয়স চল্লিশ বছর হোক না কেন।

৩. যৌনাংগের আশপাশে লোম গজানো। অর্থাৎ ঘনকালো চুল গজানো। শুধু চুল গজালেই হবেনা। কেননা তা সব শিশুরই গজায়। বনু কুরায়যার যুদ্ধে এই চুল দেখেই চিহ্নিত করা হতো যে, সে যোদ্ধা বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আবু হানিফা বলেন: লোম গজানো দেখে ফায়সালা করা যাবেনা। এটা বয়োপ্রাপ্তির লক্ষণও নয়।

৪. মাসিক স্রাব ও গর্ভধারণ: উপর্যুক্ত প্রত্যেকটি নিদর্শন দ্বারা নারী ও পুরুষ উভয়ের বয়োপ্রাপ্তি প্রমাণিত হয়। নারীর জন্য অতিরিক্ত দুটো নিদর্শন হলো মাসিক স্রাব ও গর্ভ ধারণ। কেননা ইমাম বুখারী প্রমুখ আয়েশা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: আল্লাহ্ ওড়না ব্যতীত ঋতুবতি মহিলার নামায কবুল করেন না। আর 'ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান' দ্বারা বুঝায় ধন-সম্পদকে বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা ও তার উন্নতি সাধনের ক্ষমতা, যার ফলে সে মারাত্মকভাবে ঠকবেনা এবং হারাম কাজে সম্পদ ব্যয় করবেনা। যখন কোনো ব্যক্তি বয়োপ্রাপ্ত হয় কিন্তু ভালমন্দ বিচারের জ্ঞানের অধিকারী হয়না, তখন সে অন্যের আর্থিক অভিভাবকত্বের অধীন থাকবে, যতক্ষণ না ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান তার মধ্যে না দেখা যায়। এ জন্যে কোনো নির্দিষ্ট বয়স নির্ধারণ করা হবেনা, যেমন কুরআনের বাণী থেকে বাহ্যত প্রতীয়মান হয়। তবে এটা ইমাম আবু হানিফার মতের পরিপন্থী। আর ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান প্রকাশ পাওয়ার পর যদি কারো মধ্যে পুনরায় নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়, তবে তার উপর পুনরায় হিজ্র (লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা) আরোপ করা হবে। কেননা জাস্সাস বলেন, নির্বুদ্ধিতার ক্ষতি সকলকেই গ্রাস করে। সে যখন অপচয় দ্বারা নিজের সম্পদ উজাড় করবে, তখন সে সমাজের জন্যে ও সরকারি কোষাগারের জন্যে বিপজ্জনক ও গলগ্রহ হয়ে দাঁড়াবে। এভাবে নির্বুদ্ধিতার কারণে ধন সম্পদের উপর তার অভিভাবকত্বের অবসান ঘটে। আর তার নিজের উপর অন্যের অভিভাবকত্বের অবসান ঘটে তখনই, যখন সে বুদ্ধিমান অবস্থায় বয়োপ্রাপ্ত হয় ও আইনী দায়দায়িত্বের অধিকারী হয়। ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো: ইয়াতিমের ইয়াতিমত্বের অবসান কখন হয়? তিনি জবাব দিলেন: আল্লাহ্‌র কসম, দাড়ি গজানোর পরও অনেকে উপার্জনে দুর্বল এবং অন্যকে দেয়ায়ও দুর্বল থাকে। যখন কেউ নিজের জন্যে ভাল উপার্জন করতে শিখবে তখন তার ইয়াতিমত্ব ঘুচে যাবে। সাঈদ ইবনে মনসূরে. বর্ণনা অনুসারে মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেন: 'যদি তোমরা তাদের মধ্যে ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান দেখতে পাও' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন: মানুষ শুধু বয়োপ্রাপ্ত এবং বুদ্ধিমান হলেই নিজের ধন-সম্পদের কর্তৃত্ব পায় না, যতক্ষণ না ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান তার মধ্যে না দেখা যায়।

নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ব্যক্তিকে সম্পত্তি অর্পণে শাসকের আদেশ অপরিহার্য: কিছু সংখ্যক ফকিহের মতানুসারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ব্যক্তির নিকট তার সম্পত্তি অর্পণের জন্যে শাসকের নিকট থেকে আদেশ লাভ করা ও শাসকের নিকট তার ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান লাভ প্রমাণিত হওয়া শর্ত। আবার কতক ফকিহের মতে এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তির অভিভাবকের দৃষ্টিতে ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান লাভ করেছে বলে প্রমাণিত হওয়া যথেষ্ট।

অপ্রাপ্তবয়স্ক, নির্বোধ ও পাগলের অভিভাবক বা ওছি হবে কে?: অপ্রাপ্তবয়স্ক, নির্বোধ ও পাগলের অভিভাবক তাদের পিতা। পিতা না থাকলে তার আত্মীয় স্বজন বা শাসক কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবক। কেননা সে-ই তার প্রতিনিধি। নিযুক্ত প্রতিনিধি না থাকলে তার অভিভাবক হবে শাসক। শাসক বা আত্মীয়দের দ্বারা নিযুক্ত না হলে দাদা, মা ও পিতৃপক্ষীয় অন্যান্য আত্মীয় তার অভিভাবক হতে পারবেনা। আমাদের যুগে প্রথমোক্ত মতটি অনুসরণ শ্রেয়।

হিজ্‌র আরোপিত ব্যক্তির অভিভাবক বা ওছি হওয়ার শর্তাবলী: ওছি হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যিনি হিজ্‌র আরোপিত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব লাভ করেন , চাই এই দায়িত্ব আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে দেয়া হোক বা শাসকের পক্ষ থেকে। ওছি নারী হোক বা পুরুষ, দীনদারী, সততা ও বিজ্ঞতায় তার প্রসিদ্ধ হওয়া জরুরি। উমর রা. হাফ্‌সা রা. কে ওছি নিযুক্ত করেছিলেন। ওছির দায়িত্ব হলো ইয়াতিমের ধন সম্পদ বা হিজ্‌র আরোপিত ব্যক্তির ধন সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার করবে যাতে তা বৃদ্ধি পায়। ইমাম মালেকের মতে ওছি বা পিতা স্বজনপ্রীতির মনোভাব এড়িয়ে ইয়াতিমের সম্পত্তি থেকে কিছু কিনতে বা তার সম্পদের বিনিময়ে নিজেদের সম্পত্তি বিক্রয় করতে পারে।

দুর্বলতা থাকলে অভিভাবকত্ব পরিহার করা উচিত: আবু যর রা. সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা বলেন: হে আবু যর! আমি তোমাকে দুর্বল মনে করি। তাই আমি নিজের জন্যে যা পছন্দ করি, তোমার জন্যেও তা পছন্দ করি। তুমি কখনো দুই ব্যক্তির আমীর হবে না এবং ইয়াতীমের সম্পত্তির অভিভাবক হবেনা।

অভিভাবক ইয়াতীমের সম্পত্তি থেকে ভক্ষণ করতে পারে: সূরা নিসার ৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন: 'যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে।' এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, বিত্তশালী বা সচ্ছল অভিভাবকের ইয়াতীমের মালে কোনো অধিকার নাই। অভিভাবকত্বের প্রতিদান সে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পাবে। তবে শাসক তার জন্যে কোনো ভাতা নির্ধারণ করলে তা তার জন্যে ভোগ করা হালাল। আর সে বিত্তহীন হলে তার সম্পত্তি থেকে সে সংগত পরিমাণে নিতে পারে। অর্থাৎ যে ধরনের পরিশ্রম সে করে তার জন্য প্রচলিত নিয়মানুসারে পারিশ্রমিক নিতে পারে।

আয়েশা রা. এ আয়াত প্রসংগে বলেন: এ আয়াত নাযিল হয় ইয়াতিমের তত্ত্বাবধায়ক সম্পর্কে, যে তার সম্পত্তির দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। সে দরিদ্র হলে সংগত পরিমাণে তা থেকে কিছু ভক্ষণ করতে পারে। আমর ইবনে শুয়াইব সূত্রে বর্ণিত: এক ব্যক্তি রসূল সা. এর কাছে এসে বললো: আমি দরিদ্র। আমার কিছুই নেই। আমার তদারকীতে একজন ইয়াতিম রয়েছে। রসূল সা. বললেন: তুমি তোমার ইয়াতিমের সম্পত্তি থেকে কিছু খেতে পার। কিন্তু অপচয় অপব্যয় করবেনা। সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে আর তার অভিভাবকত্ব করবেনা এবং তার সম্পদ (নিজের জন্য) সঞ্চয় করবেনা। অন্য কথায়, প্রচলিত নিয়মে একই কাজে যে পারিশ্রমিক দেয়া হয় তার চেয়ে বেশি নেয়া নিষেধ।

অপ্রাপ্ত বয়স্কের ভরণ-পোষণ: আল্লাহ্ সূরা নিসার ৫নং আয়াতে বলেন:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

'তোমাদের সম্পদ, যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে উপজীবিকা করেছেন, তা নির্বোধদের হাতে অর্পণ করোনা। তা তাকে তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে।' ইমাম কুরতুবী বলেন: 'ওছি ইয়াতিমের ব্যয় তার অবস্থা ও সম্পদ অনুযায়ী নির্বাহ করবে। সে যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক

হয় এবং তার সম্পত্তি অনেক থাকে, তবে তার জন্যে ধাত্রী পালনকারিণী নিয়োগ করবে এবং তার ব্যয় নির্বাহে প্রশস্ততার নীতি অবলম্বন করবে। আর যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয় তবে তার জন্য উত্তম পোশাক, মজাদার খাবার ও ভৃত্যের ব্যবস্থা করবে। আর যদি সম্পদ কম থাকে তবে সেই অনুপাতে ব্যয় নির্বাহ করবে। আর যদি আরো কম থাকে তবে সাধারণ খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সাধারণ পোশাকের ব্যবস্থা করবে। ইয়াতিম যদি এত দরিদ্র হয় যে তার কিছুই নেই, তবে বাইতুল মাল থেকে তার জন্যে ভাতা বরাদ্দ করা শাসকের কর্তব্য। শাসক তা না করলে মুসলমানদের উপর তা দায়িত্ব বর্তাবে। প্রথমে বিশিষ্ট জনদের উপর, তারপর সর্বসাধারণের উপর। তার মেয়ে তার জন্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাকে স্তন্য দান, ও দেখাশুনা করা তার কর্তব্য। এ জন্য সে কারো কাছে পাওনাদার হবেনা।

ওছি কি বিনা অনুমতিতে কিছু দান করতে পারবে?: ওছি, স্ত্রী ও কোষাধ্যক্ষ কারো সম্পদ থেকে তার বিনা অনুমতিতে কাউকে দান করতে পারবেনা। অবশ্য সম্পত্তির জন্য ক্ষতিকর নয় এমন স্বল্প পরিমাণে করতে পারে।

আয়েশা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন: 'স্ত্রী যখন তার স্বামীর সম্পত্তির ক্ষতি না করে তা থেকে কিছু দান করে, তার জন্যে সে ও তার স্বামী উভয়ে পুরস্কৃত হবে, কোষাগার রক্ষকও অদ্রূপ পুরস্কৃত হবে। কারো জন্যে কারো পুরস্কার হ্রাস পাবেনা।'

আটাত্তরতম অধ্যায়

অসিয়ত

সংজ্ঞা: আভিধানিক অর্থে অসিয়ত হচ্ছে সংযোগ স্থাপন। অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বের সাথে মৃত্যুর পরের সংযোগ স্থাপন।

শরিয়তের পরিভাষায় কোনো মানুষ কর্তৃক অপর কোনো মানুষকে কোনো সামগ্রী, ঋণ বা সেবা এমন শর্তে দান করা যে, যাকে দান করা হলো সে দানকারীর মৃত্যুর পরেই দানকৃত বস্তুর মালিকানা লাভ করবে, তার আগে নয়। কেউ কেউ এভাবেও একে সংজ্ঞায়িত করেছেন যে, অসিয়ত হচ্ছে স্বেচ্ছাকৃত দান হিসাবে কাউকে কোনো জিনিসের মালিকানা মৃত্যুর পরে দান করা। এই সংজ্ঞা থেকে হিবা (দান) ও অসিয়তের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। হিবা দ্বারা যে মালিকানা সৃষ্টি হয়, তা তাৎক্ষণিকভাবেই কার্যকর হয়। কিন্তু অসিয়ত দ্বারা সৃষ্ট মালিকানা মৃত্যুর পরে ব্যতীত কার্যকর হয়না। তাছাড়া হিবা একমাত্র কোনো বস্তু বা সামগ্রী দ্বারাই করা যায়। কিন্তু অসিয়ত সামগ্রী, ঋণ ও সেবা দ্বারাও করা যায়।

অসিয়তের বিধান: অছিয়ত কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজ্‌মা দ্বারা শরিয়ত সম্মত বলে প্রমাণিত। কুরআনে আছে:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۚ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

'তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে (অর্থাৎ মৃত্যুর কারণ ও লক্ষণ প্রতিভাত হলে) সে যদি কিছু সম্পত্তি রেখে যায় তবে ন্যায়ানুগ প্রথামত (অর্থাৎ উত্তরাধিকারীদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে) তার পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের জন্য অসিয়ত করার বিধান তোমাদেরকে দেয়া হলো। এটা মুত্তাকীদের জন্যে একটি কর্তব্য। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮০)

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ– 'সে যা অসিয়ত করে তা দেয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধ করো...' (সূরা নিসা, আয়াত: ১১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ........

'হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে কারো যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে অসিয়ত করার সময় সাক্ষী রাখবে।' (সূরা মায়িদা: আয়াত ১০৬)

নিম্নোক্ত হাদিসসমূহ থেকেও অসিয়তের বিধান প্রমাণিত হয়:

১. বুখারি ও মুসলিম ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'কোনো মুসলমানের নিকট অসিয়ত করার মতো কিছুমাত্র সম্পদও যদি থেকে থাকে, তবে দুটো রাত যাপন করলেও তার নিজের কাছে অসিয়ত লিপিবদ্ধ না রেখে যাপন করা বাঞ্ছণীয় নয়।' ইবনে উমর রা. বলেন: রসূল সা.কে একথা বলতে শোনার পর থেকে আমি নিজের কাছে অসিয়ত লিপিবদ্ধ না রেখে একটা রাতও কাটাইনি।

হাদিসের মর্ম হলো, অসিয়ত সদাপ্রস্তুত রাখা বিচক্ষণতা। কারণ মৃত্যু সহসাই আসতে পারে।

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন: মুসলমানের জন্যে এটাই সতর্কতা ও প্রাজ্ঞতা যে, অসিয়ত সব সময় তার কাছে লিখিত থাকবে যখন তার কাছে অসিয়ত করার মতো কিছু থাকে। কেননা সে জানেনা কখন তার মৃত্যু উপস্থিত হবে এবং তা তার ইচ্ছা বাস্তবায়নে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

২. ইমাম আহমদ, তিরমিযি, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: একজন পুরুষ বা নারী ষাট বছর আল্লাহ্র হুকুম মেনে চলার পরও যদি তাদের মৃত্যু আসে এবং তারা অসিয়তের মাধ্যমে উত্তরাধিকারীর ক্ষতি সাধন করে, তবে উভয়ের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যাবে। অত:পর আবু হুরায়রা এই আয়াতাংশ পাঠ কররেন:

مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ لا غَيْرَ مُضَآرٍّ ج وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ○

'সে যে অসিয়ত করে তা দেয়ার পর ও ঋণ পরিশোধের পর, যদি কারো জন্যে ক্ষতিকর না হয়। এটা আল্লাহ্র নির্দেশ। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।' (সূরা নিসা ৪: আয়াত ১২)।

৩. ইবনে মাজা জাবির রা. সূত্রে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'যে ব্যক্তি কোনো অসিয়ত করে মারা গেল সে যেন আল্লাহ্র পথে ও আল্লাহ্র বিধানের উপর মারা গেল, তাক্ওয়া ও শাহাদাতের মৃত্যু বরণ করলো, এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় মারা গেল। অসিয়ত যে শরিয়ত সম্মত, সে ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ্র ইজ্‌মা রয়েছে।

সাহাবিদের অসিয়ত: রসূলুল্লাহ্ সা. ইন্তিকাল কালে কোনো অসিয়ত করে যাননি। কারণ তিনি অসিয়ত করা যায় এমন কোনো সম্পত্তি রেখে যাননি। ইমাম বুখারি ইব্নে আবি আওফা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন: রসূলুল্লাহ্ সা. কোনো অসিয়ত করে যাননি। আলেমগণ এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন: কেননা তিনি তার পরে কোনো সম্পত্তি রেখে যাননি। তার যে জমি ছিলো, তা তিনি আল্লাহ্র পথে দান করে গেছেন। অস্ত্র ও খচ্চর সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন যে, এ দুটো উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিত হয়না। এটা ইমাম নববীর বর্ণনা।

সাহাবিগণ তাদের সম্পত্তির অংশবিশেষ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্যে অসিয়ত করে যেতেন। তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্যে তারা লিখিতভাবে উপদেশ দিয়ে যেতেন।

আব্দুর রাজ্জাক বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেন, আনাস রা. বলেন: সাহাবিগণ তাদের অসিয়তের শুরুতে লিখতেন:

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহিম,

'অমুকের পুত্র অমুক অসিয়ত করছে যেন সে সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মদ সা. আল্লাহ্র রসূল, কিয়ামত সংঘটিত হবেই এতে কোনো সন্দেহ নেই, এবং আল্লাহ্ কবরে যারা থাকবে তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। সে তার পরিত্যক্ত পরিবার-পরিজনকে অসিয়ত করছে যেন তারা আল্লাহ্কে ভয় করে, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ভাল করে, এবং তারা মুমিন হয়ে থাকলে যেন আল্লাহ্ ও তার রসূলের আনুগত্য করে। ইবরাহিম ও ইয়াকুব আ. তাদের সন্তানদেরকে যে অসিয়ত করেছিলেন সেই অসিয়ত করছে যে, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই দীন মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা এই দীনের কাছে আত্মসমর্পণকারী না হয়ে মৃত্যু বরণ করোনা।'

অসিয়তের যৌক্তিকতা: রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: আল্লাহ্ তোমাদের ধনসম্পদের এক তৃতীয়াংশ তোমাদের সদকা স্বরূপ দিয়েছেন, যাতে তোমাদের আমল বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তোমরা এই সম্পদকে যেখানে ইচ্ছা বা যেখানে পছন্দ কর ব্যয় কর।'

হাদিসটি দুর্বল। এর মর্ম হলো, অসিয়ত মানুষের শেষ জীবনে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায়। যাতে তার পুণ্য বৃদ্ধি পায় কিংবা ক্ষতিপূরণ হয়। তাছাড়া এতে মানুষের উপকার করা ও মানুষের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা হয়।

অসিয়তের বিধান: শরিয়তের দৃষ্টিতে অসিয়তের বিধান সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, যার সার সংক্ষেপ নিম্নে তুলে দিচ্ছি:

প্রথম মত: ইমাম যুহ্রি, আবু মিজলায, ইবনে হায্ম, ইব্নে উমর, তালহা, যুবায়ের, আব্দুল্লাহ, ইবনে আবি আওফা, তালহা ইবনে মুতার্‌রাফ, তাউস ও শা'বির মতে, কম হোক বা বেশি, যে ব্যক্তি কিছু সম্পত্তি রেখে মারা যায়, তার জন্যে অসিয়ত করা ওয়াজিব। তারা এ ব্যাপারে উপরে উল্লেখিত সূরা বাকারার ১৮০ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণ দর্শান।

দ্বিতীয় মত: এই মত অনুযায়ী পিতামাতা ও যেসব আত্মীয় উত্তরাধিকার হয়না তাদের অসিয়ত করা ওয়াজিব। এটি মাসরূক, ইয়াস, কাতাদা, ইবনে জারির ও যুহরির মত।

তৃতীয় মত: এটা চার প্রধান ইমাম ও যায়দি মযহাবের মত। মতটি হলো, সম্পত্তি রেখে গেলেও অসিয়ত করা সবার উপর ফরয নয়। পিতামাতা ও অনুত্তরাধিকারী আত্মীয়দের জন্য অসিয়ত করাও ফরয নয়। অবস্থাভেদে এর বিধান পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এটা কোথাও ওয়াজিব, কোথাও মুস্তাহাব কোথাও হারাম, কোথাও মাকরূহ এবং কোথাও মুবাহ।

ওয়াজিব: অসিয়ত করা সেই ক্ষেত্রে ওয়াজিব যেখানে মানুষের উপর শরিয়তের বিধান অনুযায়ী কোনো কর্তব্য থাকে এবং অসিয়ত না করলে তা বিনষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। যেমন তার উপর যাকাত ফরয ছিলো, যা সে দেয়নি, হজ্জ ছিলো যা সে করেনি। তার কাছে আমানত ছিলো যা প্রত্যর্পণ করেনি, কোনো ঋণ ছিলো যা সে পরিশোধ করেনি এবং সে ছাড়া আর কেউ যা জানেওনা, অথবা কোনো সাক্ষী ছাড়া তার নিকট কারো সম্পদ গচ্ছিত ছিলো।

মুস্তাহাব: আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ, দরিদ্র আত্মীয়দের কল্যাণ এবং সৎলোকদের উপকার করার জন্যে অসিয়ত করা মুস্তাহাব।

হারাম: অসিয়ত দ্বারা উত্তরাধিকারদের ক্ষতি হলে অসিয়ত করা হারাম। আব্দুর রাজ্জাক আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: কোনো ব্যক্তি যদি সত্তর বছরও নেক কাজ করে, অত:পর কোনো অসিয়ত করে কারো উপর যুলুম করে এবং এভাবে তার জীবনের শেষ কাজটি অসৎ কাজ হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে। আবার কোনো ব্যক্তি যদি সত্তর বছরব্যাপী খারাপ কাজ করতে থাকে, অত:পর একটা সুবিচারমূলক অসিয়ত করে এবং এভাবে তার জীবনের শেষ কাজটি ভাল কাজ হয়, তবে সে জান্নাতে যাবে। আবু হুরায়রা রা. বলেন: তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াতটি পড়তে পারো:

تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا– 'এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্র সীমারেখা। সুতরাং এগুলো তোমরা লংঘন করোনা।' (সূরা বাকারা ২: আয়াত ২২৯)।

সাঈদ ইবনে মান্সুর বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস রা. বলেন: 'অসিয়তে কারো ক্ষতি সাধন কবীরা গুনাহ।' হাদিসটি নাসায়িও বর্ণনা করেন। যে অসিয়ত দ্বারা কারো ক্ষতি সাধন করা উদ্দেশ্য, তা বাতিল, যদিও তা সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের চেয়ে কম হয়।)

অনুরূপ মত, গির্জা নির্মাণ বা প্রমোদশালা নির্মাণের অসিয়ত হারাম।

মাকরূহ: অসিয়ত সেই ক্ষেত্রে মাকরূহ যখন অসিয়তকারী স্বল্পবিত্তশালী হয় এবং তার এমন উত্তরাধিকারী থাকে যারা তার মুখাপেক্ষী। অনুরূপ, কোনো ফাসেককে অসিয়ত করা সেই ক্ষেত্রে মাকরূহ, যখন প্রবল ধারণা জন্মাবে যে, তারা এ দ্বারা পাপ কাজে শক্তি সঞ্চয় করবে, কিন্তু যখন মনে হবে যার জন্য অসিয়ত করা হবে সে এ দ্বারা সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত হবে তখন এটা মুস্তাহাব।

মুবাহ্: অসিয়ত সে ক্ষেত্রে মুবাহ্, যখন তা কোনো ধনী ব্যক্তির জন্য করা হয়।

প্রধান উপাদান: অসিয়তের প্রধান উপাদান হলো ইজাব অর্থাৎ অসিয়তকারীর উদ্যোগ তথা প্রস্তাব। এমন যে কোনো শব্দ ব্যবহার করলে ইজাব সম্পন্ন হবে যা দ্বারা মৃত্যুর পরে বিনিময় ব্যতীত কোনো জিনিসের মালিকানা দান করা হয়। যেমন আমি আমার মৃত্যুর পরে অমুককে অমুক জিনিসটি দেয়ার অসিয়ত করলাম। বা আমার পরে তা অমুককে দান করলাম বা অমুককে তার মালিক বানালাম।

অসিয়ত যেমন কথা দ্বারা সম্পন্ন হয় তেমনি তা লেখা বা বোধগম্য ইশারা দ্বারাও সম্পন্ন হয়, যখন অসিয়তকারী কথা বলতে অক্ষম হয়। আর যখন অসিয়ত অনির্দিষ্ট হয়, (অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষের জন্য নির্দিষ্ট না হয়) যথা- মসজিদ, সরাইখানা, বিদ্যালয় বা হাসপাতালের জন্য হয়, তখন তার কবুলের প্রয়োজন হয়না। বরং শুদ্ধ ইজাব দ্বারাই অসিয়ত সম্পন্ন হয়। কেননা এটা এ ক্ষেত্রে সদ্‌কায় পরিণত হয়। কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তির সাথে নির্দিষ্ট হয়, তখন তা যার জন্য অসিয়ত করা হয়, অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর তার পক্ষ থেকে বা সে নির্বোধ হলে তার অভিভাবকের পক্ষ থেকে কবুল হওয়া প্রয়োজন। সে যদি কবুল করে তবে অসিয়ত সম্পন্ন হবে। আর প্রত্যাখ্যান করলে বাতিল হবে এবং অসিয়তকারীর উত্তরাধিকারীদের মালিকানা বহাল থাকবে।

আর যে সব বিষয়ে লেনদেনের চুক্তি বৈধ সে সব বিষয়ে অসিয়ত করা হলে অসিয়তকারীর জন্য তা পরিবর্তন করা বা তা সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রত্যাহার করা বৈধ। প্রত্যাহার সরাসরি কথার মাধ্যমে করতে পারে, যেমন: 'আমি অসিয়ত প্রত্যাহার করলাম'। আবার তার কাজ দ্বারাও করা হতে পারে, যেমন সে যা অসিয়ত করেছিল, তা বিক্রয় করে দিলো।

অসিয়ত কখন প্রাপ্য হয়: একমাত্র অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর ও তার ঋণ পরিশোধের পরই যার জন্য অসিয়ত করা হয় অসিয়ত তার প্রাপ্য হয়। যদি ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে পরিত্যক্ত সম্পত্তির পুরোটাই নি:শেষ হয়ে যায়, তবে আর যার জন্য অসিয়ত করা হয়, তার কিছুই প্রাপ্য হবেনা। কেননা আল্লাহ্ বলেন: 'অসিয়ত প্রদান বা ঋণ পরিশোধের পরেই' (উত্তরাধিকারীর বন্টন করা হবে।')

শর্তযুক্ত অসিয়ত: শর্ত যদি বৈধ হয় তবে শর্তযুক্ত অসিয়ত বৈধ হবে। বৈধ শর্ত দ্বারা এমন শর্ত বুঝায়, যা অসিয়তকারী বা যার জন্য অসিয়ত করা হয় তার জন্যে কল্যাণকর হয় অথবা অন্য কারো জন্যে মংগলজনক হয়, নিষিদ্ধ না হয় বা শরিয়তের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী না হয়। আর শর্ত যখন বিশুদ্ধ ও বৈধ হয়, তখন যতোক্ষণ তার উপকারিতা ও কল্যাণকারিতা বহাল থাকে ততক্ষণ তা মেনে চলা জরুরি। শর্ত যদি বৈধ না হয়, বা তার উপকারিতা বহাল না থাকে তবে তা মেনে চলা জরুরি হবে না।

অসিয়তের শর্তাবলী: অসিয়তের জন্যে একজন অসিয়তকারি, যার জন্য অসিয়ত করা হয় এবং যা দেয়ার অসিয়ত করা হয় তা থাকা প্রয়োজন। আর তিনটির জন্যেই কিছু শর্ত নির্দিষ্ট রয়েছে। শর্তগুলো নিম্নে উল্লেখ করা যাচ্ছে:

অসিয়তকারীর জন্য শর্ত: অসিয়তকারীর জন্য শর্ত হলো, তার মধ্যে দান করার পূর্ণ যোগ্যতা থাকতে হবে। একজন মানুষ সুস্থ মস্তিষ্ক, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং নির্বুদ্ধিতা হেতু লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত না হলে সে দান বা অসিয়ত করার পূর্ণ যোগ্যতার অধিকারী। সে যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক, পাগল, দাস, কারো বলপ্রয়োগের অধীন, কিংবা লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ব্যক্তি হয়, তবে তার অসিয়ত শুদ্ধ হবেনা। কেননা তার দান বা অসিয়ত করার পূর্ণ যোগ্যতা নেই।

কেবল দুটি ক্ষেত্র এর ব্যতিক্রম:

১. ভালোমন্দ বাছবিচারের যোগ্যতা সম্পন্ন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু যখন নিজের কাফন-দাফন সম্পর্কে অসিয়ত করে তখন সে অসিয়ত যতোক্ষণ কল্যাণকারিতার সীমার মধ্যে থাকবে, ততোক্ষণ তা বৈধ গণ্য হবে।

২. নির্বুদ্ধিতাবশত হিজ্‌র (নিষেধাজ্ঞা) আরোপিত ব্যক্তি যদি সৎ ও জনকল্যাণমূলক কাজে যথা কুরআন শিক্ষা, মসজিদ নির্মাণ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্যে অসিয়ত করে তবে সে অসিয়ত শুদ্ধ ও বৈধ গণ্য হবে।

এ ধরনের অসিয়তকারীর উত্তরাধিকারীরা যদি অনুমতি দেয় তবে তার অসিয়ত তার সমগ্র সম্পত্তি থেকে বাস্তবায়ন করা হবে। অনুরূপ যদি তার কোনো উত্তরাধিকারী একেবারেই না থাকে তাহলেও তার সমগ্র সম্পত্তি থেকে বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু যদি তার উত্তরাধিকারী থাকে এবং এই অসিয়তকে তারা অনুমোদন না করে তাহলে তা তার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ থেকে বাস্তবায়িত হবে। এটা হচ্ছে হানাফি মযহাবের মত। ইমাম মালেক এই মতের বিরোধিতা করেন এবং স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্নের ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের অর্থ বলে এমন অপ্রাপ্ত বয়স্কের অসিয়ত বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন: 'আমাদের নিকট সর্বসম্মত মত হলো, যার বুদ্ধি কম, যে নির্বোধ এবং যে অসুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি মাঝে মাঝে সুস্থ মস্তিষ্ক হয়, তারা যদি তাদের কৃত অসিয়তের মর্ম উপলব্ধি করে, তবে তাদের অসিয়ত বৈধ হবে। অনুরূপ, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু বা বালক যখন তার অসিয়তের অর্থ বোঝে এবং কোনো প্রলাপোক্তি বা অশালীন উক্তি করেনা তখন তার অসিয়ত বৈধ ও কার্যকর।' মিশরের আইনে সংশ্লিষ্ট বিচার বিভাগ অনুমতি দিলে নির্বোধের অসিয়তও বৈধ।

যার জন্যে অসিয়ত করা হয় তার শর্তাবলী: যার জন্যে অসিয়ত করা হয় তার মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তাবলী থাকা জরুরি:

১. সে যেন অসিয়তকারীর উত্তরাধিকারী না হয়। রসূলুল্লাহ্ সা. মক্কা বিজয়ের বৎসর ঘোষণা করেন: কোনো উত্তরাধিকারীর জন্য অসিয়ত চলবে না। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি)।

এ হাদিস সকল আলেমের নিকট গৃহীত এবং তার উপর ইজ্‌মা হয়েছে।

সূরা বাকারার ১৮০ নং আয়াতে যে পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্যে অসিয়ত করার আদেশ দেয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে অধিকাংশ আলেমের মত হলো: আয়াতটির বিধি মান্‌সুখ বা রহিত। আর ইমাম শাফেয়ি বলেন: আল্লাহ্ তায়ালা অসিয়তের আয়াতও নাযিল করেছেন, উত্তরাধিকারের আয়াতও নাযিল করেছেন। এখন অসিয়তের আয়াত উত্তরাধিকারের পাশাপাশি কার্যকর থাকতে পারে, আবার উত্তরাধিকারের আয়াত অসিয়তকে রহিতও করতে পারে। এমতাবস্থায় আলেমগণ অনুসন্ধান করেছেন, উক্ত দুই সম্ভাবনার মধ্যে কোনো একটিকে অগ্রাধিকার দেয়ার উপযুক্ত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা। অনুসন্ধান করে তারা পেয়েছেন, রসূল সা. মক্কা বিজয়ের বছর বলেন: কোনো উত্তরাধিকারীর জন্য অসিয়ত চলবে না।

যার জন্য অসিয়ত করা হয়, সে অসিয়তকারীর মৃত্যুর দিন উত্তরাধিকারী হতে পারে এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত। ফলে অসিয়তকারীর যদি ছেলে না থাকে এবং অসিয়তকারী তার উত্তরাধিকারী ভাই এর জন্য অসিয়ত করে, অত:পর মৃত্যুর পূর্বে যদি তার ছেলে জন্মে, তবে উক্ত ভাই এর জন্য তার অসিয়ত বৈধ হবে। আর যদি অসিয়তকারীর ছেলে থাকা অবস্থায় সে তার ভাইয়ের জন্যে অসিয়ত করে, অত:পর ছেলেটি অসিয়তকারীর মৃত্যুর পূর্বেই মারা যায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী ভাইয়ের জন্য কৃত অসিয়ত বহাল থাকবে।

২. হানাফি মযহাবের মত হলো, যার জন্য অসিয়ত করা হয়, সে যদি কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হয়, তাহলে তার জন্যে অসিয়ত শুদ্ধ হওয়ার শর্ত এই যে, তাকে অসিয়তের সময় উপস্থিত থাকতে হবে। অর্থাৎ হয় তাকে সশরীরে ঐ সময় উপস্থিত থাকতে হবে, নচেৎ ঐ সময় তাকে কার্যত উপস্থিত থাকতে হবে। যেমন কোনো মহিলার গর্ভস্থ সন্তানের জন্যে অসিয়ত করা হলো এবং অসিয়তের সময় তার পেটে সন্তান বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু যার জন্যে অসিয়ত করা হয়েছে তা যদি কোনো ব্যক্তির সাথে নির্দিষ্ট না হয়, তাহলে অসিয়তকারীর মৃত্যুর সময় তার বাস্তব অথবা কার্যত উপস্থিত জরুরি।

অসিয়তকারী যখন বলবে: অমুকের সন্তানদের জন্যে আমার বাড়িটি অসিয়ত করলাম। কিন্তু সন্তানদের পরিচয় নির্দিষ্ট করলো না। অত:পর অসিয়ত প্রত্যাহার না করে মারা গেল, এমতাবস্থায় অসিয়তকারীর মৃত্যুর সময় যে সব সন্তান বিদ্যমান ছিলো, তারা বাড়িটি পাবে, চাই তারা সবাই বাস্তবে উপস্থিত থাকুক কিংবা কার্যত উপস্থিত থাকুক, যেমন গর্ভস্থ সন্তান চাই অসিয়ত করার সময় তারা থাকুক বা না থাকুক। অসিয়তের সময় বা অসিয়তকারীর মৃত্যুর সময় গর্ভস্থ সন্তানের বিদ্যমান ধর্তব্য হবে তখনই, যখন

অসিয়তের সময় বা অসিয়তকারীর জন্যে সময় থেকে ছয় মাসের পূর্বে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। অধিকাংশ আলেম বলেন: অসিয়তকারী যদি অছি (লেনদেনে হিজর আরোপিত ব্যক্তির তত্ত্বাবধায়ককে) যেখানে ভালো মনে করে সেখানে তার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ দান করার অসিয়ত করে তবে অসিয়ত শুদ্ধ হবে। অছির কর্তব্য হবে সৎ কাজ ও কল্যাণমূলক খাতে তা ব্যয় করা, তা থেকে নিজে এক কপর্দকও ভোগ না করা এবং কোনো উত্তরাধিকারীকে কিছু না দেয়া।'

আবু সাওর এ মতের বিরোধিতা করেন। শওকানি 'নাইলুল আওতা'র গ্রন্থে তার এ মত তুলে ধরেন।

৩. যার জন্য অসিয়ত করা হয়েছে সে যেন অসিয়তকারীকে সরাসরি অবৈধ হত্যা না করে। তা করলে অসিয়ত বাতিল হবে। কারণ যে ব্যক্তি কোনো প্রাপ্য স্বাভাবিকভাবে উপযুক্ত সময় হওয়ার আগেই পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করে, তাকে তা থেকে বাতিল করে শাস্তি দেয়া হয়। এটা আবু ইউসুফের মত। আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ বলেন. অসিয়ত বাতিল হবে না; বরং উত্তরাধিকারীদের অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল থাকবে।

যে সামগ্রীর অসিয়ত করা হয় তার শর্তাবলী: যে জিনিসটি দেয়ার জন্যে অসিয়ত করা হয়, সেটি অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর কাউকে তার মালিক বানানো যায়, এরূপ হওয়া জরুরি, চাই তা যেভাবেই হোক না কেন, তাই এমন যে কোনো জিনিসের অসিয়ত করা বৈধ, যার আর্থিক মূল্য আছে অথবা যা দ্বারা সেবা বা উপকার গ্রহণ করা যায়। কারো গাছে যে ফল হয় বা কারো গাভীর পেটে যে বাছুর রয়েছে, তা দেয়ার অসিয়ত সে করতে পারে। কারণ উত্তরাধিকারী সূত্রে এই দুটোরই মালিকানা লাভ করা সম্ভব। কাজেই অসিয়তকারীর মৃত্যুর সময় যে জিনিসের অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে বিদ্যমান, সে জিনিসের মালিকানা যার নামে অসিয়ত করা হয়, সে লাভ করতে পারে। কিন্তু যে জিনিসের অস্তিত্ব নেই, তার অসিয়ত অচল ও অশুদ্ধ। ঋণ দান বা ঘরে বসবাস করতে দেয়ার জন্যে অসিয়ত শুদ্ধ। যে জিনিস সম্পদ পদবাচ্য নয়, যেমন মৃতদেহ, তার অসিয়ত অবৈধ। অনুরূপ মুসলমানদের জন্যে মদের অসিয়তও বৈধ নয়। কেননা এটা দুই পক্ষের কারো জন্যেই সম্পদ নয়।

যে পরিমাণ সম্পত্তিতে অসিয়ত করা মুস্তাহাব: ইব্‌নে আব্দুল বার বলেন: প্রাচীন মনীষীদের মধ্যে যারা অসিয়তকে ওয়াজিব মনে করেন তারা কতটুকু সম্পত্তিতে অসিয়ত ওয়াজিব হয় এবং যারা মুস্তাহাব মনে করেন তারা কতটুকু সম্পত্তিতে মুস্তাহাব হয় তা নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। আলি রা. থেকে কেউ কেউ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: ছয়শো বা সাতশো দিরহাম পরিমাণ সম্পত্তিতে অসিয়ত করা যায়না। আবার কেউ কেউ বর্ণনা করেন আলি রা. বলেছেন: এক হাজার দিরহাম পরিমাণ সম্পত্তিতে অসিয়ত করা যায়। ইব্‌নে আব্বাস বলেন: আটশো দিরহামে অসিয়ত চলে না। আয়েশা রা. বলেন: যে ব্যক্তির চারটি সন্তান আছে এবং তিন হাজার দিরহাম আছে, তার সম্পত্তিতে অসিয়তের অবকাশ নেই। ইবরাহিম নাখ্‌য়ি বলেন: এক হাজার দিরহাম থেকে দেড় হাজার দিরহাম পর্যন্ত অসিয়ত চলে না। কাতাদার মতে এক হাজার দিরহাম বা তার উপরে অসিয়ত চলবে। আলি রা. বলেন: যে ব্যক্তি অল্প সম্পত্তি রেখে যায়, তার পক্ষে ঐ সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের জন্যে রেখে যাওয়াই উত্তম। আয়েশা রা. বলেন: আটশো দিরহামে অসিয়ত চলবে না।

এক তৃতীয়াংশের অসিয়ত: এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তির অসিয়ত বৈধ। এর চেয়ে বেশি বৈধ নয়। এর চেয়ে কম উত্তম। এটা সর্বসম্মত মত। বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি ও ইবনে মাজা সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস সূত্রে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন: আমি মক্কায় রুগ্ন থাকা অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ সা. আমাকে দেখতে এলেন। যে জায়গা থেকে আমি হিজরত করেছি সেখানে মৃত্যু বরণ করা আমার পছন্দ ছিলনা। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: আল্লাহ্ ইবনে আফরাকে কৃপা করুন। আমি বললাম: হে রসূলুল্লাহ্, আমি কি আমার সমগ্র সম্পত্তি অসিয়ত করে দেব? তিনি বললেন: না। আমি বললাম: তাহলে অর্ধেক? তিনি বললেন: না। আমি বললাম: তিন ভাগের এক ভাগ? তিনি বললেন: ঠিক আছে। এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত কর। এক তৃতীয়াংশও অনেক। তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে অমুখাপেক্ষী অবস্থায় রেখে যাওয়া তাদেরকে পরমুখাপেক্ষী অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে ভাল। তারা দরিদ্র থাকবে ও অন্যের কাছে হাত

পাতবে এটা কাম্য নয়। তুমি তোমার পরিবারের উপর যা কিছু খরচ করবে তা সদকা। এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে যে খাদ্যের গ্রাস তুলে দেবে তাও সদকা। অচিরেই এমন দিন আসবে যখন আল্লাহ্ তোমাকে সমৃদ্ধি দেবেন, তখন তোমার দ্বারা অনেকে উপকৃত হবে এবং অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ সময় সাদের একটি মেয়ে ছাড়া কোনো সন্তান ছিলনা। (ওয়াকেদির মতে, পরবর্তীকালে সাদের চারটা ছেলে হয়।)

এক তৃতীয়াংশ হিসাব করা হবে সমুদয় সম্পত্তি থেকে: অধিকাংশ আলিমের মতে অসিয়তকারীর পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পত্তি থেকে তিন ভাগের এক ভাগ হিসাব করা হবে। ইমাম মালেক বলেন: অসিয়তকারী যে সম্পত্তির কথা জানে তা থেকে এক তৃতীয়াংশ হিসাব করা হবে। যে সম্পত্তির কথা তার জানা নেই বা নতুন অর্জিত হয়েছে কিন্তু তার অজানা, তা বাদে অসিয়ত করা হবে।

মালেক, নাখয়ি ও উমর ইবনে আব্দুল আযীযের মতে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হিসাব করা হবে অসিয়তের সময় থেকে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, আহমদ ও ইমাম শাফেয়ির দুটি মতের মধ্যে যেটি বিশুদ্ধতর তা হলো, তার মৃত্যুর সময়কার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে এক তৃতীয়াংশ হিসাব করা হবে। এটা আলি রা. ও কিছু সংখ্যক তাবেয়ির মত।

এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশির অসিয়ত করা: অসিয়তকারীর যদি উত্তরাধিকারী থাকে তবে তার পক্ষে এক তৃতীয়াংশের বেশি সম্পত্তির অসিয়ত করা বৈধ নয়। যদি করে তবে কার্যকর হবে না, যতোক্ষণ না উত্তরাধিকারীরা তার অনুমতি দেয়। এর কার্যকারিতার জন্যে দুটো শর্ত রয়েছে:

১. অসিয়ত মৃত্যুর পরে কার্যকর করতে হবে। কেননা অসিয়তকারীর মৃত্যুর পূর্বে উত্তরাধিকারীর কোনো কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই তার অনুমতির কোনো মূল্য নেই। তার জীবদ্দশায় অনুমতি দিলে সে যখন ইচ্ছা অসিয়ত প্রত্যাহার করতে পারে। মৃত্যুর পর অনুমতি দিলে অসিয়ত কার্যকর হবে। যুহ্রি ও রবিয়া বলেন: অসিয়তকারী কখনো প্রত্যাহার করতে পারবে না।

২. অনুমতি দানকারী উত্তরাধিকারীর অনুমতি দানের সময় পূর্ণ যোগ্যতার অধিকারী হওয়া জরুরি। নির্বোধ হওয়ার কারণে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত না হওয়া চাই। আর যদি কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে তাহলেও অধিকাংশ আলেমের মতে এক তৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত করা জায়েয নয়।

হানাফি মযহাব, ইস্হাক, শুরাইহ্ ও এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহ্মদের মত হলো , এক তৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত করা জায়েয। এটা আলি রা. ও ইবনে মাস্উদেরও মত। কেননা এ অবস্থায় অসিয়তকারী এমন কাউকে রেখে যাচ্ছে না, যার অভাবে পতিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। তাছাড়া যেহেতু আয়াতে অসিয়তের কথা শর্তহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই এক তৃতীয়াংশের মধ্যে অসিয়তকে সীমিত করা বৈধ নয়। হাদিসে এই সীমা আরোপ করা হয়েছে যার উত্তরাধিকারী আছে তার জন্য। কাজেই যার উত্তরাধিকারী নেই, তার ব্যাপারে কোনো সীমা আরোপ করা বৈধ নয়।

অসিয়ত কখন বাতিল হয়?: ইতোপূর্বে বর্ণিত শর্তাবলীর কোনো একটি অপূর্ণ থাকলে এবং নিম্নোক্ত অবস্থাসমূহে অসিয়ত বাতিল হবে:

১. অসিয়তকারী যদি পাগল হয় এবং মৃত্যুর পূর্বে তার মস্তিষ্ক সুস্থ না হয়।

২. যার জন্য অসিয়ত করা হয়েছে সে অসিয়তকারীর আগে মারা গেলে।

৩. অসিয়তের সামগ্রীটি নির্দিষ্ট হলে এবং যার জন্য অসিয়ত করা হয়েছে তার দখলে যাওয়ার আগে ধ্বংস হয়ে গেলে।

উনআশিতম অধ্যায়

ফারায়েয্

সংজ্ঞা: শরিয়তের পরিভাষায় ফারায়েয হচ্ছে উত্তরাধিকারীর জন্যে নির্দিষ্ট সম্পত্তির অংশ। এ সংক্রান্ত বিদ্যাকে ইলমুল মিরাস বা ইলমুল ফারায়েয বলা হয়।

শরিয়তে ফারায়েযের স্থান: প্রাগ ইসলামিক জাহিলি যুগে আরবরা শুধু পুরুষদেরকে উত্তরাধিকার দিতো, নারীদেরকে নয় এবং শুধু বয়স্কদেরকে দিতো, অপ্রাপ্তবয়স্কদেরকে নয়। সেখানে শপথের মাধ্যমে পরস্পরকে উত্তরাধিকারী করা হতো। এ সব প্রথাকে আল্লাহ্ বাতিল করে দিয়ে নাযিল করেন:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ق لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ج فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ج وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ط وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ج فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ط آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

'আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন: এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। কিন্তু কেবল কন্যা দুইয়ের অধিক থাকলে তাদের জন্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্যে অর্ধাংশ। তার সন্তান থাকলে তার পিতামাতা প্রত্যেকের জন্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ। সে নি:সন্তান হলে এবং পিতামাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ। তার ভাইবোন থাকলে মাতার জন্যে এক-ষষ্ঠাংশ। এ সবই সে যা অসিয়ত করে তা দেয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তা তোমরা অবগত নও। এটা আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা নিসা, আয়াত ১১)।

আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ: জাবির রা. সূত্রে বর্ণিত, নিম্নোক্ত হাদিসে এ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে: জাবির রা. বলেন: সাদ ইবনে রবির স্ত্রী সাদের ঔরসজাত তার দুই কন্যাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ সা. এর কাছে এসে বললো: হে রসূল! এরা দুজন সাদ ইবনে রবির কন্যা। ওদের বাবা আপনার সাথে যুদ্ধ করার সময় ওহুদে শহীদ হয়। ওদের চাচা ওদের সম্পত্তি নিয়ে নিয়েছে, ওদের জন্যে কিছুই রাখেনি। অথচ সম্পত্তি ছাড়া এই দুই মেয়ের বিয়ে দেয়া সম্ভবপর নয়। রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন: এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ফায়সালা করবেন। তখন উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হলো। অত:পর রসূলুল্লাহ্ সা. তাদের চাচাকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে বললেন: সাদের কন্যাদ্বয়ের প্রত্যেককে এক তৃতীয়াংশ করে ও তাদের মাকে এক অষ্টমাংশ দাও। তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা তোমার।' (নাসায়ি ব্যতীত অপর পাঁচটি সহিহ্ হাদিস গ্রন্থ)।

ফারায়েযের জ্ঞানের মর্যাদা: ১. ইবনে মাস্উদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: তোমরা কুরআন শিখ ও শিখাও। আর ফারায়েয শিখ ও শিখাও। কেননা আমি একজন মরণশীল মানুষ এবং জ্ঞানও একদিন অন্তর্হিত হবে। অচিরেই এমন একদিন আসতে পারে, যখন ফারায়েয ও মাস্য়ালায় দুটি নাম ভিন্ন ভিন্ন রকমের হবে, অথচ তাদেরকে জানানোর জন্য কাউকে পাওয়া যাবে না।' (আহমদ)।

২. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: জ্ঞান তিন রকমের। এ ছাড়া আর সব কিছু অতিরিক্ত; সুস্পষ্ট বিধান সংবলিত আয়াত, বাস্তবায়িত সুন্নাত এবং ন্যায়সংগত উত্তরাধিকার।' (আবুদাউদ, ইবনে মাজা)।

৩. আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: তোমরা ফারায়েয শিখ ও শিখাও। কারণ এটা জ্ঞানের অর্ধেক। এটা একদিন ভুলে যাওয়া হবে এবং এটাই সর্ব প্রথম আমার উম্মতের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে। (ইবনে মাজা, দারু কুতনি)।

পরিত্যক্ত সম্পত্তি: পরিত্যক্ত সম্পত্তির সংজ্ঞা হানাফি মায্হাব অনুযায়ী: মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সমগ্র সম্পত্তি। ইমাম ইবনে হায্ম এই সংজ্ঞার সমর্থনে বলেন: 'মানুষ তার মৃত্যুর পর যে সম্পদ রেখে যায়,

তাতে আল্লাহ্ উত্তরাধিকার নির্ধারণ করেছেন, যা সম্পদ নয় তাতে নির্ধারণ করেননি। অধিকারসমূহের মধ্যে যা সম্পদের অন্তর্ভুক্ত বা সম্পদের পর্যায়ভুক্ত, তা ব্যতীত আর কোনোটায় উত্তরাধিকার নির্ধারণ করেননি, যেমন উপকার পাওয়ার অধিকার, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের অধিকার। নির্মাণ ও চাষাবাদের জন্য নির্ধারিত জমিতে অবস্থানের অধিকার। মালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বলি মযহাবে এ অধিকারসমূহ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তিও অধিকারের অন্তর্ভুক্ত, চাই এ সব অধিকার আর্থিক হোক বা আর্থিক ব্যতীত অন্য কিছু হোক।

পরিত্যক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকারসমূহ: পরিত্যক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার চার প্রকার। এগুলো সব সমান নয়, বরং একটি অপরটির চেয়ে অগ্রগণ্যতার দাবি রাখে এবং আগে সেই খাতে ব্যয় করতে হয়। যেমন:

১ প্রথম অধিকার: পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে সর্ব প্রথম ব্যয় করা হবে মৃতের কাফন-দাফন বাবদ, যেমন জানাযা ও কাফন-দাফন সংক্রান্ত আলোচনায় ইতোপূর্বে বলা হয়েছে।

২. দ্বিতীয় অধিকার: তার ঋণ পরিশোধ করা। এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ি ও ইব্‌নে হায্‌ম আল্লাহ্‌র ঋণ যথা যাকাত ও কাফ্‌ফারাকে বান্দার ঋণের চেয়ে অগ্রগণ্য মনে করেন। কিন্তু হানাফিগণ মৃত্যুর সাথে সাথে আল্লাহ্‌র অধিকার রহিত হয় বলে মনে করেন। ফলে উত্তরাধিকারীদের উপর তা পরিশোধ করার দায়িত্ব অর্পিত হয়না। তবে তারা স্বেচ্ছায় সেটা পরিশোধ করতে পারে কিংবা মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে তা পরিশোধ করার অসিয়ত করলে পরিশোধ করতে পারে। যদি সে অসিয়ত করে তবে তা একজন অচেনা বা অনাত্মীয়কে অসিয়ত করার মতো হবে। উত্তরাধিকারী বা যাকে অসিয়ত করা হয়েছে সে কাফন দাফন ও বান্দাদের ঋণ পরিশোধের পর যে সম্পত্তি উদ্বৃত্ত থাকে তার এক চতুর্থাংশের ভেতর থেকে তা পরিশোধ করবে। এ ব্যবস্থা গৃহীত হবে তখন যখন তার কোনো উত্তরাধিকারী থাকবে। উত্তরাধিকারী না থাকলে সমগ্র সম্পত্তি থেকে পরিশোধ করা হবে। হাম্বলি ফকিহ্‌গণ সর্বাবস্থায় গোটা সম্পত্তি থেকে পরিশোধ করার পক্ষপাতী। তা ছাড়া তারা বান্দার নির্দিষ্ট সামগ্রীর ঋণ সাধারণ ঋণের আগে পরিশোধ করা জরুরি, এ ব্যাপারে একমত।

৩. তৃতীয় অধিকার: ঋণ পরিশোধের পর যে সম্পত্তি উদ্বৃত্ত থাকে তার একতৃতীয়াংশ থেকে অসিয়ত বাস্তবায়ন।

৪. চতুর্থ অধিকার: অবশিষ্ট পরিত্যক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন।

উত্তরাধিকারের মূল উপাদান: উত্তরাধিকার তিনটি উপাদানের উপস্থিতি দাবি করে:
১. উত্তরাধিকারী: অর্থাৎ এমন ব্যক্তি, যে উত্তরাধিকারের কারণসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি কারণে মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত।
২. মৃত ব্যক্তি বা এমন নিখোঁজ ব্যক্তি, যাকে মৃত গণ্য করা হয়েছে।
৩. উত্তরাধিকার বা পরিত্যক্ত সম্পত্তি ; যে সম্পত্তি বা অধিকার মৃত ব্যক্তির মালিকানা থেকে উত্তরাধিকারীর মালিকানায় হস্তান্তরিত হয়।

উত্তরাধিকারের কারণসমূহ: তিন কারণে উত্তরাধিকার পাওনা হয়ে থাকে:

১. প্রকৃত সম্পর্ক বা প্রত্যক্ষ আত্মীয়তা: আল্লাহ্ সূরা আন্‌ফালে বলেন:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ط

'আত্মীয়গণ আল্লাহ্‌র বিধানে একে অন্য অপেক্ষা অধিক হকদার।' (আনফাল: ৭৫)

২. পরোক্ষ আত্মীয়তা: যেমন রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: ক্রীতদাসকে মুক্ত করা জনিত আত্মীয়তা প্রকৃত আত্মীয়তার মত। (ইবনে হাব্বান ও হাকেম)। [প্রকৃত আত্মীয় উত্তরাধিকারী নেই এমন ব্যক্তি যখন অন্য কারো সাথে এভাবে মৈত্রী বা বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করে যে, নিজের মৃত্যুর পর একে অপরকে নিজের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বানায় এবং সে ভুলক্রমে কাউকে নিহত বা আহত করলে প্রয়োজনীয় দিয়াত বা রক্তপণ পরিশোধ করার দায়িত্ব অর্পণ করে ও অপরজন তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে, তখন যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, তা ইমাম আবু হানিফার নিকট উত্তরাধিকারের একটি কারণ হিসাবে গণ্য। কিন্তু অন্যান্যদের নিকট গণ্য নয়। প্রচলিত আইনে শেষোক্ত মতের প্রতিফলন ঘটেছে।]

৩. বিশুদ্ধ বৈবাহিক বন্ধন: আল্লাহ্ বলেন: 'তোমাদের স্ত্রীগণ যে সম্পত্তি রেখে যায়, তার অর্ধাংশ তোমাদের প্রাপ্য, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে।'

উত্তরাধিকারের শর্তাবলী: উত্তরাধিকারের জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে:

১. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু অথবা এমনভাবে নিখোঁজ হওয়া যে, বিচারকের রায়ে সে মৃত বলে ঘোষিত হয়। এ ধরনের রায় তাকে মৃত বলেই সাব্যস্ত করে। পক্ষান্তরে কোনো অন্ত:সত্ত্বা স্ত্রীর উপর কেউ আক্রমণ চালালে এবং তার ফলে সে মৃত সন্তান প্রসব করলে তাকে জীবিত গণ্য করা হবে, যদিও সে তখন মৃত।

২. মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর কার্যত জীবিত থাকা শর্ত। যেমন গর্ভজাত সন্তান। কারণ সে কার্যত জীবিত। কারণ এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, তার দেহে এখনো প্রাণ সঞ্চারিত হয়নি। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী জীবিত থাকা না থাকার বিষয় যদি অজানা থাকে যেমন ডুবে যাওয়া, আগুনে পোড়া ও বিধ্বস্ত ভবনের নিচে থাকা ব্যক্তি। এ ধরনের লোকেরা যদি বিধি মোতাবেক পরস্পরের উত্তরাধিকারী হয়ও, তবুও তারা পরস্পরের উত্তরাধিকারী গণ্য হবে না, বরং তাদের সম্পত্তি তাদের জীবিত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

৩. উত্তরাধিকার কার্যকর হওয়ার পথে নিম্নোক্ত অন্তরায়গুলো না থাকা।

উত্তরাধিকারের অন্তরায়সমূহ: সে ব্যক্তি উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে, যে উত্তরাধিকার লাভের সমস্ত যোগ্যতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তার সেই সব যোগ্যতা কেড়ে নেয়া হয়েছে কোনো না কোনো অন্তরায় থাকার কারণে। এ ধরনের অন্তরায় চারটি:

১. দাসত্ব, চাই তা পূর্ণ দাসত্ব হোক বা আংশিক।

২. ইচ্ছাকৃত হারাম হত্যাকান্ড ঘটানো। উত্তরাধিকারী যদি তার উত্তরাধিকার দাতাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে সে সর্বসম্মতভাবে তার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। নাসায়ি বর্ণনা করেন, রসূল সা. বলেন: 'হত্যাকারীর জন্য কোনো প্রাপ্য নেই।'

ইচ্ছাকৃত ও অন্যায় হত্যাকান্ড সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ি বলেন: প্রত্যেক হত্যাই উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে, চাই তা কোনো পাগল বা অপ্রাপ্তবয়স্কের হাতে সংঘটিত হোক এবং চাই তা হক বা কিসাস বাস্তবায়ন বা অনুরূপ বৈধ প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হোক। মালেকি মযহাবের ফকিহগণ বলেন: একমাত্র ইচ্ছাকৃত অবৈধ হত্যাই উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে, চাই তা প্রত্যক্ষভাবে সংঘটিত হোক বা পরোক্ষভাবে। (মিসরীয়) আইনের ৫ম ধারায় এই মতই অনুসৃত হয়েছে। ধারাটি হলো: উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, উত্তরাধিকার দাতাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা, চাই হন্তা মূল অপরাধী হোক বা তার সহযোগী, অথবা এমন মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা, যার সাক্ষ্যের কারণে মৃত্যুদণ্ড দেয়া ও কার্যকর করা হয়, যখন এই হত্যা অবৈধ ও কোনো ওজর ব্যতীত সংঘটিত হয়, হত্যাকারী প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক ও পঁচিশ বছর বয়স্ক হয়। আইন সংগত ভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার ছিনিয়ে নেয়াকে ওজর গণ্য করা হয়।

৩. ধর্মের পার্থক্য: কোনো মুসলমান কাফেরের এবং কোনো কাফের মুসলমানের উত্তরাধিকারী হবে না। কেননা চারটি সহিহ হাদিস গ্রন্থ উসামা ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'মুসলমান কাফেরের উত্তরাধিকারী হবেনা এবং কাফের মুসলমানের উত্তরাধিকারী হবেনা।' অপর দিকে মুয়ায, মুয়াবিয়া, ইবনুল মুসাইয়াব, মাস্রূক ও নাসায়ি থেকে বর্ণিত মুসলমান কাফেরের উত্তরাধিকারী হবে, কিন্তু কাফের মুসলমানের উত্তরাধিকারী হবেনা, ঠিক যেমন মুসলমান কাফের মহিলাকে বিয়ে করতে পারে, কিন্তু কাফের মুসলিম মহিলাকে বিয়ে করতে পারেনা। কিন্তু অমুসলিমরা পরস্পরের উত্তরাধিকারী হবে। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে তারা সবাই একই ধর্মাবলম্বী।

৪. দেশের পার্থক্য: অর্থাৎ জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের পার্থক্য। জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের পার্থক্য মুসলমানদের পরস্পরের উত্তরাধিকারী হওয়ার অন্তরায় নয়, চাই দুই দেশের ব্যবধান ও দূরত্ব যতোই বেশি হোক। কিন্তু অমুসলিমদের মধ্যে দেশ, জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের পার্থক্য সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মতে, এটা তাদের মধ্যে পারস্পরিক উত্তরাধিকারের অন্তরায় নয়, যেমন মুসলমানদের মধ্যেও নয়। 'আল মুগনি'গ্রন্থে বলা হয়েছে: এক ধর্মের অনুসারীরা জাতীয়তার পার্থক্য থাকলেও পরস্পরের উত্তরাধিকারী হবে। কেননা কুরআন ও সুন্নাহ্র উক্তিসমূহের ব্যাপকতা ও

শর্তহীনতা তাদের পারস্পরিক উত্তরাধিকারের দাবি জানায়। কুরআন বা সুন্নায় এমন কোনো উক্তিই পাওয়া যায়না এবং এই মর্মে কোনো ইজ্‌মাও দেখা যায়না যে, তারা পরস্পরের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে কিয়াসেরও কোনো সুযোগ নেই। প্রচলিত আইনে এই মতই অনুসৃত হয়েছে কেবল একটি ক্ষেত্রে ব্যতীত। ইমাম আবু হানিফা বলেন, যখন ভিন্ন কোনো দেশের আইন তার বিদেশী নাগরিকদের উত্তরাধিকার দিতে অস্বীকার করে। আইনটির ৬নং ধারায় বলা হয়েছে:

'বিদেশী সরকারের অনুসৃত আইন বিদেশীদেরকে উত্তরাধিকার দিতে অস্বীকার করা ব্যতীত আর কোনো কারণে জাতীয়তার পার্থক্য মুসলমানদের মাঝে বা অমুসলমানদের মাঝে উত্তরাধিকার প্রদানের অন্তরায় সৃষ্টি করেনা।'

পরিত্যক্ত সম্পত্তির হকদার কে কে?: হানাফি মযহাব অনুযায়ী পরিত্যক্ত সম্পত্তির হকদারগণ:

১. আসহাবুল ফুরুয।
২. আত্মীয় আসাবা বা প্রকৃত আসাবা।
৩. অনাত্মীয় আসাবা বা অপ্রকৃত আসাবা।
৪. আসহাবুল ফুরুযের বাড়তি প্রাপ্য।
৫. সাবিল আরহাম বা মায়ের পক্ষের আত্মীয়।
৬. মাওলাল মুয়ালাত তথা সাবেক মনিব।
৭. অপরকে আত্মীয় বলে স্বীকৃতি দান।
৮. এক তৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত।
৯. বাইতুল মাল।

মিসরীয় আইনে পরিত্যক্ত হকদারদের ক্রমিক তালিকা নিম্নরূপ:

১. আসহাবুল ফুরুয ।
২. আত্মীয় আসাবা বা প্রকৃত আসাবা।
৩. আসহাবুল ফুরুযের বাড়তি প্রাপ্য।
৪. যাবিল আরহাম।
৫. দম্পতির একজনের বাড়তি প্রাপ্য।
৬. অনাত্মীয় আসাবা বা অপ্রকৃত আসাবা।
৭, অপরকে আত্মীয় বলে স্বীকৃতি।
৮. সমগ্র সম্পত্তি যার জন্যে অসিয়ত করা হয়।
৯. বায়তুল মাল।

১. আসহাবুল ফুরুয: আসহাবুল ফুরুয সেসব উত্তরাধিকরী, যাদের জন্য ছয়টা নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারিত রয়েছে। যথা: অর্ধাংশ, এক চতুর্থাংশ, এক অষ্টমাংশ, দুই তৃতীয়াংশ, এক তৃতীয়াংশ ও এক ষষ্ঠাংশ।

এই অংশগুলোর হকদার হচ্ছে আসহাবুল ফুরুয এবং তারা মোট বারোজন: চারজন পুরুষদের মধ্য থেকে এবং আটজন নারীদের মধ্য থেকে। পুরুষ চারজন হলো: পিতা, প্রত্যক্ষ দাদা, (চাই যত উর্ধ্বে যাক) মা শরীক ভাই ও স্বামী। আর মহিলা আটজন হচ্ছে, স্ত্রী, মেয়ে, সহোদরা বোন, পিতা শরীক বোন, মা শরীক বোন, ছেলের মেয়ে, মা, প্রত্যক্ষ দাদি, (চাই যতো উর্ধ্বে যাক) নিম্নে এই ক'জনের প্রত্যেকের বিশদ বিবরণ দেয়া যাচ্ছে:

পিতার বিভিন্ন অবস্থা: আল্লাহ্ বলেন: 'তার (মৃত ব্যক্তির) সন্তান থাকলে তার পিতামাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ। সে নি:সন্তান হলে এবং শুধু পিতামাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্য এক তৃতীয়াংশ।' (উল্লেখ্য, এ আয়াতে সন্তান দ্বারা ছেলে বা মেয়ে উভয়কে বুঝানো হয়েছে। এখানে মৃত ব্যক্তি নি:সন্তান হলে মায়ের অংশ উল্লেখ করা ও পিতার অংশ উল্লেখ না করা দ্বারা বুঝা যায়, অবশিষ্ট অংশ পিতার।)

পিতার তিন অবস্থা: এক অবস্থায় সে শুধু নির্দিষ্ট অংশ পায়, আরেক অবস্থায় সে একাধিক উত্তরাধিকারীর সাথে প্রাপ্য অংশ পায়, আরেক অবস্থায় নির্দিষ্ট ও একাধিক উত্তরাধিকারীর সাথে প্রাপ্য অংশ উভয়ই পায়।

প্রথম অবস্থা: মৃতের একজন মাত্র বা একাধিক পুরুষ সন্তান থাকলে পিতার প্রাপ্য এক ষষ্ঠাংশ।

দ্বিতীয় অবস্থা: মৃতের কোনো পুরুষ বা কন্যা সন্তান উত্তরাধিকারী না থাকলে এবং পিতা একা উত্তরাধিকারী হলে সে সমগ্র সম্পত্তি পাবে। আর মৃতের কোনো সন্তান থাকলে পিতা আসহাবুল ফুরুযের অবশিষ্টদের সাথে প্রাপ্য অংশ পাবে।

তৃতীয় অবস্থা: পিতার সাথে যদি মৃতের কোনো কন্যা সন্তান থাকে, তবে পিতা নির্দিষ্ট এক ষষ্ঠাংশ তো পাবেই, সেই সাথে আস্হাবুল ফুরুযের সাথে প্রাপ্য অংশও পাবে।

প্রত্যক্ষ দাদার অবস্থা: দাদা দু'রকম: প্রত্যক্ষ দাদা ও পরোক্ষ দাদা।

প্রত্যক্ষ দাদা হলো সেই দাদা, যার সাথে মৃতের সম্পর্ক কোনো নারীর মাধ্যম ব্যতীত সরাসরিভাবে হওয়া সম্ভব, যেমন পিতার পিতা। আর পরোক্ষ দাদা হলো, মৃতের সাথে যার সম্পর্ক একজন নারির মাধ্যমে ব্যতীত হয়না, যেমন মায়ের পিতা (নানা), প্রত্যক্ষ দাদা অর্থাৎ পিতার পিতার উত্তরাধিকার সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত। ইম্রান ইবনে হাছীন রা. থেকে বর্ণিত: এক ব্যক্তি রসূল সা. এর নিকট এসে বললো: আমার ছেলের ছেলে মারা গেছে। তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে আমি কতটুকু পাবো? তিনি বললেন: তুমি এক ষষ্ঠাংশ পাবে। অত:পর যখন সে রওনা হলো, অমনি তিনি তাকে ডেকে বললেন: তুমি এক ষষ্ঠাংশ পাবে। তারপর যখন সে রওনা হলো, অমনি তাকে আবার ডেকে বললেন: তুমি আরো এক ষষ্ঠাংশ পাবে। তারপর যখন সে চলে যেতে উদ্যত হলো, অমনি ডেকে বললেন: অপর এক ষষ্ঠাংশ জীবিকা। (আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিযি)।

মৃতের পিতা যখন জীবিত থাকে তখন প্রত্যক্ষ দাদার অংশ বিলুপ্ত হয়। পিতা জীবিত না থাকলে চারটি ক্ষেত্রে ব্যতীত দাদা পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়। সেই চারটি ক্ষেত্র হলো:

১. পিতা জীবিত থাকলে পিতার মা (দাদি) উত্তরাধিকারী হয়না। কেননা সে পিতার সাথে যুক্ত থাকে। সে শুধু দাদা জীবিত থাকলে তার সাথে উত্তরাধিকারী হয়।

২. মৃত ব্যক্তি যখন তার পিতামাতা ও স্বামী-স্ত্রীর একজনকে রেখে যায় তখন স্বামী-স্ত্রীর একজনকে নির্দিষ্ট অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ মা পাবে। কিন্তু যখন পিতার পরিবর্তে দাদা থাকে তখন মা সমগ্র সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবে। উমর রা. এই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন।

৩. পিতা বিদ্যমান থাকলে সহোদর ভাইবোনরা এবং বৈমাত্রেয় ভাইবোনরা উত্তরাধিকার পাবেনা। তবে দাদা থাকলে তার কারণে সহোদর ভাই-বোনরা ও পিতাশরিক ভাইবোনরা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেনা। এটা ইমাম শাফেয়ি, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম মালেকের মত। ইমাম আবু হানিফা বলেন: পিতার কারণে যেমন তারা বঞ্চিত হয়, তেমনি দাদার কারণেও বঞ্চিত হবে। তাদের উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। (মিসরীয়) উত্তরাধিকার আইনে প্রথমোক্ত মতটি অনুসৃত হয়েছে।

বৈপিত্রেয় ভাইয়ের বিভিন্ন অবস্থা: আল্লাহ্ বলেন:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَّلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ج فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

'যদি পিতামাতা ও সন্তানহীন কোনো পুরুষ অথবা নারির উত্তরাধিকারী থাকে তার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা ভগ্নী, তবে প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ। তারা এর চেয়ে অধিক হলে সকলে সমঅংশীদার হবে এক তৃতীয়াংশে।' (সূরা নিসা, আয়াত ১২)।

আয়াতে উল্লিখিত 'কালালা' অর্থ যার পিতা ও সন্তান নেই। আর ভাই ও বোন অর্থ বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন। আয়াতটি থেকে জানা যায়, এদের তিনটি অবস্থা:

১. এক ব্যক্তির জন্য একষষ্ঠাংশ, চাই পুরুষ হোক বা নারী।
২. দুই বা ততোধিক ব্যক্তির জন্যে এক তৃতীয়াংশ এবং এতে পুরুষ ও স্ত্রী সমান।
৩. উত্তরাধিকারী সন্তান যথা সন্তান বা ছেলের সন্তান থাকলে অথবা পিতা বা দাদা থাকলে এই ভাই-বোনেরা কোনো উত্তরাধিকার পাবেনা। তবে মা ও দাদি থাকলে পাবে।

স্বামীর বিভিন্ন অবস্থা: আল্লাহ্ বলেন:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ج فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ-

'তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ।' (সূরা নিসা, ১২)।
এ আয়াতে বলা হলো, স্বামীর দুটো অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: উত্তরাধিকারী সন্তান না থাকলে সে অর্ধেক সম্পত্তি পাবে। এই সন্তান উক্ত স্বামীর ঔরসজাত হোক বা অন্য স্বামীর ঔরসজাত হোক, তাতে কিছু যায় আসেনা। সন্তান দ্বারা ছেলে মেয়ে ও ছেলের মেয়ে বুঝায়।

দ্বিতীয় অবস্থা: উত্তরাধিকারী সন্তান থাকলে স্বামী এক চতুর্থাংশ সম্পত্তি পাবে।

স্ত্রীর অবস্থা: আল্লাহ্ বলেন:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ج فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ....

'তোমাদের সন্তান না থাকলে তোমাদের স্ত্রীদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ, আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ।' (সূরা নিসা, ১২)
এ আয়াত থেকে জানা গেল স্ত্রীর দু'টি অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: স্বামীর উত্তরাধিকারী সন্তান না থাকলে সে এক চতুর্থাংশ পাবে। চাই এ সন্তান তার উদরজাত হোক বা অন্য কারো উদরজাত।

দ্বিতীয় অবস্থা: স্বামীর উত্তরাধিকারী সন্তান থাকলে স্ত্রী এক অষ্টমাংশ পাবে। একাধিক স্ত্রী থাকলে তারা প্রথম অবস্থায় এক চতুর্থাংশ ও দ্বিতীয় অবস্থায় এক অষ্টমাংশ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেবে।

তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী: রজয়ী (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর স্বামী স্ত্রীর ইদ্দত সমাপনের আগে মারা গেলে সে স্বামীর উত্তরাধিকার পাবে। হাম্বলি ফকিহ্গণের মতে, যে স্ত্রীকে সহবাস ও নির্জন সাক্ষাতের পূর্বে তালাক দেয়া হয়েছে, তার স্বামী যদি মৃত্যু প্রাক্কালীন রোগাবস্থায় তালাক দিয়ে ঐ রোগাবস্থায়ই মারা যায়, তবে স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিয়ে না করা পর্যন্ত উত্তরাধিকার পাবে। তবে তাকে মৃত্যুজনিত ইদ্দত পালন করতে হবে।

আধুনিক আইন মৃত্যু প্রাক্কালীন রোগাবস্থায় বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে স্ত্রী গণ্য করে, যদি স্ত্রী ঐ তালাকে অসম্মত থাকে এবং তার ইদ্দত পালনরত অবস্থায় একই রোগে স্বামী মারা যায়।

ঔরসজাত কন্যার অবস্থা: আল্লাহ্ তায়ালা বলেন: 'আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন: এক ছেলের অংশ দুই মেয়ের অংশের সমান। কিন্তু কেবল কন্যা দুইয়ের অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ। আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্যে অর্ধাংশ।'
এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে: ঔরসজাত কন্যার তিন রকম অবস্থা।
প্রথম অবস্থা: একটি মাত্র কন্যা থাকলে সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।

দ্বিতীয় অবস্থা: দুই বা ততোধিক কন্যা থাকলে এবং তাদের সাথে এক বা একাধিক পুত্র না থাকলে উক্ত দুই বা ততোধিক কন্যা পাবে দুই তৃতীয়াংশ। ইবনে কুদামা বলেন: ইবনে আব্বাসের একটি বিরল বর্ণনা ব্যতীত সমগ্র আলেম সমাজ একমত যে, দুই মেয়ের অংশ দুই তৃতীয়াংশ। ইবনে রুশ্‌দ বলেন: ইবনে আব্বাসের বহুল পরিচিত মতটি অন্য সকলের মতের অনুরূপ।

তৃতীয় অবস্থা: যখন মেয়ের সাথে এক বা একাধিক ছেলে থাকে তখন মেয়ে সকলের সাথে দুই কন্যার সমান এক ছেলে ভিত্তিতে অংশ পাবে। অনুরূপ মেয়ে বা ছেলে একাধিক হলে তখনও তদ্রূপ।

সহোদর বোনের অবস্থা: আল্লাহ্ সূরা নিসার শেষ আয়াতে বলেন:

يَسْتَفْتُوْنَكَ ط قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْ الْكَلٰلَةِ ط إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ج وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ط فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ط وَإِنْ كَانُوْا إِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

'লোকেরা তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বল, পিতামাতাহীন নি:সন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন: কোনো পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার একটা বোন থাকে, তবে সে বোনের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক এবং সে বোন যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। আর দুই বোন থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ। আর যদি ভাই বোন উভয় থাকে, তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান।'

রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'তোমরা বোনদেরকে মেয়েদের সাথে আসাব বানিয়ে নাও।'

সহোদরা বোনের পাঁচটি অবস্থা:

১. একমাত্র বোন থাকলে এবং তার সাথে কোনো সন্তান, ছেলের সন্তান, পিতা, দাদা, বা সহোদর ভাই না থাকলে, সে অর্ধেক সম্পত্তি পাবে।

২. দুই বা ততোধিক সহোদর বোন হলে, কোনো পুরুষ উত্তরাধিকারী না থাকলে দুই তৃতীয়াংশ পাবে।

৩. দুই বা ততোধিক সহোদর বোনের সাথে একজন সহোদর ভাই থাকলে উক্ত ভাই বোনদের সাথে 'দুই নারীর সমান এক পুরুষ' ভিত্তিতে উত্তরাধিকার পাবে।

৪. বোনরা মেয়েদের সাথে ও ছেলের মেয়েদের সাথে উত্তরাধিকারী হবে, তারা মেয়েদের বা ছেলের মেয়েদের অংশের পর বাদবাকি সম্পত্তি নেবে।

৫. ছেলে বা ছেলের ছেলের সাথে এবং পিতার সাথে মিলিত হলে সহোদর বোনেরা কিছুই পাবেনা। এটা ফকিহ্দের সর্বসম্মত মত। দাদা থাকলেও ইমাম আবু হানিফার মতে সহোদর বোনেরা কিছুই পাবেনা। এ ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের দ্বিমত রয়েছে, যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

বৈমাত্রেয় বোনদের অবস্থা: বৈমাত্রেয় বোনদের ছয় অবস্থা:

১. আর কোন বৈমাত্রেয় ভাই নেই, বোন নেই, সহোদর বোন নেই, এমতাবস্থায় একমাত্র বৈমাত্রেয় বোন পাবে অর্ধেক সম্পত্তি।

২. দুই বা ততোধিক বৈমাত্রেয় বোন পাবে দুই তৃতীয়াংশ।

৩. একমাত্র সহোদর বোনের সাথে পাবে এক ষষ্ঠাংশ, যাতে দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয়।

৪. এক বা একাধিক বৈমাত্রেয় বোনের সাথে যখন বৈমাত্রেয় ভাই থাকে, তখন 'দুই নারীর সমান এক পুরুষ' এই নীতির ভিত্তিতে উত্তরাধিকার পাবে।

৫. এক বা একাধিক বৈমাত্রেয় বোনের সাথে যখন মেয়ে বা ছেলের মেয়ে থাকে, তখন মেয়ে ও ছেলের মেয়ের অংশ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকবে তা তাদের হবে।

৬. নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা যুক্ত হলে বৈমাত্রেয় বোনেরা কিছুই পাবেনা:

১. উত্তরাধিকারী ছেলে বা পিতা।

২. সহোদর ভাই।

৩. সহোদরা বোন, যখন সে মেয়ে বা ছেলের মেয়ের সাথে যুক্ত হবে। কেননা সে এরূপ অবস্থায় সহোদর ভাইয়ের সমপর্যায়ে চলে যাবে। তাই তাকে বৈমাত্রেয় ভাই ও বৈমাত্রেয় বোনের চেয়ে উর্ধ্বে স্থান দেয়া হবে, যখন সে অন্যদের সাথে যুক্ত হবে।

৪. দুই সহোদরা বোনের সাথে। তবে যখন তাদের সমপর্যায়ে কোনো বৈমাত্রেয় ভাই থাকবে, তখন অবশিষ্ট সম্পত্তি 'দুই নারীর সমান এক পুরুষ' ভিত্তিতে বণ্টন করা হবে। সুতরাং মৃত ব্যক্তি যখন দু'জন সহোদর বোন, দু'য়ের অধিক বৈমাত্রেয় বোন এবং একজন বৈমাত্রেয় ভাই রেখে যাবে, তখন সহোদরা দুই বোনের জন্য দুই তৃতীয়াংশ থাকবে। আর অবশিষ্ট সম্পত্তি বৈমাত্রেয় বোনদের ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মধ্যে দুই নারীর সমান এক পুরুষ' নীতির ভিত্তিতে বণ্টন করা হবে।

ছেলের মেয়ে (পৌত্রী)দের অবস্থা: ছেলের মেয়েদের পাঁচ অবস্থা:

১. ছেলের একমাত্র মেয়ে অর্ধেক সম্পত্তি পাবে যখন তার সাথে আর কোনো ঔরসজাত সন্তান থাকেনা।

২. ছেলের দুই বা ততোধিক মেয়ে দুই তৃতীয়াংশ সম্পত্তি পাবে, যখন তাদের সাথে আর কোনো ঔরসজাত সন্তান থাকেনা।

৩. ছেলের এক বা একাধিক মেয়ে এক ষষ্ঠাংশ পাবে যখন তার সাথে একজন ঔরসজাত কন্যা সন্তান থাকবে, যাতে দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয়। তবে যখন তাদের সমপর্যায়ের কোনো ছেলে থাকবে তখন সে তাদের সাথে 'দুই মেয়ের সমান এক ছেলে' এই নীতির ভিত্তিতে উত্তরাধিকার পাবে।

৪. ছেলে থাকলে ছেলের মেয়েরা উত্তরাধিকার পাবেনা।

৫. দু'জন বা ততোধিক ঔরসজাত মেয়ে থাকলে ছেলের মেয়েরা উত্তরাধিকার পাবেনা। তবে যখন তাদের সাথে একটা সমপর্যায়ের বা নিম্নতর পর্যায়ের ছেলের ছেলে (পৌত্র) থাকবে তখন 'দুই মেয়ের সমান এক ছেলে' নীতির ভিত্তিতে উত্তরাধিকার বণ্টিত হবে।

মায়ের অবস্থা: সূরা নিসার ১১ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন: 'তার সন্তান থাকলে তার পিতামাতার প্রত্যেকের জন্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ। সে নি:সন্তান হলে এবং পিতামাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্যে এক তৃতীয়াংশ। তার ভাইবোন থাকলে মাতার জন্যে এক ষষ্ঠাংশ।'

মায়ের তিন অবস্থা: ১. তার সাথে কোনো সন্তান থাকলে, ছেলের সন্তান থাকলে, কিংবা দু'জন সহোদর, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন থাকলে এক ষষ্ঠাংশ পাবে।

২. উল্লিখিতদের কেউ না থাকলে সমগ্র সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবে।
৩. উল্লিখিতদের কেউ না থাকলে স্বামী স্ত্রীর একজনের অংশের পর নিম্নোক্ত দুই অবস্থায় অবশিষ্ট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবে:
১. যখন মৃত স্ত্রী স্বামী ও পিতামাতা রেখে যায়।
২. যখন মৃত স্বামী স্ত্রী ও পিতামাতা রেখে যায়।

দাদিদের অবস্থা: ১. কুবাইসা ইবনে যুয়াইব রা. সূত্রে বর্ণিত: জনৈকা দাদি আবু বকর রা. এর নিকট এসে তার উত্তরাধিকার চাইল। আবু বকর রা. বললেন: আল্লাহ্র কিতাবে আপনার জন্যে কিছু নির্ধারিত নেই। রসূলুল্লাহ্ সা. এর সুন্নাহ্তে কিছু আছে বলেও আমার জানা নেই। তবে এখন যান, আমি লোকজনের সাথে পরামর্শ করে নেই। অত:পর তিনি পরামর্শ করলেন মুগিরা ইবনে শু'বা বললেন: জনৈকা দাদি রসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট গিয়েছিল। তিনি তাকে এক ষষ্ঠাংশ দিয়েছিলেন। আবু বকর মুগিরাকে বললেন: তোমার সাথে আর কেউ আছে কি? তখন মুহাম্মদ ইবনে মাস্লামা আনসারী দাঁড়িয়ে মুগিরা যা বলেছেন তাই বললেন। তখন আবু বকর আগন্তুক দাদিকে এক ষষ্ঠাংশ দিলেন। এরপর আরেক দাদি উমর রা. এর নিকট এসে তার কাছে তার উত্তরাধিকার চাইল। উমর রা. বললেন: আল্লাহ্র কিতাবে আপনার জন্য কিছু নেই। তবে সেই এক ষষ্ঠাংশ আছে। আপনারা উভয়ে যদি একত্রে আসেন, তবে এই এক ষষ্ঠাংশ আপনাদের উভয়ের মধ্যে বণ্টন করে দেব। আর আপনাদের দু'জনের মধ্যে যেজন একা আসবে, সে একাই এটা পাবে।' —নাসায়ি ব্যতীত অবশিষ্ট পাঁচটি সহিহ হাদিসগ্রন্থ, তিরমিযি এটিকে সহিহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বস্তুত দাদিদের তিন অবস্থা : ১. একজন থাকলে সে একাই এক ষষ্ঠাংশ পাবে। আর একাধিক থাকলে সবাই সম্মিলিতভাবে তা পাবে। তবে শর্ত এই যে, সবাইকে সমপর্যায়ের হতে হবে। অর্থাৎ দাদি বা নানি হতে হবে।
২. নিকটতম দাদি থাকলে দূরের দাদি অংশ পাবেনা। যেমন নানি থাকলে নানির মা বা দাদার মা কোনো অংশ পাবেনা।
৩. মা থাকলে দাদি বা নানি অংশ পাবেনা। অনুরূপ পিতা থাকলে পিতৃপক্ষীয় দাদি কোনো অংশ পাবেনা। পিতা থাকলে নানি অংশ পাবে। দাদা থাকলে দাদার মা অংশ পাবেনা। কেননা সে দাদার আওতাভুক্ত।

আসাবা

সংজ্ঞা: আসাবা হচ্ছে আসেবের বহুবচন অর্থাৎ পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়গণ। নির্ধারিত অংশের অধিকারী (আসহাবুল ফুরুয) তাদের অংশ নেয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তা যারা পায় তারাই আসাবা। যদি কিছু অবশিষ্ট না থাকে তবে তারা কিছুই পাবেনা। তবে ছেলে যদি আসেব হয় তবে সে কোনো অবস্থায় বঞ্চিত হবেনা।

অনুরূপ আসাবা সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে যদি আসহাবুল ফুরুযের কেউ না থাকে, কেননা বুখারি ও মুসলিম ইব্নে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন:

ফরযগুলো (অর্থাৎ নির্ধারিত অংশগুলো) তাদের প্রাপকদেরকে দিয়ে দাও। অত:পর যা অবশিষ্ট থাকে তা (মৃত ব্যক্তির) নিকটতম পুরুষকে দাও।' (ইবনে আব্বাসের মতে, মৃত ব্যক্তি যখন একটি মেয়ে এক ভাই ও এক বোন রেখে যায়, তখন মেয়ে অর্ধেক ও ভাই অর্ধেক পাবে এবং বোন কিছুই পাবেনা।)

আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'যে কোনো মুমিনের জন্যে আমিই দুনিয়া ও আখিরাতে ঘনিষ্ঠতর। যদি চাও এই আয়াত পাঠ কর: 'নবি মুমিনদের জন্য তাদের নিজেদের চেয়েও ঘনিষ্ঠ। সুতরাং কোনো মুমিন কিছু সম্পত্তি রেখে মারা গেলে তার উত্তরাধিকারী হবে তার বিদ্যমান আসাবা। আর যে ব্যক্তি ঋণ কিংবা নি:স্ব উত্তরাধিকারী রেখে যায়, সে যেন আমার কাছে আসে। আমিই তার অভিভাবক।'

আসাবা কত প্রকার ও কী কী?: আসাবা দুই প্রকার: ১. প্রকৃত আসাবা ২. অপ্রকৃত আসাবা।

প্রকৃত আসাবা: প্রকৃত আসাবা তিন প্রকার: ১. পুরুষ আসাবা ২. স্ত্রী আসাবা ৩. পরনির্ভর আসাবা।

পুরুষ আসাবা: সেই সব পুরুষ আসাবা এর অন্তর্ভুক্ত, যাদের সাথে মৃতের সম্পর্ক স্থাপনে কোনো নারীর অনুপ্রবেশ ঘটেনা। এ ধরনের আসাবা চার প্রকার:

১. পুত্র সন্তান তথা মৃতের শাখা।
২. পিতৃপুরুষ তথা মৃতের মূল।
৩. ভাই তথা পিতার শাখা।
৪. চাচা তথা দাদার শাখা।

স্ত্রী আসাবা: স্ত্রী আসাবা হচ্ছে সেই মহিলা উত্তরাধিকারী, যে একা হলে অর্ধেক সম্পত্তি পায়, আর তার সাথে এক বা একাধিক বোন থাকলে দুই তৃতীয়াংশ পায়। তার বা তাদের সাথে কোনো ভাই থাকলে তখন সবাই সম্মিলিত আসাবায় পরিণত হবে। তারা চারটি শ্রেণি হবে:

১. এক বা একাধিক মেয়ে।
২. এক বা একাধিক বোন।
৩. সহোদর এক বা একাধিক বোন।
৪. বৈমাত্রেয় এক বা একাধিক বোন।

এই চার শ্রেণির প্রত্যেক শ্রেণি ভাই এর সাথে মিলে আসাবা হবে। তাই তাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্য হবে 'দুই নারীর সমান এক পুরুষ' এই নীতির ভিত্তিতে। (উত্তরাধিকারী ভাই না থাকলে যে নারী কোনো অংশ পায়না, সে ভাই থাকলে আসাবাভুক্ত হবেনা। তাই কোনো ব্যক্তি যদি চাচা বা ফুফু রেখে মারা যায়, তবে সমগ্র সম্পত্তি চাচা পাবে। ফুফু কিছুই পাবে না, ফুফু তার ভাই এর সাথে আসাবা হবেনা। কেননা ভাই না থাকলে সে কিছুই পেত না। ভাই এর ছেলে বোনের মেয়ের সাথেও একই রকম।)

পরনির্ভর আসাবা: পরনির্ভর আসাবা এমন মহিলাকে বলা হয়, যে আসাবা হতে অন্য মহিলার উপর নির্ভরশীল। পরনির্ভর আসাবা মাত্র দু'রকমের:

১. সহোদরা বোন বা সহোদরা বোনের মেয়ে বা ছেলের মেয়ের সাথে।
২. বৈমাত্রেয় এক বা একাধিক বোন, মেয়ে বা ছেলের মেয়ের সাথে। নির্ধারিত অংশগুলো বণ্টনের পর অবশিষ্ট সম্পত্তি তারা পাবে।

পুরুষ আসাবাকে উত্তরাধিকার প্রদানের পদ্ধতি: কিভাবে মহিলা আসাবা ও পরনির্ভর আসাবাকে উত্তরাধিকার প্রদান করতে হয়, তা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

এখন পুরুষ আসাবাকে কিভাবে উত্তরাধিকার প্রদান করতে হবে তা আলোচনা করছি: পুরুষ আসাবা চার প্রকার এবং তারা নিম্নরূপ ধারাক্রমে উত্তরাধিকার পাবে:

১. ছেলে ও ছেলের ছেলে, যত নিম্ন পর্যন্ত যাক।
২. ছেলে ও ছেলের ছেলের দিকের কাউকে না পাওয়া গেলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি পিতৃপুরুষদের দিকে স্থানান্তরিত হবে এবং তাদের মধ্যে পিতা, দাদা ও তদূর্ধ্বগণ অন্তর্ভুক্ত।
৩. পিতৃপুরুষদের মধ্য থেকে কেউ জীবিত না থাকলে ভাইয়েরা পরিত্যক্ত সম্পত্তি বা তার অবশিষ্টাংশ পাবে। আর ভাইদের মধ্যে আপন ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই, আপন ভাইয়ের ছেলেরা, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলেরা ও তদনিম্নবর্তীরা অন্তর্ভুক্ত।

৪. এ দিকের কেউ জীবিত না থাকলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বা তার অবশিষ্টাংশ চাচাদের দিকে স্থানান্তরিত হবে, চাই তারা মৃত ব্যক্তির চাচা হোক বা তার পিতা বা দাদার চাচা। তবে সর্বাবস্থায় মৃত ব্যক্তির চাচারা তার পিতার চাচাদের উপর এবং পিতার চাচারা দাদার চাচাদের উপর অগ্রাধিকার পাবে। একই পর্যায়ের

একাধিক ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে তাদের মধ্যে যিনি মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতর তিনি উত্তরাধিকার প্রাপ্তিতে অগ্রগণ্য হবেন। আর মৃত ব্যক্তির সাথে তাদের সবার সম্পর্ক যদি সমান হয়, তবে যার আত্মীয়তা অধিকতর শক্তিশালী, সে উত্তরাধিকারে অগ্রগণ্য হবে। আর সকলের আত্মীয়তা সমান শক্তিশালী হলে তারা সবাই সমভাবে উত্তরাধিকারী হবে এবং সংখ্যা অনুযায়ী তাদের মধ্যে উত্তরাধিকার বন্টিত হবে।

অপ্রকৃত আসাবা: অপ্রকৃত আসাবা হলো সাবেক মনিব, চাই পুরুষ হোক বা স্ত্রী। সাবেক মনিব না থাকলে মৃতের পুরুষ আসাবার মধ্যে উত্তরাধিকার বন্টিত হবে।

উত্তরাধিকার থেকে আংশিক বঞ্চনা ও পূর্ণ বঞ্চনা: কোনো ব্যক্তির উপস্থিতির কারণে অপর ব্যক্তি উত্তরাধিকার থেকে আংশিক বা পুরোপুরি বঞ্চিত হলে তাকে 'হুজুব' বলা হয় এবং বঞ্চিতকে বলা হয় 'মাহজুব'। আর উত্তরাধিকার প্রাপ্তিতে কোনো বিধিগত অন্তরায় সৃষ্টির কারণে কাউকে তার গোটা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করাকে 'হিরমান' ও বঞ্চিতকে 'মাহ্‌রূম' বলা হয়।

হুজুব কয় প্রকার: হুজুব দুই প্রকার: ১. উত্তরাধিকার হ্রাসকারী ২. উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চনাকারী।

উত্তরাধিকার হ্রাসকারী হুজুব হলো, অন্য কোনো ব্যক্তির উপস্থিতির কারণে উত্তরাধিকার হ্রাস পাওয়া। এটা পাঁচ ব্যক্তির কারণে হয়ে থাকে:

১. সন্তান, যার উপস্থিতির কারণে স্বামীর উত্তরাধিকার অর্ধেক থেকে সিকিতে নেমে যায়।

২. সন্তান, যার উপস্থিতিতে স্ত্রীর উত্তরাধিকার সিকি থেকে এক অষ্টমাংশে নেমে যায়।

৩. উত্তরাধিকারী সন্তানের উপস্থিতির কারণে মায়ের উত্তরাধিকার এক তৃতীয়াংশ থেকে এক ষষ্ঠাংশে নেমে যায়।

৪. ছেলের মেয়ে।

৫. বৈমাত্রেয় বোন।

উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চনাকারী হুজুব: অন্য কারো উপস্থিতির কারণে কোনো ব্যক্তির সমগ্র উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া হচ্ছে বঞ্চনাকারী হুজুব। যেমন ছেলের উপস্থিতির কারণে ভাইয়ের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া। ছয়জন উত্তরাধিকারীর উত্তরাধিকার এই ধরনের সার্বিক বঞ্চনা থেকে মুক্ত, যদিও তাদের উত্তরাধিকার থেকে আংশিক বঞ্চনা সম্ভবপর। এই ছয়জন হচ্ছে:

১-২. পিতা ও মাতা

৩-৪. ছেলে ও মেয়ে

৫-৬. স্বামী ও স্ত্রী।

এই ছয়জন উত্তরাধিকারী ব্যতীত অন্যান্য উত্তরাধিকারীর উত্তরাধিকার থেকে সার্বিক বঞ্চনার সম্ভাবনা আছে। এই সার্বিক বঞ্চনাকারী হুজুবের দুইটি ভিত্তি:

১. যে ব্যক্তির সম্পর্ক মৃত ব্যক্তির সাথে অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সে ঐ ব্যক্তির উপস্থিতিতে উত্তরাধিকারী হয়না, যেমন ছেলের ছেলে। কেননা সে ছেলের উপস্থিতিতে উত্তরাধিকারী হয়, যদিও তারা তার মাধ্যমেই মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত।

২. ঘনিষ্ঠতর ব্যক্তিকে দূরতর ব্যক্তির উপর অগ্রাধিকার দিতে হয়। তাই ছেলের কারণে ভ্রাতুষ্পুত্র বঞ্চিত হয়। সবাই যদি ঘনিষ্ঠতায় সমান হয় তবে আত্মীয়তা অধিকতর শক্তিশালী হলে অগ্রাধিকার পায়। যেমন সহোদর ভাই বৈমাত্রেয় ভাইকে বঞ্চিত করে।

মাহ্‌রূম ও মাহ্‌জুবে পার্থক্য: নিম্নোক্ত দু'টি ক্ষেত্রে মাহ্‌রূম ও মাহ্‌জুবের পার্থক্য হয়ে যায়:

১. মাহ্‌রূম আদৌ উত্তরাধিকারের হকদার নয়, যেমন হত্যাকারী। পক্ষান্তরে মাহ্‌জুব উত্তরাধিকারে হকদার। কিন্তু উত্তরাধিকার প্রাপ্তিতে তার চেয়ে অগ্রগণ্য একজনের উপস্থিতির কারণে সে বঞ্চিত।

২. উত্তরাধিকার থেকে যে ব্যক্তি মাহ্‌রূম বা বঞ্চিত, সে অন্য কিছুতে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা। তাই সে তাকে তা থেকে আদৌ বঞ্চিত করে না, বরং ওটাকে অস্তিত্বহীনের মত করে দেয়। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি একজন কাফের ছেলে ও মুসলমান ভাই রেখে মারা যায়, তবে গোটা উত্তরাধিকার ভাইয়ের। ছেলে কিছুই পাবেনা।

পক্ষান্তরে মাহ্‌জুব অন্য জিনিসে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ফলে সে কাউকে উত্তরাধিকার থেকে আংশিকভাবে বা সার্বিকভাবে বঞ্চিত করতে পারে। দুই বা ততোধিক ভাই পিতা ও মাতার উপস্থিতিতে

উত্তরাধিকার পায়না। কেননা পিতা উপস্থিত। তবে তারা উভয়ে মায়ের অংশ এক তৃতীয়াংশ থেকে এক ষষ্ঠাংশে নামাতে পারে।

আওল

সংজ্ঞা: শাব্দিক অর্থে আওল হচ্ছে উচ্চতর হওয়া, বেশি হওয়া বা পক্ষপাতিত্ব করা। কুরআনে বলা হয়েছে: ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا 'এতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা আছে।' (সূরা নিসা: ৩)।

আর ফিকহের পরিভাষায় আস্হাবুল ফুরুযের অংশ বাড়িয়ে দেয়া এবং তাদের উত্তরাধিকারের হিসসার পরিমাণ কমিয়ে দেয়াকে আওল বলা হয়। বর্ণিত আছে যে, ইসলামে সর্বপ্রথম উত্তরাধিকারের আওল করার ঘটনা ঘটেছিল ওমর রা. এর আমলে। জনৈক স্বামী ও দুই বোনের ব্যাপারে তিনি আওলের সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। তার সাথে যে সব সাহাবি ছিলেন তাদেরকে তিনি বললেন: আমি যদি প্রথমে স্বামীকে বা দুই বোনকে হিসসা দিয়ে দেই তাহলে অপর জনের পাওনা হিস্সা অবশিষ্ট থাকবেনা। কাজেই তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, কী করবো? তখন আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব তাকে আওল করার পরামর্শ দিলেন। কেউ বলেন: আলি রা. আবার কেউ বলেন, যায়েদ ইবনে সাবিত রা এই পরামর্শ দিয়েছিল।

আওলের কয়েকটি দৃষ্টান্ত: ১. জনৈকা মহিলা স্বামী, দুই সহোদরা বোন ও দুই বৈপিত্রেয় বোন রেখে মারা যায়। এটিকে শুরাইহী মাসয়ালা নামে আখ্যায়িত করা হয়। কেননা খ্যাতিমান বিচারক শুরাইহ্ স্বামীকে তার প্রাপ্য অর্ধেক সম্পত্তির পরিবর্তে দশ ভাগের ৩ ভাগ দিয়েছিলেন। তাই সে গোত্রে গোত্রে ঘুরে বলে বেড়াচ্ছিল : শুরাইহ আমাকে অর্ধেকও দিলনা, এক তৃতীয়াংশও দিলনা। সংবাদ পেয়ে শুরাইহ্ তার কাছে এলেন, তাকে শাস্তি দিলেন এবং বললেন: তুমি অপপ্রচার চালাচ্ছ এবং আওল গোপন করছ।'

২.জনৈক ব্যক্তি স্ত্রী, দুই মেয়ে, পিতা ও মাতা রেখে মারা গেল। আলি রা. কুফার মসজিদে খুতবা দেয়ার সময় বললেন: 'মহান আল্লাহ্‌র জন্য সকল প্রশংসা,যিনি অকাট্যভাবে সত্যের ফায়সালা করেন, প্রত্যেক মানুষকে তার চেষ্টার প্রতিফল দেন এবং তার কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে।' এসময় উক্ত ব্যক্তির উত্তরাধিকারের সমস্যাটা জানালে তিনি জবাব দিলেন: মহিলাটির এক অষ্টমাংশ এক নবমাংশে রূপান্তরিত হয়েছে।' তারপর তিনি তাঁর অবশিষ্ট খুতবা সম্পন্ন করেন।

যে সব মাসয়ালায় আওল হয়, তার মূল হচ্ছে ৬- ১২- ২৪ অর্থাৎ ছয় কখনো সাতে, কখনো আটে, কখনো নয়ে, কখনো দশে রূপান্তরিত হতে পারে। আর বারো কখনো তেরোতে, পনেরোতে বা সতেরোতে রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু চব্বিশ কখনো সাতাশে ব্যতীত রূপান্তরিত হয়না। আর যে সকল মাসয়ালায় আদৌ আওল হয়না, তা হচ্ছে সেই সব মাসয়ালা, যার মূল ২-৩-৪-৮ উত্তরাধিকার আইনের ১৫ নং ধারায় আওল অনুসৃত হয়েছে। ধারাটিতে বলা হয়েছে,'আসহাবুল ফুরুযের অংশগুলো যখন মোট পরিত্যক্ত সম্মত্তির চেয়ে বেশি হয়ে যাবে, তখন তা তাদের উত্তরাধিকারের অংশ অনুপাতে তাদের মধ্যে বন্টন করা হবে।'

আওলের সমস্যাগুলো সমাধানের পদ্ধতি: আপনাকে মূল মাসয়ালাটি অনুধাবন করতে হবে, প্রত্যেক হকদারের প্রাপ্য অংশ কতটুকু জানতে হবে, তারপর তাদের অংশগুলো যোগ করবেন এবং সমষ্টিকে মূল ধরে নিবেন, অত:পর মোট পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে মূল দিয়ে ভাগ দিবেন। এভাবে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ থেকে তার ভাগে কতটুকু কম পড়ে জানা যাবে। কাজেই কোনো যুলুম বা বঞ্চনা হবেনা। যেমন স্বামী ও দুই সহোদরা বোনের ব্যাপার ধরুন। মূল সম্পত্তিকে যদি ছয় ধরি,তবে স্বামীর প্রাপ্য হয় অর্ধেক অর্থাৎ তিন, আর দুই বোনের প্রাপ্য দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ চার। এভাবে সমষ্টি দাঁড়ালো সাত। কাজেই পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে সাত ভাগ করতে হবে।(মূল ছিলো ছয়। কিন্তু তাকে সাত ভাগ করে আওল করা হলো।)

রদ

সংজ্ঞা: আরবি ভাষায় রদের আভিধানিক অর্থ ফিরিয়ে দেয়া। কোথাও এর অর্থ প্রতিহত করাও হয়। ফিকহের পারিভাষায় রদ হলো আস্হাবুল ফুরুযের প্রাপ্য অংশগুলোর হকদারের ঘাটতি থাকায় যে অংশগুলো উদ্বৃত্ত থেকে যায় তা তাদের প্রাপ্য অংশের অনুপাতে তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া।

রদের মূল উপাদান: রদের প্রধান তিনটি উপাদানের উপস্থিতি ব্যতীত রদ কার্যকর হয়না। উপাদান তিনটি এই:

১. নির্দিষ্ট অংশের হকদারের উপস্থিতি (অর্থাৎ আসহাবুল ফুরুযের উপস্থিতি)।
২. পরিত্যক্ত সম্পত্তির কিছু উদ্বৃত্ত থাকা।
৩. উত্তরাধিকারের প্রাপক বা হকদারের অভাব।

রদ সম্পর্কে ফকিহ্‌দের অভিমত: রদ সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে কোনো বক্তব্য নেই। এ জন্য এ ব্যাপারে ফকিহ্‌দের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। কেউ বলেন: আস্‌হাবুল ফুরুযের কাউকে উদ্বৃত্ত থেকে কোনো অংশ রদ করা বা ফিরিয়ে দেয়া যাবেনা। বরং আস্‌হাবুল ফুরুয কর্তৃক নিজ নিজ অংশ নেয়ার পর যা উদ্বৃত্ত থাকবে এবং কোনো উত্তরাধিকারী পাওয়া যাবেনা, তা বাইতুল মালে জমা হবে। (এটা যায়েদ ইবনে সাবিত, উরওয়া, যুহ্‌রি, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ির মত)। আবার কেউ বলেন:সকল আস্‌হাবুল ফুরুযকে উদ্বৃত্ত অংশ তাদের অংশের অনুপাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। এমনকি স্বামী স্ত্রীকেও। এটা উসমান রা. এর মত।

কারো কারো মত: স্বামী, স্ত্রী পিতা ও পিতামহ ব্যতীত সকল আস্‌হাবুল ফুরুজকে উদ্বৃত্ত অংশ দেয়া হবে। সুতরাং মোট আট শ্রেণিকে উদ্বৃত্ত অংশ দেয়া হবে :

১. মেয়ে ২. ছেলের মেয়ে ৩. সহোদর বোন ৪. বৈমাত্রেয় বোন ৫. মা ৬. দাদি ৭. বৈপিত্রেয় ভাই ৮. বৈপিত্রেয় বোন বস্তুত এটাই সর্বজনগ্রাহ্য মত। এটা ওমর রা., আলি রা. অধিকাংশ সাহাবি, অধিকাংশ তাবেয়ির মত। তাছাড়া বাইতুল মালে যখন বিপর্যয় ঘটে, তখন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহ্‌মদ, ইমাম শাফিয়ি, মায্‌হাবের নির্ভরযোগ্য অংশ এবং ইমাম মালেকের কোনো কোনো শিষ্যেরও মত এটাই। তারা বলেন: স্বামী স্ত্রীকে দেয়া হবেনা এজন্য যে, একমাত্র রক্ত সম্পর্কের কল্যাণেই উদ্বৃত্ত অংশ পাওয়া যায়। অথচ দাম্পত্য সম্পর্ক হেতু এখানে রক্ত সম্পর্কের অস্তিত্ব নেই। পিতা ও পিতামহও উদ্বৃত্ত অংশ পাবেনা.। কেননা এটা শুধু উত্তরাধিকারী না থাকলেই পাওয়া যায়। অথচ পিতা ও পিতামহ উত্তরাধিকারী । কাজেই তারা অবশিষ্ট অংশ উত্তরাধিকারী সূত্রে পাবে, উদ্ধৃত্ত হিসাবে নয়। আধুনিক আইন এই মতটিকে সর্বত্রই অনুসরণ করে শুধু একটি মাসয়ালা ব্যতীত। সেই মাসলায় উসমান রা. এর মত অনুসরণ করা হয়েছে। সেখানে স্বামী স্ত্রীর একজনকে উদ্বৃত্ত অংশ দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছে। মাসয়ালাটি হলো; স্বামী স্ত্রীর একজন যখন মারা যায় এবং অপর জন ব্যতীত আর কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যায়না, তখন স্বামী স্ত্রীর মধ্য হতে যে জন জীবিত, সে উত্তরাধিকার হিসাবেও এবং রদ হিসাবেও সমগ্র পরিত্যক্ত সম্পত্তি পাবে। তবে আইনে স্বামী স্ত্রীর একজনকে উদ্বৃত্ত অংশ দেয়ার সময় অবশ্যই মাতৃপক্ষীয় আত্মীয়দের পরে দিতে হবে। ৩০ নং ধারায় বলা হয়েছে

'উত্তরাধিকারের নির্ধারিত অংশগুলো যদি গোটা পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে গ্রাস না করে এবং প্রত্যক্ষ আসাবার মধ্য থেকেও কাউকে না পাওয়া যায়, তবে অবশিষ্ট পরিত্যক্ত সম্পত্তি স্বামী স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য আসহাবুল ফুরুযকে তাদের প্রাপ্য অংশের অনুপাতে দেয়া হবে। অত:পর যেটুকু অবশিষ্ট থাকবে তা শুধু তখনই স্বামী স্ত্রীর একজনকে দেয়া হবে যখন প্রত্যক্ষ আসাবার কাউকে পাওয়া যাবেনা, কিংবা কোনো বংশীয় উত্তরাধিকারীও পাওয়া যাবেনা কিংবা কোনো মাতৃপক্ষীয় আত্মীয়ও পাওয়া যাবেনা।'

রদের সমস্যাবলী সমাধানের পদ্ধতি: আসহাবুল ফুরুযের সংগে যখন স্বামী স্ত্রীর একজন থাকে, যাকে উদ্বৃত্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি দেয়া যায়না, তখন সে মূল পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তার যে নির্দিষ্ট অংশ পাওনা থাকে তা গ্রহণ করবে।

অত:পর যেটুকু উদ্বৃত্ত থাকে তা আসহাবুল ফুরুযের জন্য থাকবে। তারা যদি একই শ্রেণির হয় তবে তাদের সংখ্যা অনুযায়ী তাদের মধ্যে বণ্টিত হবে। চাই উক্ত শ্রেণির মধ্য থেকে একজন থাকুক, যেমন এক মেয়ে অথবা একাধিক থাকুক যেমন তিন মেয়ে। আর যদি একাধিক শ্রেণির হয় যেমন মা ও মেয়ে। তাহলে উদ্বৃত্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাদের মধ্যে তাদের প্রাপ্য অংশ অনুপাতে বণ্টিত হবে এবং উদ্বৃত্ত অংশও সেই অনুপাতে রদ করা হবে। আর যদি আস্‌হাবুল ফুরুযের সাথে স্বামী স্ত্রীর একজন না থাকে, তাহলে তাদের প্রাপ্য অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা তাদেরকে তাদের সংখ্যা অনুযায়ী দেয়া হবে যদি একই শ্রেণীভুক্ত হয়। চাই উক্ত শ্রেণির মধ্য থেকে মাত্র একজন উপস্থিত থাকুক, অথবা একাধিক জন। আর যদি একাধিক শ্রেণির লোক থাকে তবে অবশিষ্টাংশ তাদেরকে তাদের অংশ অনুপাতে দেয়া হবে। এভাবে প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর অংশ তার অংশ অনুপাতে বেড়ে যাবে এবং সে অংশ ও রদ উভয় হিসাবে উত্তরাধিকার লাভ করবে।

যাবিল আরহাম: যাবিল আরহাম এমন আত্মীয়কে বলা হয়, যে কোনো নির্দিষ্ট অংশের অধিকারীও (আসহাবুল ফুরূয) নয় এবং আসাবাও নয়। ফকিহগণ তাদেরকে উত্তরাধিকার প্রদানের ব্যাপারে নানা মত পোষণ করেন।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ির মতে তারা উত্তরাধিকারের হকদার বা প্রাপক নয়। বরং পরিত্যক্ত সম্পত্তি বাইতুল মালে জমা হবে। এ মত আবু বকর রা. উমর রা. উসমান রা. যায়েদ, যুহারি, আওযায়ি ও দাউদেরও। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদের মতে তারা উত্তরাধিকারের হকদার। এ মত আলি রা. ইব্‌নে আব্বাস রা. ও ইব্‌নে মাসউদেরও, যখন আসহাবুল ফুরূয ও আসাবা থাকেনা তখন। সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব বলেন; মেয়ের সাথে মামাও উত্তরাধিকারী হয়। আধুনিক আইনে এই মতের প্রতিফলন ঘটেছে। ৩১ থেকে ৩৮ নং ধারায় তাদেরকে উত্তরাধিকার দেয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে:

ধারা ৩১: প্রত্যক্ষ আসাবা ও প্রত্যক্ষ আস্‌হাবুল ফুরুযের মধ্য থেকে যখন কাউকে পাওয়া যায়না, তখন পরিত্যক্ত সম্পত্তি বা তার অবশিষ্টাংশ যাবিল আর্‌হামের জন্য হবে।

যাবিল আরহাম চার শ্রেণির, তন্মধ্যে উত্তরাধিকারে কতকের উপর কতকের প্রাধান্য রয়েছে নিম্নোক্ত ধারাবাহিকতা অনুসারে:

প্রথম শ্রেণি: মেয়ের সন্তানেরা এবং ছেলের মেয়ের সন্তানেরা, যতো নিম্নের হোক।
দ্বিতীয় শ্রেণি: নানা যতো উর্ধ্বের হোক এবং নানি যতো উর্ধ্বের হোক।

তৃতীয় শ্রেণি: বৈপিত্রেয় ভাইদের ছেলেরা ও তাদের সন্তানরা, যতো নিচের হোক, আপন বোন বা সৎ বোনদের মেয়েরা, যতো নিচের হোক, আপন বোনদের মেয়েরা বা সৎ বোনদের মেয়েরা, যতো নিচের হোক, আপন বা বৈমাত্রেয় ভাইদের ছেলেদের মেয়েরা, যতো নিচের হোক, এবং তাদের সন্তানেরা যতো নীচের হোক।

চতুর্থ শ্রেণি: চতুর্থ শ্রেণিতে ছয়টি গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত, যাদের মধ্যে একটি অপরটি অপেক্ষা উত্তরাধিকারে অগ্রগণ্যতার দাবি রাখে। অগ্রগণ্যতা অনুসারে তাদের ধারাক্রম নিম্নরূপ:

১. মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয় চাচারা, আপন ফুফুরা, খালারা ও মামারা অথবা বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয় ফুফুরা, মামারা ও খালারা।

২. উপরিউক্তদের সন্তানেরা যতো নিচের হোক, মৃতের আপন চাচাতো বোন অথবা বৈমাত্রেয় চাচাতো বোন এবং তাদের ছেলেদের মেয়েরা যতো নিচের হোক এবং উপরোক্তদের সন্তান যতো নিচের হোক।

৩. মৃতের পিতার বৈপিত্রেয় চাচারা, তার আপন ফুফুরা, মামারা,খালারা বা বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয় ফুফুরা, মামারা,খালারা এবং মৃতের আপন চাচারা, ফুফুরা, মামারা ও খালারা অথবা মৃতের মায়ের বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয় চাচারা, ফুফুরা, মামারা ও খালারা।

৪. উপর্যোক্তদের সন্তানেরা যতো নিচের হোক, মৃতের পিতার আপন কিংবা বৈমাত্রেয় চাচাতো বোনেরা এবং তাদের পৈত্রীরা যতো নিচের হোক এবং তাদের সন্তানেরা যতো নিচের হোক।

৫. মৃতের পিতার পিতার বৈপিত্রেয় চাচারা, মৃতের মায়ের পিতার আপন অথবা বৈমাত্রেয় চাচারা এবং পিতা ও মাতা উভয়ের আপন অথবা বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয় ফুফুরা, মামারা ও খালারা। মৃতের মায়ের মায়ের চাচারা, মৃতের পিতার মায়ের চাচারা এবং মাতাও পিতা উভয়ের আপন কিংবা বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয় ফুফুরা, খালারা ও মামারা।

৬. উপর্যুক্তদের সন্তানেরা যতো নিচের হোক। মৃতের পিতার পিতার আপন অথবা বৈমাত্রেয় চাচাতো বোনেরা এবং তাদের বৈপিত্রের যতো নিচের হোক এবং উপর্যুক্তদের সন্তানেরা যতো নিচের হোক।

ধারা ৩২: যাবিল আর্‌হামের প্রথম শ্রেণিটির মধ্যে উত্তরাধিকার পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার তারাই যারা মৃতের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ জন। যদি তারা সবাই সমান ঘনিষ্ঠ হয়, তাহলে আস্‌হাবুল ফুরুযের সন্তান যাবিল আরহামের সন্তানের চেয়ে অগ্রগণ্য। আর যদি তারা সবাই ঘনিষ্ঠতায় সমান হয় এবং তাদের মধ্যে কোনো আস্‌হাবুল ফুরুযের সন্তান না থাকে অথবা সবাই আস্‌হাবুল ফুরুযের কোনো একজনের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে তারা সবাই উত্তরাধিকারের অংশীদার হবে।

ধারা ৩৩: যাবিল আর্‌হামের দ্বিতীয় শ্রেণির মধ্যে উত্তরাধিকারের সবচেয়ে বেশি হকদার তারাই যারা

মৃতের ঘনিষ্ঠতম। যদি সবাই ঘনিষ্ঠতায় সমান হয় তবে অগ্রগণ্য হবে যাবিল ফুরুযের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি। তাতেও যদি সবাই সমান হয় অর্থাৎ হয় সবাই যাবিল ফুরুযের সাথে সম্পৃক্ত, কিংবা কেউ তা নয়, তবে তারা আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতায় সমপর্যায়ের কিনা দেখতে হবে। যদি সমপর্যায়ের হয় তবে উত্তরাধিকারে সমান অংশীদার হবে। আর যদি সমপর্যায়ের না হয়, তবে পিতার আত্মীয়রা পাবে দুই তৃতীয়াংশ এবং মায়ের আত্মীয়রা এক তৃতীয়াংশ।

ধারা ৩৪: যাবিল আর্‌হামের তৃতীয় শ্রেণির মধ্যে উত্তরাধিকারের তারাই অধিক হকদার যারা মৃতের ঘনিষ্ঠতম। যদি সবাই সমান ঘনিষ্ঠ হয়, তবে তাদের ভেতরে যদি কোনো আসাবার সন্তান থাকে, তবে সে যাবিল আর্‌হামের সন্তানের চেয়ে অগ্রগণ্য বিবেচিত হবে। তাদের মধ্যে যে জন মৃতের অধিক ঘনিষ্ঠ, তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। তাদের মধ্যে যে জন পিতা ও মাতা উভয়ের সন্তান, সে বৈমাত্রেয় সন্তানের চেয়ে অগ্রগণ্য, আর শুধু বৈমাত্রেয় সন্তান শুধু বৈপিত্রেয় সন্তানের চেয়ে অগ্রগণ্য। যদি সবাই আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতায় সমান হয় তবে সবাই উত্তরাধিকারে সমান অংশীদার হবে।

ধারা ৩৫: ৩১ নং ধারায় বর্ণিত চতুর্থ শ্রেণির গোষ্ঠীগুলোর মধ্য থেকে প্রথম গোষ্ঠীটিতে, যখন পিতার গোষ্ঠীটি একা থাকে অর্থাৎ মৃতের বৈপিত্রেয় চাচারা ও ফুফুরা অথবা মায়ের গোষ্ঠীটি অর্থাৎ মৃতের মামা ও খালারা একা থাকে, তখন তাদের মধ্যে যে আত্মীয়তায় ঘনিষ্ঠতম তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। তাদের মধ্যে যে জন পিতা ও মাতা উভয়ের সন্তান সে বৈমাত্রেয় সন্তানের উপর অগ্রাধিকার পাবে। আর বৈমাত্রেয় জন অগ্রাধিকার পাবে বৈপিত্রেয় জনের উপর। আত্মীয়তায় সবাই সমান হলে সবাই সমভাবে উত্তরাধিকারের অংশীদার হবে। আর উভয় গোষ্ঠী একত্রিত হলে পিতৃপক্ষীয়দের জন্য দুই তৃতীয়াংশ ও মাতৃপক্ষীয়দের জন্য এক তৃতীয়াংশ। প্রত্যেক গোষ্ঠীর অংশ যেভাবে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে সেভাবে বণ্টন করা হবে এবং পূর্বোক্ত প্যারাদ্বয়ের বিধান তৃতীয় ও পঞ্চম গোষ্ঠীর উপর কার্যকর হবে।

ধারা ৩৬: তৃতীয় গোষ্ঠীটির ক্ষেত্রে নিকটতমকে দূরতমের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে। আর যখন সবাই সমান হবে ও পরিমণ্ডল এক হবে তখন তারা যদি আসাবার সন্তান হয় অথবা যাবিল আর্‌হামের সন্তান হয় তবে ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যদি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের হয় তবে আসাবার সন্তানকে যাবিল আর্‌হামের সন্তানের উপর অগ্রধিকার দেয়া হবে। আর যখন পরিমণ্ডল ভিন্ন ভিন্ন হবে, তখন পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়দেরকে দুই তৃতীয়াংশ ও মাতৃপক্ষীয় আত্মীয়দেরকে এক তৃতীয়াংশ দেয়া হবে। প্রত্যেক পক্ষ যে অংশ পাবে তা পূর্বোল্লেখিত পন্থায় বণ্টন করা হবে এবং উপর্যুক্ত দুই প্যারার বিধান চতুর্থ ও ষষ্ঠ গোষ্ঠীর উপর কার্যকর করা হবে।

ধারা ৩৭: পরিমণ্ডল ভিন্ন হওয়া ব্যতীত যাবিল আর্‌হামের কোনো উত্তরাধিকারীর একাধিক আত্মীয়তার সূত্র ধর্তব্য নয়।

ধারা ৩৮: যাবিল আর্‌হামের উত্তরাধিকার 'দুজন নারীর সমান একজন পুরুষ' এই নীতির ভিত্তিতে বণ্টন করা হবে।

গর্ভস্থ সন্তান: এখানে শুধু উত্তরাধিকার ও গর্ভের মেয়াদকালের গির্ভস্থ সন্তান নিয়ে আলোচনা হবে।

উত্তরাধিকারের বিচারে: গর্ভস্থ সন্তান যদি মায়ের পেটে থাকে তবে তার বিধান এক রকম, আর যদি ভূমিষ্ঠ হয় তবে তার বিধান অন্য রকম।

গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে: সন্তান যদি সম্পূর্ণ জীবিত ভূমিষ্ঠ হয় তবে সেও অন্যের উত্তরাধিকারী হবে এবং অন্যেরাও তার উত্তরাধিকারী হবে। কেননা আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন: 'নবজাতক যখন শব্দ করে তখন তার উপর উত্তরাধিকারের বিধান কার্যকর হয়।'এখানে শব্দ করার অর্থ সন্তানের জীবিত থাকার লক্ষণ। জীবনের লক্ষণ যে কোনো শব্দ করা, শ্বাস প্রশ্বাস, হাঁচি ইত্যাদি। এটা ইমাম সাওরি, আওযায়ি, শাফেয়ি ও হানাফি ফকিহদের অভিমত। আর যদি সন্তান মৃত ভূমিষ্ঠ হয় এবং সেটা তার মায়ের উপর কোনো আঘাতের কারণে না হয়, তবে সর্বসম্মতভাবে সেও উত্তরাধিকারী হবেনা এবং অন্য কেউও তার উত্তরাধিকারী হবেনা। আর যদি তার মায়ের উপর কোনো অপরাধমূলক আঘাতের কারণে সন্তান মৃত ভূমিষ্ঠ হয় তবে হানাফি মযহাব মতে সে উত্তরাধিকারী হবে এবং অন্যেরাও তার উত্তরাধিকারী হবে।

শাফেয়ি, মালেকি ও হাম্বলি ফকিহ্‌গণ বলেন: সে কোনো উত্তরাধিকারের হকদার হবেনা । শুধু দিয়াতের

এক দশমাংশ পাবে। আর এই দিয়াতের এক দশমাংশ ব্যতীত অন্য কেউও তার কাছে কোন উত্তরাধিকার পাবেনা। তার উত্তরাধিকারী হতে পারে এমন যাকেই কল্পনা করা যায় সে তার উত্তরাধিকারী হবে।

লায়েস ইবনে সাদ ও রাবিয়া ইবনে আব্দুর রহমান বলেন, গর্ভের সন্তান যদি তার মায়ের উপর কোনো আঘাতের কারণে মৃত ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে সেও কারো উত্তরাধিকারী হবেনা এবং অন্য কেউও তার উত্তরাধিকারী হবেনা। কেবল তার মা দিয়াতের এক দশমাংশ পাবে। এটা শুধু মা পাবে। কেননা গর্ভের সন্তান তার দেহেরই অংশ। আর আঘাতটা যখন একা তার উপরই পড়েছে, তখন ক্ষতিপূরণ সে একাই পাবে। আধুনিক আইনেও এই ব্যবস্থা রয়েছে।

মায়ের পেটে সন্তান: ১. মায়ের পেটে যে সন্তান থাকে, সে যখন উত্তরাধিকারী হয়না অথবা অন্যের কারণে সে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, তখন তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে কিছুই স্থগিত রাখা যাবেনা। যখন কোন ব্যক্তি স্ত্রী, পিতা এবং তার পিতা ব্যতীত অন্যের ঔরসের সন্তান গর্ভে ধারণকারিণী মাতাকে রেখে মারা যায়, তখন এই গর্ভস্থ সন্তান কোনো উত্তরাধিকার পাবেনা। কেননা এই সন্তান বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন ছাড়া অন্য কিছু হতে পারেনা। আর আসল উত্তরাধিকারী পিতার সাথে বৈপিত্রেয় ভাই-বোন উত্তরাধিকারী হয়না।

২. গর্ভের সন্তান যদি উত্তরাধিকারী হয় এবং তার সাথে আর কোনো উত্তরাধিকারী একেবারেই না থাকে অথবা তার সাথে এমন একজন উত্তরাধিকারী থাকে, যে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত, তবে গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তির বন্টন স্থগিত রাখা হবে। অনুরূপ যখন উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত নয় এমন উত্তরাধিকারীরা তার সাথে থাকবে এবং তারা সবাই স্পষ্টভাবে,মৌনভাবে বা বন্টনের দাবি না জানানোর মাধ্যমে বন্টন স্থগিত রাখতে সম্মত থাকে তাহলেও বন্টন স্থগিত রাখা হবে।

৩. গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে যে উত্তরাধিকারীর হিসসা পরিবর্তিত হয়না, তার পুরো হিসসা দিয়ে দেয়া হবে এবং অন্যদের উত্তরাধিকার বন্টন স্থগিত রাখা হবে। যেমন যখন কেউ দাদি ও গর্ভবতী স্ত্রী রেখে মারা যায় তখন দাদিকে এক ষষ্ঠাংশ দিয়ে দেয়া হবে। কেননা সন্তান ছেলে বা মেয়ে যাই হোক দাদির হিসসা অপরিবর্তিতই থাকবে।

৪. যে উত্তরাধিকারীর উত্তরাধিকার গর্ভস্থ সন্তানের দুই অবস্থার এক অবস্থায় রহিত হয় এবং অপর অবস্থায় রহিত হয় না, তাকে কোনো অংশ দেয়া হবেনা।কেননা তার প্রাপ্য অংশ নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। যেমন কেউ যদি ভাই ও গর্ভবতী স্ত্রীকে রেখে মারা যায় তবে ভাই কিছুই (আপাতত) পাবেনা। কারণ গর্ভস্থ সন্তান ছেলে হতে পারে। এটা অধিকাংশ আলেমের মত।

৫. গর্ভস্থ সন্তানের লিংগভেদে আসহাবুল ফুরুযের মধ্য হতে যার অংশ পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাকে দুই অংশের মধ্যে যেটি ক্ষুদ্রতর সেটি দেয়া হবে এবং বৃহত্তর অংশ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখা হবে। সন্তান যদি জীবিত ভূমিষ্ঠ হয় এবং বৃহত্তর অংশ তার প্রাপ্য হয়, তবে সে বৃহত্তর অংশটি নেবে। আর যদি বৃহত্তর অংশ তার প্রাপ্য না হয় বরং ক্ষুদ্রতর অংশ প্রাপ্য হয় তবে সে সেটি নেবে এবং অবশিষ্টাংশ সে উত্তরাধিকারীদেরকে ফেরত দেবে। যদি মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তবে সে কিছুই পাবেনা এবং সমগ্র পরিত্যক্ত সম্পত্তি নবজাতককে ভ্রুক্ষেপ না করেই উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করা হবে।

গর্ভের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মেয়াদ: গর্ভের সন্তানের পূর্ণতা লাভ ও জীবিত ভূমিষ্ঠ হওয়ার সর্বনিম্ন মেয়াদ ছয় মাস। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلٰثُونَ شَهْرًا- 'তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তাকে স্তন ছাড়াতে ত্রিশ মাস লাগে'। (সূরা আহ্কাফ, আয়াত ১৫) এবং وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ- 'তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে' (সূরা লুকমান, আয়াত ১৪) দুধ ছাড়াতে যখন দু'বছর লাগে, তখন ছয় মাসের বেশি অবশিষ্ট থাকেনা। এটাই অধিকাংশ আলেমের মত।

হানাফি ফকিহ্ কামাল ইবনে হুমাম বলেন: সচরাচর গর্ভের মেয়াদ ছয় মাসের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। ঠিক ছয় মাসে সন্তান হওয়ার কথা যুগ যুগ কাল পরও কদাচিৎ শোনা যায়। কোনো কোনো হাম্বলি ফকিহ্ের মতে গর্ভের ন্যূনতম মেয়াদ নয় মাস।

আধুনিক আইনে অধিকাংশ আলেমের মতের বিরোধিতা করে কতিপয় হাম্বলি ফকিহ ও শরিয়তানুগত চিকিৎসকের মতানুসারে গর্ভের সর্বনিম্ন মেয়াদ নয়টি চন্দ্রমাস অর্থাৎ ২৭০ দিন ধার্য করা হয়েছে। কেননা

এটা অধিকাংশের মতের সাথে সংগতিপূর্ণ। গর্ভের সর্বনিম্ন মেয়াদের ন্যায় সর্বোচ্চ মেয়াদের ব্যাপারেও ফকিহ্‌দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফি ফকিহ্‌দের মতে দুই বছর, মালিকি ফকিহ্ মুহাম্মদ ইবনুল হাকামের মতে নয় মাস এবং কারো কারো মতে এক চান্দ্র বৎসর অর্থাৎ ৩৫৪ দিন। আধুনিক আইনে শরিয়ত সম্মত চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতানুসারে এক সৌর বছর (৩৬৫ দিন) ধার্য করেছে এবং এটিকে সন্তানের বংশ, উত্তরাধিকার, ওয়াক্ফ ও অসিয়ত নির্ধারণের ভিত্তি গণ্য করেছে।

ইমাম আবু ইউসুফের মতের উপর হানাফি মযহাবের ফতোয়ার ভিত্তি। আধুনিক আইন তার সেই মতকেই গ্রহণ করেছে। সেটি হলো, কুরআনের দুই আয়াতের যেটাতে বৃহত্তর মেয়াদ উল্লেখ করা হয়েছে, সেটাই গর্ভের সর্বোচ্চ মেয়াদ। আধুনিক আইন তিন ইমামের এই মতকেও অনুসরণ করেছে যে, সন্তানের জীবিত ভূমিষ্ঠ হওয়া তার উপর উত্তরাধিকার আইন প্রযোজ্য হওয়ার শর্ত, মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর বা স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদের এক বছরের মধ্যে সন্তানের জন্ম হওয়া তার উত্তরাধিকার লাভের শর্ত---- মুহাম্মদ ইবনে হাকামের এ মতও আধুনিক আইনে গৃহীত হয়েছে। ৪২, ৪৩ ও ৪৪নং ধারায় বলা হয়েছে:

৪২ নং ধারা: মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে গর্ভস্থ সন্তানের জন্য নারী বা পুরুষ হিসাবে যে অংশ বৃহত্তর, সেটা রেখে দিতে হবে।

৪৩ নং ধারা: স্বামী যখন স্ত্রীকে বা ইদ্দত পালনরতা স্ত্রীকে রেখে মারা যাবে, তখন তার গর্ভস্থ সন্তান কেবল তখনই তার উত্তরাধিকারী হবে যখন সে মৃত্যু বা বিচ্ছেদের দিন থেকে তিনশ পয়ষট্টি দিনের মধ্যে জীবিত ভূমিষ্ঠ হবে। এই সন্তান নিম্নের দুই অবস্থা ব্যতীত পিতা ছাড়া আর কারো উত্তরাধিকারী হবেনা।

১. যদি তার মা মৃত্যু বা বিচ্ছেদ জনিত ইদ্দত পালনরত থাকে। যদি উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া ব্যক্তি ঐ ইদ্দতেই মারা যায় এবং মৃত্যু বা বিচ্ছেদের দিন থেকে সর্বোচ্চ তিনশো পয়ষট্টি দিনের মধ্যে সন্তান জীবিত ভূমিষ্ঠ হয়।

২. মৃতের মৃত্যুর সময় যদি দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল থাকে এবং তার মৃত্যুর দিন থেকে সর্বোচ্চ দু'শো সত্তর দিনের মধ্যে জীবিত ভূমিষ্ট হয়।

৪৪ নং ধারা: যাকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার অপেক্ষায় তার প্রাপ্যের চেয়ে কম দেয়া হয়। সে তার অংশের বেশিটুকু যে উত্তরাধিকার পেয়েছে তার কাছ থেকে বাকিটুকু ফেরত নেবে। আর যদি সে পাওনার চেয়ে বেশি পেয়ে থাকে, তবে যে উত্তরাধিকারীর অংশের বেশিটুকু নিয়েছে তাকে তা ফেরত দেবে।

নিরুদ্দেশ: নিরুদ্দেশ: যখন কেউ নিখোঁজ হয়ে যায়, তার খবরাদি জানা না যায়, কোথায় থাকে এবং জীবিত আছে না মৃত, জানা না যায় এবং বিচারক তাকে মৃত ধরে নেয়, তখন তাকে নিরুদ্দেশ বলা হয়। বিচারকের সিদ্ধান্ত: এ ধরনের ব্যক্তি সম্পর্কে বিচারকের সিদ্ধান্ত হয় কোনো সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে গৃহীত হবে, যেমন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর সাক্ষ্য অথবা দীর্ঘ সময় কেটে যাওয়ার পর এমন সব আলামতের ভিত্তিতে গৃহীত হবে যা প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হবার যোগ্য নয়। প্রথমাবস্থায় যে সময় তার মৃত্যুর প্রমাণ পাওয়া যাবে তখন থেকে সে নিশ্চিত মৃত বিবেচিত হবে। দ্বিতীয় অবস্থায় যখন দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে বিচারক তাকে মৃত বলে রায় দেয় তখন তাকে কার্যত মৃত ধরা হবে। কেননা তার জীবিত থাকারও সম্ভাবনা রয়েছে।

কতদিন পরে নিরুদ্দেশকে মৃত ধরা হবে: কতদিন পরে নিরুদ্দেশ ব্যক্তিকে মৃত ধরা হবে সে ব্যাপারে ফকিহ্‌দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক বলেন: চার বছর পর। কেননা উমর রা. বলেছেন: যে মহিলার স্বামী নিখোঁজ হয়ে গেছে এবং সে কোথায় থাকে জানা যায়না, সে মহিলাকে চার বছর অপেক্ষা করতে হবে, চার বছর পর চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে, তারপর সে অন্য স্বামীকে বিয়ে করতে পারবে।'–বুখারি, শাফেয়ি।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম মালেকের সুপ্রসিদ্ধ মত এই যে, এ জন্য কোনো মেয়াদ ধার্য করা হবেনা, বরং প্রত্যেক যুগের বিচারকদের বিবেচনার উপর সমর্পিত থাকবে। আল মুগনি' গ্রন্থে যে নিরুদ্দেশের মৃত্যু সংক্রান্ত ধারণা প্রবলতর হয়নি, তার সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'তার মৃত্যু হয়েছে এ কথা নিশ্চিত ভাবে না জানা পর্যন্ত তার সম্পত্তি বণ্টন করা হবেনা, তার স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে করবেনা। অনুরূপ, এত দীর্ঘ মেয়াদ না কেটে যাওয়া পর্যন্তও তার সম্পত্তি বণ্টন করা হবেনা ও তার স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে করবেনা যত দিন পর্যন্ত সাধারণত বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকেনা। এটা কত দিন ধরা যেতে পারে তা নির্ধারণ করবে বিচারক। এটা ইমাম শাফেয়ি, ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান, ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম

আবু ইউসুফের মত। কেননা তার বেঁচে থাকাই স্বাভাবিক অবস্থা। 'ইমাম আহ্মদ বলেন: সে যতো দিন এমন ভাবে নিরুদ্দেশ হয় যে মৃত্যুর ধারণা প্রবলতর হয়, তাহলে সূক্ষ্ম চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে চার বছর অতিক্রম করার পর তার মৃত্যুর ফায়সালা করা হবে। (যুদ্ধের ময়দানে বা বহু সামরিক অভিযানের পর কেউ নিখোঁজ হলে অথবা কেউ বাড়িতে থাকা অবস্থায় এশার নামাযে বা অন্য কোনো কাজে বের হয়ে আর ফিরলো না এবং তার কোনো খবরও জানা গেলনা- এ ধরনের লোকের মতই)। আর যদি কেউ এমন সফরে থাকে, যেখানে নিরাপদে থাকার সম্ভাবনাই বেশি (যেমন হজ্জ, ব্যবসায় বা শিক্ষা সফর) তবে তার ব্যাপারও বিচারকের উপর সোপর্দ থাকবে। তিনি যতো দিন পর সমীচীন মনে করেন এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে তার জীবিত বা মৃত থাকার বিষয়ে তদন্ত করে তার মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেবেন।

যে ক্ষেত্রে মৃত্যুর ধারণা প্রবলতর হয়, সে ক্ষেত্রে আহমদের মতটি আধুনিক আইনে গৃহীত হয়েছে। সেখানে তার মতানুসারে চার বছরের মেয়াদ ধার্য করা হয়েছে। আর যে ক্ষেত্রে মৃত্যুর ধারণা প্রবলতর নয়, সে ক্ষেত্রে বিষয়টা বিচারকের মতের উপর সোপর্দ হবে।

১৯২৯ সালের ২৫ নং আইনের ২১ নং ধারায় বলা হয়েছে: এ ক্ষেত্রে যে নিরুদ্দেশ ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা প্রবলতর, তাকে তার নিখোঁজ হওয়ার তারিখ থেকে চার বছর পর মৃত বলে গণ্য করা হবে। অন্যান্য অবস্থায় কতদিন পরে তাকে মৃত ধরে নেয়া হবে তা বিচারক নির্ধারণ করবে। নিরুদ্দেশ ব্যক্তি জীবিত না মৃত তা জানবার জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে সর্বাত্মক অনুসন্ধান চালানোর পরই বিচারক এটা নির্ধারণ করবে।

নিরুদ্দেশের উত্তরাধিকার: নিরুদ্দেশ ব্যক্তি যদি কিছু সম্পত্তি রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে থাকে, তবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ততক্ষণ পর্যন্ত তার মালিকানায় থাকবে এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করা হবেনা, যতক্ষণ তার মৃত্যুর নিশ্চিত খবর না জানা যায় কিংবা বিচারক তাকে মৃত ঘোষণা না করে। যখন তার মৃত্যুর নিশ্চিত খবর জানা যাবে কিংবা বিচারক তাকে মৃত ঘোষণা করবে, তখন যারা উত্তরাধিকারী, তারা মৃত্যুর সময় বা মৃত ঘোষিত হওয়ার সময়েই উত্তরাধিকার পাওয়ার হকদার হবে। তার আগে যে মারা গেছে কিংবা তারপরে উত্তরাধিকারী হয়েছে, সে উত্তরাধিকার পাবেনা।

পক্ষান্তরে যখন সে অন্যের উত্তরাধিকারী হবে, তখন মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তার অংশ স্থগিত রাখা হবে। যখন তাকে মৃত ঘোষণা করা হবে, তখন তার স্থগিত অংশ অন্য উত্তরাধিকারীদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। আধুনিক আইনেও এ কথাই বলা হয়েছে। ৪৫ নং ধারায় বলা হয়েছে:

নিরুদ্দেশ ব্যক্তির অবস্থা স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত মৃতের উত্তরাধিকারে তার প্রাপ্য অংশ স্থগিত থাকবে। যদি জানা যায় যে, সে জীবিত তবে তার অংশ গ্রহণ করবে। আর যদি মৃত বলে জানা যায়, তবে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময়ে অন্য যারা তার উত্তরাধিকারী ছিলো, তাদেরকে এই অংশটি দেয়া হবে। মৃত ঘোষিত হওয়ার পর যদি সে জীবিত প্রমাণিত হয়, তবে অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের দখলে তার অংশের যতোটুকু অবশিষ্ট আছে তা তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেবে। (এ হচ্ছে উত্তরাধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধি, যদি তার স্ত্রী থেকে থাকে তবে সে সম্পর্কে ১৯২৯ সালের ২৫ নং আইনের ২২ নং ধারায় বলা হয়েছে:

'পূর্ববর্তী ধারায় যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে, তদনুযায়ী নিরুদ্দেশকে মৃত ঘোষণা করার পর তার স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর যেভাবে ইদ্দত পালন করতে হয় সেভাবে ইদ্দত পালন করবে এবং তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি সে সব উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করা হবে, যারা বিচারকের রায় ঘোষণার সময় বিদ্যমান ছিলো। আর ১৯২০ সালের ২৫ নং আইনের ৭নং ধারায় বলা হয়েছে: যখন নিরুদ্দেশ ব্যক্তি ফিরে আসবে অথবা জানা যাবে যে, সে জীবিত আছে, তখন তার স্ত্রীর দ্বিতীয় স্বামী যদি তার সাথে সহবাস না করে থাকে তবে সে তার সাথে সহবাস করবে। আর যদি দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর জীবিত থাকার কথা না জেনে তার সাথে সহবাস করে থাকে তবে স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামীরই থাকবে, যদি তার বিয়ে প্রথম স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দতের ভেতরে না হয়ে থাকে।')

নপুংসক

সংজ্ঞা: খুনসা বা নপুংসক বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যার পুরুষ হওয়া বা স্ত্রী হওয়া সন্দেহজনক। কেননা হয় তার পুরুষাংগ বা স্ত্রীলিংগ কোনোটাই নেই অথবা দুটোই আছে।

কীভাবে উত্তরাধিকারী হবে: যদি তার পুরুষ হওয়া স্পষ্ট হয় তবে সে পুরুষের সমান উত্তরাধিকার পাবে, আর যদি তার স্ত্রী হওয়া স্পষ্ট হয় তবে সে স্ত্রীলোকের সমান উত্তরাধিকার পাবে।

পুরুষত্ব ও স্ত্রীত্বের নিদর্শনাবলী দ্বারাই যে কোন একটি জানা যাবে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে পেশাব করা দ্বারা এটা জানা যায়। সে যদি পুরুষাংগ দ্বারা পেশাব করে তবে সে পুরুষ। আর যদি স্ত্রীলিংগ দ্বারা পেশাব করে তবে সে স্ত্রী লোক। আর যদি দুটো দিয়েই করে তবে প্রথমে যেটি দিয়ে পেশাব বের হয় সেটি অনুযায়ী পরিচিত হবে। আর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর যদি তার দাড়ি গজায় কিংবা মেয়েদের কাছে যায় (সহবাসের ইচ্ছা নিয়ে) অথবা পুরুষের ন্যায় তার স্বপ্ন দোষ হয়, তবে সে পুরুষ। আর যদি মেয়েদের মত তার স্তন হয় কিংবা তা দিয়ে দুধ গড়ায় কিংবা হায়েয হয় বা গর্ভ ধারণ করে তবে সে নারী। এ সব ক্ষেত্রে তাকে বলা হবে সাধারণ নপুংসক।

কিন্তু যদি পুরুষ না স্ত্রী বুঝা না যায়, কোনো নিদর্শন দ্বারা তাকে স্পষ্ট চেনা না যায় অথবা নিদর্শনগুলো পরস্পর বিরোধী হয়, তাহলে তাকে বলা হবে জটিল নপুংসক।

ফকিহ্গণ তার উত্তরাধিকার নিয়ে মত বিরোধে লিপ্ত। ইমাম আবু হানিফা বলেন: তাকে একবার পুরুষ ধরা হবে, অত:পর পুনরায় নারী ধরা হবে। তারপর দুই অবস্থার মধ্যে যেটি খারাপ সেই অনুসারে তার সাথে লেনদেন করা হবে। এক হিসেবে যদি সে উত্তরাধিকারী হয় এবং অন্য হিসেবে উত্তরাধিকারী না হয় তবে তাকে কিছুই দেয়া হবেনা। আর যদি উভয় হিসাবে উত্তরাধিকারী হয় এবং তার হিসসা কম বেশি হয়, তাহলে তাকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হিসসাটাই দেয়া হবে। ইমাম মালেক, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমামিয়া শীয়াগণ বলেন: পুরুষ ও স্ত্রীর অংশদ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশ তাকে দেয়া হবে। ইমাম শাফেয়ি বলেন: সকল উত্তরাধিকারী ও নপুংসক উভয় অংশের মধ্যে যেটি ক্ষুদ্রতর সেটি পাবে। কেননা ওটাই তাদের উভয়ের জন্য অবশিষ্ট রয়েছে। ইমাম আহ্মদ বলেন: যদি আশা করা যায় তার প্রকৃত অবস্থা অচিরেই স্পষ্ট হবে, তাহলে প্রত্যেক উত্তরাধিকারী ও নপুংসককে ক্ষুদ্রতর অংশ দেয়া হবে ও অবশিষ্টাংশ স্থগিত রাখা হবে। আর যদি তেমন আশা না থাকে তাহলে পুরুষ ও স্ত্রীর অংশদ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশ সে গ্রহণ করবে। এই শেষোক্ত মতটিই অগ্রগণ্য। তবে আধুনিক আইন ইমাম আবু হানিফার মতকে গ্রহণ করেছে। ৪৬ নং ধারায় বলা হয়েছে: 'যে নপুংসক জটিল এবং পুরুষ না স্ত্রী চেনা যায়না, তাকে ক্ষুদ্রতর অংশ দেয়া হবে। আর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ অবশিষ্ট উত্তরাধিকারীদের দেয়া হবে।'

মুরতাদের উত্তরাধিকার: মুরতাদ কারো উত্তরাধিকারী হয়না এবং তার সম্পত্তিরও কেউ উত্তরাধিকারী হয়না। তার উত্তরাধিকার মুসলমানদের বাইতুল মালে জমা হবে। এটা ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমাদের প্রসিদ্ধতর মত। হানাফিগণ বলেন: মুরতাদ হওয়ার আগে যা কিছু উপার্জন করেছে, তার উত্তরাধিকারী হবে তার মুসলিম আত্মীয়রা। এর পরে যা কিছু উপার্জন করেছে তা বাইতুল মালের। এ ব্যাপারে 'হুদুদ' অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

জারজ ও বৈধ স্বামী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত সন্তান: বৈধ বিয়ে ব্যতীত যে সন্তানের জন্ম তা জারজ সন্তান । আর বৈধ স্বামী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত সন্তান হলো, যে সন্তানের পিতৃত্ব বৈধ স্বামী স্বীকার করেনা।

শরিয়ত স্বীকৃত পিতৃপরিচয়ের অভাবে সর্বসম্মতভাবে এই দুই সন্তানের সাথে তাদের পিতামাতার উত্তরাধিকারের সম্পর্ক নেই। কেবল তাদের মায়ের সাথে তাদের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক বিদ্যমান। ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত: জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা. এর আমলে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ তুলে 'লিয়ান' করে ও তার সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করে, রসূলুল্লাহ্ সা. উক্ত স্বামী-স্ত্রীকে বিছিন্ন করে দেন এবং সন্তানকে স্ত্রীর সাথে যুক্ত করে দেন। -বুখারি ও আবু দাউদ। আবু দাউদের ভাষ্য হলো: 'রসূলুল্লাহ্ সা. লিয়ানের সন্তানের উত্তরাধিকার তার মাকে ও তারপর তার মায়ের উত্তরাধিকারীদেরকে দিয়েছেন'। আর আইনের ৪৭ নং ধারায় বলা হয়েছে: জারজ সন্তান ও লিয়ানের সন্তান তার মা ও মায়ের আত্মীয়দের উত্তরাধিকারী হবে এবং তার মা ও মায়ের আত্মীয়রা তাদের উত্তরাধিকারী হবে।'

তাখারুজ

সংজ্ঞা: তাখারুজ হলো, উত্তরাধিকারীদের পারস্পরিক সম্পত্তিতে কোনো উত্তরাধিকারীকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোনো অংশের বিনিময়ে বা বিনিময় ব্যতীত উত্তরাধিকার থেকে বহিষ্কার করা। তাখারুজ দু'জন উত্তরাধিকারীর মধ্যেও এরূপ শর্তে হতে পারে যে, একজন আরেকজনের অংশ কোনো নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে নিয়ে নেবে।

বিধান: তাখারুজ পারস্পরিক সম্পত্তিতে হলে বৈধ। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ তার মৃত্যু প্রাক্কালীন

রোগের সময় স্বীয় স্ত্রী তামাদরকে তালাক দেন, তারপর স্ত্রীর ইদ্দত পালনরত অবস্থায় মারা যান। অত:পর উসমান রা. অন্য তিনজন মহিলাসহ তাকে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেন। অত:পর অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা তিরাশি হাজার মুদ্রা দিয়ে তার উত্তরাধিকারের এক চতুর্থায়াংশের মূল্যের জন্য তার সাথে আপোস করে।

৪৮ নং ধারায় বলা হয়েছে: 'নির্দিষ্ট কিছুর বিনিময়ে উত্তরাধিকারীদের একজন উত্তরাধিকারীকে উত্তরাধিকার থেকে বহিষ্কার করাকে তাখারুজ বলা হয়। এভাবে একজন উত্তরাধিকারী যখন আরেকজন উত্তরাধিকারীকে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে তাখারুজ করে, তখন সে অপরজনের অংশ লাভ করে ও পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তার স্থলাভিষিক্ত হয়। আর যখন উত্তরাধিকারীদের একজন অন্য সকলের সাথে তাখারুজ করে তখন যে সম্পদের বিনিময়ে এটা করে তা যদি পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ হয় তবে তার অংশ তাদের সকলের মধ্যে সকলের প্রাপ্য অনুপাতে বণ্টন করা হবে। আর যদি সেটি তাদের নিজ নিজ সম্পত্তি থেকে দেয়া হয় এবং তাখারুজের চুক্তিতে বহিষ্কৃত উত্তরাধিকারীর অংশ কিভাবে বণ্টিত হবে তার উল্লেখ না থাকে তাহলে তা তাদের মধ্যে সমান হারে বণ্টিত হবে।

৬, ৭, ৮. উত্তরাধিকার ব্যতীত পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হওয়া: উত্তরাধিকার আইনের ৪নং ধারায় বলা হয়েছে:

যখন কোনো মৃত ব্যক্তির আদৌ কোনো উত্তরাধিকারী পাওয়া যায়না তখন পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিম্নোক্ত ধারাবাহিকতা অনুযায়ী বণ্টিত হবে:

প্রথমত মৃত ব্যক্তি যে অপর ব্যক্তিকে নিজের বংশধর বলে স্বীকার করে।

দ্বিতীয়ত সম্পত্তির যে অংশের সীমার মধ্যে অসিয়ত কার্যকর হয়, তার চেয়ে বেশি অসিয়ত করে।

দুই শ্রেণির কাউকেও যখন পাওয়া যায়না তখন পরিত্যক্ত সম্পত্তি বা তার অবশিষ্টাংশ রাষ্ট্রীয় গারে জমা হবে। এর অর্থ দাঁড়ালো, মৃত ব্যক্তি যখন কোনো উত্তরাধিকারী না রেখে মারা যায় তখন ক সম্পত্তির অংশীদার হয় তিনজন:

ন অপব ব্যক্তিকে নিজের বংশধর বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি সম্পত্তির অসিয়ত করা হয় যার জন্য।

৩. বাইতুল মাল বা সরকারি কোষাগার।

এই তিনটি সম্পর্কে নিম্নে একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাচ্ছে:

যাকে নিজের বংশধর বলে দাবি করা হয়: মিসরে যে আইন প্রচলিত তা হচ্ছে: মৃত ব্যক্তি যখন অপর কোনো ব্যক্তিকে নিজের বংশধর বলে দাবি করে, তখন সেই ব্যক্তির বংশ পরিচয় যদি অজ্ঞাত হয়, তার বংশীয় সম্পর্ক অন্য কারো সাথে আছে প্রমাণিত না হয় এবং তাকে নিজের বংশধর বলে স্বীকার করার পর স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা না হয়, তবে যাকে বংশধর বলে স্বীকার করা হয়েছে সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে স্বীকৃতি দানকারীর মৃত্যুর সময় স্বীকৃতি দানকারীকে মৃত ঘোষণা করার সময় যাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে তার জীবিত থাকা এবং উত্তরাধিকারী হওয়ার পথে কোনো অন্তরায় না থাকা শর্ত। এ আইনের যে বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে: 'যাকে বংশধর বলে স্বীকার করা হয়েছে সে উত্তরাধিকারী নয়। কেননা উত্তরাধিকার প্রকৃত বংশধর প্রমাণিত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। অথচ কেবল স্বীকৃতি দিলেই বংশধর প্রমাণিত হয়না। তথাপি ফকিহগণ কোনো কোনো অবস্থায় তার উপর উত্তরাধিকারের বিধি প্রয়োগ করেছেন, যেমন এক তৃতীয়াংশের বেশির অসিয়ত যার জন্য করা হয় তার অতিরিক্ত অংশটুকু দেয়ার উপর তাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাকে মৃতের স্থলাভিষিক্ত গণ্য করেছেন, যেমন তার ক্রয় করা পণ্যকে ক্রটিযুক্ত দেখিয়ে সে ফেরত দেয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। বস্তুত সে উত্তরাধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও কেবল বাস্তবতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী গণ্য করাকে কল্যাণকর মনে করা হয়েছে।

এক তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত যার জন্য অসিয়ত করা হয়: মৃত ব্যক্তি যখন কোনো উত্তরাধিকারী না রেখেই মারা যায় এবং সে অপর কোনো ব্যক্তিকে বংশধর বলেও স্বীকার করেনা, তখন একজন অনাত্মীয়কেও সমুদয় পরিত্যক্ত সম্পত্তি বা তার অংশ বিশেষ প্রদানের অসিয়ত করা জায়েয। কেননা এক তৃতীয়াংশের মধ্যে অসিয়তকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল উত্তরাধিকারীদের স্বার্থেই। তাদের কেউ যখন নেই, তখন আর সেই সীমাবদ্ধতা রাখার বাধ্যবাধকতা নেই।

বাইতুল মাল: যখন মৃত ব্যক্তি কোনো উত্তরাধিকারী না রেখে মারা যায়, উপরন্তু কাউকে সে নিজের বংশধর বলেও স্বীকার করেনি এবং এক তৃতীয়াংশের বেশি কারো জন্য অসিয়তও করেনি, তখন তার সম্পত্তি মুসলমানদের বাইতুল মালে জমা হবে, যাতে তা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়।

ওয়াজিব অসিয়ত: হিজরি ১৩৬৫ ও খৃ: ১৯৪৬ সালে ৭১ নং ওয়াজিব অসিয়ত আইন প্রবর্তিত হয়, যার প্রধান বিধিগুলো নিম্নরূপ:

১. মৃত ব্যক্তির জীবদ্দশায় তার যে সন্তান মারা গেছে অথবা কার্যত তার সাথেই মারা গেছে বলে গণ্য হয়েছে, সে সন্তানের সন্তানকে যদি মৃত ব্যক্তি এতটা পরিমাণ সম্পত্তি দেয়ার অসিয়ত না করে গিয়ে থাকে, যা ঐ সন্তান তার মৃত্যুর সময় জীবিত থাকলে পেত, তা হলে তার মোট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের সীমার মধ্যে উক্ত অংশের সমান উক্ত সন্তানের জন্য অসিয়ত করা ওয়াজিব। তবে এ জন্য শর্ত হলো, সে যেন উত্তরাধিকারী না হয় এবং যতোটুকু তার জন্য অসিয়ত করা ওয়াজিব ততোটুকু পরিমাণ সম্পত্তি মৃত ব্যক্তি ইতোপূর্বে অন্য কোনো পদ্ধতিতে তাকে না দেয়। আর যদি তার চেয়ে কম পরিমাণে তাকে ইতোপূর্বে দিয়ে থাকে তাহলে সেই পরিমাণে তার জন্য অসিয়ত করা ওয়াজিব, যাতে তাকে যতোটুকু দেয়া ওয়াজিব তা পূর্ণ হয়।

এই অসিয়ত মেয়েদের প্রথম স্তরের সন্তানদের জন্য এবং মৃতের সেই সন্তানদের প্রথম স্তরের সন্তানদের জন্যও করতে হবে, যারা মৃতের সাথে কোনো নারীর মাধ্যমে সম্পৃক্ত নয়, চাই যতো নিম্নের হোক। এ জন্য শর্ত হলো, প্রত্যেক উর্ধ্বতন তার নিজের অধস্তনকে উত্তরাধিকার থেকে বাদ দেবে, অন্যের অধস্তনকে নয়। উপরন্তু প্রত্যেক উর্ধ্বতনের অংশ তার অধস্তনের মধ্যে বণ্টন করা হবে, যদিও তাতে উত্তরাধিকার বণ্টনের পরিমাণ নিম্নমুখী হয়। যেমন মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত উর্ধ্বতনরা যদি তার পরে মারা যেত এবং তাদের মৃত্যু প্রজাতির স্তর সমূহের মৃত্যুর মত ধারাবাহিকভাবে হতো।

২. মৃত ব্যক্তি যখন যার জন্য অসিয়ত করা ওয়াজিব তার জন্য তার প্রাপ্য অংশের চেয়ে বেশির [illegible] করে তখন অতিরিক্তটুকু হবে ইচ্ছাধীন অসিয়ত। আর যদি তার চেয়ে কম করে তবে যতোটুকু ক[illegible] তার প্রাপ্য অংশ পূর্ণ হবে ততটুকু অসিয়ত করা ওয়াজিব। আর যাদের জন্য অসিয়ত করা ওয়াজিব তাদে[illegible] কতকের জন্য করলে ও কতকের জন্য না করলে যাদের জন্য তাদের প্রাপ্য অংশ পরিমাণ অসিয়ত করেনি, তাদের জন্য অসিয়ত করা ওয়াজিব। যার জন্য অসিয়ত করা হয়নি তার অংশ এবং যার জন্য যতটা অসিয়ত করা ওয়াজিব তার চেয়ে কম করেছে তার বাকি অংশ এক তৃতীয়াংশের অবশিষ্টাংশ থেকে নেয়া হবে। সেখান থেকে নিতে গিয়ে যদি সংকুলান না হয় তবে তা থেকেও ইচ্ছাধীন অসিয়তকৃত অংশ থেকে নেয়া হবে।

৩. ওয়াজিব অসিয়ত অন্য সব ধরনের অসিয়তের উপর অগ্রগণ্য। যাদের জন্য অসিয়ত করা ওয়াজিব তাদের জন্য মৃত ব্যক্তি যখন অসিয়ত না করে এবং অন্যদের জন্য অসিয়ত করে, তখন যাদের জন্য অসিয়ত করা ওয়াজিব, তাদের প্রত্যেকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের অবশিষ্টাংশ থেকে নিজ নিজ প্রাপ্য অংশ সংকুলান হলে আদায় করে নেবে। নচেৎ সেই অংশ থেকে ও অন্যদের জন্য অসিয়তকৃত অংশ থেকে আদায় করে নেবে।

ওয়াজিব ওছিয়তের সমস্যাগুলো সমাধানের উপায়:

১. যে সন্তান পিতামাতার একজনের জীবদ্দশায় মারা গেছে, তাকে জীবিত ও উত্তরাধিকারী ধরে নিতে হবে এবং সে জীবিত থাকলে যে অংশ তার পাওনা হতো তা হিসাব করা হবে।

২. মৃত সন্তানের এই অংশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে বের করে তার সেই সন্তানকে দেয়া হবে যার জন্য অসিয়ত করা ওয়াজিব, যদি তার অংশ এক তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে কমের সমান হয়। যদি তার চেয়ে বেশি হয় তবে তাকে এক তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমিত করা হবে, অত:পর 'এক পুরুষ দুই নারীর সমান' নীতির ভিত্তিতে সন্তানদের মধ্যে বণ্টিত হবে।

৩. পরিত্যক্ত সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে শরিয়ত নির্ধারিত অংশ অনুপাতে বণ্টন করা হবে।